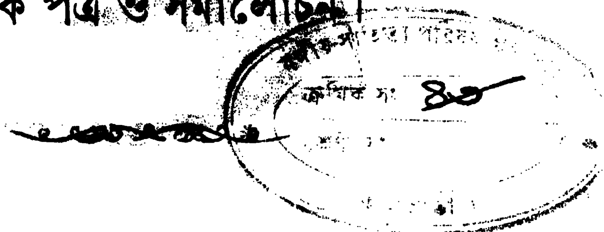
অবসর।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।



একাদশ খণ্ড।

১৩২১ - ২২

শ্রীলালবিহারী দত্ত

ও

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণি-য়্যাট্-ল

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীহরিপদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর ইলেক্‌ট্রিক মেসিন প্রেসে"
শ্রীহরিপদ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

অবসর—



জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক

সার ওয়ালটার স্কটের

"লেডি অফ দি লেক"

উপন্যাসের একটি দৃশ্য।

অবসর।

১১শ ভাগ ১৩২১। —— ১ম সংখ্যা, ভাদ্র।

অবসর।

বহু অন্বেষণে পেয়েছি তোমায়
আজি ওগো "অবসর"!
শ্রান্ত ক্লিষ্টপ্রাণে শান্তি-প্রদায়িনী
বড় তুমি নিরন্তর।
সংসার মরুর মরীচিকা-মাঝে
পড়ি যবে পিপাসায়,
ওষ্ঠাগত প্রাণ, হতাশে চাহিয়া
থাকি তব প্রতীক্ষায়;—
তুমি কোথা হ'তে সে তপ্ত পরাণে
ঢালিতে শান্তির বারি,
ধীর পদক্ষেপে দাও দরশন
সে'কালে করুণা করি।
রত্নগর্ভা তুমি ধর গর্ভে কত,
মূল্যবান উপদেশ,
বুঝি বা তোমায় না পেলে নরের
দুর্গতি হ'ত অশেষ!
হতাশের আশা ভগ্ন হৃদে বল,
ধৃতিতে বিতর সুখ,
পরিশ্রান্ত জনে শান্তি বিতরিয়া
নিবার সকল দুখ।
কাব্য আলাপন সাহিত্য বিজ্ঞান
তোমার প্রসাদে নর
পুরাণেতিহাস ধর্ম্মনীতি আদি
করে ওগো "অবসর"।
এ বিশাল বিশ্বে কোথা নিরজনে
ল'ভেছ জনম তুমি,
কিন্তু উঠিতেছে তব যশঃ ভাতি
উজ্জ্বলি ভারত ভূমি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

১

নবীন বরষে মনের হরষে
পরমেশ তব চরণে।
আশা চিরকাল কাটে যেন কাল
(ওই) রাতুল-চরণ-শরণে॥

২

এ নব বরষে পিতা পরমেশে
নব ভাবে সাজে সাজিয়ে।
মানস-কুসুম ঢালি অনুপম
যাচি পদে আজি মজিয়ে।

৩

(যেন) কর্ম্মময় ভবে নর নারী সবে
'অবসর' সদা লভিয়ে।
(করি) তব নাম গান জুড়ায় পরাণ
হরষিত মনে বসিয়ে॥

৪

(মম!) আর কিছু নাই এই ভিক্ষা চাই
শক্তি নাহি স্তুতি করিতে।
(আমি) যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
তব রূপ পাই হেরিতে॥

৫

যত মহাজন (তব) করুণাভাজন
(আমি) অভাজন আছি পড়িয়ে।
করি কৃপাদান হের ভগবান
পাপ তাপ নাশ করিয়ে॥

৬

(তব) অপরূপ রূপ ওহে বিশ্বরূপ
বিরূপ হওনা অধমে।
! পদে এ মিনতি হের বিশ্বপতি
(বড়) যাতনা পেতেছি মরমে॥

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদ্বার।

কাব্যের স্বরূপ।

বিদেশীয় বিখ্যাত সমালোচক মেকলে বলিয়াছেন যে, 'সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাই বলিয়া কালচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental Science) কখনও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় না, বরং উত্তরোত্তর উন্নতই হইতে থাকে।' সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য হইলেও কাব্যসাহিত্যে ইহা ন্যূনাধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুরুচি-সঙ্গত প্রণালীর চরম উন্নতি সাধিত হইলেও, উহা কিছুতেই উপযুক্ত কলা-সকলের প্রতি বিশ্বসাধারণের তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করাইতে পারে না। এবং অস্পষ্ট হইলেও কবির ভাষা তাহার কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযোগী। সুসভ্য সমাজের ব্যবহৃত শব্দাবলী দার্শনিক, কিন্তু অর্দ্ধসভ্য লোকের ব্যবহৃত শব্দাবলীই কবিতার উপযুক্ত।

মানবের ভাষাগত পার্থক্য আংশিক মাত্রায় তাহাদের মানসিক কার্য্য-কলাপের প্রাকৃত পরিবর্ত্তন হইতে সমুদ্ভূত এবং এই পরিবর্ত্তন দ্বারাই বিজ্ঞা-নের উন্নতি ও কাব্যের অবনতি। জ্ঞানোন্নতি বিধানের জন্য যেমন একীকরণ (Generalisation) আবশ্যক, ভাব-উদ্ভাবনের জন্যও তেমনি আবার বিশেষত্বের (Particularity) নিতান্ত প্রয়োজন। মনুষ্যের জ্ঞান ও চিন্তার আধিক্য অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি কম, শ্রেণীবিশেষের প্রতি বেশী। সুতরাং তাহারা শিব গড়াইতে বানর গড়াইয়া ফেলেন—এবং স্বরূপ-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রতিবিম্ব দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে সমধিক নিপুণ হইতে পারেন, কিন্তু বিশ্লেষণ কবির কায নহে—কবির কায বাস্তব চিত্র চিত্রিত করা।

কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ অনেকটা চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং একথা বলা যাইতে পারে না যে, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশক্তিরও হ্রস্বতা ঘটিবে। কারণ, ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রতিভা না থাকিলে জোড় করিয়া কেহ কাহাকেও কবি করিতে পারে না। বিজ্ঞান অনেকটা তথ্যাগার সদৃশ ; যদি তাহা না হইত, তবে মানব কখনও অতীত যুগের আবিষ্কৃত তথ্য জানিতে সমর্থ হইত না। বৈজ্ঞানিক তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের আবিষ্কৃত

ক্রিয়াকলাপের ছায়াবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কবি কখনও কোন বিষয়ের বর্ণনায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অনুগমন করেন না। কবি সাধারণতঃ তাঁহার অন্তর-নিহিত ভাবরাশিরই বিকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ সকল ভাব কখনও অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করেন না।

কবি শব্দ-সমুদ্র মন্থন করিয়া ভাবরাশিকে এমন ভাবে অভিব্যক্ত করেন যে, উহা স্বপ্নের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চিত্রকর যে কার্য্য রঙের সাহায্যে সম্পাদন করেন, কবি তাহা শব্দের সাহায্যে করিয়া থাকেন। চিত্রকর ও কবির মধ্যে এই যা পার্থক্য। জনৈক বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন,—

"As imagination bodies forth The forms of things unknown, the poet's pen

Turns them to shapes and gives to airy nothing

A local habitation and a name,"

বস্তুতঃও কাব্য মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এক অতি অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন-মাধুরীর সৃষ্টি করে। কবির কাব্য-রচনা করিবার নিয়মটী অভ্রান্ত, কিন্তু তিনি যে যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য-রচনা করেন, তাহাই সময়ে সময়ে ভ্রান্ত। কল্পনাপ্রসূত কাযই কাব্য—বিশেষতঃ কবি কাব্য-রচনার সময় তন্ময়চিত্তে কল্পনারই আশ্রয় লইয়া থাকেন। কবি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগামী হইতে বাধ্য নহেন, এবং তিনি স্বকীয় চিত্তবিনোদনার্থ ও পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ সময়ে সময়ে স্বীয় বক্তব্যের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কাব্য হইতে সত্যের নামগন্ধ লোপ করিতে পারেন না।

সুসভ্য সমাজে ও সাহিত্য জগতে যিনি কবিযশঃপ্রার্থী, তিনি সর্ব্বতোভাবে বালস্বভাবের অনুগামী হইবেন। যে সুগভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহার ক্রমোন্নতির অন্তরায় বোধে সেদিকে দৃষ্টিহীন হওয়াই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ পরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া কবির গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে। মেকলের মতে, 'কাব্য কেবল কল্পনার ফল এবং তজ্জন্যই উহা যৌক্তিক চিন্তার সহিত সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম।' কিন্তু একথা সম্পূর্ণ প্রমাদাত্মক। চরম সত্যও কাব্যের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইতে পারে। যদি আমরা মেকলের মত

স্বীকার করি, তবে অসভ্য লোকদিগকেও কবি স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, তাহারাও কল্পনার সন্তান এবং বিচারশক্তিহীন। স্বপ্নসদৃশ অলীক পদার্থের সৃষ্টি করাই কাব্যের উদ্দেশ্য,—একথা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। জীবনের দুর্জ্ঞেয় জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করাও কাব্যের প্রধানতম উদ্দেশ্য! অধ্যাপক সার্পসাহেব তদীয় Aspeet of Poetry নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"So far is it from being true that reason has putout imagination, that perhaps there never was a time when reason so imperatively calls imagination to her aid and when imagination enters so largely into all literary and evon into Scientific products." সুতরাং বলা অবৈধ নহে যে, অযৌক্তিক কল্পনা কাব্যের উপাদান হইবার অনুপযোগী। মেকলে একথাও বলিয়াছেন যে 'মানবের মনে বিভিন্ন চিত্র চিত্রিত করাই মহাকবি মিল্টনের কৃতিত্ব'। কিন্তু যে শক্তি থাকিলে ঐরূপ চিত্র চিত্রিত করা যাইতে পারে, বালক কিম্বা অসভ্যের পক্ষে তাহা কি সম্ভবপর? সুতরাং যদি মেকলের মত মানিয়া লওয়া যায়, তবে বিদ্যার সহিতও কাব্যের অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়া যায়; কিন্তু "Learning and wisdom may be lodged in the same brain with the highest poetry, as Lucretius, Virgil, Dante, Milton and goethe may proev." ম্যাথিউ আরনল্ডের ন্যায় মনস্বী সমালোচকও বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট কাব্যের উপদেশ ও উপাদান অনেকাংশে প্রকৃত বিষয়ের অনুরূপতা ও গভীরতা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে; এবং এই অনুরূপতা ও গভীরতা যতই বেশী হইবে, কাব্যের উৎকর্ষতাও ততই অধিক প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং কাব্য কেবল কল্পনামূলক হইতে পারে না, উহাতে সত্যের নামগন্ধও বিশেষরূপে জড়িত থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত।

সোণার হার।

(গল্প)

১

গ্রামের নবগোপাল বাবুকেই সৎ এবং বিশ্বাসী লোক মনে করিয়া হরেন্দ্র কাশী যাইবার সময় তাহার স্ত্রীর সমস্ত গহনা তাঁহারই কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গেল। নবগোপালবাবুও ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না; কেননা প্রতিবেশী হরেন্দ্রের এই সামান্য উপকারটুকু করিতে অস্বীকার করাটা তিনি নেহাইৎ অন্যায় বিবেচনা করিলেন। হরেন্দ্র নবগোপালবাবুকে গহনাগুলি বুঝাইয়া দিয়া একদিন বেশ নিশ্চিন্তমনে স্ত্রীকে লইয়া কাশী চলিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ সবেমাত্র পূবের আকাশে দেখা দিয়াছিল। নবগোপালবাবু আহারাদি শেষ করিয়া বিছানায় বসিয়া ধূমপান করিতে-ছিলেন। পার্শ্বের উন্মুক্ত জানালা দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সারা বিছানাটা আলোকিত করিয়াছিল। সেই ধপ্‌ধপে বিছানার একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড তাকিয়ার উপর নিজের কৃষ্ণবর্ণ স্থূল দেহখানি এলাইয়া দিয়া অবিরাম ভড়র্ ভড়র্ শব্দে নির্জ্জন গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন। ললাট তাঁহার ঈষৎ কুঞ্চিত। কি একটা বিষয় খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

বাহিরে পরিষ্কার আকাশে কি সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের আলো কেমন স্নিগ্ধ, কেমন চমৎকার! চারিদিকে যেন হাসির ফোয়ারা খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির ছবিতে বেশ একটা সহজ সরল ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু নবগোপালবাবুর সে সকলের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, দৃষ্টি ছিল তাঁর আপন অন্তরের ভিতর। তিনি সেখানে একটা কিছু গড়িয়া পিটিয়া ঠিক করিয়া রাখিতেছিলেন। নবগোপালবাবুর ভিতর বাহির দুই-ই সমান— দুই-ই অন্ধকারময়।

সংসারের কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া যখন পত্নী স্নেহলতা গৃহে প্রবেশ করিল, তখন নবগোপালবাবু ধূমপান সমাধা করিলেন। হুঁকাটী স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন—"ওগো শুনেছ, হরেন্দ্র আজ কাশী থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে?"

"কৈ না! সত্যি নাকি? তা কখন এল তারা?"

"সত্যি নয় ত কি আর মিথ্যে বলছি? আপদ আর থাকবে কোন চুলোয়? এই বিকেলে ৫টার সময় ফিরে এসেছে।"

"ওমা! ও আবার কি রকম কথা তোমার! আপদ কাকে ব'লছ গো? বেচারা কতদিন পরে দেশে ফিরে এসেছে। আহা, তা আস্‌বে বৈ কি! আপনার ঘর বাড়ী ফেলে বিদেশে কি আর সত্যি বেশীদিন পড়ে থাকতে ভাল লাগে?"

"কাল যে গহনাগুলো চাইতে আসবে?"

"তা তার-গহনা দিয়ে দেবে, ব্যাস্।"

"ব্যাস্! ভারী আমার ব্যাস্ শিখেছেরে! এতদিন যে আমি রাখলুম, তার দরুণ কিছু পাব না? হারটা তাকে আর আমি দিচ্ছি নে।

"তা সে অম্‌নি দিতে চাইবে কেন?"

"আরে—দিতে চাইবে না যে সে আমি জানি; কিন্তু হার যে সে আমার কাছে রেখেছিল, তার প্রমাণ কি?"

"ওমা! ঠকিয়ে নেবে তুমি?"

"তুমি মনে করেছ কি তবে! ব'লে-ক'য়ে?"

"অধর্ম্ম হবে যে!"

"ওঃ!—ভারী আমার 'ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এসেছেন গো! আপনার চরকায় তেল দাও। নিজের কায দেখ, কায দেখ। কাযকর্ম্ম সেরে শুয়ে পড়, রাত হয়েছে" বলিয়া নবগোপালবাবু শুইয়া পড়িলেন। স্নেহলতা বহুক্ষণ বকিল, কিন্তু নবগোপালবাবু আর একটীও কথা কহিলেন না। অগত্যা স্নেহলতাকে শেষে থামিতে হইল।

২

যাহা হইবার তাহাই হইল। হরেন্দ্র অন্যান্য অলঙ্কারগুলি পাইল বটে, কিন্তু হার পাইল না! অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল, ঝগড়া হইল, কিন্তু নবগোপালবাবু হার কিছুতেই বাহির করিলেন না; বলিলেন—"হার হার করে মিছে চেঁচিও না, হার আমাকে দিয়েছিলে?"

হরেন্দ্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"দিই নি? মিথ্যে কথা ফের? সেই পাথর সেট্ করা পাঁচশ টাকার হারটা? পাজি, জোচ্চোর কোথাকার

নবগোপালবাবুও রাগিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন—"গালাগালি হচ্ছে? তোর মত ছোটলোককে এখুনি আমি রীতিমত জব্দ করে

দিতে পারি জানিস্? ফের যদি পাগ্‌লামি করবি, তা হ'লে চাকর দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেব।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে কে কাকে জব্দ করে" বলিয়া হরেন্দ্র অলঙ্কারগুলি তুলিয়া লইয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে আসিয়া হরেন্দ্র পাড়ার দশজনকে ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভদ্রলোকে যে এইরূপ করিয়া প্রতিবেশীকে ঠকাইতে পারে, সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করিলেন যে তাঁহারা এই সর্ব্বপ্রথম সে কথা শুনিলেন। অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু পুলিসে সংবাদ দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায় কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহাই ঠিক হইল। হরেন্দ্র পুলিসে সংবাদ দিতে স্বীকৃত হইল। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না। নবগোপালবাবুর কাছে যে হরেন্দ্র হারটী রাখিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হয় কিরূপে? হরেন্দ্র যখন নবগোপালবাবুকে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিল, তখন তথায় কেহই ছিল না; কাযেই সাক্ষী মোটেই পাওয়া গেল না। বেচারা হরেন্দ্র যেন একেবারে দমিয়া গেল। একদিন মধ্যাহ্নে বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া হরেন্দ্র কত কি ভাবিতেছিল। ভাবনার তাহার সীমা ছিল না; সে কেবলই ভাবিয়া যাইতেছিল, কিন্তু একটী মাত্র উপায়ও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়াই তাহার দিনগুলা আজকাল কাটিয়া যাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে একবার তাহার মনে হইল—"তাই ত! লোকটা জোচ্চুরি করে আমার অমন চমৎকার হারটা গাপ্ কর্লে, আর আমি তার কিছু কর্ত্তে পারলুম না? একটুও তাকে জব্দ কর্ত্তে পারলুম না? জব্দ করা চাই, যেমন করে হোক, হার তার কাছ থেকে আদায় কর্ত্তেই হবে।" হরেন্দ্র হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় আদায় কর্ত্তে হবে।"

ঠিক এই সময় হরেন্দ্রের পত্নী সরলা গৃহে প্রবেশ করিল। স্ত্রীকে দেখিয়া হরেন্দ্র উঠিয়া বসিল। সরলা স্বামীর কাছে আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল— "আদায় তা হ'লে না করে ছাড়্‌ছ না?"

হরেন্দ্র বলিল—"নিশ্চয়ই না।"

"উপায় কিছু ঠিক করেছ? কেমন করে করবে?"

"চেষ্টার অসাধ্য কায নেই" জান ত তা? আমি কি সহজে ছাড়ব মনে করছ নাকি? দেখ, আদায় কর্ত্তে পারি কি না?

"আমি একটা কথা বলব, শুনবে?"

"কি বল না?"

"তোমার ভজহরিকে ওদের বাড়ী চাকর রেখে দাও না?"

"কি হবে তাতে?"

"ভজহরি তোমার খুব বাধ্য জানি। ওকে দিয়ে কাযটা হাসিল করে নিতে পারবে এখন।"

"তা ত বুঝলুম। কিন্তু ভজহরিকে ওরা রাখবে কেন? ওদের ত চাকর রয়েছে?"

"না না, নেই, সেটা কাল পালিয়েছে।"

"কে বল্লে তোমাকে?"

"নাপ্‌তে বৌ বল্‌ছিল। ওদের চাকরটা পালিয়ে গেছে ব'লে ওরা বুঝি তাকে একটা চাকর দেখে দিতে ব'লেছে। ভজহরিকে যদি ওখানে ঢুকিয়ে দাও তা হলে বল, আমি নাপ্‌তে বৌকে বল্‌ব এখন।"

"আচ্ছা তুমি ব'ল তাকে।"

"বেশ" বলিয়া সরলা কি একটা জিনিষ আলমারি হইতে বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র বুঝিয়াছিল, এ একটা বেশ চমৎকার উপায়; তাই মোটে দেরী করিল না, তখনই একটা ছাতা লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভজহরি একবার খুব বিপদে পড়িয়াছিল। হরেন্দ্রের পিতা অনেক চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ঢের অর্থও ব্যয় হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই ভজহরি ইঁহাদের অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। হরেন্দ্রকে সে খুব ভালবাসিত, কারণ সে তাহাকে একপ্রকার কোলেপিঠে করিয়াই মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

ভজহরির বাটী যাইয়া হরেন্দ্র পূর্ণ একঘণ্টা কাল তাহাকে বেশ করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইল। ভাল করিয়া সকল কথা শুনিয়া ভজহরি স্বীকৃত হইল, বলিল—"দোষ হবে না ত এতে?"

হরেন্দ্র বলিল—"একবার বের করে আন্‌তে পারলে সে আর এ কথা প্রকাশই কর্ত্তে পারবে না।"

ভজহরি বলিল—"যদি করে ?"

হরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কিছু হবে না। তুমি মোটেই ভয় ক'র না।"

৩

ভজহরি নবগোপালবাবুর বাটীতে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রায় পাঁচমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে পর্য্যন্ত হারের কোন কিনারা হয় নাই। হরেন্দ্র তখনও হারের কথা ভুলিতে পারে নাই, উহার স্মৃতি মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিশেষ কষ্ট দিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্র একাকী বাহিরের ঘরে একখানা ইজি চেয়ারে পড়িয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের রাস্তা বেশ সুন্দর দেখা যাইতেছিল; হরেন্দ্র একদৃষ্টে সেই পথের দিকে চাহিয়াছিল। রাস্তা দিয়া লোক যাইলেই সে মাথা তুলিয়া ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইতেছিল। ক্রমে ভজহরি সেই পথে দেখা দিল।

তাহাকে দেখিয়াই হরেন্দ্র একেবারে লাফ দিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল; কিছুক্ষণ পরে ভজহরি দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই সে বলিয়া উঠিল—"কি ভজুদা, যা অনুমান করেছিলে তাই ঠিক কি ?"

ভজহরি ধীরে ধীরে কপাটটী ভেজাইয়া দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তাই ঠিক।"

"তা হ'লে আজই করবে মনে করেছ ?"

"হ্যাঁ আজই, আর দেরী করা ভাল নয়। কি বল তুমি ?"

"আমিও তাই বলি।"

"তুমি সব ঠিক করে রেখেছ ? আজই তা হলে বেরিয়ে পড়ছ ত ?"

"হ্যাঁ, এই রাত্রেই; এখন কাযটা হ'য়ে গেলেই হয়। আর সেখানে যখন চাকরী হ'ল, তখন সেখানে থাকাই ভাল।"

"আর এখানে থাকাও ঠিক নয়। ব্যাটা বড় খারাপ লোক, এর পর নিশ্চয়ই পেছনে লাগ্‌বে।"

"সেই জন্যেই ত আরো যাচ্ছি।"

"তোমার মেয়েকে এনেছি, সে এইখানেই আছে।"

"আচ্ছা, বেশ করেছ। তা হলে এখন আমি চল্লুম। তুমি ঘুমিয়ে প'ড় না কিন্তু, আমি কায শেষ করেই এখানে আসব।"

"হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি এক কায ক'রো ত। এই কাগজটুকু সঙ্গে রেখে

দাও। বাক্সটা তুমি নিও না, যেখানে আছে সেই খানেই রেখে দিও, খালি হারটা নিও, আর এই লেখা কাগজটুকু সেই বাক্সে রেখে দিও।"

"কেন?"

"দরকার আছে।"

ভজহরি একটু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা।" তারপর—হরেন্দ্রের হাত হইতে কাগজটুকু লইয়া প্রস্থান করিল।

৪

ভজহরি যখন নবগোপালবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি মাত্র ৮'টা। নবগোপালবাবু পুত্রকন্যাকে দুইপার্শ্বে লইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় আহারে বসিয়াছিলেন, আর গৃহিনী স্নেহলতা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। ভজহরি সেখানে গেল না, যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল। চট্ করিয়া একটা উপায় ঠিক করিয়া লইয়া সে একেবারে বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল। দেখিল, সম্মুখের ঘরের দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। এদিক ওদিক চাহিয়া সে ত্বরিতপদে গৃহে প্রবেশ করিল। এই ঘর দিয়াও শয়নকক্ষে যাওয়া যায়। ভজহরি সেখানে যাইয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ার একপার্শ্বে ঘেঁসিয়া বসিলে এ ঘরটা বেশ দেখা যায়। ভজহরির ভয় হইল, পাছে কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে। কিন্তু কোন মতেই বিলম্ব করা যাইতে পারে না। ভজহরি সাহসে ভর করিয়া দরজার নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহা ভেজাইয়া দিল; কেহ লক্ষ্যও করিল না।

এখন ভজহরির মাথা হইতে ভয়ের বোঝা কতকটা নামিয়া গেল, ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে আপনার কার্য্যে অগ্রসর হইল। বিছানার একটা কোণ উল্টাইয়া বড় রকমের একটা চাবী বাহির করিল; সেটা লোহার সিন্দুকের চাবী। ভজহরি সেই চাবীর সাহায্যে সিন্দুক খুলিয়া ফেলিল। ডালা তুলিতেই একটা চক্‌চকে মখমল মোড়া বাক্স তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বাক্সটা হাতে তুলিয়া লইয়া সে খুলিল। কি সুন্দর হার! নানাবর্ণের পাথরগুলা ভজহরির চক্ষের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হারটী তুলিয়া লইয়া হরেন্দ্রপ্রদত্ত কাগজটুকু বাক্সের ভিতর রাখিয়া ডালা বন্ধ করিয়া দিল। পরে বাক্সটী যথাস্থানে রাখিয়া সাবধানে সিন্দুকে চাবী বন্ধ করিল।

কায.শেষ হইয়া গেল। ঘরের বাতাসে ভজহরির যেন দম আটকাইয়া যাইতেছিল, ঘর ছাড়িয়া পলাইবার জন্য তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। চাবীটা খাটের কোণে রাখিয়া উল্টান বিছানা ঠিক করিয়া দিয়া সে বেগে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; তখনও রান্নাঘরে হাসিগল্প চলিতেছিল। ভজহরি আর দাঁড়াইল না, সাবধানে প্রাঙ্গণে নামিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

* * * * *

কাল সপ্তমী পূজা, আজ ষষ্ঠী। ছেলে মেয়েরা দলে দলে নূতন কাপড় জামা পরিয়া বাড়ী বাড়ী ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতেছে। নবগোপালবাবু ডাকিলেন—"ওগো, শান্তিকে একবার এদিকে ডেকে দাও ত, দরকার আছে।"

স্নেহলতা কন্যা শান্তিকে সঙ্গে লইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"কেন, কি দরকার?"

নবগোপালবাবু বলিলেন—"সেই হারটা আজ ওকে প'র্‌তে দেব। আর মিছে তুলে রেখে কি হবে?"

স্নেহলতা হারের কথা শুনিতে বা তাহা দেখিতে মোটে ভালবাসিত না। তাই স্বামীর কথা শুনিয়া তাহার রাগ হইল, বলিল—"না, থাক্, ও হার প'রবে না।"

নবগোপালবাবু সিন্দুক খুলিয়া হারের বাক্স বাহির করিয়া বলিলেন—"তোমাকে ত আর পর্‌তে বলছি নে? ও পরবে না কেন? আয় ত শান্তি আমার কাছে!"

স্নেহলতা আর দাঁড়াইল না, তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিতেই একটা অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত কাল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। ও কি ও! সে দেখিল, তাহার স্বামী লোহার সিন্দুকে ঠেশ দিয়া পড়িয়া আছেন এবং কন্যা শান্তি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। হারের বাক্সটা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু হার নাই। ডালার উপর একটুকরা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্নেহলতা তাহা তুলিয়া লইয়া পড়িল—"যার জিনিষ তার কাছেই গেছে।"

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

মাতৃত্ব।

মাতার আসন বড় উচ্চে! মাতার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু জগতে আর আছেন কি না, তাহা বলা বড়ই কঠিন। জননী সন্তানের নিমিত্ত অনাহারেও দিন যাপন করেন। সন্তান যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তিনি গর্ভবেদনার সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়া তাহার মুখাবলোকন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন। দশমাস দশদিন সন্তান উদরে রাখা যে কি কষ্ট, তাহা মাতা ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না। সন্তানের কষ্ট উপস্থিত হইলে মাতা তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত কত দেবতার নিকট কত কি আরাধনা করেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হয়। সেই জন্যই মাতা অত উচ্চাসনে সমাসীনা।

এই স্বার্থপর জগতের মধ্যে মাতার ন্যায় নিস্বার্থভাবে সন্তানকে আর কে ভালবাসিতে পারে? আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বর, যদি মাতার হৃদয়ে অপার করুণা ঢালিয়া না দিতেন, তবে এই জগৎ কোন্ দিন লীন হইয়া যাইত! মাতার হৃদয় হইতে যে করুণার স্রোত মর্ত্ত্যধামে প্রবাহিত, তাহা স্বর্গের মন্দাকিনীর বারিধারার অপেক্ষাও মধুর। যিনি তাহা উপভোগ করিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্ম সুন্দররূপে অবগত আছেন। পিতার হৃদয়ে সময়ে সময়ে স্বার্থপরতা ক্রোধ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু মাতার হৃদয়ে ক্রোধ দৃষ্ট হইলেও তাহা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত। পিতা বিমাতার বশীভূত হইয়া সন্তানকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু মাতা তাহা পারেন না। মাতার হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল; কোমল হৃদয় আঘাত সহ্য করিতে পারে না। সন্তানকে যখনই অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতে দেখেন, তখনই তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে। যাহার হৃদয় যত কোমল, তাহার হৃদয় তত প্রেম ও আবেগে পরিপূর্ণ। প্রেমের নিকট স্বার্থপরতা দাঁড়াইতে পারে না। নিস্বার্থ প্রেম এমন জিনিষ, তাহা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই

এই পৃথিবীতে বহুমূল্য হীরকাদি পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিস্বার্থ প্রেম পাওয়া বড়ই দুষ্কর। স্বর্গ দেবতার সমষ্টি লইয়া গঠিত। দেবতার হৃদয়ে স্বার্থপরতা দেখা যায়, ও সেই স্বার্থপরতার জন্য স্বর্গও সময়ে সময়ে কলুষিত হয়। কিন্তু মাতার হৃদয় স্বার্থপরতায় জড়িত নয় বলিয়া, তাহা স্বর্গের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

সন্তানের যাহাতে তৃপ্তি, মাতারও তাহাতে তৃপ্তি; সন্তানের যাহাতে সুখ, মাতারও তাহাতে সুখ; সন্তানের যাহাতে দুঃখ, মাতারও তাহাতে দুঃখ।

অনেকে বলিতে পারেন, সন্তান উপযুক্ত হইলে, অসময়ে মাতাকে রক্ষা করিবে। কিন্তু এমনও সন্তান আছে যে, সে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না; কিন্তু মাতা নিয়তই তাহার মঙ্গল কামনা করেন।

চন্দ্রকিরণেও তীব্রতা আছে, মাদকতা আছে, মোহ আছে, কিন্তু মাতার স্নেহে তীব্রতা, মাদকতা বা মোহ নাই। মাতার হৃদয় সর্ব্বদাই সন্তানের হৃদয়ে স্নেহ বর্ষণ করে, তাহা সন্তান উপলব্ধি করিতে পারে না। মাতা অন্যের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন, কিন্তু সন্তানের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। সন্তান যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, মাতা তাহারই চেষ্টা করেন। দশ জনে কিসে সন্তানকে মান্য করিবে, সন্তান কিসে ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয় হইবে, মাতা তাহার চেষ্টা করিতে শোণিত-পাত করেন।

মাতার মধুর বচন শ্রবণ করিলে সমগ্র হৃদয়ের গুপ্ত ভাবগুলি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। বীণা যেমন কতকগুলি মধুর ও সুশ্রাব্য স্বর-সংযোগে গঠিত, তেমনই মাতার হৃদয় স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি সুধাসিক্ত গুণাবলী লইয়া গঠিত। বীণার বিভিন্ন তারে হস্ত প্রদান করিলে, তাহা যেমন বিভিন্ন সুর প্রদান করে, সেইরূপ সন্তানের একবিন্দু অশ্রু মাতার হৃদয়ে সমগ্র ভাবগুলি জাগাইয়া দেয়; মাতা তখন সন্তানের সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন; তিনি আপনাকে আপনি সম্যক্-রূপে বুঝিতে পারেন না। অনন্ত নীলাকাশের যেমন সীমা নাই, তাহা যেমন নীরবে অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডল, অনন্ত দৃশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে; সেইরূপ মাতার হৃদয়েরও সীমা নাই, তাহাও নীরবে অসংখ্য দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে।

সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, নিন্দা খ্যাতির মধ্য দিয়া মাতা আপন মহত্ত্ব ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেই জন্যই মাতা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপযুক্ত পাত্রী। যশের প্রতিও মাতার আকাঙ্ক্ষা নাই, নিন্দার প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষ নাই; জ্ঞানের প্রতিও তাঁহার আবেগ নাই, অজ্ঞানতার প্রতিও তাঁহার ঘৃণা নাই; সুতরাং মাতার জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। মাতার নিকট হইতে আমরা ঐ সকল গুণ ধর্ম্ম শিক্ষা করি বলিয়া ভবিষ্যতে সংসারে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই; কিন্তু যে মাতা উক্ত গুণের অধি-

কারিণী নহেন, তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে সন্তান সৎশিক্ষা লাভ করিবে! শৈশবে মানব-হৃদয় কোমল থাকে, তখন তাহাকে যেদিকে পরিচালনা করা যায়, সেই দিকেই যায়। মাতা যদি সদ্‌গুণশালিনী হন, তবে তিনি তখন হইতেই সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, অন্যথা তাহা হইতে পারে না।

মাতার হৃদয়ের সহিত সন্তানের হৃদয়ের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। মাতার হৃদয়ে যে সমস্ত ভাবাবেশ সংঘটিত হয়, সন্তানের হৃদয়েও তাহাই হয়। তাই মাতা সহজেই সন্তানের হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হন এবং সেইজন্যই শৈশবে সন্তানের হৃদয়কে সুধাময় করিয়া তুলিতে পারেন।

পুরুষের হৃদয় স্বভাবতঃ কঠোর হইলেও নারীর সংস্পর্শে আসিয়া, তাহা আবার ধীরে ধীরে কোমল ভাব ধারণ করে। সেই কোমলতা আবার মানবের যন্ত্রণাতাড়িত কঠোর হৃদয়কে ধীরে ধীরে মাতৃত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

প্রাবৃট্‌কালের জলদজালের উপর সৌদামিনী যেমন রঙ্গে ভঙ্গে খেলিতে থাকে, সেইরূপ নারীর হৃদয় নীরস সংসার-যন্ত্রণা-তাড়িত পুরুষহৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

পুরুষ মুক্তাত্মা, যতদিন না নারীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, ততদিন তাহার উদাসীন ভাব তদীয় হৃদয়ে প্রবলবেগে বহিতে থাকে। তারপর নারীর অপূর্ব্ব রূপ-গরিমায় মুগ্ধ হইলে, অনন্ত সংসারের অনন্ত কোলাহলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে; আর তাহার উদাসীনতার অস্তিত্ব থাকে না। যে নারী উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সেই নারী মানবকে সংসারে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ধীরতা, স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি গুণরাশি শিক্ষা দিতে সমর্থ। সেই নারী ধীরে ধীরে মানবকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের মধুর অস্ফুট আলোকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। স্ত্রী জাতি মানবজাতির মাতা, কেবল যে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তিনিই মাতা, তাহা নহে; যে নারী সুন্দর সদুপদেশ দান করিয়া ধীরে ধীরে মানবকে পাপের ভীষণ পথ হইতে ধর্ম্মের মধুর পথে লইয়া যান, তিনিও মাতা।

মাতাই প্রথমে শিক্ষা দেন,—পিতাকে ভক্তি করিতে, তৎপরে অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিতে, ভাই বোনকে স্নেহ করিতে, দাস দাসীকে অনুগ্রহ করিতে, প্রতিবেশীর উপকার করিতে, গরিব দুঃখীকে দয়া করিতে, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে।

সন্তান বিপদে পড়িলে, মাতা আপন তেজস্বিতায় তাহাকে উত্তেজিত করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

গৃহধর্ম্মের নিমিত্ত আমাদের যতগুলি সৎশিক্ষার আবশ্যক, আমরা তাহা প্রথমে মাতার নিকট হইতে লাভ করি। তৎপরে ধীরে ধীরে আলোচনার সহায়তায় তাহাদের পুষ্টিসাধন করিতে যত্নতৎপর হই।

জগদীশ্বর, সন্তান গর্ব্ভে জন্মিবার সময় হইতেই, জননীর স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। যদি তিনি অপার করুণা প্রকাশ না করিয়া জননীর স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ প্রদান না করিতেন, তবে এই সুখের ধরাধাম কোন্ দিন লীন হইয়া যাইত। তিনি আমাদের মাতার পিতা ও মাতা দুইই। তাঁহার হৃদয় পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এই দুই লইয়া গঠিত। সেই জন্যই সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতার হৃদয়ে অনন্ত করুণার অনন্ত স্রোত ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই, তাহার রক্ষার উপায় হয়। অতএব মাতার মাতৃত্বের ভিতর দিয়াই যেন আমরা অপার করুণাময় অনন্ত জ্ঞানের আধার অনন্ত জগতের পিতা ও মাতা জগদীশ্বরকে ভক্তি করিতে সমর্থ হই।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী।

শীত ও গ্রীষ্ম।

—ঃ*ঃ—

শীত কহে, "গ্রীষ্ম তুমি অতি দুরদান্ত,
তব তাপে জীবগণ হয় বড় ক্লান্ত;
কে যায় আরামে নিদ্রা প্রতাপে তোমার ?
সহে গো যাতনা বহু তব তাপে নর"।
গ্রীষ্ম বলে, "শীত, তব শীতল শরীর,
কথাগুলি করে মোর শ্রবণ বধির ;
দীনগণ লভে শান্তি আমার আশ্রয়ে
আমি না থাকিলে তারা যেত যমালয়ে"।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

নুরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

---

(৩)

যাহার ভাগ্যে রাজানুগ্রহ-লাভ ঘটে, সংসারে তাহার আর ভাবনা কি ? সম্রাটের অনুগ্রহে তৎপরবর্ত্তী দিবসেই গিয়াস্‌বেগ রাজ-সরকারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্বকীয় কৃতিত্বগুণে সাধারণ অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে রাজ-সরকারে সম্মানজনক পদ লাভ করিয়া গিয়াস্‌বেগ আপন পদোচিত কর্ত্তব্য এরূপ নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সম্রাট্ তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বপদ প্রদান করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে গিয়াস্‌বেগ রাজকীয় ভবনের গৃহকার্য্য সম্বন্ধীয় কর্ত্তা হইলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর পরে সম্রাট্ কর্ত্তৃক "ইৎমাদ্—উদ্-দৌলা" এই মহা গৌরবজনক উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই উপাধির অর্থ "অতুল রত্নের অধিকারী"। কি আশ্চর্য্য ! পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বৃক্ষলতাগুল্মপরিশূন্য মরুভূমির মধ্যে বন্ধু-বান্ধব-বিহীনাবস্থায় অনশনে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ সেই ব্যক্তি সম্রাট্ আক্‌বরের রাজদরবারে সবিশেষ গণ্য মান্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

পাঠক ! চলুন, একবার আমরা ইত্যবসরে সেই মরুভূমিজাতা ক্ষুদ্র শিশুটীর সন্ধান করি। একদিন যে সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে তাহার জনকজননী পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আজ সেই শিশু আর কোমলপ্রাণা, অর্দ্ধস্ফুটভাষিণী শিশু নহে। আজ সেই শিশু পৌর্ণমাসীর শশধরের ন্যায় সহাস্যমুখী। তাহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয়, বর্ত্তুল গ্রীবাদেশ, ললিত পদ-বিক্ষেপ আর চারুমুখে মধুর হাসি দেখিলে আজ মুনি-ঋষিরও ধ্যান ভঙ্গ হয়। পঞ্চদশবর্ষীয়া মেহের-উন্নিষা আজ বর্ষার প্রথমোচ্ছ্বাসময়ী তরঙ্গিণীর ন্যায় আপন রূপ-তরঙ্গে টলটলায়মানা। আহা ! সেই অতুলনীয় রূপের সাজি—সেই বিম্বাধরে মৃদু মধুর হাসি আর সেই লজ্জামাখা রসনায় কোকিলবিনিন্দিত স্বর যে একবার দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, এ সংসারে বুঝি সে-ই ধন্য—সে-ই কৃতার্থ !

একদিন প্রভাতকালে পূর্ব্বাকাশে যখন বালভানুর সিন্দুর-বিন্দু-নিভ

কিরণরাশি ঘনান্তরালের মধ্য দিয়া উঁকি মারিতেছিল, আর অদূরে কুঞ্জবনের মধ্যে বসিয়া স্বভাবমুগ্ধা পিকবধূ "কুহু" তানে জগৎ মোহিত করিতেছিল; তখন—সেই সুশীতল, সুস্নিগ্ধ প্রভাতকালে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরের মহিলাগণ একটী রম্য কাননে "মিনাবাজার" বসাইবার জন্য সম্মিলিতা হইলেন। এই অমরাবতীসদৃশ, নন্দনকাননপ্রতিদ্বন্দ্বী কাননের শোভা আর কি বর্ণন করিব? ইহার কোথাও বা সুগন্ধি কুসুম-বৃক্ষ-নিচয় নানা-জাতীয় কুসুম-গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত কাননটীকে ভরপূর করিয়াছে, কোথাও বা স্বচ্ছতোয়া-নির্ঝরিণী কুল কুলু নাদে কি এক অব্যক্ত গীতি গাহিতেছে, আবার কোথাও বা সরোবর-সোপানে সুন্দরী রমণীগণ রূপের হাট মিলাইয়া বসিয়া আছে।

এই উদ্যানের এক পার্শ্বে স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর মহিষীর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে উদ্যানের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অশেষ প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখনও বা উদ্যানের নয়নরঞ্জক পদার্থপুঞ্জ দর্শন করিয়া ভাবে আত্মহারা হইতেছেন। আমার বিশ্বাস, যদি সেই উদ্যানে সেই সময়ে কোন কবি গমন করিতেন, তবে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন "ভূমিতলে ইহাই স্বর্গ"।

সমগ্র উদ্যানটী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। ইহার কোথাও বা সুন্দরী তন্বঙ্গীসকল সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে—কোথাও বা প্রগল্‌ভা বালিকা-গণ হাস্য করিতেছে, আবার কোথাও বা কোন কোন প্রফুল্লমুখী কুসুম-বৃক্ষে মনের আনন্দে ঝুল খেলিতেছে। আমাদের আখ্যায়িকোক্ত মেহের এবং তাঁহার মাতাও এই আনন্দের অংশ-গ্রহণে বিরতা ছিলেন না। মেহের-জননী যখন সমাগতা বেগমদিগের সহিত মধুর আলাপে নিমগ্না ছিলেন, মেহের তখন সেই উদ্যানমধ্যস্থ একটী নির্ঝরিণীমধ্যে চরণযুগল আজানু ডুবা-ইয়া দিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি যেন কি ভাবিতেছিলেন। তখন যদি কেহ সেই মস্‌লিন বস্ত্রে অবগুণ্ঠনবতী, ব্রীড়াবনতা, অনিন্দ্যসুন্দরী মেহেরকে দর্শন করিতেন, তখন তিনি তাহাকে স্বর্গচ্যুতা কোন দেবকন্যা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন।

মেহের নির্ঝরিণীর নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ধীরপদবিক্ষেপে উদ্যানের গুপ্তদ্বার দিয়া একটী অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর, সুঠাম তরুণ যুবক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, উরুদেশ সরু এবং

আকৃতিও নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষীণ। তাঁহার ললাটে কৃষ্ণকুন্তলদাম কুঞ্চিতাকারে পতিত হইয়াছে: তাঁহার নেত্রদ্বয়—অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিযুক্ত। তাঁহার অধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তদীয় হৃদয়নিহিত, দৃঢ় সংকল্প স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। পাঠক বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সুপুরুষ স্বয়ং সম্রাট্ আকবরের প্রিয় পুত্র সেলিম। সেলিম কথা বার্ত্তায় কতকটা উদ্ধতস্বভাব-সম্পন্ন হইলেও লোকের সহিত আচরণে অতি নম্র ও অতি ভদ্র। আমোদ প্রমোদ ও সুরাপান সেলিমকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি উদ্যানমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে যেখানে চিন্তাবিষ্টা মেহের বসিয়া ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজকে আসিতে দেখিয়া মেহের তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিলেন এবং একটু সরিয়া গেলেন। নির্ঝরিণীর অনতিদূরে কয়েকটী সুগন্ধি সুদর্শন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেলিমের মন সেই পুষ্পচয়নে ব্যাকুল হইল। কিন্তু তাঁহার হস্তে দুইটী কবুতর থাকায় তিনি পুষ্প-চয়ন করিতে পারিতেছিলেন না। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিলেন—নির্ঝরিণীর নিকট মেহের বসিয়া আছেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগ্নি! তুমি কিছুক্ষণের জন্য এই কবুতর দুইটী রাখ, আমি কয়েকটী ফুল তুলিয়া আনি?" মেহের সেলিমের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে কোমল করযুগল বাহির করিয়া কবুতর দুইটী গ্রহণ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেলিম ফিরিয়া আসিয়া কবুতর দু'টী চাহিলেন, কিন্তু মেহের কথা না বলিয়া হাত তুলিয়া কেবল একটীমাত্র কবুতর উঠাইলেন।

যুবরাজ বলিলেন, একি! আর একটী কবুতর কোথায় গেল?

ভয়বিজড়িত কণ্ঠে মেহের উত্তর করিলেন,—'উড়িয়া গিয়াছে।'

যুবরাজ ঈদৃশ উত্তরে একটু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "কিরূপে?"

মেহের বলিলেন—"এইরূপে"—এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত অন্য কবুতর-টীকেও উড়াইয়া দিলেন। মেহের যে সময় কবুতরটীকে উড়াইয়া দিতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহার মুখাবগুণ্ঠন অপসৃত হওয়ায় তদীয় কমল মুখ-খানি সেলিমের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেলিম সেই দেবজনবাঞ্ছিত, অপ্সরা-রূপবিনিন্দিত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেহের বলিলেন! "আমায় ক্ষমা করুন, কবুতরটী আমি

ইচ্ছা করিয়া উড়াইয়া দিই নাই।" এই কথা বলিবার সময় মেহেরের গণ্ডস্থল লজ্জায় আরক্তিম হইল, তিনি আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না।

যুবরাজ বলিলেন, "আর আমার কবুতরে প্রয়োজন নাই, এখন বল দেখি সুন্দরি, তুমি কি স্বর্গ হইতে ছল করিতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইয়াছ?"

মেহের সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন, যুবরাজ! আমার পিতা মির্জ্জা গিয়াস্‌বেগ "ইত্‌মদ্‌—উদ্দৌলা"। আমি এখন আমার মাতার নিকট যাই—এই বলিয়া মেহের গমনোদ্যতা হইলেন।

যুবরাজ সেলিম তাঁহার করকমল ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছ। তুমি আর একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার রূপ-সুধা পান করি।"

মেহের সেলিমের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "যুবরাজ, আমাকে যাইতে দিন।"

যুবরাজ কাতরস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! আমাকে প্রাণে মারিও না।"

মেহের বলিলেন—"যুবরাজ, এইভাবে আমার গতিরোধ করিবার আপনার কোন অধিকার নাই।"

সেলিম বলিলেন, সুন্দরি! তোমার ঐ প্রেমোদ্ভাসিত দৃষ্টি—ঐ মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষ আমার হৃদয় মথিত করিয়াছে। সুন্দরি! আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, আমার এই ভালবাসার হেম-হার তুমি ছিঁড়িবার পূর্ব্বে আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেল।

মেহের এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মেহের বলিলেন, "যুবরাজ! আমার সহিত বিদ্রূপ করা আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।"

সেলিম বলিলেন, "কখনও নহে। সুন্দরি! আমি তোমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছি না। আজ হইতে তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—প্রাণের আরাধ্য দেবতা—জীবনের ধ্রুব তারা।

মেহের বলিলেন, যুবরাজ! আমি দরিদ্রের কন্যা, আমি আপনার ভালবাসার যোগ্যপাত্র নহি।"

সেলিম বলিলেন, "অধিক আর কি বলিব সুন্দরি, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণেশ্বরী—আজ হইতে তুমিই আমার জ্ঞান—

তুমিই আমার ধ্যান—চিরদিন হৃদয়-মন্দিরে তোমারই প্রতিমা স্থান পাইবে!"

মেহের সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যুবরাজ, আমাকে আমার মাতার নিকট যাইতে অনুমতি দিন?"

যুবরাজ বলিলেন, "অনুমতি! সে কি কথা সুন্দরি? আজ হইতে আমিই তোমার আজ্ঞাধীন। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার যাহা অভিপ্রায়, তাহাই করিতে পার।"

মেহের কি জানি কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অদূরে নির্ঝরিণীর কল কল জলোচ্ছ্বাসের নিস্বন ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। সেলিম ও মেহের দু'জনেই নির্ব্বাক—দুজনেই নিস্পন্দ! সে দৃশ্য দেখিয়া কণ্ব-আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দর্শন-দৃশ্য স্মৃতিপথে জাগরিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বঙ্গলক্ষ্মী।

১

গুণ্ঠন মাঝে চাহনিটুকু দেখিয়া চিনেছি কে তুমি বামা?
আঁধার রাতির দীপ্ত তারা! বঙ্গ-গৃহের মনোরমা!
দেবী তুমি! নারী তুমি! মহান্ তুমি মহান্ মাঝে।
বন্দি তোমায় ধন্য করি ধন্য তুমি হিয়ার মাঝে!

২

অর্ঘ্য করে শুচি-স্নাত পূজার গৃহে ভোরের বেলায়—
যখন তোমার যাত্রা সুরু, নূপুরগুলি কোমল পায়
কেমন কোমল সুরে বাজে সুর বাহারের মূর্চ্ছনায়—
ফুলেরা সব শিউরে চাহে ভোরের হাওয়া ওম্নি বায়।

৩

চীনাংশুকের দিব্য ভাতি নাই যদিও অঙ্গে বটে,
অঙ্গরাগের সুপ্ত রাগে কান্নাপুরি চাঁদের হাটে!
আলতা পরা চরণ দুটী শাখা হাতে ভাগ্যবতী!—
শাড়ীখানি অঙ্গবেড়া লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী।

৪

জন্ম হ'তে কেবলি ব্রত স্বামী ও পুত্রকন্যা লাগি—
মৃত্যু শিয়রে তাদেরি শুভ দেবতা-চরণে নিয়েছ মাগি।
আপনা লাগিয়া চাওনিত কিছু আপন হারায়ে আছো।
স্বরূপ তোমার কেমনে আঁকি, অন্নপূর্ণারূপে যে রাজো!

৫

বিশ্ব লইয়া পেতেছ ঘর, বক্ষে কত কতই স্নেহ!
মুছায়ে দিতেছ যাতনার জল, ঘরে ঘরে অহরহঃ—
একটী দিনেও নাহিক কুণ্ঠা একটী দিনেও নাহিক শ্রান্তি
তোমারি দুয়ারে বসতি করিয়া ধন্য হয়েছে শান্তি—

৬

করুণায় ভরা করুণাময়ী চিনেছি তোমার অমল হাসি—
শারদাকাশ হইতে ভাসি ধবল গাঙে জ্যোৎস্না-রাশি।
গর্ব্ব তুমি দীনের ঘরে "মুক্তা খনির গর্ভ ভূষা
তোমারি অধর-রক্ত-রাগে লাজে রাঙে সন্ধ্যা উষা।

৭

স্বপ্ন-দেশের অপ্সরা সে শুনি বটে মানস-হরা
এমন পল্লী-বাটে নদীর ঘাটে রয় কি মূর্ত্তি সালঙ্কারা।"
(ও যাঁর) চরণক্ষেপে পদ্ম ফোটে, হাস্যে ঝড়ে মুক্তাধারা—
কৃষ্ণ কেশের মুক্তা-দামে কাজল মেঘের তিমিল-ধারা।

৮

কমল তুমি! কোমল তুমি! প্রবল তুমি মায়ার ডোরে—
তোমায় হেরে ভক্ত হৃদি শতদলে মুঞ্জরে।—
ব'লতে কথা, ফুরায় কথা! মর্ম্মে উঠে কতই গাথা।—
স্বর্গ এসে মর্ত্ত্যে নামে, তোমার পূজা হয় গো যেথা।
বেঁচে থাকো সুখে থাকো শান্তি তোমায় রহুক ঘিরে!—
কালো রূপে ভুবন আলো আমাদের এই ঘরে ঘরে॥

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

অভিনেত্রীর বিপদ।



মিস্ ফ্লোরা ওরফে ম্যাডাম বুকাম্প লণ্ডনের মধ্যে একজন সুরসিকা, সুগায়িকা, অভিনয়-পটীয়সী নৃত্যকুশলা ও সুন্দরী। ইঁহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী লণ্ডনের কোন নাট্যশালায় দৃষ্টিগোচর হইত না। ইঁহার সংসারের মধ্যে রুগ্ন স্বামী ও উভয়ের নয়নানন্দ একটীমাত্র পুত্র ও দুইজন ধাত্রী ইত্যাদি। একমাত্র ফ্লোরার উপায়েই সকলেই প্রতিপালিত।

ফ্লোরা গেইটী থিয়েটারের একজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী। যে দিন ফ্লোরার নাম বোর্ডে উঠে, সে রাত্রে নাট্যশালায় জনতা এত অধিক পরিমাণে হয় যে, শান্তিভঙ্গ আশঙ্কায় নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষকে দস্তুরমত পুলিশের সাহায্য লইতে হয়। ফ্লোরা সপ্তাহে চারি দিন অভিনয় করেন। এই চারিদিনেই ফ্লোরার দৌহিত্র কর্ত্তৃপক্ষগণ সাতদিনের কামান কামাইয়া লন। ফ্লোরাকে পাইয়া গেইটী থিয়েটারের যে নামোজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন!

ফ্লোরার অভিনয় দেখিয়া ফ্লোরার জন্য কত যুবক উন্মত্ত। কত লক্ষপতি কোটীপতি ফ্লোরাকে লাভ করিবার জন্য কতরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ও কত দিকে কত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সফলমনোরথ হইতে দেন নাই; ফ্লোরার চরিত্র অতি নির্ম্মল। একমাত্র স্বামী ভিন্ন ফ্লোরা অপর পুরুষকে কখন কোন দিন প্রেমের চক্ষে দেখেন নাই। যদিও স্বামী রুগ্ন, তথাপি স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য ফ্লোরা সদাই সচেষ্ট। রুগ্ন স্বামীর প্রতি কখন কোনদিন কোন রূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই বা মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। স্বামীর মুখ দেখিয়া, পুত্রের মুখ দেখিয়া, দাস-দাসীর মুখ দেখিয়া ফ্লোরা সর্ব্বদাই প্রফুল্লিতা। সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

ফ্লোরার স্বামী মিষ্টার বুকাম্প রোগ-শয্যায় রোগ-যন্ত্রণায় ফ্লোরাকে কতদিন কত কটু কহিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী সরলা ফ্লোরা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া আরও যত্নের সহিত স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়াছেন। সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া, স্বামীর প্রেম ও ভালবাসায় মুগ্ধ হন। স্বামীকে দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করেন।

আমাদের দেশে অভিনেত্রীর নাম শুনিলে, অনেকেই ঘৃণায় নাসিকা

কুঞ্চন করেন ও তৎসংক্রান্ত কথায় যোগদান না করিয়া অপর কথার অবতারণা করিয়া থাকেন। কারণ, আমাদের দেশের অভিনেত্রী হাজার সুনাম অর্জ্জন করিলেও লোকের চক্ষে সে ঘৃণিতা, কুলটা ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু বিলাতের অভিনেত্রী ও আমাদের দেশের অভিনেত্রী এই দুইএর স্থান ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিলাতের অভিনেত্রীগণ সময়ে সম্ভ্রান্ত ধনকুবেরের সুনজরে পড়িয়া তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে পড়া গিয়াছে—অমুক ডিউকের সহিত অমুক অভিনেত্রীর বিবাহ হইয়াছে; অমুক আর্লের সহিত অমুক অভিনেত্রীর বিবাহ হইয়াছে! যে দেশের যে পদ্ধতি। আমাদের দেশের পদ্ধতি একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ অজ্ঞাত-কুল-শীলসম্পন্না, কে তাহাদের বিবাহ করিবেন! সুতরাং সমাজ তাহাদের বিরূপ। এমন কি, লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া থাকিলেও, আমরা অভিনেত্রীকে বিবাহ করিতে পারিব না। বিলাতের—ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনয়কলা-পটীয়সী হইবার জন্য নাট্যশালায় যোগদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আশা এই যে, তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে চাইকি কোন সম্ভ্রান্ত ধনবানের পত্নী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। অভিনয়ে সুনাম অর্জ্জন করিলে, বিশেষতঃ ধনীর দল তাঁহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে শুভ-দৃষ্টিপাত করিবেন।

ফ্লোরার ভাগ্যে কিন্তু ধনী স্বামী-লাভ হয় নাই। উভয়ের অবস্থার অনুরূপ উভয়েই লাভ করিয়াছেন। এখন ফ্লোরা অভিনয় কৌশলে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি ফ্লোরা স্বামী ভিন্ন কোন পরপুরুষের অনুরাগিণী? না—তাহা কখনই নয়। অনেক ধনী ব্যক্তি তাহার প্রতি অনুরাগ ও আসক্তির ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে নানারূপ প্রলোভনে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কেহই সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া, ভগ্নমনে ফ্লোরার আশা সকলকেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

একদিন রিহিয়ার্স্যাল ভাঙ্গিবার কিছু পূর্ব্বে নাট্যশালার অধিকারী মিষ্টার পলের নিকট হইতে পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া ফ্লোরার নিকট উপস্থিত হইল; ফ্লোরা পত্রখানি পাঠ করিয়া পত্রবাহককে বিদায় দিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বোধ করি মিঃ পল অন্য কোন নূতন নাটক শীঘ্রই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন! তাই বুঝি তাহার এত জরুরি

ডাক পড়িয়াছে। যাহা হউক, ফ্লোরা আপন কার্য্য সারিয়া মিষ্টার পলের সহিত দেখা করিতে গেলেন—মিষ্টার পলের প্রাইভেট চেম্বারে! মিঃ পল ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার ইভান্স উভয়ে ফ্লোরারই সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; মিঃ ইভান্স ফ্লোরার উপর মিঃ পলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পাক প্রকারে তাহার মুখ হইতে ফ্লোরা সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কি করিবেন—মনিবের কথার উপর কথা বলা একান্ত নীতিবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় তিনি মিষ্টার পলকে কোনরূপ সদুপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না; মানবের ভাগ্যলক্ষ্মী যে শীঘ্রই তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবেন, স্থির জানিলেন; ফলতঃ তাহাই ঘটিল। ফ্লোরা মিষ্টার পলের প্রাইভেট চেম্বারে প্রবেশ করিয়াই উভয়কে অভিবাদন করিলেন ও তাহাকে এইরূপ অসময়ে ডাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিষ্টার পলের ইঙ্গিতানুসারে মিষ্টার ইভান্স তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু অসহায়া রমণীকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সন্নিকটেই দণ্ডায়মান হইয়া সদুপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এ দিকে মিষ্টারপল ফ্লোরার উপর এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহাকে দেখিবামাত্রই আপনার পার্শ্ববর্ত্তী কোচের উপর বসিতে নির্দ্দেশ করিলেন! ফ্লোরা এই অসম্ভাবিত আহ্বানে কতকটা অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু পলের দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না; সুতরাং মনিবের কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন! ফ্লোরাকে সম্পূর্ণ নিকটে পাইয়া মিষ্টার পল তাহাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। পলের এইরূপ ব্যবহারে ফ্লোরা যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন ও তৎক্ষণাৎ আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য যত্নবতী হইলেন। ফ্লোরা পলকে বাধা দিয়া কহিলেন, মিষ্টার পল! আপনার অসৌজন্যে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম; আপনি জানেন আমি বিবাহিতা! আমার স্বামী বর্ত্তমান! আপনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হইয়া জানিনা আজ কি সাহসে আমার প্রতি অসদ্ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছেন? আমি চলিলাম—আপনার এ দুরভিসন্ধি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে কখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম না। মিষ্টার পল ফ্লোরাকে বাধা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন ও যাহাতে গৃহ পরিত্যাগ করিতে না পারে, সেইজন্য

জোর করিয়া তাহার হাত দুখানি ধরিয়া রহিলেন। ফ্লোরা আসন্ন বিপদে যতদুর সাধ্য আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট রহিলেন এবং পিশাচের কবলমুক্ত হইবার জন্য বল প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না; মিষ্টার পল ফ্লোরাকে নানারূপ প্রেমের কথা কহিতে লাগিলেন ও ফ্লোরার জন্য তিনি যে কত কাতর, তাহা জানাইতে লাগিলেন। ফ্লোরা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—আমাকে ছাড়ুন! নতুবা আপনি সমূহ বিপদে পতিত হইবেন। বাহিরে মিষ্টার ইভান্স এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন ভাবিতেছিলেন! ফ্লোরার চীৎকারে তাঁহার চমক একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রভুর বিনানুমতিতে তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; ইভান্সকে দেখিয়া পিশাচ পল ফ্লোরার হাত ছাড়িয়া দিল; ফ্লোরা বিদ্যুৎগতিতে গৃহের বাহিরে আসিয়া পলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পিশাচ, নরকের ঘৃণিত কীট! আজ হইতে তোমার নাট্যশালায় পদাঘাত করিয়া চলিলাম; আর তোমার সহিত দেখা হইবে না। তুমি যখন রমণীর সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ, আর তোমাকে বিশ্বাস নাই। মন হইতে এরূপ বাসনা ত্যাগ কর, নতুবা তোমার সমূহ বিপদ নিশ্চিত জানিও; ইহা বলিয়া ফ্লোরা প্রস্থান করিলেন! ফ্লোরার প্রতি পলের এইরূপ ব্যবহার ক্রমে জানিতে পারিয়া অপরাপর সকলেই একে একে নাট্যশালা ত্যাগ করিলেন ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। পলের ভাগ্যলক্ষ্মী পলকে ত্যাগ করিলেন; সেই দিন হইতেই গেইটীর অভিনয় বন্ধ হইল।

সকলের এইরূপ ব্যবহারে পিশাচ পল যারপর নাই ভীত ও রাগান্বিত হইয়া মিষ্টার ইভান্সকে বলিল, মিষ্টার ইভান্স! সকলের এগ্রিমেণ্ট বাহির কর! দেখি সময় উত্তীর্ণ না হইতেই কে কোথায় যোগদান করিতে সমর্থ হয়! মিষ্টার ইভান্স পলের আদেশানুসারে সমস্ত এগ্রিমেণ্ট বাহির করিলেন! পল সকলের এগ্রিমেণ্ট দেখিয়া একেবারে কপালে চক্ষু তুলিয়া ইভান্সকে বলিতে লাগিলেন, মিষ্টার ইভান্স? ইহাদের মধ্যে ভাল ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরইতো এগ্রিমেণ্টের সময় ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন উপায়! ফ্লোরার ত এগ্রিমেণ্ট দেখিতেছি অনেক দিনই অতীত হইয়া গিয়াছে! এখন কি করিব বল দেখি?

মিষ্টার ইভান্স বলিলেন, আমি তো আপনাকে এ সম্বন্ধে অনেক দিন ও

অনেকবার বলিয়াছি—আপনি তখন আমার কথায় আদৌ কর্ণপাত করেন নাই ; এখন আমি কি করিব বলুন ! পলের উপর মিষ্টার ইভান্সও যারপর-নাই রুষ্ট হইয়াছেন, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরও বলিয়া উঠিলেন ;—আপনার এরূপ অসদ্ব্যবহারে কে আপনার অধীনে কর্ম্ম করিবে বলুন ; গেইটীর বিজয় নিশান কেবল আপনারই দোষে আজ হইতে লোপ পাইল ! যদিও আপনাতে আমাতে চাকর মনিব সম্বন্ধ—আপনার কথার উপর, আপনার কার্য্যের উপর অভিমত প্রকাশ করা যদিও আমার ক্ষমতার বাহিরে, তথাপি ন্যায়সঙ্গত কথা আমাকে কহিতেই হইবে ; আপনার সহিত এই সমস্ত বিষয় লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করা আমার কর্ত্তব্য নয় ও আমার ইচ্ছাও নয় জানিবেন। আমাকেও বিদায় দিন—আজ হইতে আমিও আপনার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিলাম ; জানিবেন, একমাত্র ফ্লোরার অবমাননাতেই আপনার হাতে গড়া বড় সাধের সাজান বাগান মরুভূমিতে পরিণত হইল ; এই বলিয়া মিষ্টার ইভান্স পলের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন !

মিষ্টার পল প্রমাদ গণিল ; দেখিল সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ! পল বলিয়া উঠিল, যাও সকলেই যাও, আমি কাহাকেও চাহি না ; যদি পারি আবার নূতন নূতন উদ্যমে নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীর সহিত গেইটীর অভিনয় আরম্ভ করিব ! নয় দু একমাস লোকসান হইবে, লোকসান দিব ; এত দিন লাভ খাইয়া আসিয়াছি, নয় সেই লাভের অংশ হইতেই কিছু লোকসানের খাতায় খরচ লিখিব ; আমি মিষ্টার পল ! দেখিব কোন থিয়েটার আমার মত অধিক বেতনে অভিনেতা অভিনেত্রী নিযুক্ত করে ! কিন্তু একটী কায ; ফ্লোরাকে যে কোন প্রকারে অশেষ বিপদে ফেলিতেই হইবে। আজ সে আমার যে অপমান করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যদি আমি সর্ব্বস্বান্ত হই, তাহাও শ্রেয় ; তথাপি আম এ অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব ! একমাত্র ফ্লোরার জন্যই আমাকে এত অপমান সহিতে হইয়াছে ; আমাকে আরও লোকসান সহিতে হইবে ! আমি ফ্লোরাকে উচিত মত শিক্ষা দিয়া তবে পুনশ্চ অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব ! ইত্যাদি বলিয়া মিষ্টার পল ফ্লোরার সর্ব্বনাশের জন্য আপন মনে নানারূপ দুরভিসন্ধি খাটাইতে লাগিল !

এ দিকে ফ্লোরা গেইটী থিয়েটার ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া নিউইয়র্কের মিউনিসিপাল থিয়েটারের এজেণ্ট মিষ্টার কেলি কাল-বিলম্ব না করিয়া

ক্লোরাকে নিউইয়র্কে লইয়া যাইবার জন্য মাসিক ৬০০০ ডলার বেতনে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ক্লোরার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন! ক্লোরা মিষ্টার কেলির প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া এগ্রিমেণ্ট সহি করিলেন ও নির্দ্দিষ্ট দিনে নিউইয়র্ক যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন; যাইবার মধ্যে ক্লোরা ও মাষ্টার চার্লস ক্লোরার একমাত্র নয়নানন্দ স্নেহের পুতলি! দুই জন ধাত্রী ও একজন কেয়ার টেকার! মিষ্টার বুকাম্প অপরাপর সকলকে লইয়া লণ্ডনের বাটীতেই অবস্থান করিতে সংকল্প করিলেন; কারণ তিনি চলৎশক্তি-হীন; এরূপ অবস্থায় পত্নীর সহিত গমন করা তিনি বিধেয় বোধ করিলেন না!

ক্লোরার লণ্ডন ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যই যে, যে কোন প্রকারেই হউক কিছু দিনের জন্য পিশাচ পলের মুখ-দর্শন না করা! পলকে তিনি এতই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন যে, পলের নাম পর্য্যন্তও শুনিতে ঘৃণা বোধ করেন।

এ দিকে পল ক্লোরার নিউইয়র্ক যাইবার কথা শুনিয়া পথেই তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে এইরূপ সংকল্প করিতে লাগিল। শিকার পলাই-তেছে দেখিয়া পিশাচ কিরূপে স্থির থাকিবে! যাহার উপর এত আক্রোশ, তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে গিয়া যদি নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি এরূপ দুরভিসন্ধি মন হইতে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না! পল কাল বিলম্ব না করিয়া গোপনে নিউইয়র্কে যাইবার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল; অতি গোপনে ক্লোরার অনুসরণ করিতে হইবে—অতি গোপনে আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে হইবে—অতি গোপনে আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া অপরাপর সকলকে উচিত মত শিক্ষা দিতে হইবে—আবার গেইটীর উদ্বোধন করিতে হইবে। এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাহার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল।

ক্লোরা নির্দ্দিষ্ট দিনে মিষ্টার কেলির সহিত নিউইয়র্কে যাত্রা করিলেন; পলও অপর জাহাজে করিয়া নিউইয়র্কের জন্য লণ্ডন পরিত্যাগ করিল! পিশাচ অবলার কি সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন; তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী! পরের মন্দ অভিপ্রায়ে থাকিলে আপনার মন্দ যে অগ্রেই ঘটিয়া থাকে. পিশাচ-প্রকৃতি পলের মত মনুষ্য-হৃদয়ে পৈশাচিক কার্য্য সম্পূরণের সময় তাহা আদৌ স্থান পায় না!

যথাসময়ে মিস্ ফ্লোরা বা ম্যাডাম বুকাম্প নির্ব্বিঘ্নে নিউইয়র্কে অবতরণ করিলেন! সহরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল; প্রতি কাগজে ফ্লোরার প্রতিমূর্ত্তি দিয়া মিউনিসিপ্যাল—থিয়েটার কোম্পানী বিস্তারিত ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন; থিয়েটারের অধ্যক্ষ মিষ্টার কেম্প ফ্লোরাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন! ফ্লোরা মিষ্টার কেম্পের অনুকম্পায় প্রাসাদ তুল্য একখানি দ্বিতল বাটীতে আপনার বাসস্থান মনোনীত করিলেন; এখানে ফ্লোরা সকলেরই নিকট মহা সমাদর পাইতে লাগিলেন। অধিক কথা বলিতে কি, ফ্লোরা এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন। এদিকে পিশাচ দলও যথাসময়ে নিউইয়র্কে আসিয়া ফ্লোরার গতি বিধি অতি গোপনভাবে লক্ষ্য করিতেছে; কি করিয়া কবে ফ্লোরার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, ইহাই পিশাচের উদ্দেশ্য। ফ্লোরা যথাসময়ে রিহিয়ার স্থালে যোগদান করিয়া অভিনেত্রী বৃন্দকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন! ফ্লোরার শিক্ষা-চাতুর্য্যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই এমন কি থিয়েটারের অধ্যক্ষও একেবারে মুগ্ধ! ফ্লোরা হইতেই যে অতিশীঘ্রই থিয়েটারের নামোজ্জ্বল হইবে, সকলেই এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফ্লোরার মুখ চাহিয়া আছেন। মিষ্টার কেম্প আপনার মনে নানা আকাশ কুসুমের সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি বারবার যে লোকসান দিয়াছেন, এইবার ফ্লোরা হইতে তাহার চতুর্গুণ লাভ করিয়া লইবেন!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহরের চারিধার মিউনিসিপাল থিয়েটারের প্লাকার্ডে ছাইয়া ফেলিল, হাটে মাঠে, পথে ঘাটে, ট্রেণে ষ্টিমারে সকলেরই মুখে ফ্লোরার কথা; অভিনয় হইবার তিন দিন পূর্ব্বেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গেল; প্রথম রাত্রিতে ফ্লোরার অভিনয় দর্শনে কতলোক বিফলমনোরথ হইয়া দ্বিতীয় রজনীর জন্য তখন হইতেই টিকিট সংগ্রহ করিতে লাগিল, সহরময় এক মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল।

অদ্য মিউনিসিপাল থিয়েটারে ফ্লোরার প্রথম অভিনয় রজনী; ফ্লোরা সন্ধ্যার পরই অপ্সরী-বিনিন্দিত সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একবার স্নেহের পুতলী চার্লসকে স্নেহভরে কোলে লইলেন ও বলিলেন বাবা; ভগবানের নিকট একবার আমার সুনামের জন্য প্রার্থনা কর দেখি! বালক জানু পাতিয়া করযোড়ে মাতার উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট কাতরে প্রার্থনা করিল; ইহা দেখিয়া স্নেহময়ী মাতার প্রাণে কি যেন এক নূতন আনন্দের লহরী উঠিল!

ফ্লোরা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে ধাত্রীর নিকট দিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া থিয়েটারের অভিমুখে চলিলেন, সঙ্গে একজন মাত্র দাসী রহিল। বাটীর বাহিরে মোটরকার অপেক্ষা করিতেছে—কতলোক ফ্লোরার বাটীর সম্মুখে ফ্লোরাকে দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে! ফ্লোরা সহাস্যবদনে সকলকে অভিবাদন করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া সগর্ব্বে তীরবেগে থিয়েটার অভিমুখে ছুটিল।

জনতার মধ্যে পিশাচ পল গুপ্তভাবে লুক্কায়িত ছিল; ফ্লোরার এত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পিশাচের হৃদয়ে শেলাঘাত অপেক্ষা অধিক বাজিয়া উঠিল, ক্রমে জনতা কমিল। পিশাচ এইবার আপনার অভীষ্ট পূরণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল; অতি সন্তর্পণে চোরের মত ফ্লোরার বাসভবনে প্রবেশ করিয়া বালকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ধাত্রী চার্লসকে ছাড়িয়া অনতিদূরে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে, বালক ইতস্ততঃ আপন মনে খেলিয়া বেড়াইতেছে। পিশাচ বালককে দেখিয়াই চিনিতে পারিল ও একলম্ফে তাহার উপর পতিত হইয়া সেই গোলাপবিনিন্দিত সুকোমল মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহাকে আপনার লংকোটের ভিতর পুরিয়া নিমিষের মধ্যে তথা হইতে অদৃশ্য হইল! পিশাচ চার্লসকে অকস্মাৎ এরূপভাবে ধরিয়াছিল যে, দুধের বাছা কাঁদিবারও সময় পাইল না! চার্লসকে লইয়া পল একেবারে তাহার বাসা বাটীতে উপস্থিত হইল ও আপনার ঘরে তাহাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; বালক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না—সে ঘরে থাকিতে চাহিল না, কিন্তু পিশাচ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারবন্ধ করিয়া দিল ও মনে ভাবিল—এইবার আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে! এইবার আমি প্রতিহিংসা পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে পারিয়াছি! এইবার দুষ্টার পুত্রের জন্য বক্ষে করাঘাত দেখিতে পাইয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইব! এইবার একবার সেই গাধিনীর নিকট যাইয়া এই সু-খবরটী দিয়া আসি—দেখি পুত্রের মুখ চাহিয়া আমার বশে আসে কি না! নিশ্চয় আসিবে, মাতা কখন পুত্রহারা হইয়া থাকিতে পারিবে না, এইবার ফ্লোরাকে লইয়া আমার মনের ভিতরে বহুদিন সঞ্চিত সাধ ও আশা মিটাইব! এই বলিয়া দুষ্ট মিউনিসিপাল থিয়েটারের অভিমুখে গমন করিল!

এদিকে দুধের বাছা চার্লস ভূমে পড়িয়া কতক্ষণ কাঁদিল! আবার উঠিয়া দ্বার ধরিয়া বাহিরে আসিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল! দ্বার

খোলা পাইল না বলিয়া মা মা বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল! বিপন্নের সহায় ভগবান বালকের রোদন দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন! অসহায়ের বন্ধু বিপদবারণ চার্লসকে বাহিরে আসিবার পথ দেখাইয়া দিলেন! পলের ঘরে আর একটী ছোট দরজা ছিল, সেইটী খুলিলে পশ্চাতের বারান্দায় আসা যাইত! সেই দরজাটী ভিতরদিক হইতেই বন্ধ থাকিত! সৌভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়িতে পলের তদ্বিষয় আদৌ মনে ছিল না; চার্লস সেই দরজাটী খুলিয়া অতি সহজেই পশ্চাৎস্থিত বারান্দায় আসিল। বারান্দার বাহিরে আসিয়া বালক দেখিল অপর ঘরে লোকজন রহিয়াছে; বালক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটী প্রৌঢ়াকে জড়াইয়া ধরিল! প্রৌঢ়া অকস্মাৎ এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বালকের ছোট ছোট কোমল বাহুপাশে আপনাকে আবদ্ধ দেখিয়া যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হইল ও বালককে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া সে কোথা হইতে আসিল, কেই বা তাহাকে আনিল, তাহার অনুসন্ধানের জন্য বাহিরের বারান্দায় আসিয়া ইতস্ততঃ চারিদিক অন্বেষণ করিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইল; বালকের মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি কাদের ছেলে, কোথা হইতে কি করিয়া এখানে আসিলে? কে তোমায় লইয়া আসিল; তোমার বাপ মা কোথায়? বালক কাঁদিতে লাগিল, প্রৌঢ়া বালকের ক্রন্দন দেখিয়া তাহাকে ভুলাইবার জন্য একখানি সচিত্র খবরের কাগজ দিয়া চিত্রাবলী দেখাইতে লাগিল; বালক কাগজে আপনার স্নেহময়ী মাতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তখনি চিনিতে পারিল ও 'আমার মা আমার মা' বলিয়া অহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। বালকের নৃত্য দেখিয়া প্রৌঢ়ার হৃদয় আরও দ্রবীভূত হইল ও তাহাকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া বারংবার তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিল! বালক বার বার বলিতে লাগিল—এই আমার মা, আমি মায়ের কাছে যাব। প্রৌঢ়া তখন বলিল, চল বাবা! মায়ের বাছা,—আমি তোমায় মায়ের কাছে দিয়া আসি, এই বলিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার সহিত থিয়েটার অভি-মুখে গমন করিল।

এ দিকে পল থিয়েটারে আসিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে ফ্লোরার সহিত সাক্ষাতের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল! ফ্লোরা আপনার জন্য স্বতন্ত্র একটী ঘর পাইয়াছেন! অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতেছে, ফ্লোরা তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিতেছেন!

এখনও অভিনয় আরম্ভ হইবার প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এমন সময় সেই নর-রাক্ষস পিশাচের অবতার পল, ফ্লোরার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিল; ফ্লোরা পলকে দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ও বিস্ময়ে ম্লান হইয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

পল ফ্লোরার প্রতি ভ্রূকুটিপাত করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি মনে করিয়াছ যে, সেইটীর সর্ব্বনাশ করিয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া এখানে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলে? আমি তাহা হইতে দিব না! তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তবে আমি ক্ষান্ত হইব! আজ এখানে অভিনয় করিবে; শত সহস্র দর্শকের কণ্ঠে তোমার সুনাম ঘোষিত হইবে; থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে পাইয়া বিশেষ লাভবান হইবে! কিন্তু আমি তাহা কিছুই হইতে দিব না! একবার বাসায় খবর লইয়া দেখ, তোমার সন্তান কোথায়! আর সন্তানের মুখ দেখিতে পাইতেছ না! দেখিতে পাইবেও না ইহা নিশ্চিত জানিও। পলের মুখে এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া ফ্লোরা সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই পল আপন পকেট হইতে একটী রিভলবার বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—নিঃশব্দে থাক! যদি আপনার হিত চাও, তবে চীৎকার করিও না! এখনও বলি, আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, হারাধন ফিরিয়া পাইবে, আজীবন সুখে থাকিবে! এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও! ফ্লোরা পিশাচের বাক্যে বলিয়া উঠিল, তুমি নর-পিশাচ তুমি নর-রাক্ষস, তোমার সহিত বাক্যব্যয় করা বৃথা; গোপনে তুমিই আমার পুত্রকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ; তোমার মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তুমিই এ কায করিয়াছ! কিন্তু তোমার এ মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না; ভগবান আছেন, তোমার পাপের দণ্ড তিনিই বিধান ক'র্বেন। ফ্লোরার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল; আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা রহিল না! তিনি জ্ঞানহারা হইয়া সেই স্থানেই পতিতা হইলেন! পল অবসর বুঝিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! কিন্তু সেই সময়ে একজন কেয়ার টেকার আসিয়া "ম্যাডাম! অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে" বলিয়াই ফ্লোরাকে ভূমিতলে অজ্ঞান অবস্থায় পতিতা দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহার চীৎকারে অপরাপর সকলে সবেগে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, ফ্লোরার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পলকে সন্দেহ ক্রমে ধরিয়া নজরবন্দী

রাখিল! পল পলাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ফ্লোরার সংজ্ঞালাভ তখনও না হওয়াতে এবং পলের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ ক্রমেই দৃঢ়ীভূত হওয়াতে তখনি পুলিশ ডাকা হইল ও পিশাচ পুলিশের হস্তে সমর্পিত হইল। পলকে লইয়া পুলিশের লোক চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে ফ্লোরার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; এবং পুত্র পুত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মিষ্টার কেম্প ফ্লোরার মুখে পল সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও রাগান্বিত হইলেন ও তখনই ফ্লোরার বাটীতে লোক পাঠাইলেন! প্রেরিত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিল! মিষ্টার কেম্প পুলিশের কর্ত্তাকে টেলিফোন করিয়া পল সম্বন্ধে সমুদয় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন ও পলের উপর সতর্ক পাহারার জন্য আদেশ দিলেন!

অভিনয় আরম্ভ হইল; সকলে ফ্লোরাকে সান্ত্বনা করিয়া রঙ্গমঞ্চে নামাইলেন; কিন্তু পুত্রশোকাতুরা ফ্লোরা পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন! দর্শকবৃন্দ সকলেই যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! মিষ্টার কেম্প সকলকে ফ্লোরার অসুস্থতার কারণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া পর দিন অভিনয়ের আয়োজন করিলেন! ফ্লোরার এইরূপ আকস্মিক বিপদে দর্শকবৃন্দ সকলেই দুঃখিত হইলেন ও সে রাত্রের মত থিয়েটার ত্যাগ করিয়া পরদিন ফ্লোরার অভিনয় দেখিবার জন্য দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

এ দিকে সেই প্রৌঢ়া ফ্লোরার পুত্রকে লইয়া এতক্ষণে থিয়েটারের অধ্যক্ষের নিকট আসিল। তখনও ফ্লোরার জ্ঞান হয় নাই; সকলেই বিশেষ ভাবিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ফ্লোরার সন্তানকে দেখিয়া ও প্রৌঢ়ার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ফ্লোরার জ্ঞান সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইল; ফ্লোরা চক্ষু মেলিলেন! চক্ষু মেলিয়াই দেখিলেন—স্নেহের পুত্তলী তাহার গলা ধরিয়া বসিয়া আছে! ফ্লোরা হারাধনকে পাইয়া আকাশের চাঁদ লাভ করিলেন ও প্রৌঢ়ার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন; এ দিকে পলকে লইয়া সেই রাত্রেই পুলিশ পুনরায় থিয়েটারে উপস্থিত হইল; বালক পলকে দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিল ও বলিতে লাগিল, এই দুষ্ট আমাকে ধরিয়া আনিয়াছিল; পুলিশ বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ও প্রৌঢ়ার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পলকে চালান দিল!

পরদিবস ক্লোরার অভিনয় দর্শনে দর্শকবৃন্দ এত চমৎকৃত হইল যে, তাহাদের ক্লোরার অভিনয় দেখিবার বাসনা আরও বাড়িল! সহরময় ক্লোরার সুখ্যাতি আর ধরে না; তদবধি ক্লোরা নিউইয়র্কেই সুনাম ও সম্ভ্রমের সহিত অভিনয় করিতে লাগিলেন। বিচারে পলের দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল জানিবেন।

শ্রীননিলাল সুর।

সংসার-চিত্র।

সংসারের আবরণ সুকোমল বটে;
কিন্তু হায়! সংসার এ অভ্যন্তর হ'তে
আগ্নেয় গিরি সম করে অনল উদ্গার—
দহে সে হৃদয়ের এ বাসন্তী ভাণ্ডার!
হৃদয়-পরাণ—সর্ব্বস্ব আমার দিয়া
ভালোবাসি। কি আশ্চর্য্য! তবু নর-হিয়া
তুষ্ট নহে; সামান্য—কণিকা অপরাধে
কি ভ্রূকুটি! রোষ-দৃষ্টি! তিরস্কার বিঁধে'
করে জর্জ্জরিত! চতুর্দ্দিক হ'তে ঘোর
নারী-কণ্ঠে বিদ্রূপ-হাস্য উঠে ঘন-ঘোর
মেঘমাঝে বক্র-কায়া বিদ্যুল্লতা প্রায়!
চিত্ত শক্তি-হীন! শির নত হ'য়ে যায়!
দাও শক্তি! মহাশক্তি! অই মুক্ত আলো!
যাই সেথা—ভেঙে'-চূরে ভব-কারা কালো।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মগধেশ্বরী-সেবা ও পূজা।

মহাত্মা আর্য্যঋষিগণ হিন্দুদিগের জন্য অনেক দেব-দেবীর পূজার বিধান করিয়া গিয়াছেন। এমন কি বৃক্ষ, লতা, নদ-নদীরও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে হিন্দুগণ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ মানসে অনেক দেব-দেবীর পূজা করিতেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-সভ্যতা-স্রোতে প্রায় সকলই বিলীন হইয়া গিয়াছে! এমন কি, এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় পুনরায় সেই ধর্ম্মের দিকে আর্য্য সন্তানগণের মতি গতি ফিরিয়াছে। লুপ্ত-ধর্ম্ম-রত্ন-উদ্ধার মানসে এখন প্রায় লোকই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সকলেই স্বীয় স্বীয় ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন।

হিন্দুরা পৌত্তলিক বলিয়া অনেকে নিন্দা করেন, কিন্তু বলিতে গেলে আমরা পুতুল পূজা করি বলিয়াই আজ জগতে হিন্দু বলিয়া পরিচিত, শত বিপ্লবেও এই ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ আছে। এই পুতুল পূজায় যে কি অলৌকিক রহস্য নিহিত আছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি আজ যে বিষয়ের বর্ণনা করিতে বসিয়াছি, তাহাও একটী অলৌকিক রহস্যে পরিপূর্ণ। হিন্দুগণ অনর্থক কোন কার্য্য করেন নাই।

চট্টগ্রামে বহুকালাবধি মগধেশ্বরী-সেবা ও পূজা প্রচলিত আছে। ইহা আর কোথাও দৃষ্ট হয় বলিয়া বোধ হয় না। কিরূপে, কোথা হইতে ইহা চট্টগ্রামে প্রচলিত হইল, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা যথাযথ বর্ণন করিলাম।

সাধারণতঃ 'সেবা' বলিলে 'পূজা' বুঝায়, কিন্তু এই 'মগধেশ্বরী-সেবা' বলিলে 'মগধেশ্বরী পূজা' বুঝায় না। 'সেবা' ও 'পূজা' স্বতন্ত্র।

'মগধেশ্বরী পূজা' শনিবার কি মঙ্গলবার নিশীথ রাত্রে প্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধি অনুযায়ী পূজা করিতে হয়। তাহা ঠিক্ শ্রীশ্রী৺কালী পূজার মত। প্রতিমাও কালীর প্রতিমার মত। কিন্তু দ্বিহস্তবিশিষ্টা, মুণ্ডমালা-বিহীনা। তাহা সাধারণতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের জন্য মানস করিয়া পূজা করিতে হয়। বিশ্বাস, এই পূজার দ্বারা গর্ভিণীর ও গর্ভস্থিত শিশুর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। এই পূজা, শক্তি পূজার অংশ মাত্র।

কিন্তু 'মধগধেশ্বরী-সেবা' সেইরূপ নহে। তাহা দিনের বেলায় শনিবার কি মঙ্গলবার করিতে হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণের দরকার করে না। কোন মন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না। সাধারণ লোক বা গৃহস্থ স্বয়ং এই কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। এই 'সেবা' গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্যই করা হইয়া থাকে; তবে যাহাদের কোন 'মানস' থাকে, তাহাদের জন্যও এই 'সেবা' করা হইয়া থাকে। এই সেবার জন্য চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়; তাহার একটী সুন্দর কারণও দেখা যায়। অনেকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতার 'মানস' করেন; কিন্তু সিদ্ধির ফল অপরিজ্ঞাত থাকে; হইবে কি না তজ্জন্য সন্দেহ থাকে। কিন্তু এই 'সেবার' ফল সম্বন্ধে একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিব।

এই 'সেবার' বিধি এইরূপ ঃ—

একদিন শনিবার কি মঙ্গলবারে একখানা নূতন বাঁশের ঝাঁকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কলার পাতা বিছাইতে হয়। তাহার উপর পরিষ্কার পাঁচ-পোয়া চাউল রাখিতে হয়। চাউলগুলি রক্তজবার দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেওয়া হয়। যাহার 'মানসিক' দিতে হইবে, একটী ছাগী শিশু আনিয়া তাহার পদধৌত জল মানসিকের মস্তকে দিয়া ঐ ছাগী শিশুটী কাটিয়া তাহার রক্তে চাউলগুলি রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। রক্তাক্ত মুণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি চর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ঝাঁকায় সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। মুণ্ডটীর উপর একটী সর্ষপ-তৈলের দীপ-শলিতা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর কয়েকখণ্ড মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঝাঁকার উপর রাখিয়া দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে সকলে "ডালি" বলিয়া থাকে। তারপর সকলে প্রণাম করিলে 'ডালি' মাথায় লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া রাখা হয়। তথায় ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া দেবীকে আহ্বান করতঃ লোকজন ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক গ্রামে 'ডালি' রাখিবার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। তাহাকে গ্রাম্যবাসীরা পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া থাকে, তাহাকে "সেবা খোলা" বলে। যখন ডালি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়, তখন শকুনী গৃধিনী আসিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করতঃ মানসকারীর অভীষ্ট সিদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া যায়। ইহাতে একটী বিস্মিত হইবার বিষয় আছে।

যখন ডালি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়, তখন শকুনী-গৃধিনী পূর্ব্বে ভক্ষণ না করিলে অন্য কোন মাংসাশী জীব তাহা স্পর্শও করে না। দূর হইতে কেবল

আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করতঃ শব্দ করিতে থাকে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একটী ডালি ৫।৬ দিন যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। কোন জীবই তাহা স্পর্শ করে নাই। যখন সেই ডালিটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়া রাখা হইল, তখন অনেক শকুনী গৃধিনী সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু কতক্ষণ বৃক্ষ ডালে বসিয়া পুনঃ চলিয়া গেল। নিকটে একটী কুকুর ছিল, তাহাকে ডাকিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কুকুরটী একটু নিকটে যাইয়া অবজ্ঞাভরে চলিয়া গেল। যে গৃহস্থ এই মানসিক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার বর্গের আকুল ক্রন্দনে পাষাণও গলিত হয়। কিন্তু ডালি অভুক্তই রহিল। যাহার জন্য মানস করা হইয়াছিল, সে আর রক্ষা পাইল না। লোকে বলিয়া থাকে যে, যদি 'সেবা' সম্বন্ধে কোনরূপ ক্রটী লক্ষিত হয়, তবে দেবী সেই ডালি গ্রহণ করেন না। শকুনী গৃধিনী এই ক্ষেত্রে দেবীর সহচরী ও অনুচর বলিয়া কথিত হয়। দেবীর আদেশ না হইলে তাহারা ডালি স্পর্শ করে না বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস।

আর একটী ডালি সম্বন্ধে আমি দেখিয়াছি যে, একস্থানের দুইটী গৃহস্থের বাড়ী হইতে দুইটী ডালি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়া রাখা হয়। তাহাতে দেখা গেল যে, কোথা হইতে অনেকগুলি শকুনী-গৃধিনী আসিয়া মহানন্দে একটী ডালি লোফালুফি করিয়া ভক্ষণ করিল; অপরটী চাহিয়াও দেখিল না। আমি এই সব দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম! এই সকলের প্রতি আমার কিছুই বিশ্বাস ছিল না! তাহা দেখিয়া আমার মনে এমন একটী ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল যে, চিন্তা করিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। জগতে এমন অনেক অলৌকিক রহস্য আছে, যাহা অদ্যাপিও মানব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তখন আমার মনে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শত শতবার নিজের অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা চাহিলাম। এখনও যদি পথে কোন "সেবা খোলা" দেখিতে পাই, দেবীর উদ্দেশ্যে অমনি মস্তক অবনত হইয়া পড়ে; এবং পূর্ব্বকথা স্মরণ পথে উদিত হইয়া ভয়ের ও ভক্তির উদ্রেক হয়। আমরা যতই কেন মুখে বলি না হিন্দুদিগের এই সব অন্ধ বিশ্বাস, ইহা কিছুই নহে, কিন্তু এই কথা বলিতে অন্তরে একটু না একটু ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। আন্তরিক সাহস করিয়া দেবতার অবজ্ঞা করিতে কেহই পারে না। অনেকে পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য মুখে হিন্দুদের দেবীরও পূজা পদ্ধতির নিন্দা করিয়া থাকেন।

কিন্তু অন্তরে অন্যভাব, হিন্দু প্রতিমা দেখিলে সভয়ে প্রণাম করেন। চট্টগ্রামে "মগধেশ্বরী-সেবা" প্রচলন সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ আছে। অতি পূর্ব্বকালে চট্টগ্রামে মগ্ জাতির বাসস্থান ছিল, তাহারাই "মগধেশ্বরীর" সেবা করিত। মগজাতির দেবতা বলিয়া "মগধেশ্বরী" নাম হইয়াছে। কিন্তু 'মগধেশ্বরীর পূজা' ঠিক কালীপূজার মত। ইহাতে "মগধেশ্বরী" দেবতা কেবল যে মগ-জাতির দেবতা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যাহা হউক, কালক্রমে হিন্দু বৌদ্ধ উভয়জাতিরা ইহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, পাঠান রাজত্বকালীন দুর্দ্দান্ত বক্তিয়ার খিলিজির অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাজ নীলাম্বর মজুমদার স্বীয় পরিজন ও দেবসদৃশ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহ সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী শঙ্খ-নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী সুচিয়া গ্রামে স্বীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি না হওয়ায় একজন স্থবিরের (মগ সন্ন্যাসী) পরামর্শানুসারে চট্টগ্রামে তিনিই প্রথম এই "মগধেশ্বরীর সেবা" প্রচলিত করেন। এইরূপ কথিত আছে, এই সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে কৃত্তিবাস নামক পুত্ররত্ন প্রদান করেন। কালক্রমে এই কৃত্তিবাস "কল্পতরু" বলিয়া বিখ্যাত হ'ন, তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার দান-শীলতার যথেষ্ট পরিচয় চট্টগ্রামে দেদীপ্যমান আছে। তাঁহার বিশাল বংশ চট্টগ্রামে এখনও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান আছে।

দেখা যায় যে, যে কোন জাতির হউক না কেন, যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অলৌকিক বিষয় হিন্দুদিগের নয়নগোচর হয়, তাহা হিন্দুরা অভ্রান্তভাবে ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন। এমন কি বৌদ্ধদিগের যে সকল মঠ আছে, তাহাতে হিন্দুরাও গমন করিয়া, ভক্তির সহিত প্রণাম করেন। মুসলমান ফকির দেখিলে, হিন্দুরা আদর করিয়া থাকেন। মুসলমান দর্‌গায় হিন্দুরা মানসিক দিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমানেরা আদর করিয়া একজন হিন্দু সন্ন্যাসী দেখিলেও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। ইহা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর্য্যজাতি গুণের মর্য্যাদা করিতে কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই।

শ্রীনগেন্দ্রলাল চৌধুরী।

মহাপুরুষীয়-ধর্ম্ম।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বহুশাখায় বিভক্ত ও অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক মহাপুরুষ আসামে প্রচার করিয়াছেন; তন্মধ্যে মহাপুরুষীয় ধর্ম্মেরই প্রচলন অধিক। ৺শঙ্করদেব ও ৺মাধবদেব এই ধর্ম্মপ্রচার ও ভাগবতের অনুপম অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাপুরুষ দ্বারা প্রচারিত বলিয়া বোধ হয় এই ধর্ম্মের নাম "মহাপুরুষীয়"। মহাপুরুষীয় ধর্ম্মানুসারে বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। অন্য দেবদেবীর পূজা করা তাহাদের নিষেধ। শঙ্করদেব বলিয়াছেন,—

"অন্য দেবদেবী ন করিবা সেবা
গৃহকো নে খাইবা,
প্রসাদো নে খাইবা,
ভক্তি হইবে ব্যভিচার।" "কীর্ত্তন" *

'অন্য দেব দেবীর পূজা করিও না, (তাহাদের) গৃহে খাইও না, প্রসাদও খাইও না, তাহা হইলে ভক্তির ব্যভিচার হইবে। যাগ যজ্ঞাদি করা মহাপুরুষীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিষেধ। তাহাদের মতে তন্ত্রাদিতে যে সমস্ত যাগযজ্ঞের বিধি আছে, তাহা কোন না কোন দেবতার সন্তোষার্থে করা হয় মাত্র। সুতরাং যিনি দেবতারও দেবতা, সেই বিষ্ণুর আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, তাহাতেই সমস্ত দেবতার সন্তোষ সাধন হয়।

ভাগবত ধর্ম্মই মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের মূল, ভাগবতে কেবল বিষ্ণুপূজার বিধি আছে। ভাগবতে—

"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা"। ভাগবত॥

"যেমন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে, কাণ্ড শাখা প্রশাখা সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে, আবার যেমন আত্মসন্তোষ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র ভগবৎসেবাই সমস্ত দেবার্চ্চনার তুল্য"। সেই জন্য মহাপুরুষীয়-

* কীর্ত্তন ৺শঙ্করদেব রচিত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মপুস্তক।

দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাতে অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা নিষেধ এবং এই ক্রিয়া কাণ্ডের ব্রতীকেই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়। প্রতিনিধি দ্বারা তাহা সম্পন্ন করা নিষেধ।

মহাপুরুষীয়দিগের মতে কর্ম্ম অপেক্ষা হৃদয়ের ভাবই শ্রেষ্ঠ; তাহারা কর্ম্মকে একটা অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করে না। 'নামঘোষায় * আছে—

"কর্ম্মত বিশ্বাস যার হিয়াত থাকন্ত হরি
অতিশয় দূর হোন্ততার।
দূরতো বিদূর হোন্ত তার অহঙ্কার থাকান্তেও
সাক্ষাৎ কৃষ্ণক পাবে,
শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্ম্মকার॥"

নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান থাকা সত্ত্বেও বাহিরের কর্ম্মকাণ্ডে যাহার বিশ্বাস, পরমেশ্বর তাহার নিকট হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই যাহার ধর্ম্ম, তাহার মনে যদি অহঙ্কারও থাকে, তথাপি সে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের মূল মন্ত্রই হইতেছে—

"রাম কহ রাম কহ রামমন্ত্র সার।
তপ, জপ, যজ্ঞ যাগে-সিদ্ধি নাহি আর" ॥ 'কীর্ত্তন'

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে প্রচলিত ধর্ম্মকাণ্ড, মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীত্যার্থে শ্রাদ্ধাদি কিম্বা বিঘ্ন নাশের জন্য গ্রহযাগ অথবা তীর্থাদি ভ্রমণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই মহাপুরুষীয়দিগের অবিধেয়।

খিটোজন কৃষ্ণ কথা, বিচার সময় মনে
ধৈর্য্য ধরি ক্ষণেক থাকয়।
যত তীর্থ স্নানদান, দেব পিতৃ যজ্ঞ যাগ
যোগাদিরো ফলক পারয়॥
যার পুত্র সবে ঐত, হরিত শরণ লৈয়া
হরিগুণ গাবে শুদ্ধভাবে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু, নদীর জলক পিয়া
পিতৃগণ তৃপিতিক পাবে॥ "নামঘোষা"॥

যিনি কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণ কথা চিন্তা করেন, তিনি সমস্ত তীর্থে স্নানদান, দেবলোক, পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে যাগ যজ্ঞ ও

* নামঘোষা ৺মাধবদেব রচিত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মপুস্তক।

যোগাদির সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হন। এবং যাহার পুত্রগণ হরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ ভাবে হরিগুণ গান করে, তাহাদের পিতৃলোক দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুনদীর জলপান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে।

তীর্থ ভ্রমণ ও প্রতিমা পূজা করা সম্বন্ধে ৺শঙ্করদেব বলিয়াছেন –

"তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি।
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি॥
বৈষ্ণবের নাই ইসব মতি। 'কীর্ত্তন'।

তীর্থ বলিয়া জলে শরীর ও মন শুদ্ধ করে, প্রতিমায় দেবতা আরোপ করে, কিন্তু যিনি বৈষ্ণব তাঁহার এই সমস্ত বিষয়ের দিকে মন যায় না।

আরও—

"সূর্য্য গ্রহণত এক কোটী ধেনু
ব্রাহ্মণকে করে দান।
প্রয়াগ গঙ্গার জলত নিবাস
করে দশ কল্প মান॥
অযুতেক যজ্ঞ— করে অশ্বমেধ
সুবর্ণক করে দান।
এক শত ভাগ গবিন্দের নাম
তবে ও নুহি সমান্॥" 'কীর্ত্তন॥'

'সূর্য্যগ্রহণের সময় ব্রাহ্মণকে এককোটী গোদান, প্রয়াগের গঙ্গাতীরে দশকল্প-কাল বাস, দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সুবর্ণদান করিলে যে ফল হয়, তাহা গোবিন্দনামের শতাংশের একাংশেরও সমান নহে।'

মহাপুরুষীয়দিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, একভাগ 'অবিরক্ত', সংসারের প্রতি যাহাদের বিরাগ জন্মে নাই, অপর ভাগ 'বিরক্ত', সংসারের প্রতি যাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। যে সকল ভক্তদিগের সংসারে বিরাগ জন্মে নাই, তাহাদিগকে বেদ-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি করিতে হয়।

"অবিরক্ত ভকতের বেদ লঙ্ঘিবার দোষ
জানিবা হৈবেক নিশ্চয়।
পরম বিরক্ত মিটো, কৃষ্ণ ভকত ভৈল
তার এ কো নাহিক নির্ণয়॥" 'কীর্ত্তন'॥

'অবিরক্ত ভক্তদিগের বেদ লঙ্ঘন করা পাপ, ইহা নিশ্চয় জানিও!

কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যে যাহারা পরম বিরক্ত, তাহাদের জন্য কর্ম্মাকর্ম্ম নিরূপিত নাই।'

যাহারা সংসারী, তাহাদের বেদ-বিহিত ভক্তি-অবিরোধী কার্য্যাদি করিতে হয়, না করিলে ধর্ম্মাচরণ পূর্ণ হয় না। হরিনাম-অবিরোধী কর্ম্ম কি কি? হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন, অতিথি সৎকার, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব মোচন, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্ত-সেবা প্রভৃতি হরিনাম-অবিরোধী কার্য্য বলিয়া কথিত। যে সমস্ত মহাপুরুষীয় গৃহাশ্রমত্যাগী, তাহারা সকল কার্য্যেই স্বাধীন ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের হাত হইতে মুক্ত। সমাজে যে সমস্ত কার্য্য করা পাপ বলিয়া ধরা হয়, কেহ সেই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কতগুলি দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইল না। যে পাপে সমাজ যে পরিমাণে কলুষিত হয়, সেই পরিমাণের অনুপাতে অর্থদণ্ড দিতে হয়। সেই অর্থ কেবল একজনের উদর পূরণে ব্যয়িত না হইয়া সমাজের সমস্ত ভক্তদিগের প্রীতিভোজে ব্যয় করা হয়। বিবাহ বিধি ৺শঙ্করদেব যাহা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন লুপ্তপ্রায়; কোথাও সে বিধি প্রতিপালিত হয় না, সুতরাং তাহার নিয়মাদিও পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে মিতাক্ষরীণ অনুসারে বিচার কার্য্য পরিচালিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগভর্ণমেণ্টের বিচার আলয়ে দায়ভাগ অনুসারেই বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু এখনও কোন বিষয় যদি সমাজেই মীমাংসিত হয়, তবে মিতাক্ষরীণ অনুসারেই হইয়া থাকে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী।

সুখী কে?

দীনতার দায়ে দীন দিন-কার্য্য করি সম্পাদন
শিশু যেবা সেও লভে কালে শ্রেষ্ঠ পদ।
বৈভবের ভাবী অধিপতি আলস্যে কাটায়ে কাল
না পারে লভিতে শান্তি বিশ্ব-আকাঙ্ক্ষিত॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

শরত-আহ্বান।

পরিবেষ্টিত অমল ধবল
কাশ-গুচ্ছ ভূষণে,
শ্যাম-নবীন-ধান্যের শিস
শোভিত উজল ভুবনে।
মধুর বায় বহিছে মৃদুল.
প্রকৃতি পরশে পুলকাকুল,
গাহিছে হরষে পতত্রিকুল
ললিত রাগিণী সুতানে।
রঙ্গে ভঙ্গে রস-তরঙ্গে
কুসুম-নিকর দুলিছে,
রেণু মাখা চোখে রেণুবাস
ওই, অন্ধ হইয়ে ছুটিছে;
নীলিমাকাশ কুন্দ-নিরদ
রথ'পরি চড়ি এসগো শরত
মণি-ঝলমল নির্ম্মল প্রাতে
'বস গো শষ্প আসনে।
মোহন আস্যে সুমধুর হাসি
উজল বিভায় ধরণী
রূপের ছটায় আমোদিত কর
সুচারু হিরণ্য-বরণি!
বন উপবন শাখা শাখিগণ,
ক্ষেত্র মাঠ হো'ক্ স্বর্গ-কানন
নগ নদ নদী প্রাসাদ ভবন
উজল' বিমল বরণে;
এস, ধীর মন্থরে শারদ-লক্ষ্মী
সাজিয়া রঙিল বসনে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

———

শিক্ষার দোষ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামা।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়;—হৈমকিরণ সংযত করিয়া শ্রান্তকলেবরে সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। রাখালগণ মাঠ হইতে গাভীপাল লইয়া গ্রামের মধ্যে আগমন করিতেছে। কৃষককুল মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। পল্লীর নীরব বনভূমিতে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

চাঁদেরহাট গ্রামের দক্ষিণ ভাগে শ্যামসুন্দরের প্রকাণ্ড দীঘি। দীর্ঘিকায় নীলজল পরিপূর্ণ। চারিপার্শ্বে চারিটী ঘাট সুন্দরভাবে বাঁধা—গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক এই দীঘিতে স্নান করিতে আগমন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে যদিও গ্রামের অপর দুই একটী পুষ্করিণীতে জল পাওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে সেই দীঘি ব্যতীত আর কোথাও জল থাকে না।

ননিদের বাড়ী যে পাড়ায়, সে পাড়ায় একটা পুকুর আছে, যে বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অধিক বৃষ্টি হয়, সে বৎসর সে পুষ্করিণীতে একটু আধটু জল থাকে। এ বৎসর বৈশাখমাস পর্য্যন্ত সে পুষ্করিণীতে যে জল ছিল, তাহাতে একরূপ কাজ চলিতেছিল, কিন্তু বৈশাখমাসে বৃষ্টি না হওয়ায় তাহার সামান্য জল অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অতি প্রত্যূষে রৌদ্রের তাপ খরতর না হইতে হইতে তাহাতে স্নান করিয়া লওয়া চলে, এবং রন্ধনাদি করিবার জল আনা চলে, কিন্তু সে জল আর পান করা চলে না। তাহা ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এখন সমস্ত গ্রামের লোকেরই পানীয় জল শ্যামসুন্দরের দীঘিতে। বৈকালে গ্রামের সমস্ত ললনাকুলই কলসী লইয়া দল বাঁধিয়া শ্যামসুন্দরের দীঘিতে জল আনিতে গমন করিয়া থাকেন।

চপলা পাড়ার মেয়েদের সহিত জল আনিতে শ্যামসুন্দরের দীঘিতে গমন করিয়াছিল। পথে শ্যামা গোয়ালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে

বলিল,—"মাঠাক্‌রুণ আমাকে হীরু বাবুদের বাড়ী পাঠিয়েছিলেন, আমি এখন সেখান হ'তে আস্‌ছি—চল, তোমাদের বাড়ী যাব।"

চপলা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন।

যখন চপলা বাড়ী আসিল, তখন তাহার শ্বাশুড়ী বাড়ী ছিলেন না,—পাড়ার মধ্যে কোথায় গমন করিয়াছিলেন।

চপলা গৃহমধ্যে গমন করিয়া যথাস্থানে জলকলস রক্ষা করিয়া বাহিরে আসিল। শ্যামাকে বসিতে বলিয়া সন্ধ্যার দীপ গুছাইতে গমন করিতেছিল, শ্যামা বলিল,—"আমি আর বসিব না, বাড়ীতে কাজ আছে।"

চপলা বলিল,—"আমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিবে না ?"

শ্যামা। দেখা করিতেই আসিয়াছিলাম,—কিন্তু দেখা হইল কৈ !

চপলা। পাড়ার মধ্যে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।

শ্যামা। আমি বাড়ী গিয়া সন্ধ্যা জ্বালিব।

চপলা। হীরুদের বাড়ী গিয়াছিলে ?

শ্যামা। হ্যাঁ, মাঠাক্‌রুণের কথামত গিয়াছিলাম।

চপলা। তাহাকে কি বলিলে ?

শ্যামা। মাঠাক্‌রুণের কথামত তোমাদের বাড়ী একবার আসিবার জন্য বলিলাম।

চপলা। সে কি বলিল ?

শ্যামা। সে বলিল সন্ধ্যার পরেই যাইব।

চপলা। তবে তুমি এখন যাও।

শ্যামা। একটা কথা বলিব ?

চপলা। বল না কেন,—আপত্তি কি ?

শ্যামা। তুমি যদি রাগ না কর, তবে বলি।

চপলা। সে কি,—এমন কি কথা বলিবে, যাহাতে আমি রাগ করিব ?

শ্যামা তখন নানাবিধ ভাবভঙ্গি সহকারে নানাবিধ আকার—ইঙ্গিত করিয়া অবশেষে বলিল,—"হীরু বাবু তোমাকে ভালবাসে—তোমাকে চায়। তুমি যদি তাহাকে আসিতে বল, সে তোমাদের গোলাম হইয়া থাকে।"

পথ-পার্শ্বে-পতিতা ফণিনীর পুচ্ছদেশে পদক্ষেপ করিলে সে যেমন ফণা উত্তোলন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, চপলা তেমনি ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল ! তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামা ভীত হইল।

যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া চপলা শ্যামাকে ও হীরুকে গালাগালি দিতে লাগিল, এই সময় চপলার শ্বাশুড়ী বাড়ী আসিলেন। বধূর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া খেঙ্‌রা লইয়া শ্যামাকে প্রহার করিতে গেলেন,—শ্যামা ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিল। তারপরে শ্বাশুড়ী বধূতে অনেকক্ষণ আর্ত্তনাদ করিলেন,—এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত পল্লী ডুবিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পরে সমস্ত পল্লী যখন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধে বসিয়াছিল, তখন হীরালাল দক্ষিণ হস্তে একগাছি যষ্টি ও বাম হস্তে একটি ল্যাণ্ঠন লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল।

প্রথমেই গিয়া শ্যামার বাড়ী উপস্থিত হইল। গোয়ালাপাড়ার একপ্রান্তে শ্যামার বাড়ী, একখানি খড়ের গৃহ লইয়া তাহার সমস্ত বাড়ী। সেই গৃহেই রন্ধন—সেই গৃহেই দ্রব্যাদি রক্ষা ও শয়ন হইয়া থাকে। ত্রিজগতে শ্যামার আর কেহ নাই—বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে। পাড়া হইতে কয়েক সের দুগ্ধ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদিচ্ছা জল মিশাইয়া বিক্রয় করতঃ গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আর প্রতিবাসিগণের কথাবার্ত্তা শুনিত, তজ্জন্য সকলে তাহাকে কিছু কিছু সাহায্যও করিত।

শ্যামা গৃহমধ্যে বসিয়া পান্তাভাত ভোজন করিতেছিল, এমন সময় হীরালাল তাহার উঠানে গিয়া ডাকিল,—শ্যামামাসি।"

হীরালালের গলার স্বর শুনিয়া শ্যামা তাড়াতাড়ি মুখের অর্দ্ধচর্ব্বিত গ্রাস গিলিয়া ফেলিল, এবং হাতের গ্রাস পাত্রস্থ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল, বলিল,—"কেন বাবা ?"

হীরা। কি হ'ল মাসী ?

শ্যামা। সে কথা আর ব'ল না বাবা,—অনেক মানুষ দেখেছি—এমন দুরন্ত বৌ কখনও দেখি নি !

হীরা। কি হ'ল ?

শ্যামা। হ'ল তোমার আর আমার চৌদ্দপুরুষ অন্ত--শ্বাশুড়ী মাগী এসে আমাকে খেঙ্‌রা নিয়ে মারে আর কি,—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

হীরালাল কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, এই আমি যাচ্চি—আসল কথা শুনিয়া দিয়ে আসি। দেখবো—শ্যামার পায়ে ধরে হীরুর কাছে পাঠায় কি না। যদি এ কাজ সমাধা কর্ত্তে না পারি, আমি বাপের বেটা নই।"

ক্রমশঃ।

হীরালাল চলিয়া গেল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সুলতানার প্রণয়।

সুলতানা নাইলি তুরস্কের বর্ত্তমান সুলতান পঞ্চম মহম্মদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রিন্স মামুদ রসিদের দুহিতা। ইনি বিদুষী, রূপসী; কেবল তুর্কীভাষায় নহে, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাতেও সুলতানার বিশেষ অধিকার আছে। সম্প্রতি সুলতানা নাইলি সুপ্রসিদ্ধ তুর্ক-বীর আনোয়ার বের সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধা হইয়াছেন। ইঁহাদের পরিণয়-কাহিনী বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। বিগত তুর্ক-বলকান-যুদ্ধে তুর্ক-বীর অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন, সারা দেশ তাঁহার যশোগীতে মুখরিত হইয়া উঠে, ইঁহারই রণকৌশলে ও ক্ষিপ্রকারিতায় অড্রিয়া-নোপল পুনরধিকৃত হয় এবং যুদ্ধাবসানে তুরস্ক-দরবার আনোয়ার বে কে 'পাশা' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।—সাহাজাদি নাইলি প্রত্যহ সংবাদ পত্র পাঠ করিতেন; সংবাদ পত্রে বীরবর আনোয়ারের বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠেন। আনোয়ারের নাম শুনিলে তাঁহার অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইত; ক্রমেই আনোয়ারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, এক দিন তিনি আনোয়ারকে এক খানি পত্র লিখিয়া তাঁহার অন্তরের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন; তিনি যে আনোয়ারের একান্ত গুণমুগ্ধা—তাঁহারই উদ্দেশে তিনি যে কায়-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন—পত্রে এ কথারও উল্লেখ ছিল। সাহাজাদির প্রেম পত্র পাঠ করিয়া আনোয়ার বে স্তম্ভিত হইলেন। মহামান্য সুলতানের হারেমের অসূর্য্যম্পশ্যা সাহাজাদি নাইলি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী—তাঁহার প্রণয়-প্রার্থিনী! ইহা কি সম্ভব? আনোয়ার সাহাজাদিকে তাঁহার পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন; পত্রে সাহাজাদির সম্মান ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণ-ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আনোয়ারের বীরোচিত পত্র পাঠ করিয়া সুলতানা অধিকতর মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর একদিন সুলতানা নাইলি পিতার নিকট তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; তিনি যে আনোয়ারের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী এবং মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন,—পিতাকে অকপট চিত্তে তাহা সকলি বলিলেন।

সহৃদয় প্রিন্স মামুদ কন্যার কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন; তুরস্কের গৌরব স্বরূপ বীরবর আনোয়ার বেকে কন্যা দান করা যে কিছুমাত্র অগৌরবের কথা নহে—বরং সৌভাগ্যের কথা, ইহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন। সাহাজাদির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সম্প্রতি মহাসমারোহ সহকারে তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সুলতান-প্রদত্ত প্রভূত বিত্ত নবদম্পতীর হস্তগত হইয়াছে।

শোক সংবাদ।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় ২২এ শ্রাবণ রাত্রি একটা পনের মিনিটের সময় মদীয় ভ্রাতষ্পুত্র প্রাণাধিক সুরেনচণ্ডী দত্ত অকালে মর্ত্ত্যলীলা সম্পন্ন করিয়া স্বর্গবাসে চলিয়া গিয়াছে।

তাহার অভাবে আমাদের পরিবারবর্গ শোকাগ্নিতে দহ্যমান—আমাদের বাড়ী হা হা রবে মুখরিত। তাহার বয়স সবে তেইশ বৎসর নয়মাস মাত্র হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে সে আমাদের বিপুল ছাপাখানা, বিস্তৃত পুস্তকের কারবার ও সমস্ত কার্য্যের ভার লইয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। অধিকন্তু "অবসরের" ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিল। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা যে কি কষ্টে কালাতিবাহিত করিতেছি, তাহা সেই সর্ব্বশান্তিপ্রদাতা শ্রীভগবানই জানেন।

আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ৺নবকুমার দত্ত মহাশয় অবসরের প্রতিষ্ঠাতা—প্রাণপণে ইহার সম্পাদন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তারপর বালক সুরেন ইচ্ছা করিয়া যখন ইহার ভার গ্রহণ করে, আমি তখন অতি আহ্লাদে তাহার উপর ভারার্পণ করিয়া পশ্চাৎ হইতে প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এখন সে গিয়াছে—বুঝি আমি তাহার খুল্লতাত হইয়া এই সকল গুরুভারে তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলাম, বলিয়া আমার উপরে রাগ করিয়া আমাকে প্রতিভারে কষ্ট দিবার জন্যই তাহার স্বর্গগমন।

অবসর আমার দাদার প্রতিষ্ঠিত—কাজেই আমাদের নিকট ইহা দেবমন্দির সদৃশ। যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহার কার্য্য করিব।

বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদন শেষ করিয়াই সুরেন চলিয়া গিয়াছে। আগামী সংখ্যা হইতে আমি ইহার কার্য্য করিব। ভরসা করি, আমার যত্নে অবসর অবনত হইবে না—বরং উন্নত হইবে, আশা করিতে পারি।

আগামী সংখ্যায় সুরেনের হাফটোন ছবি ও জীবনী প্রকাশিত হইবে।

আপনাদের ভৃত্য—
শ্রীলালবিহারী দত্ত।

অবসর—



স্বৰ্গীয় সুরেশচন্দ্র দত্ত।

সুরেশচণ্ডী।

ঐ সুন্দর প্রতিকৃতি স্বর্গগত সুরেশচণ্ডী দত্তের। সুরেশচণ্ডী অল্পবয়স্ক মেধাবী যুবক—জাতীয় সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, অল্পদিন মাত্র নিপুণতার সহিত 'অবসর' মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া সংসার হইতে চিরতরে চলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসম্বন্ধে পরিচয় দিবার মত কার্য্য তাঁহার অপরবিধ কিছুই নাই। পিতৃ-বিয়োগে কেবল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং নবজীবনে বৈচিত্র্য বা রহস্য-জাল-জড়িত ব্যাপার কি থাকিবে? তবে বলা যাইতে পারে, জীবিত থাকিলে কালে তাঁহার জীবন-বৃক্ষে স্বর্ণফল ফলিতে পারিত।

ত্রয়োবিংশ বর্ষ নবম মাস মাত্র সুরেশচণ্ডী মর্ত্তভূমে কাটাইয়া গিয়াছেন। এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহাতে কোন প্রকার পাতক স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায় নাই। সুরেশচণ্ডী গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সুরেশচণ্ডীর মন্ত্রদাতা গুরু, এবং দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপদেষ্টা ছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন কি প্রকারে গঠিত হইতেছিল। তিনি কখনও আলস্যে কাল কাটাইতেন না বা কুসঙ্গীর সঙ্গলাভে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন না।

ইঁহার একুশ বর্ষ বয়সে রবির দশা পড়ে। পাপদৃষ্টি রবি অষ্টমে (নিধন স্থানে) বিরুদ্ধ থাকেন। রবি অষ্টমে থাকিলে জাতক ব্যবহার কার্য্যে ধূর্ত্ত হয়, এবং বহুবিধ কষ্টভাগী ও নিধনত্ব প্রাপ্ত হয়। আলস্য-বৃদ্ধি, কার্য্যে উদ্যম ভঙ্গ, চৌরদ্বারা ক্ষতি, শরীর কৃশ, জ্বরাদি রোগ, শত্রু-বৃদ্ধি, বুদ্ধির ভ্রম, চক্ষুপীড়া এবং হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণ বলিয়া দিয়াছিলেন,—"প্রশস্ত উপায় দ্বারা ভক্তি-ভাবে সেই জগৎ-পিতা নারায়ণের পূজা করাইয়া ১০০৮ তুলসী দান করা আবশ্যক। আর রবির পূজা ও দান করাইয়া গ্রহদোষ শান্তি করান নিতান্ত আবশ্যক—যে হেতু ২৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মারক-দোষ-যুক্ত বিরুদ্ধ রবির দশা থাকিবে। ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামক সূর্য্য-কবচ বা নবগ্রহ-কবচ ত্রিলৌহ যন্ত্রে ধারণ করিলে সর্ব্বব্যাধি ও সর্ব্ব আপদ-মুক্ত হইবেন।"

সুরেণচণ্ডী কুষ্ঠীর এ ফলাফল বা জ্যোতিষিগণের মন্তব্য কাহাকেও জানিতে দেন নাই। ইহার জন্য কোন দৈব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কি না, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। তবে রবিবার করিতেন—অর্থাৎ প্রত্যেক শুক্ল রবিবারে অপরাহ্নে হবিষ্যাশী হইয়া থাকিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রবিবারে তিনি শ্যামনগরের এক বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে যান। সেখানে রবিবার-ব্রত ভঙ্গ হয়,—বান্ধবগণের অনুরোধে মৎস্য মাংসাদি ভোজন করেন। সোমবারে বাড়ী ফিরিয়া আসেন,—শুক্রবারে জ্বর হয়। পর শুক্রবারে রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটের সময়ে অকালে কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া স্বর্গারোহণ করেন।

অবসরের প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ৺নবকুমার দত্তের ঐ একটী মাত্র পুত্র ছিলেন। আর নাই—সুরেণচণ্ডীর পুত্রাদি কিছুই হয় নাই; অতএব নবকুমার বংশহীন হইলেন। বর্ত্তমান অবসর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় নবকুমার বাবুর ভ্রাতা, তিনিই এখন সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও অধিকারী।

অশ্রুবিন্দু।

ফুটিতে ফুটিতে আহা!
ফুটিল না সে যে গো,
নীরবে পড়িয়া গেল ঝরিয়া;
বাসনা-প্রসূন শত
নিরমম কাল গো,
নিমিষে চরণে গেল দলিয়া!
অকলঙ্ক চাঁদ হায়!
দেখিতে দেখিতে গো,
অকাল-জলদ দিল ঢাকিয়া,—
শমন ব্যাধের শরে
পড়িল ঢলিয়া গো,
মধুর-সঙ্গীতকারী পাপিয়া!

বীণাটী বাজিতেছিল
সুমধুর তানে গো,
সহসা থামিল তার ছিঁড়িয়া ;—
রাগিণীটী বায়ু-স্রোতে
ভাসিয়া আসিতে গো,
চকিতে চলিয়া গেল ফিরিয়া।
তরীখানি পাল-ভরে
নাচিয়া নাচিয়া গো,
যেতেছিল তীরবেগে ছুটিয়া ;—
একটী দারুণ ঢেউ
নিমেষে পরশি গো,
অতলে ডুবায়ে দিল টুটিয়া !

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার।

'অবসর' সুরেন বাবুকে হারাইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। সুরেন বাবুর বয়স এত অল্প—প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন ক্ষমতা দেখিয়া তেমন বুঝি নাই ; মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার বয়স আরও বেশী ! যাহা হউক, সকলই ভগবানের ইচ্ছা !

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক।
সাহিত্য সম্মিলন—ইছাপুরা, ঢাকা।

সান্ত্বনা।

দেবের বালক 'সুরেন'—সে যে
আস্‌ছিলো এই কাননে—
জোছ্‌নার রথে পরীর মতো
কমল-গোলাপ চয়নে !

তোমরা তখন স্নেহের ডোরে
রাখ্‌লে বেঁধে সোণার ঘরে,
কাট্‌বে বাঁধন সে যে ভোরে—
সেই কথাটী না জেনে!
বাঁচ্‌তো যদি বাঁচ্‌তো কমল—
আহা! বাঁচ্‌তো অরুণ-কিরণে।
জোছ্‌না-রথে আস্‌ছিলো সে,
জোছ্‌না-রথেই গেছে চলে,'
তাইতো তোমরা কাঁদ্‌ছো আহা!
ভাসিয়ে বক্ষ নয়ন-জলে!
তোমাদের মাণিক নয় তো সে;
দেবের বালক অম্নি এসে,
অম্‌নি র'য়ে অম্‌নি হেসে,'
অম্‌নি আবার যায় যে চলে'!
এই কাননে অমন ধারা
চিরটী কাল আস্‌ছে চলে'।
স্বরগ হ'তে কুসুম এসে
সাজায় মধু-শরৎকাল,—
সব সুষমা আবরি' ফেলে
বর্ষা-শীতের কুহেলী-জাল!
চেওনা এথা হেরিতে তারে,—
গান শোনো' তার বীণার তারে,—
দেখ্‌বে—তারে দেখ্‌বে পরে,
কাট্‌বে যখন মায়ার জাল—
ওই ওপারে ফুলের বনে,
দেখ্‌বে তারে চিরকাল।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়:

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

শব্দ-চিন্তা।

অতিথি। পুরাকালে বনবাসী ঋষিগণ উপবাস—তিথির অবসানে পারায়ণ (পান্না) জন্য গৃহস্থের আলয়ে সমাগত হইতেন। একাদশী আদি উপবাস তিথির অবসানে আগত বলিয়া অভ্যাগত ঋষির অ—তিথি খ্যাতি।

আপ্যায়িত। অতিথি উপনীত হইলে গৃহস্থ তাঁহাকে বিনয় সম্ভাষণে আহ্বান করিয়া তাঁহার চরণে পাদ্য-সেচনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

অর্ঘ্য। তৎপরে গৃহস্থ অতিথির পথশ্রম অপনোদন জন্য তাঁহার ঘ্রাণার্থে দূর্ব্বা ও অক্ষত দানে পূজা করিতেন।

মধুপর্ক। পথশ্রম-জাত তৃষ্ণা দুরীকরণ জন্য গৃহস্থ দধি, দুগ্ধ, তক্র, ঘৃত, শর্করা, মধু-মিশ্রণ (মধুপর্ক) দ্বারা আসনে উপবিষ্ট অতিথিকে দিতেন।

গোঘ্ন। মধুপর্ক পানে অতিথি সুস্থ হইলে নাপিত (গৃহ-ভৃত্য) অতিথির দর্শন জন্য তাঁহার সম্মুখে পশু উপস্থিত করিত। এবং অতিথির পছন্দ হইলে পশু-হত্যা হইত।

এই পশুহত্যা হইতে অতিথির "গোঘ্ন" খ্যাতি।

মহর্ষি বাল্মিকির সময়ে অতিথিকে গো নিবেদনের প্রথা ছিল। যথা :— শ্রীরাম আগমনে ভরদ্বাজ—

"উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গাম্ অর্ঘ্যং উদকম্ ততঃ"

অগস্ত্য-আদি মুনিগণের আগমনে শ্রীরাম

"পাদ্য-অর্ঘ্য-আদিভিঃ আনর্চ্চ
গাম্ নিবেদ্য চ সাদরম্"

বেদে বরপাত্র ও রাজা আদি পঞ্চ শ্রেষ্ঠ অতিথি নির্দ্দিষ্ট আছে। বরপাত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও মধুপর্ক প্রদত্ত হইলে নাপিত "গৌ গৌঃ" (গৌঃ গৌঃ) শব্দে রজ্জু ধারণপূর্ব্বক বরপাত্রকে পশু প্রদর্শন করে। ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত বরপাত্র তৎক্ষণাৎ মন্ত্র পড়েন :—

"মুঞ্চ গাম্.................."

এই বেদমন্ত্রবলে পুরাণকারগণ :—

"................মধুপর্কে পশোঃ বধঃ"

নিষেধ করিলেন। কিন্তু হিন্দু এই নিষেধ ভঙ্গে পালন করিতেছেন। গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত হইলে ছাগবধ হইত, এখন মেষে টান পড়িয়াছে।

কুশল। তৎপরে আলাপ পরিচয়। কুশ সুলভ হইলেই ঋষির হোমাদি সচ্ছলে চলিত এবং ঋষি কুশ-ল সম্ভোগ করিতেন। তাই বলে,—

"ব্রাহ্মণম্ কুশলম্ পৃচ্ছেৎ"

রন্ধন সমাপ্তে ভোজ্যের উত্তম—অংশগুলি সর্ব্বাগ্রে অতিথি পাইতেন। অতিথি-সৎকারের এই নিয়ম। গোভিল গৃহ্য-সূত্রের এই সনাতন নিয়ম বঙ্গে ভঙ্গে পালিত হইতেছে।

বিধবা। ধব অর্থে বস্ত্র বা আবরণ (Coverture)। পতি বর্ত্তমানে নারী স-ধবা থাকে। এবং পতিহীন নারী বি-ধবা হয়।

দেবর। প্রাচীনকালে বি-ধবা স্বামীর কনিষ্ঠকে শয্যায় আকর্ষণ করিত।

বিধবা দেবরম্ মর্যম্ আকৃণুতে (১০।৪০।২ঋ)

তাই মনুর মতে (৯।৬৯।৬০-৭০) বিধবা কন্যকা একটী পুত্র লাভ কাল তক স্বামীর কনিষ্ঠকে বিবাহ করিতে পারেন। এই প্রথা হইতে স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারীর দে-বর হইয়াছেন, এখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকালে নিদ্-বর বা কোল-বর হইয়া বরযাত্র গমন করেন।

হিন্দুর জাতি-বিশেষে এখনও এই প্রথা চলিত আছে।

য়িহুদি জাতির মধ্যে এ প্রথা চির বিরাজিত আছে। তবে মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র-উক্ত বিধির কিছু ইতর বিশেষ বাইবেলে দেখা যায়। ঐ শুন মুষা বলিতেছেন (ডিউ ২৫।৫—১০):—

যদি ভ্রাতৃগণ একত্রে থাকে এবং একের মরণ হয় এবং কোন পুত্র সন্তান না থাকে, তবে মৃতের বি-ধবা অপরিচিতকে বিবাহ করিবে না। তাহার স্বামীর ভ্রাতা তাহাতে উপগত হইবে। এবং তাহাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিবে। এবং স্বামীর ভ্রাতার কর্ত্তব্য পালন করিবে।

প্রথম সন্তান মৃতের নাম ধারণ করিবে। যাহাতে মৃতের নাম ইস্রেল হইতে বিলুপ্ত না হয়।

যদি ভ্রাতা মৃতের বিধবাকে গ্রহণ না করে, তবে সে বিধবা (নগরের) দ্বারদেশে বৃদ্ধগণের সমীপে উপস্থিত হইবে এবং বলিবে যে, আমার স্বামীর ভ্রাতা ইস্রেলে মৃতের নাম রক্ষায় বিমুখ। তিনি আমাতে স্বামীর ভ্রাতার কর্ত্তব্য পালন করেন না।

তখন নগর-বৃদ্ধগণ তাহাকে ডাকিবে এবং সমস্ত বলিবে। যদি তিনি উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আমি উহাকে চাহি না।

তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ বৃদ্ধগণের সাক্ষাতে তাহার নিকট আসিয়া তাহার জুতা খুলিয়া লইবে এবং তাহার মুখে থু দিবে। এবং উত্তরে বলিবে যে, ভ্রাতার বংশ-রক্ষায় বিমুখ ভ্রাতার এই গতি হইবে।

ইস্রেলে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে এবং তাহার আলয়কে "জুতা খোলার আবাস" বলিবে।

(মাযু ২২।২৪ দেখ) বেদ ও মনুস্মৃতি সম্মত এই প্রাচীন প্রথা অগ্নিপুরাণ-কার এক শ্লোকে ভারত ছাড়া করিয়াছেন।

"দেবরেণ সুত উৎপত্তিঃ
মধুপর্কে পশোঃ বধঃ"

কল্পনা বলে যেমন এক ব্রহ্ম হইতে তেত্রিশকোটী দেবতা স্বর্গময় হইয়াছে।

"সাধকানাম্ হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা" (গীতা)

তেমনি সাজ সরঞ্জামে আসবাব পত্রে স্বর্গ ঢাকিয়া গিয়াছে।

অলীক। স্বর্গের নাম অলীকং পদ (Olympos) কিন্তু অলীক কথা কেহ মানে না।

আন্‌কা। স্বর্গের আনক (পটহ) হইতে আন্‌কা কথা হইয়াছে।

আজগবী। স্বর্গের অজগবী ধনু (শিবধনু) হইতে আজগবী কথা হইয়াছে। শিবচক্ষু হইলে মানব মহানিদ্রায় অভিভূত হয়।

ভগবতী শিবা শঙ্করী হইতে দুগ্ধবতী গাভী শৃগালী ও চিল ভগবতী শিবা ও শঙ্করী হইয়াছে।

স্বর্গের "মন্দারঃ পারিজাতকঃ"

ধরাধামের পাল্‌টে মান্দার।

রৌদ্র। সূর্য্যমণ্ডলের অধি-দেবতা রুদ্রদেবের (১) রুদ্রতেজ বা রৌদ্রকে আমরা সূর্য্য-কিরণ বলি।

রুদ্রদেবের বর পুত্র রাক্ষসগণও রৌদ্র নাম ধারণ করে।

রবি-রাবণ। বিশ্বশ্রবা রবির পুত্র রাবণ বটে। রবি ও রাবণ উভয়ের মূলে রব।

(১) "শিবাধি-দৈবতম্ সূর্য্যম্"।

লক্ষ্মী। লক্ষ্ম (কলঙ্ক) হইতে স্ত্রীগ্রহ পূর্ণচন্দ্র লক্ষ্মী নাম ধারণ করেন। তাই কো-জাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে (চন্দ্রোদয় কালে) লক্ষ্মী পূজার বিধি।

অলক্ষ্মী। অমাচন্দ্র লক্ষ্ম হীন বলিয়া অলক্ষ্মী নাম ধারণ করেন। তাই অমা দিনে হল কর্ষণ নিষ্ফল বলিয়া নিষিদ্ধ। অলক্ষ্মী ও অ-হল্যা তুল্যমূল্য। তাই অমানিশাতে শ্যামাপূজার অগ্রে অলক্ষ্মী পূজা হয়।

শনি। মন্দগতি হইতে শনৈশ্চর শনি।

অশনি। দ্রুতগতি হইতে বজ্র অশনি নাম পাইল।

মঘপুষ্প। মঘা নক্ষত্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি হইতে কুন্দফুল মঘপুষ্প নাম পাইল।

অগস্ত্য পুষ্প। অগস্ত্য তারার আকার ধারণ করে বলিয়া বকপুষ্প--অগস্ত্য পুষ্প নাম পাইল।

করতোয়া। হেমবতীর বিবাহে হর-কর-নিঃসৃত তোয় হইতে করতোয়া নদীর নাম।

বাহুদা। স্মৃতিকার লিখিত মুনির বাহুদানে বাহুদা নদীর নাম।

বাশিষ্ঠী। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম হইতে গোমতী নদীর নাম বাশিষ্ঠী হইল।

গৌতমী। গৌতম অগস্ত্য মুনির আশ্রম হইতে গোদাবরীর নাম গৌতমী।

গণ্ডকী। ক্ষুদ্র গণ্ড শৈল হইতে গণ্ডকী নদীর নাম। এই গণ্ডশৈল শালগ্রাম পল্লীর ঘাটে মেলে বলিয়া গণ্ড-শিলার নাম শালগ্রাম শিলা।

কৌশিকী। বিশ্বামিত্র-স্বসা কুশিকরাজনন্দিনী কৌশিকী নদী-রূপা হইয়া কৌশিকী নামে খ্যাত।

কাবেরী। কাবের মুনি-কন্যা কাবেরী পিতার পাপ মোচনার্থে নদীরূপা হইয়া কাবেরী নাম ধারণ করেন।

কর্ম্মনাশা। বৃত্র বধ-জনিত ব্রহ্ম-হত্যার পাপ ক্ষালনে নদী "কর্ম্মনাশা" নাম পাইল।

নর্ম্মদা। দেবগণের নর্ম্ম (ক্রীড়া) দানে খরস্রোতা মেখলা নদী নর্ম্মদা নামে খ্যাত।

অলকানন্দা। কুবেরের অলকাপুরীর আনন্দবর্দ্ধনে অলকানন্দা নাম।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অনাথিনী।

(গল্প।)

আপন বলিতে সারা সংসারে আমার কেহই ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভেই আমি দেশত্যাগ করিয়া পাহাড়ে দেশে চলিয়া যাই। সেই হইতে দেশের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ উঠিয়া যায়।

আমরা জাতিতে গোয়ালা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পৈত্রিক ব্যবসাটাই অবলম্বন করিব স্থির করিলাম; কারণ আমি আধুনিক সভ্য-জগৎ-সম্মত ইংরাজি বিদ্যা একেবারেই অভ্যাস করি নাই। সুতরাং 'ভাগ্যহীন মোর মত' যে কেরানীকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার একান্ত অনুপযুক্ত, সে কথা না বলিলেও চলে। তবে চেষ্টা করিলে হয় ত জমীদারী সেরেস্তায় সরকারী মিলিতে পারিত। কিন্তু আমি সে চেষ্টাও করি নাই, আর সে সরকারীও আমার জুটে নাই।

দার্জ্জিলিংএর কাছেই একটা পল্লীর মধ্যে আমি একটা আস্তানা গাড়িয়াছিলাম। সেই স্থান হইতে নিত্য আমি একটী গাড়ী করিয়া সহরের মধ্যে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতাম, প্রবাসী বাঙ্গালীমহলে অল্প দিনেই আমার বেশ পসার হইয়া গেল। দুই পয়সা আয়ও বাড়িয়া গেল। সুতরাং নিত্য প্রভাতে পল্লী হইতে সহরের মধ্যে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাওয়া, আমার পক্ষে স্নানাহারের ন্যায় একটা নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ভোর পাঁচটার সময় আমি দুগ্ধের গাড়ীতে ঘোড়া যুড়িয়া সহরে যাত্রা করিতাম। রাস্তার দুই পার্শ্বের ঝেলু গাছের কাল ছায়া প্রভাত-প্রায় গগনের ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট দীর্ঘাকার মানব মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইত। প্রভাতের স্বাস্থ্যময় শীতল সমীরণ আমার কানে কানে কত আশার কথা বলিয়া যাইত; আর কৈশোর ও যৌবনের মধ্য পথবর্ত্তী আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘোড়ার রাশটী ধরিয়া বসিয়া থাকিতাম। স্বপ্নের ছবির মত কত অস্পষ্ট কথা আমার মনে হইত, মুগ্ধভাবে নীরবে বসিয়া কত কথা যে আমি ভাবিতাম, তাহার ইয়ত্তা নাই!

আমার অত্যন্ত অশ্বটী ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সহরের পথে অগ্রসর হইত। আমায় সে জন্য কোন কষ্টই করিতে হইত না। প্রথমে

একটী দেশী হোটেল, তাহার পর পরপর বাবুদের বাড়ীর দোর গোড়ায় আমার নিরীহ অশ্বটী আপনি-ই আসিয়া দাঁড়াইত। আমি সেই অবসরে আকাশের দিকে নীরবে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। সহস্র কিরীটধারী সূর্য্যদেব পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পৃথিবীর উপর প্রথম দৃষ্টি ফেলিতেন ;—আঃ, সে কি সুন্দর দৃশ্য ! পর্ব্বতের সহস্র শীর্ষ রাম-ধনুকের মত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিত ; যেন পর্ব্বতরাজ রাজবেশ পরিধান করিয়া, অত্যুজ্জ্বল হীরক-বিশিষ্ট রাজমুকুটে মস্তক শোভিত করিয়া মহিমময় সৌম্যমূর্ত্তিতে প্রজার সুখ দুঃখ নিরীক্ষণ করিতেছেন ! পক্ষিগণের মিশ্র কণ্ঠোত্থিত কাকলী তখন আমার চারণমুখ-বিনিঃসৃত রাজ আহ্বান-গীতি বলিয়া ভ্রম হইত। মুহূর্ত্তেই আবার সে মূর্ত্তি মিলাইয়া যাইত, তাহার পর থাকিত – শুধু রক্তাক্ষ সূর্য্য, আর তাঁহার সপ্তাশ্ব-বাহিত রথ। আর থাকিত---কেলুপত্রের বায়ুর সহিত মিলন-গীতি,— সর্ সর্, মর্ মর্ !

প্রভাতের রঙ্গীন আলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিত ! সে আবার আরও সুন্দর দৃশ্য ! গাঢ় নীল পাতাগুলি সোণালী রঙের বলিয়া মনে হইত ! এইরূপ নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। এমন সময় আমার গাড়ী আসিয়া হোটেলের দ্বারে দাঁড়াইত। আমার মোহ ছুটিয়া যাইত, আমি আবার কর্ম্মময় জগতে ফিরিয়া আসিতাম !

হোটেলের সম্মুখে দুগ্ধের জন্য একটী টব পড়িয়া থাকিত। আমার গাড়ীর শব্দ পাইলে একজন ভৃত্য বাহির হইয়া সেই টবটী গৃহে লইয়া যাইত।

একদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। আমার গাড়ীর শব্দ পাইয়াও কোন ভৃত্য বাহিরে আসিল না। আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সে কথা ভাবিবার আমার কোনই আবশ্যক নাই বুঝিয়া, আমি দৈনিক যেমন টবটী দুগ্ধপূর্ণ করিয়া দেই, সে দিনও তেমনি দিলাম। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গাড়ী চালাইতে উদ্যত হইলে, একটা দ্বার খোলার শব্দ পাইলাম। পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিলাম, একটী বালিকা ধীরে ধীরে দুগ্ধ-পূর্ণ টবের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, গৌর-বর্ণ, তাহার দেহখানিতে অস্থির সংখ্যা অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়। চোখ দুইটী গাঢ় নীল—ডাগর ডাগর ! বয়স বোধ হয়. একাদশ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহাকে দেখিলেই মনে কেমন একটা করুণার সঞ্চার হয়,—“আহা বেচারী !” প্রথম দর্শনেই আমার মনে হইল, লোকে বলে এবং আমি নিজেও

দেখিতেছি, দার্জ্জিলিংএ স্বাস্থ্যের রাজত্ব, তবে এ বালিকা এত কৃশাঙ্গী কেন? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? আবার মনে হইল, —"তবে বুঝি নতুন এসেছে? হ্যাঁ, তাই হবে।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ তুমি যে?—"

নম্র স্বরে বালিকা বলিল,—"হ্যাঁ—"

বালিকা দুগ্ধের পাত্রটী লইতে যাইতেছিল। আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। আচ্ছা, তুমি ছিলে কোথা, থাক কোথা?"

বালিকা তেমনি সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"সংসারে আমরা মায়ে ঝীয়ে ছিলুম, এখন অভাগিনী আমি অনাথা। হোটেলের কর্ত্তা দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। কাল থেকে আমি এই খানেই আছি।"

বালিকার ইতিহাস শুনিয়া আমি অন্তরে বড় ব্যথা পাইলাম, মনে হইল,—"আহা বেচারী, এও তা'হলে আমারই মত নিঃস্ব,—বান্ধব-হীন।" প্রকাশ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি জাত তোমরা?"

"গোয়ালা।"

"গোয়ালা? ঠিক জান?"

"হ্যাঁ—"

আমি আর কিছু বলিলাম না। বালিকা দুগ্ধপূর্ণ টবটী কষ্টে তুলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমি কিয়ৎক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। বাস্তবিক বালিকার অদৃষ্টের ফের দেখিয়া আমার অন্তরে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতেছিল,—"আহা, বেচারা বড় অনাথিনী—বড় অভাগিনী।"

যেদিন হইতে আমি বালিকাকে দেখিলাম, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহার জন্য করুণা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার চরিত্রে আর একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল, আর প্রভাতের আলো আমার নিকট তেমন রঙ্গীন, তেমন সুন্দর ঠেকিল না। কি যেন কি একটা তাহাতে নাই।

সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগিয়াছিল—বালিকার সেই বিষাদমাখা ডাগর ডাগর চোখ দুটী! কি করুণ সে দৃষ্টি! সারাদিনের মধ্যে কম করিয়া পঞ্চাশবার তাহার কথা আমার মনে জাগিতে লাগিল। তাহার স্মৃতি হইতে কিছুতেই আমি আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলাম না। একটা নেশার মত সে আমায় বেষ্টন করিয়া রহিল।

পরদিন আমি যখন দুগ্ধ দিতে গেলাম, সে তখন আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আহা বেচারা জন্মদুঃখিনী, অনাথিনী, বড় স্নেহের কাঙ্গাল! স্নেহ করিবার মত তাঁহার একজনও নাই! আমি দুগ্ধপাত্র পূর্ণ করিতে করিতে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম,—"তোমার নাম কি?"

অতি মৃদুকণ্ঠে বীণায় করুণ সুরের মত উত্তর হইল,—"কমলা।"

"বাঃ! কি সুন্দর নামটী। কি বল্‌লে? কমলা?"

বালিকা নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলে, সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে সেটী তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"দাঁড়াও কমলা, এই নেবুটা নাও—গাছপাকা ফল!"—সেদিন আমি পথে আসিতে আসিতে একটা গাছপাকা নেবু পাইয়াছিলাম। বালিকাকে সেইটী আমার স্নেহের প্রথম উপহার দিলাম।

বালিকা সেটী আমার হস্ত হইতে সাগ্রহে গ্রহণ করিল; তাহার পর দুগ্ধের পাত্রটী লইয়া হোটেলের মধ্যে চলিয়া গেল। কি জানি কেন অজ্ঞাতে একটী দীর্ঘশ্বাস আমার হৃদয় ভেদ করিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই আমি কমলার জন্য কিছু না কিছু উপহার আনিতাম।

প্রণয়-দেবতা আমাদিগের অলক্ষ্যে বসিয়া কি কল পাতিতেছিলেন, তাহা না বুঝিতে পারিলেও এটা বেশ বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের বন্ধন,—স্নেহের বন্ধন ক্রমে গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। আমার আসিতে কোনদিন বিলম্ব হইলে দেখিতাম, কিশোরী তাহার করুণ দৃষ্টিপূর্ণ ডাগর ডাগর চোখ দুটী তুলিয়া আমারই আগমন-পথের দিকে চাহিয়া আছে। আমার চোখের সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিলেই ক্ষণেকের তরে নয়নের বিষাদের ভাব কাটিয়া গিয়া আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিত! আর আমারও নীরস প্রাণের মধ্যে যে একটা আনন্দের লহর ছুটিয়া যাইত না, একথা বলিতে পারি না।

কিন্তু সারাদিনান্তে এ ক্ষণিকের মিলনও বিধাতার প্রাণে সহিল না। একদিন দুগ্ধ দিতে আসিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কমলার সাক্ষাৎ পাইলাম না। একবার আমার মনে হইল,—"তবে বোধ হয় তাহার কোন অসুখ হইয়া থাকিবে।" চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? তখন একজন ভৃত্য হোটেলের দুগ্ধ লইয়া

চলিয়া গিয়াছে, তবে আর কাহাকেই বা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব? আর, ছিঃ! লজ্জা করে না? কেহ যদি বলে,—"তার খোঁজে তোমার দরকার কিহে? সে তোমার কেউ হয় নাকি?" তখন আমি কি উত্তর দিব? সত্যই ত সে আমার কে, যে তাহার জন্য আমি এত চিন্তিত হই? সেও কি আমার জন্য এমনি করিয়া চিন্তা করে? কে জানে!

সে দিনটা আমার নিকট নিতান্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হইল। কোন কর্ম্মেই ঠিক করিয়া মন লাগাইতে পারিলাম না।

পরদিন গেল,—তাহার পরদিন,—তাহার পরদিন, ক্রমে মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু তথাপি আমি আমার নয়নানন্দদায়িনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমার মনের সুখ কর্পূরখণ্ডের ন্যায় একটু একটু করিয়া উবিয়া যাইতে লাগিল। কেন তাহা কে বলিয়া দিবে?

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এ কয়মাসের মধ্যে একদিনও কমলার দর্শন পাই নাই। একদিন প্রাতে নিয়ম মত আমি হোটেলে দুগ্ধ দিয়া স্থানান্তরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এরূপ সময়ে একটা কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠ আমি শুনিতে পাইলাম। কৌতূহলী হইয়া হোটেলের দ্বারের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, একটী কিশোরী সিক্ত-নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বাহির হইতেছে, আর তাহার পশ্চাতে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে হোটেলওয়ালা স্বয়ং আসিতেছেন। আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম— কিশোরী আমারই নয়নের মণি 'কমলা'!

ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল, হোটেলওয়ালাকে এক মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া অবলা কমলার প্রতি অযথা অত্যাচারের প্রতিফল লই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, তাহাতে কমলার কোন উপকার ত হইবেই না, উপরন্তু আমার শ্রীঘরবাসের বন্দোবস্তও হইয়া যাইতে পারে। কাযেই সে কর্ম্মে বিরত হইলাম।

হোটেলওয়ালা কর্কশ স্বরে কহিলেন—"খবদ্দার বেটী, আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর পা দিবি না। অনাথা দেখে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলুম, তার ত খুব ফল পেলুম। অমন মোটা সোণার চেনটা চুরি ক'রে নিলি। তা বেশ হ'য়েছে—আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, এখন এখান থেকে বেরোও;—যে চুলোয় হয় যাও।" গজর গজর করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

আমি কমলার নিকট গিয়া বলিলাম,—"চল কমলি, আমার বাড়ী তুমি থাক্‌বে!"

সে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কিন্তু আমি যে চোর।"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"হ'তে পারে না, নিজে চোখে দেখ্‌লেও আমি তা বিশ্বাস করি না।"

সে তাহার ডাগর ডাগর চোখ দুটী আমার মুখের উপর রাখিয়া বলিল,—"কেন?"

"কেন?—কেন তা জানি না, আমার মন ব'লচে,—তুমি আমারই মত নিরীহ।"

তাহার নয়ন বহিয়া অজস্রধারে অশ্রু ছুটিল। ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া সে বলিল,—"ধন্য ভগবান, তবু এখনো একজন আমায় নির্দ্দোষ—নিরীহ মনে ক'রে,—সেই আমার যথেষ্ট।"

"আর শুধু তাই নয়, আমি তোমায় বিশ্বাস ক'রে আমার হৃদয়ের চাবি দেব, তাও স্থির করেছি।"

এবার কমলা লজ্জায় মুখ নত করিল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুধর ও জলধর।

গিরি কহে, "মেঘ তব ভাল বীরপণা,
লুণ্ঠিত চরণে কেন হ'য়ে জলকণা?
আশ্রিতের প্রতি আমি বড়ই সদয়,
বৃথা ডেকে মর কেন দিতেছি অভয়।"
জীমূত হাসিয়া কহে, "আমি কামচার,
মোর শব্দে জলমগ্ন মৈনাক পাহাড়;
বজ্রে তব পক্ষ কেটে করেছি অচল,
পুনঃ যদি উঠে পাখা খুঁজি অন্তঃস্থল।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

মাতৃত্বের পুষ্টি।

এই মোহময় জগতের মোহ-মাদকতা জীবের ধর্ম্ম-পথ রোধ করে। জীব মোহের চতুরতায় আপনাকে আপনি বুঝিতে সমর্থ হয় না। সে যে সুখের স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছে, সে যে মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ রাজ-রাজেশ্বর পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট হইতে এই মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছে, ইহা তাহার স্মরণ থাকে না। সে আত্মবিস্মৃত হয়। তাহার জীবন যে পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ টলটলায়মান, তাহার জীবনের সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, ইহা তাহার স্মরণ থাকে না। সে সংসারের অনন্ত জনস্রোতের অনন্ত কোলা-হলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

তবে যে বাল্যে জননীর নিকট হইতে সুন্দর মঙ্গলময় উপদেশ লাভ করি-য়াছে, সে কালে ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। আমরা বুঝিতে পারি, বাল্যের শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রধান ভিত্তি। চরিত্রোপযোগী সমুদয় সদ্‌গুণ বাল্যেই মানব হৃদয়ে রোপিত হয়। মানব তাহা আবার শিক্ষার প্রভাবে মার্জ্জিত করিয়া তোলে। মাতা সেই সকল সদ্‌গুণ সন্তানকে বাল্যেই শিক্ষা দেন।

মাতা তাহা আবার তাঁহার মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, দেশের বালিকাগণই দেশের ভাবী-সন্তানের মাতা। তাহারাই কালে সন্তানের মাতা হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবে। তাহাদেরই হৃদয়ে মাতৃত্ব রহিয়াছে। সেই মাতৃত্ব পুষ্টির জন্য জনক-জননীর প্রধান কর্ত্তব্য, বালিকাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করা।

মাতৃত্ব আর কিছুই নহে, তাহা কেবল কতকগুলি সদ্‌গুণের সমষ্টি মাত্র। স্নেহ, দয়া, পরোপকার, ভক্তি, প্রীতি, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, সততা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের সমবায়ই মাতৃত্ব। বাল্যে যাহাতে ঐ সকল গুণ বালিকার হৃদয়ে সুন্দর রূপে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, পিতা-মাতার তাহাতে মনোযোগ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

মনুষ্য-হৃদয় পরম কারুণিক জগৎ-পিতার মহিমায় মহিমান্বিত। তাহাতে যখন কোন পাপ প্রবেশ করে, তখন তাহা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে থাকে। স্বর্গ যেমন পাপের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, হৃদয়ও সেইরূপ পাপের

অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, পাপের প্রবল অত্যাচারে হৃদয়ে নানা রোগ উৎপন্ন হয়; তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সেই জন্যই পিতা-মাতার প্রধান কর্ত্তব্য,—বাল্যে যাহাতে বালিকার হৃদয় ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা। তাহা যদি না করেন, তবে স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হৃদয় কুশিক্ষায় নরক হইয়া উঠে।

বালিকার হৃদয় স্বভাবতঃ স্নেহ প্রবণ। সেই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে মাতৃত্বের বীজ বপন করা অতি সহজ। বালিকা যাহাতে স্নেহ, দয়া, সারল্য, সন্তান-বাৎসল্য, ভক্তি, প্রীতি, পরোপকার, প্রেম, অনুরাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাধুতা প্রভৃতি সদগুণরাশি শিক্ষা করিতে পারে, তাহাই করা আমাদের প্রধান করণীয় কর্ম্ম। কারণ, উহারাই ভাবী সন্তানের মাতা। সে যদি শৈশবে ঐ সমুদয় গুণরাশি প্রাপ্ত না হয়, তবে সে কেমন করিয়া তাহা সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করিবে?

মাতার মাতৃত্বের ন্যায় অমৃতময় পদার্থ জগতে আর আছে কি না সন্দেহ! অমৃত সেবন করিলে মানব অমর হয়, কিন্তু যিনি মাতৃস্বরূপ অমৃত সেবন করিয়াছেন, তিনি এই মর-জগতের অমর, কারণ অমিয় শোক তাপ, প্রবঞ্চনা, সত্য মিথ্যা জড়িত সংসারে পাওয়া বড়ই দুষ্কর; সুতরাং জগতে মাতৃত্বই আমাদের সুধার কার্য্য করে।

বাল্যে বালিকার হৃদয় আমাদের হৃদয় অপেক্ষা কোমল থাকে। সেই কোমল হৃদয়ে যাহাতে মাতৃত্বরূপ বৃক্ষের বীজ রোপিত হয়, তাহার চেষ্টা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। বৃক্ষের বীজ যেমন তাহার ক্ষুদ্র কোষে আবদ্ধ থাকে ও কালে তাহা মাটিতে উপ্ত হইয়া জল, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতির সহায়তায় বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ মাতার সমস্ত গুণরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে, পরে তাহা উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সহায়তায় মহান্ মাতৃত্বে পরিণত হয়।

শূন্য মণ্ডল যেমন সমগ্র জগতের আধার, সেইরূপ হৃদয়াকাশও সমস্ত গুণের আধার। অনন্ত গগনমণ্ডল যেমন সমস্ত পদার্থ নীরবে ধারণ করিয়া আছে, তেমনই আমাদের হৃদয়ও সবই নীরবে ধারণ করিয়া আছে। পুরুষের হৃদয় অপেক্ষা স্ত্রীর হৃদয় ধারণক্ষম। তাই রমণী নীরবে গর্ভবেদনা সহ্য করিতে সমর্থ। সেই জন্যই রমণী জাতি মাতৃস্থানীয়া।

পৃথিবী আমাদের শাস্ত্রমতে প্রাণময়ী। কিন্তু তিনি প্রাণময়ী হইয়াও

আমাদের পদতলে নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন, আমরা অবাধে তাঁহাকে পদদলন করিতেছি, তিনি কিছুমাত্রও বলিতেছেন না। বরং আমাদের জীবন-ধারণোপযোগী সমুদয় শস্যই তাহা হইতে অপহরণ করিতেছি; কিন্তু তিনি কিছুই বলিতেছেন না। তিনি যেন আমাদের মাতা, আর আমরা যেন তাঁহার স্নেহপালিত সন্তান। সন্তানের উপকারের জন্য মাতার যতটুকু মাতৃত্ব থাকার দরকার, তাহা তাঁহার হৃদয়ে আছে; আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি নীরবে মানবকে যে স্নেহ প্রদান করেন, তাহা মাতার স্নেহ অপেক্ষা মধুর। কিন্তু আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া আমাদের দশা এরূপ। আমরা যে বুঝিতে পারি না, তাহার অনেক কারণ আছে।

আমাদের আর্য্যনারীগণই আদিম অবস্থায় এই মহামহিমান্বিতা সাগর-বসনা ধরার নিকট হইতে বিনয়, স্নেহ, দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণই শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা জগতে মাতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, আমরা যেন বালিকা-দিগকে পৃথিবী হইতে মাতৃত্ব গ্রহণ করিতে শিক্ষা প্রদান করি। পৃথিবীতে মাতৃত্বের যেমন পুষ্টি, বোধ হয় সমস্ত নারী-মণ্ডলীতে তাহার সেরূপ পুষ্টিলাভ ঘটে নাই। পৃথিবী একাধারে স্নেহময়ী, করুণাময়ী, দ্বেষশূন্যা, ক্রোধ-রহিতা,—সর্ব্বদাই যেন হাস্যময়ী। পৃথিবীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আত্মার পবিত্রতা সাধন করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ ধরিত্রীর মাতৃত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে অধ্যাত্ম জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনায় হৃদয় পূত হয়। অনন্ত জগতের অনন্তত্ব বুঝিতে পারিলে, নিজকে অতি সামান্য—হেয়াদপি হেয় বোধ হয়। আকাশ অনন্ত। সেই অনন্ত গগনে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবীরও কিছু অনন্তত্ব আছে। তাই পৃথিবী মাতৃত্ব ও অনন্তত্বের আধার।

পৃথিবীর মাতৃত্ব বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে গেলে, তাহাদিগকে প্রকারান্তরে পৃথিবীর অসীমত্বও শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বুঝিতে পারে যে, আমরা কিছুই নহি, আমরা অনন্ত জগতের নিকট কত ক্ষুদ্র। আর স্নেহও অনন্ত। সেই অনন্ত স্নেহের বশীভূতা

হইয়াও বটে এবং উক্ত কারণেও বটে, মাতা স্বইচ্ছায় সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করেন।

তাই, বালিকাগণ যাহাতে সহজেই পৃথিবীর মাতৃত্ব ও অনন্তত্ব বুঝিতে পারে, তাহার বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

বালিকার তরুণ হৃদয়ের পুষ্টি-সাধন করা বড়ই কঠিন, সেই জন্য তাহার তরুণ হৃদয়ের পুষ্টি-সাধন করিতে হইলে, নিজকেও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, মাতাই বালিকাকে শিক্ষা দেন। সেই জন্যই মাতার বোঝা উচিত, আমরা যেমন সন্তানের মাতা, কালে উহারাও তদ্রূপ হইবে।

বালিকার হৃদয়ের ভাব মাতাই বুঝিতে পারেন। হৃদয়ে যাহাতে পাপ-স্পৃহা প্রবেশ করিতে না পারে, মাতার তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, হৃদয়ই মাতৃত্বের আধার। হৃদয় অপবিত্র হইলে, মাতৃত্বের মধ্যেও আবিলতার ছায়া আসিয়া পড়ে।

যাহা পবিত্র, যাহা চিরপ্রীতিপ্রদ, যাহা কামনাবিহীন, যাহা মঙ্গলময়, যাহা পুষ্পের মত সুন্দর, তাহাই আদর্শ। আদর্শ বলিলে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষ বুঝায় না; পরন্তু তাহাদের গুণসমষ্টি বুঝায়। মাতৃত্বে সকল গুণই অতি সুন্দর রূপে পুষ্টি-লাভ করিয়াছে। তাই মাতৃত্ব এত সুন্দর, এত পবিত্র, এত প্রেমময়, এত মঙ্গলময় বলিয়া জগতে আদর্শরূপে গীত।

মাতৃত্বের নিকট পাপ বা মোহ, অনন্ত মহাসাগরে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায় বেগে কোথায় ভাসিয়া যায়, কেহই তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না।

মাতৃত্বের বিকাশে জগতের বিকাশ। মাতৃত্বের বিনাশে জগতের বিনাশ। ইহার এত সম্যক্ বিকাশ বলিয়া, জগৎও এত সুন্দর বিকশিত হইয়াছে। নচেৎ জগৎ কোন্ দিন ধ্বংসের মুখে চলিয়া যাইত!

বর্ত্তমান সময়ে মাতার মধ্যেও প্রায় স্বার্থপরতা, ঘৃণা, অহঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে। তাহার প্রধান কারণ, মাতৃত্বের সম্যক্ পুষ্টি হইতেছে না। অধুনা যদি মাতার মাতৃত্বের সম্যক্ বিকাশ হয়, তবে মাতার স্নেহের পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা কেবল নিজ নিজ অহঙ্কারে মত্ত থাকি; বালিকাদিগের শিক্ষার নিয়ম-প্রণালী সম্বন্ধে একবারও চর্চ্চা করি না। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা! আমরা যদি পুনরায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত

করি ও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করি; তবে আবার তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

বালিকাদিগকে কেবল বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রাঁধা প্রভৃতি শিক্ষা দিলে হইবে না; এ সকল ত আবশ্যকই, ইহার উপর লেখা পড়া শিক্ষা দিতে হইবে।

মাতার শিক্ষাদানের উপর বালিকার হৃদয়ের পুষ্টিসাধন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং বৎসর বৎসর বালিকাগণ সম্পূর্ণরূপে সৎশিক্ষা লাভ করিলে, আমরা কালে তাহাদের হৃদয়ে মাতৃত্বের পুষ্টিসাধন দেখিতে পাইব।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী।

মাতৃপূজা।

কার্ত্তিকের অমানিশা ঘোর অন্ধকারে,
এলায়ে চিকুর-জাল ঘন কাদম্বিনী।
শত সূর্য্য-প্রভান্বিত মুকুট সুন্দরে
উজলি গগনতল তমসা যামিনী॥
অলক্ত রঞ্জিত পদ হর-হৃদি পরে
শ্বেত নদে বিকসিত রক্তোৎপল-সমা।
নীরদ বরণে মরি শত সুধা ঝরে
ঢালি সুপ্তা ধরা-বক্ষে অনন্ত সুষমা॥
আসিছ মা পুনঃ তুমি ভারত-মাঝারে
বৎসরের আশীর্ব্বাদ করিতে প্রদান।
হরিতে অশুভ যত, বরাভয় করে
উদ্ধারিতে দীন হীন অধম সন্তান॥
তাইতো ভারতবাসী মুছি আঁখিজল
বৎসরের দৈন্য দুঃখ শত হাহাকার
পাশরি, আনন্দ উৎসে হয়েছে বিহ্বল
পূজিতে মঙ্গলময়ী! চরণ তোমার॥
পূত স্নিগ্ধ নিরমল জাহ্নবী-সলিল
ভরি কোন ভাগ্যবান সুবর্ণ-কলসে।

অমরবাঞ্ছিত ওই চরণ-যুগল
অর্চ্চনা করিছে, মাগো মনের হরষে॥
কেহ বা পূজিছে তোমা পত্রের কুটীরে
পুষ্প দূর্ব্বা বিল্বদলে অর্ঘ্য করি দান।
অক্ষয় আশীষ তব লভিবার তরে
জননি! আকুল আজি সবার পরাণ॥
কিন্তু মা, জানি না তুমি তুষ্ট কিসে হও,
অভয় চরণ দুটী কিসের অধীন?
ভুবনমোহিনী রূপ মানবে দেখাও,
কোন ব্রতে ব্রতী নর পায় হেন দিন?
হায় মা, অধম আমি লৌকিক আচারে
সাজায়ে নৈবেদ্য, করি ছাগ বলিদান
পূজেছিনু ও চরণ, তাতে তো আমারে—
দিয়েছ তারিণী তুমি ভাল প্রতিদান॥
পূজা-উপচার সনে নিয়াছ হরিয়ে—
পরাণের শত সাধ—সুখের সংসার
ছাগ-শিশু মত, হায়! হৃদি বিদারিয়ে
তুলে নেছ জননী গো সর্ব্বস্ব আমার॥
তুমি বুঝি চাহ শুধু নির্ম্মল ভকতি,
অনাসক্ত মানবের পূত অন্তঃস্থল?
চাহ না বাহ্যিক পূজা সমাজের রীতি,
চাহ শুধু ভকতের প্রেম অশ্রুজল!
তাই যদি চাহ, তবে এস গো তারিণী
আদ্যাশক্তি সনাতনী জননী আমার।
নিদাঘ কুসুম-সম শুষ্ক হৃদিখানি
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চরণ তোমার
পূজিব, জুড়াব দেবি! তাপিত পরাণ—
বাসনা কামনা ধীরে হবে অবসান॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার

নূরজাহান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

মেহের চীৎকার করিয়া কহিল,—যুবরাজ, আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন? যদি কেহ আপনাকে আমার সহিত এরূপ অবস্থায় দেখে, তবে আমারই সর্ব্বনাশ, আপনার বিরুদ্ধে কে কথা বলিতে সাহস করিবে?

সেলিম। সুন্দরি? সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। আমার দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে কাহার এমন সাধ্য যে সেলিমের হৃদয়েশ্বরী মেহের-উন্‌-নিসার চরিত্রে কলঙ্ক ঘোষণা করে?

মে। সে যাহা হউক, যুবরাজ, আমাকে এখন বিদায় দিন?

সে। সুন্দরি, তাহা হইবে না। তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেও হৃদয় হইতে যাইতে পারিবে না। সুন্দরি, তুমি যে আজ হ'তে আমার হৃদয়ের রাণী—প্রাণের প্রতিমা;—আমি যে তোমা বই এ সংসারে আর কিছুই জানি না।

মে। যুবরাজ, হইতে পারে আপনি আমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ ভালবাসা হৃদয়ের নয়—ইহা কেবল মুহূর্ত্তমাত্রের চিত্তবিভ্রম।

সে। সুন্দরি, আমি আল্লার নামে—খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি—এত ভালবাসি যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার আমার ক্ষমতা নাই। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে এই দেখ—দেখ তোমার জন্য আমি এই মুহূর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছি। এই বলিয়া সেলিম পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে তৎক্ষণাৎ একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করতঃ তাহা আমূল বক্ষে বসাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

মেহের তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত হইতে ছুরিকাখানি কাড়িয়া লইলেন।

মে। মাপ করিবেন যুবরাজ, এ অধীনীর ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আমি সত্য সত্যই জানিতাম না যে, যুবরাজের হৃদয় এই সামান্যা ভিখারিণীর জন্য

এতটা উন্মথিত হইয়াছে। যুবরাজ, আজ হ'তে আমিও—এই হতভাগিনীও—মেহের-উন্-নিসাও যুবরাজ সেলিমের—পদসেবিকা দাসী।

মেহেরের উত্তর শুনিয়া সেলিমের গণ্ডস্থল আনন্দে আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি অত্যধিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া আরও দৃঢ়তার সহিত মেহেরের হস্ত ধারণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেহের বলিল, যুবরাজ, আমার পিতা-মাতা যদি আমাদের এই শুভ-সম্মিলনের প্রতিবন্ধক হন, তবে—

সেলিম মেহেরের কথায় বাধা জন্মাইয়া বলিলেন, সে ভার আমার উপর রহিল।

মেহের সেই কথা শুনিয়া আনন্দ-উদ্বেলিত নয়নে সেলিমের দিকে একবার সপ্রেম দৃষ্টি করিল। অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইল, মেহের লজ্জাবনতমুখী হইলেন।

তখন সেলিম সেই সলজ্জা মেহেরকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করতঃ আপন বক্ষোপরি রাখিলেন। এবং তারপর—তারপর লিখিতে লজ্জা হয়, রূপোন্মত্ত সেলিম সেই বিশ্বসুন্দরীর আরক্তিম গণ্ডস্থলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন, আর একদৃষ্টে সেই সুধাংশু-বদনখানির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। সেলিমের তখনকার ভাব দর্শনে বোধ হয়, যেন তিনি বলিতেছিলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

কিছুক্ষণ পরে মেহের উঠিয়া সেলিমের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল এবং অনতিবিলম্বে আপন মাতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। তখন সন্ধ্যাকাল সমাগত-প্রায়। দূরে পশ্চিম গগনে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষিত হইয়া অস্তগমনোন্মুখী রবিকে সাশ্রুনয়নে বিদায় দিতেছিল। সেলিম তাহা দেখিতে দেখিতে অশ্রু ও বিষাদ-ভারাক্রান্ত নেত্রে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৫)

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। পৌর্ণমাসীর সমুজ্জ্বল কুমুদিনীনাথ একখানি সোণার থালার ন্যায় আকাশ-মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য

নক্ষত্রসকল মিটি মিটি জ্বলিয়া আপনাদের অবস্থানের দূরত্ব ও অবয়বের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কচিৎ দুই একটী চকোর চন্দ্র-কিরণ-সুধা পানাশায় দূরে শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে কোন গৃহে সুষুপ্ত শিশুর নিদ্রা-ভঙ্গ বা ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন, কোন বাটীর প্রাঙ্গণে দৌবারিক-কুলতিলক সারমেয়ের গম্ভীর রব এবং কোথাও বা ক্ষুদ্র লতাগুল্মের মধ্যে নিশাচর শৃগালাদি জন্তুগণের ধীর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। এমন সময় কে ঐ দুইজন পুরুষ-স্ত্রী গৃহের ঝুলবারান্দায় বসিয়া আছেন? গৃহের নিম্ন দিয়া নীল সলিলা যমুনা কল্ কল্ রবে প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহারা কি তাহাই দর্শন করিতেছেন; অথবা মৃদু মন্দ মলয়ানিল উপভোগ করিতেছেন? না, তাহা নহে। এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গিয়াস্‌বেগ ও তাঁহার পত্নী।

গিয়াস্ পত্নী। দেখ! দেখ! কেমন সুন্দর রাত্রি! আমি এরূপ জ্যোৎস্না-রাত্রি বড় ভালবাসি।

গি। কিন্তু একবার সেই রাত্রিটীর বিষয় স্মরণ কর দেখি, যে রাত্রিতে তুমি প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিলে, সে রাত্রের কথা স্মরণ হয় কি? সে রাত্রিতে চন্দ্র আমাদিগকে কিরণ দেয় নাই—পৃথিবী বিন্দুপরিমাণ আশ্রয় দেয় নাই কেহ একবার মুখ তুলিয়াও আমাদের দিকে বারেক তাকায় নাই। কি আশ্চর্য্য! মানুষের অভাবের সময় স্বর্গীয় পদার্থপুঞ্জের ন্যায় বহিঃপ্রকৃতিও বুঝি তাহার প্রতিকূল হয়।

গি-পত্নী। আজিকার এই সুন্দর রাত্রিতে কেন সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিতেছ? দেখ, মেহেরকে ঐরূপ ভাবে পথের মাঝে ফেলিয়া রাখা অন্যায় হইয়াছিল। দেখ না কেন, মেহেরের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৌভাগ্যও যেন দিন দিন বাড়িতেছে।

গি। হাঁ, সত্য কথাই বলিয়াছ। মেহেরকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, তাহার ভবিষ্যৎ বিশেষ সমুজ্জ্বল। সে পঞ্চদশবর্ষীয়া হইলেও কেমন গাম্ভীর্য্যময়ী ও চিন্তাশীলা। অধিক আর কি বলিব, আকবরের ন্যায় মহানুভব সম্রাট্, তোমার ন্যায় পত্নী ও মেহেরের ন্যায় কন্যা পাইয়া আমি পরম সুখী হইয়াছি।

গি-পত্নী। আমিও তোমার ন্যায় স্বামী পাইয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু দেখ, একটী কথা তোমাকে

বলিব বলিব ভাবিয়াও এতদিন বলি নাই। মেহেরের শীঘ্র একটা বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

গি। আমিও বহুদিন যাবৎ এই বিষয় চিন্তা করিতেছি। তুমি বোধ হয় আলিকুলী বেগের নাম শুনিয়া থাকিবে। তিনি সাহসী ও সদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট লোক, আমি তাঁহারই সহিত মেহেরের বিবাহ দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি।

গি-পত্নী। তিনি কোন্ দেশীয় লোক ?

গি। তিনি পারস্য দেশীয় লোক।

গি-পত্নী। তবে মালিকমসুদ যে বলিয়াছিল,—আমাদের মেহের রাজ-রাণী—সম্রাটের বেগম হইবে, সে কথা ভুল! যুবরাজ সেলিম ত পূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছেন।

গিয়াসবেগ পত্নীর কথায় বাধা জন্মাইয়া বলিলেন, দেখ, যুবরাজ সেলিম বিলাসী, প্রমোদপ্রিয়; সুতরাং সেলিম মোগল রাজ্যের ভাবী একচ্ছত্র সম্রাট্ হইলেও আমি কখনও তাহার সহিত মেহেরের বিবাহ দিব না। ইহাতে যদি আমাকে এ রাজ্য ছাড়িয়া আবার পূর্ব্ববৎ বনে বনে—পথে পথে বন্য পশু বা ভিখারীর ন্যায় বেড়াইতে হয়, তাহাও সর্ব্বাংশে বরণীয়।

গি-পত্নী। আচ্ছা মনে কর, যদি সেলিম মেহেরকে সত্য সত্যই সর্ব্বান্তঃ-করণে ভালবাসে—সেলিম যদি মেহের বই অন্য কাহাকেও এজগতে হৃদয় দান না করে, তাহা হইলেও কি সেলিমের সহিত বিবাহ দিবে না ?

গি। অসম্ভব, তুমি কি মনে কর সেলিমের ন্যায় বিলাসী, সুরাপায়ী, স্খলিত-চরিত্র, তরুণ যুবক মেহেরকে পবিত্র ভাবে—হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারে ? সে যে সৌন্দর্য্যের পিপাসু—রূপের ভিখারী। যে দিন তাহার রূপ-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে, সেই দিনই যে সে মেহেরকে ছিন্ন পাদুকার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিবে ?

গি পত্নী। তবে কি তুমি আলিকুলীর সহিত মেহেরের বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ ?

গি। হাঁ, আপাততঃ তাহাই। আলিকুলী যেমনই সুশ্রী, তেমনই বীর। বীর বলিয়া আলিকুলী সৈন্যগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জনও করিয়াছেন।

গি-পত্নী। আমি অনেক সময় তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি, তিনি কি মেহেরের মত সুন্দর ?

গি। না, মেহেরের মত সুশ্রী নন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস,—মেহের তাঁহার একটু পরিচয় পাইলেই তাঁহাকে ভালবাসিবে। তিনি আমাদের ন্যায় রাজনৈতিক ব্যাপারে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্রাট্ আকবরের সৈন্যদলে যোগদান করেন। তিনিও আমাদেরই ন্যায় পূর্ব্বে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু ভাগ্য-গুণে আজি তিনি এক সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক

এই ভাবে গিয়াস্ ও তাঁহার পত্নী সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীতে আপন গৃহের ঝুলবারান্দায় বসিয়া মেহেরের বিবাহ-সম্বন্ধীয় কত কথা বলিলেন। তাঁহারা কথাবার্ত্তায় এতটা তন্ময় হইয়াছিলেন যে, উপরে—আকাশে যে একখণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের আদপেই ধারণা ছিল না। অকস্মাৎ বজ্রধ্বনিতে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইলে —উভয়ে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

(৬)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে গিয়াস্-পত্নী ও তাঁহার কন্যা মেহের-উন্-নিসা একখানি শিবিকায় আরোহণ করিলেন। শিবিকার মধ্যভাগ মখ্‌মল্ ও সুবর্ণাদি বহুমূল্য ধাতু দ্বারা মণ্ডিত। ষোড়শ জন বাহক তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানাদি অতিক্রম করিয়া শিবিকা অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলে, বাহিকাগণ আসিয়া বাহকদিগের স্থান অধিকার করিল। শিবিকা নাগামহল ছাড়িয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রাঙ্গণে ভারত-সম্রাট্ আকবরের প্রিয়া মহিষী যোধবাই আজ "ভিজিয়া" উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন। গিয়াস্-বেগ সেই উৎসবে যোগদান করিতে গেলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শরৎকাল। বহিঃপ্রকৃতি আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। আকাশ নীলবর্ণ—শস্যক্ষেত্র শ্যামল। স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে আপনা হইতেই ভাবুকের চিত্তে যেন এই শ্লোক উত্থিত হয়—

"আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে;
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ—
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

সুতরাং এমন আনন্দময় শারদীয় প্রভাতে—যে শরৎকালে বিশ্বজননী শারদীয় মাতার আগমনে বঙ্গের দীন দরিদ্র, ধনী নির্ধন সকলের মুখ আনন্দে

উৎফুল্ল হয়—ব্যথিতের ব্যথা দূর হয়—চিরদুঃখীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, আর সরলপ্রাণা কৃষকরমণী যে শরৎকালে আশুধান্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে পঞ্চমে গান করে, সেই সুমধুর সুস্নিগ্ধ শরৎকালে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের অঙ্কশায়িনী কি নীরব থাকিতে পারেন? তাই রাজ-পরিবারের ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি লইয়া আজ যোধবাই "ভিজিয়া" উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন।

প্রাতঃকাল অতি মনোহর। ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিও যেন প্রেমাশ্রুতে সেই উৎসব ক্ষেত্র অভিষিঞ্চিত করিবার জন্য পতিত হইতেছে। এদিকে মোগলান্তঃপুরের তন্বঙ্গী যুবতীগণ একে অন্যের গাত্রে পড়িয়া কখনও বা নৃত্য করিতেছিলেন—কখনও বা গান করিতেছিলেন—আবার কখনও বা হাস্যের কল্ কল্ শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতেছিলেন।

রাজমহিষী যোধবাই একখানি সুবর্ণখচিত সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বয়স তখন চল্লিশের কিঞ্চিদধিক, তথাপি তাঁহার লাবণ্যরাশি দর্শনে তাঁহাকে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাতিস্থূল—নাতি কৃশ, মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী শারদীয় পৌর্ণমাসীর চন্দ্রের ন্যায় টল্ টলে, কুন্তল-রাশি গাঢ় কৃষ্ণ, দেখিলে একখানি চিত্রপট বলিয়া মনে হয়। সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে যতদূর ভালবাসিতেন, আর কোন বেগমকেই ততদূর ভালবাসিতেন না।

আমাদের আখ্যায়িকোক্ত মেহের ও তাঁহার মাতা গিয়া যোধবাইকে প্রণাম করিলেন। মেহেরের মাতা যোধবাইএর পার্শ্বে একখানি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন এবং মেহের যুবতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত যোগদান করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল।

উপস্থিত যুবতীরা মেহেরের গান শুনিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বসিয়া ঐ যুবকটী কে? চল পাঠক একবার অনুসন্ধান করি,—অন্তঃপুর মধ্যে কেমনে অন্য পুরুষ—বিশেষতঃ উদ্ভিন্ন যুবক প্রবেশ করিয়াছে!

যুবরাজ সেলিম সেইদিন প্রভাতকালে মেহের ও তাহার মাতাকে শিবিকায় আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে আপনি অন্তঃপুরে আসিয়া মেহেরের সঙ্গীত, নর্ত্তনাদি শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। তিনি মেহেরের সঙ্গীত শ্রবণে এতদূর মোহিত হইয়াছেন যে, কেদারার উপর ভাবাবেশে

শুইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, তিনি যেন তেমন স্বর - তেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী কখনও শুনেন নাই কিংবা দেখেন নাই।

যোধবাই মেহেরের সঙ্গীতে প্রীতা হইয়া তাহার গণ্ডে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন, মেহের! তোমার যেমনি মিষ্ট স্বর, তেমনই মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গী! তারপর তিনি মেহের-জননীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন," আহা মেয়েটী যেন একটী সোণার পুতুল! কিন্তু এমন সোণার মেয়ের যোগ্য বর পাইলে কি ?

গিয়াস-পত্নী বলিলেন, কাল রাত্রে আমার স্বামী বলিয়াছেন যে, সম্রাটের সেনাবিভাগে আলিকুলী খাঁ নামে একজন সুপুরুষ সৈনিক আছেন, তাঁহারই সহিত মেহেরের বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

যোধবাই। আলিকুলী খাঁ খুব সুপুরুষ এবং সুদক্ষ সৈনিক পুরুষ, তাহা আমি জানি। কিন্তু যোদ্ধপুরুষেরা কখনও রমণী-প্রেমে আত্মহৃদয় বিসর্জ্জন দিতে পারে না; সেই জন্য ভাবিতেছি, আলিকুলীর সহিত বিবাহ হইলে মেয়েটী বোধ হয় সুখী হইতে পারিবে না। সে যাহা হোক্, আলিকুলীর সহিত মেহেরের পরিণয়-নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ আমার সহিত তোমাদের একবার পরামর্শ করা উচিত ছিল।

গি-পত্নী। আমার স্বামী সবে মাত্র কাল রাত্রে আমাকে এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং সম্রাজ্ঞীকে কেমন করিয়া আমি তাহা নিবেদন করিব ? আমি স্বয়ং এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তিনি স্বামী—সুতরাং তিনি যাহা ভাল বুঝেন, আমারও তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণিক সহানুভূতি।

যোধ। আমারও সেই মত। তোমার স্বামী যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহাতেই মত দেওয়া আমি প্রকৃত স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আশা করি মেহের সুখী হউক , কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটী কথা আছে।

গি-পত্নী। কি কথা সম্রাজ্ঞী !

কথাটী এই—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অনন্ত দাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪)

কুটিলা কহয়ে আমি যাইব সংহতি।
সূর্য্যের নিকট কিছু করিব মিনতি॥
ললিতাদি সখী-সঙ্গে কুটিলা চলিল।
কুটিলা চলিল সঙ্গে বিষম জঞ্জাল॥
বন প্রবেশিয়া ধনী কুটিলারে কয়।
এই বনে বনদেবের হয়েছে আশ্রয়॥
যত দিন সেই দেব বৈসে মোর হৃদি।
ততদিন হৈতে মোর হইয়াছে ব্যাধি॥
কুটিলা কহয়ে তবে অন্য পথে যাই।
অনন্ত কহয়ে বনে আছে সর্ব্বথাই॥

(৫)

পুনঃ সে কুটিলা বলে, সে দেব পাইবার কালে,
কি লক্ষণ করয়ে উদয়।
রাই কহে সৌরভেতে, আমোদ করে এ চিতে,
সব তনু সিঞ্চিয়ে পড়য়॥
(তখন) রাই অঙ্গ-সঙ্গ হৈতে, কৃষ্ণ গন্ধ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল তার নাশা।
তনুতে লোমাঞ্চ হেরে, রাধিকার পায়ে ধ'রে,
বলে রাধে হারাইলাম দিশা॥
তেঁই কহে রুদ্র বলি, দ্রুত গতি যাহ চলি,
সভয়ে পাইলে যাবে প্রাণ।
সেহ ভয়াতুর হোল, দ্রুত গতি পলাইল,
অনন্তের হরিষ বিধান॥

(৬)

সখীগণ হাসি, কহিছে সুভাষি,
নন্দী ভুলালি ছলে।
কহে ধনী রাই, যত কহি তাই,
শ্রীকৃষ্ণ চরণ-বলে॥
এখানে শ্রীহরি, রাধিকা স্মঁওরি,
বিরহ মরমে ভোর।
সুবল যাইয়ে, প্রবোধ করিয়ে,
ধরিল আপন কোর॥
হরি ধরি বলে, আসিবার কালে.
দেখিয়াছি ধনী রাই।
কান্দি ঘরে গেল, না জানি কি হোল,
এখনও মিলিল নাই॥
বন-শুক-পাখী, ডালে বসি ডাকি,
বলে এসেছে সুন্দরী রাধা।
হেনকালে চন্দ্রাবলী, আগমন করি,
মনেতে লাগল ধাঁধাঁ॥
এস এস প্রাণের কিশোরী।
অধিক আদর পেয়ে, চন্দ্রা হরষিত হয়ে,
বলে দুটী চরণেতে ধরি॥
তোমার চরণ-তল, এই মোর ভাগ্য-বল,
তুমি মোর ভজন পূজন।
ফলিল সুখদ তরু, পাইলাম সুখের গুরু
হৃদে ধরি করি সুসেবন॥
আর না ছাড়িব তোমা, জগতে জানুক মহিমা,
নিরজনে কুঞ্জে লয়ে যাব।
চরণ মুছাব কেশে, বসাইব হৃদি পাশে,
ক্ষণে ক্ষণে সর পিয়াইব॥
ধরিয়া শ্যামের করে, লইল নিকুঞ্জ পরে,
আনন্দে করয়ে সুসেবন।

পরশে জানিল শ্যাম, হৃদে জপেন রাধা নাম,
দাস অনন্ত নিমগন ॥

(৭)

মনে মনে ভাবিছেন শ্রীহরি।
যদি কুঞ্জে আইসেন কিশোরী ॥
আসিয়াছেন অতি অনুরাগে।
কি করিবে দারুণ বিয়োগে ॥
এ কথা কহয়ে যদি শুক।
তবে ধনী না হেরিবে মুখ ॥
রাধা রাধা বলেন বনমালী।
চমকিত হৈল চন্দ্রাবলী ॥
এখানেতে রাই কুঞ্জে গিয়া।
ঝুরে আঁখি বঁধু না দেখিয়া ॥
ডাকিয়া কহিছে শুক শারী।
চন্দ্রাবলী লয়ে গেছে হরি ॥
শুনিয়ে বিদরে ধনীর হিয়ে।
(বলেন) যমুনাতে মরিব ডুবিয়ে ॥
সখী কহে অনন্ত ভঙ্গিতে।
যুক্তি আছয়ে সাধিতে ॥

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কাব্যপ্রতিভায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

আত্ম-সংযমের জন্য অমানুষিক কঠোরতা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধানার্থ একনিষ্ঠ উৎসাহোদ্যম এবং সর্ব্বোপরি বালকোচিত আত্মবিস্মৃতি-প্রবণতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চরিত্রগত সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। তপোবনবিহারী মুনি-ঋষিগণের ন্যায় তদীয় আচার ব্যবহারও নিতান্ত পবিত্র ও সরল ছিল। যৌবন ও বয়ঃপ্রাপ্তি সত্বেও তিনি মহাকবি মিল্টনের ন্যায় সংযত ও পবিত্র-ভাবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। মিল্টনের ন্যায় তাঁহারও জীবনে অনেক বিঘ্ন-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল এবং তিনিও জনহিতকর বহুকার্য্য সংসাধনে যত্নপর ছিলেন। পরিশেষে তিনিও মিল্টনের ন্যায় কোনও সুমহান্‌ গ্রন্থ সম্পাদনার্থ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—এমত ধারণা লইয়া আজীবন সাহিত্যসেবায় নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি কোনও অনাদর প্রদর্শন না করিয়া পরন্তু তাহাদের সহিত যে সর্ব্বতো-ভাবে সংস্রব রক্ষা করিয়া চলিতেন, এজন্য বাস্তবিকই মিল্টনের তুলনায় তিনি অনেক গুণে বেশী সুখী ও উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। Paradise Lost এবং Samson Agonistes প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিল্টন যেমন আজীবন স্ত্রী-জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তেমন করেন নাই। মিল্টন তাঁহার আপন কন্যাদিগকেই সাহিত্যক্ষেত্রে দাসীর ন্যায় মনে করিতেন এবং সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার পত্নী ও ভগিনীকে নিজের মতই আধ্যাত্মিক উন্নত বিবেচনা করিতেন এবং স্বভাবতঃই তাহাদের দ্বারা স্বীয় কাব্যের সমালোচনা করাইতে ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। এমন কি, তাঁহার কাব্যের একটী উৎকৃষ্ট কবিতা "The Daffodils" তাঁহার পত্নীর উপদেশানুসারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে করিয়াছেন। কাব্যক্ষেত্রে যে তিনি অনন্ত যশের অধিকারী হইয়াছেন, তাহারও মূলে তদীয় স্নেহময়ী ভগিনীর প্রাধান্য বিশেষরূপেই বিরাজিত রহি-য়াছে;—তাই তিনি লিখিয়াছেন :—

"She gave me eyes, she gave me ears ;
And humble cares, and delicate fears ;

A heart, the fountain of sweet tears ;
And love, and thought and joy."

পুত্রকন্যার প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। সুকুমার-মতি শিশুদিগের প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ছিল, তাহা তদীয় 'We are seven,' 'Lucy,' Gray,' এবং 'Alice fell' নামক সর্ব্বজন পরিচিত কবিতাত্রয়ে বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইলেও স্বীয় কাব্যে ভগিনী ডরোথির 'Address to a child' এবং 'The Mothers return' নামক কবিতা দুইটী সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি উহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বালস্বভাবের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, 'The Poet's epitaph' শীর্ষক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশনিচয়ে তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

"But who is he, with modest looks,
And clad in homely russet brown ?
He murmurs near the running brooks
A music sweeter than their own,
He is retired as noontide dew
Or fountain in a noon-day grove ;
And you must love him, ere to you
He will seem worthy of your love.

* * *

But he is weak ; both Man and Boy,
Hath been an idler in the land ;
Contented if he might enjoy
The things which others understand."

শরীর ও মনের সমুচিত শান্তিরক্ষার্থ কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব, কিন্তু যিনি একদিন অন্তরের সহিত ফরাসীবিপ্লবের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার পক্ষে এবংবিধ শান্তিপ্রিয়তা নিতান্তই বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ হ্রদ ও পর্ব্বতের সান্নিধ্যে আশৈশব অবস্থানে তাঁহার মনেও প্রাকৃতিক শান্তি-সৌন্দর্য্য একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে যে কোন

বিরোধী প্রকৃতি সুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, শৈশবে আত্মহত্যার চেষ্টাতেই তাহা বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সেই সুপ্ত প্রকৃতির সহিত ঐকান্তিক চেষ্টা সংমিশ্রিত হইয়াই তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গরিমায় সমুজ্জ্বল করিয়াছিল ও স্বল্পকালের নিমিত্ত বিপ্লবস্পৃহায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পরবর্ত্তী ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অন্যায় বিপ্লবের অপকারিতা সম্বন্ধে অনতিকাল মধ্যেই অনেক বাস্তব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফরাসীবিপ্লবের ফলপ্রসূত অনিবার্য্য দুঃখাবসাদের সময় তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তদনন্তর যখন রণদুর্ম্মদ নেপোলিয়নের সৈনিকোচিত স্বৈরচারিতায় ফরাসীবিপ্লবের বিষময় ফল দেখা দিল, তখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেম জ্বলন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক 'To the men of kent' 'On the subjugation of switzerland' এবং 'When I have borne in memory' প্রভৃতি উপাদেয় সনেটের সৃষ্টি করিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাহার 'Ode to Duty' নামক কবিতা পাঠে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, কতকগুলি অন্তর্জাত শক্তি একত্রিত হইয়াই তাঁহাকে বাহ্যপ্রকৃতির অনুশীলনে প্রণোদিত করিয়াছিল। এবং ফলে মানুষের অন্তরস্থ নৈতিক প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য প্রকৃতির সুসঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হয়, নিম্নোক্ত কবিতাংশে তাহা সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

"Stern Law-giver! yet dost thou wear
The God head's most benignant grace;
Nor know we anything so fair
As is the smile upon thy face;
Flowers laugh before thee in their beds
And fragrance in thy footing treads;
Thou dost preserve the stars from wrong;
And the most ancient heavens, through thee,
Are fresh and strong."

তদনন্তর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ Church of England এর প্রতি দিন দিন অনুরক্ত হইতে থাকেন; এবং অবশেষে সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের

অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি Reform bill (সংস্কার-নীতি) ও Catholic Emancipation (উদার-নীতি) এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গিয়াছেন, এবং কাম্বারলণ্ড অঞ্চলে যাহাতে বাষ্পীয় শকটের বহুল বিস্তৃতি না ঘটে, তজ্জন্য প্রাণপাত বিরুদ্ধচেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন।

মনুষ্যরূপে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন তাহার কাব্যগত দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক। বৈসাদৃশ্যই ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কাব্যগত সর্ব্বপ্রধান দোষ। তাহার কাব্যের অনেক স্থলেই ভাব-প্রবণ কোমল কবিতার অসার অকিঞ্চিৎকর গদ্যের ছায়া প্রকটিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে নিবিষ্ট না হইয়া কাব্যসাহিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—তাই তাঁহার কাব্যে এবংবিধ বৈসাদৃশ্যের রেখাপাত হইয়াছে। পদ্য ও গদ্যের মধ্যে ভাষাগত তেমন কোন পার্থক্য নাই, এমত ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; এবং এমন কি পোপ, বায়রণ প্রভৃতি কবির কাব্যকেও তিনি কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট মনে করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভারে পরিপূরিত ভূভাগে নিরন্তর অবস্থান করায় যে সকল দরিদ্রলোকের হৃদয় পবিত্রতা ও সরলতার আধারস্বরূপ হইয়াছে; তাহাদিগের পক্ষে যে মানবোচিত মৌলিক ভাবরাশি স্বাভাবিক, তাহাই চিত্রিত করিতে তিনি নিপুণভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেক কবিতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত; এমন কি, তিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,—"I wish to be considered as a teacher or as nothing." আদর্শ কবিরূপে বিশেষ কোন কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহার জন্ম হইয়াছে, আজীবন তিনি এমত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া গিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা, মনের প্রত্যেকটী চিন্তা গাম্ভীর্য্যের তুলিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জ্ঞান ও কল্পনা তাঁহার জন্মভূমির নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল—ইহাও তাঁহার কাব্যগত অন্যতম দোষ। এমন কি, যখন তিনি সুদূর-দেশে পরিভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার কল্পনা ও মন স্বদেশের নদনদী ও পাহাড় পর্ব্বতের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকিত। যখনই তিনি কোন কবিতা রচনায় নিবিষ্ট হইতেন, তখনই তাহার উপাদান সংগ্রহার্থ তাঁহাকে উইণ্ডারমিয়ার ও হেলভেলিনের দিকে তাকাইতে হইত।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আর একটী দোষ এই যে, তাঁহার কাব্যে পবিত্রপ্রেমের সুখশীতল স্পর্শ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনে তিনি একটী মাত্র প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও নিজ সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল না। তাঁহার কাব্যে প্রেমের কথার নিতান্ত অভাব, এই জন্য উহা সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় নাই। মিল্টন ও টেনিসনের ন্যায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও নিতান্ত অরসিক ছিলেন। "Betty Foy's troubles" লিখিয়া তিনি কবিবর বায়রণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহার রসজ্ঞান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই বায়রণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিতেন না যে,—

"Till who view the Idiot in his glory
Conceive the bard the hero of the story."

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে যে কেবল দোষই ছিল তাহা নহে, উহাতে গুণও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার ভাষায় যেরূপ অনাবিল প্রাঞ্জলতা পরিলক্ষিত হয়, অন্য কাহারও ভাষায় তদ্রূপ হয় না। কঠোর সুস্পষ্ট প্রকৃতি-পরায়ণতার সহিত চরম সত্যের সংমিশ্রণ তাঁহার কাব্যকে গৌরব-মাল্যে বিভূষিত করিয়াছে। ম্যাথিউ আরনল্ড সত্যই বলিয়াছেন যে,—

Nature herself seems to write for him with her own bare, sheer, penetrating power, * * * His expression may often be called bald, as for instance, in the poem of Resolution and Independence, but it is bald as the bare mountain-tops are bald, with a baldness which is full of grandeur," বিরাট ব্যোমের উন্মুক্ত তলে দাঁড়াইয়া, প্রকৃতির নগ্নসৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার একনিষ্ঠ প্রকৃতি-উপাসনার ফল। তাহার উক্তি অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও টেনিসনেরই ন্যায় ভাবপ্রবণ। অপ্রমত্ত গাম্ভীর্য্য তাঁহার কাব্যের অন্যতম বিশেষত্ব। মানবের জন্য মানবের সহানুভূতি, বাক্‌শক্তিহীন প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা, নির্জ্জীবে সজীব-জ্ঞান, স্পষ্ট এবং প্রকৃত স্বরূপ-বর্ণনা প্রভৃতিও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য-কুশলতার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত।

কে তুমি চপলে ?

ঘন কাদম্বিনী কোলে
কে তুমি চমকি যাও,
খেলায়ে কনক-প্রভা
চকিতে কোথা লুকাও ?

দিগন্ত অবনী ঘেরা,
মসীবর্ণ নীলিমায়,
আঁধার তরঙ্গে যেন,
ধরাখানি ভেসে যায়।

বিষাদে প্রকৃতি সতী,
অঞ্চল বসনে ঢাকি ;
বিমল বদন-খানি,
যেন কি বিষাদ মাখি।

না হেরি চাঁদিমা-হাসি,
না হেরি তারার হার ;
আজি প্রকৃতির প্রাণে
সুগভীর হাহাকার।

দূরিতে বিষাদ তার,
তাই কি চকিতে চাও ?
খেলায়ে কনক-আভা
পলকে কোথা লুকাও ?

নিবিড় আঁধার-রাশি,
পলকে কি মুছে যায় ?
আবরে ধরণী-অঙ্গ
সুগভীর নীলিমায়।

বিষাদ কালিমা-মাখা,
গভীর আঁধার প্রাণ,
উদাস, বিভ্রান্ত, ক্লান্ত,
অবসাদে অবসান।

আঁধার সে হৃদি মাঝে,
ঝলকি নয়ন-কোণে

আকুলি হৃদয়, মরি—
কি খেলা খেলাও প্রাণে?

দূরে কি আঁধার তায়,
নিভে কি যাতনানল?
চকিতেবাড়ায় শুধু
জ্বালাময় আঁখিজল!

বাড়ে গো পিয়াসা হৃদে,
আকুল দীরঘ শ্বাস,
জেগে রয় চিরতরে
প্রাণময় হা হুতাশ!

জীবন বসন্ত ভাতি,
নিদয় নিদাঘ আসি,
দহি দাবানল সম,
করে সে মরুভুরাশি।

চপলে! লুকায়ে মেঘে,
ঝলকি প্রকৃতি প্রাণে,
ঢালিয়া বিষাদ-রাশি,
কি সুখ উপজে মনে?

কেন বা ধরায় আসি,
নিলসি নয়ন-কোণে,
আকুলে কাঁদাও কত
বিষাদ-আঁধার প্রাণে,

একটী কটাক্ষ তোর
মরি কি আবর্ত্তময়;
জীবনের সুখ শান্তি
ক্ষণেকে হরিয়া লয়।

বুঝি গো দীধিতি ওই
মেঘে, নয়নের কোণে,
দহিতে লুকায়ে রও
প্রকৃতি, মানবগণে!

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার

বিষ্ণুপুর-রাজ্য-পরিদর্শন।



বসন্ত কালটা বড় মধুর! চারিদিকে নূতন নূতন গাছ সবুজ সবুজ পাতাগুলা মাথায় নিয়ে যেন আজ রাজা, তা'দের স্ফূর্ত্তি দিবার জন্য বরুণদেব মাঝে মাঝে তাঁর করুণার এক এক কণা দান কচ্ছেন; পবনদেব তাদের সঙ্গে নেচে নেচে কত আলাপ পরিচয় কচ্ছেন, বন্ধুত্বটা যেন অনেক দিনেরই! শ্রীমতী প্রকৃতি রাণী রাজার উপযুক্ত মাল্য, সাজ সজ্জা দিয়ে তাদের মান রক্ষা কচ্ছেন। আজ বনস্থ বৃক্ষরাজি যেন ধীরে ধীরে স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন ক'রে নিজ নিজ কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতেছে। তা'দের মাঝে কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি ইত্যাদি।

এতকালে অজ্ঞানান্ধকার যেন বসন্তের মৃদু সমীরণে দূর হইয়া গিয়াছে; শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি জীব-হৃদয়-দগ্ধকারী রিপুসকল বসন্তের জাগরণে ভয়ে পলাইয়াছে;—তরুরাজি আজি উন্নত ও স্বাধীন! ঘুমই যেন জীবগণকে অধিক মুগ্ধ করিতে সমর্থ, সে কথা ত সবাই বলেন; যখন ঘুম ভাঙ্গে—তখন জড়তা দূর হয়, মন প্রফুল্ল হয়, হৃদয়ে যেন স্বতঃই একটা স্বাধীনতার বিকাশজনিত আনন্দের উৎস সারা প্রাণের মধ্যে ছুটিতে থাকে, তখন জীব কর্ত্তব্য পথে ধায়, বিচারশক্তি হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে, তাই সাধুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ নিদ্রা রাত্রিভাগের, দিবাভাগের নহে; দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া আর "সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা" উভয়ই সমান, সুতরাং সে নিয়ম এ স্থানে প্রযোজ্য নহে। আজ তরুগণ অরণ্যে জাগিয়াছে, বসন্তের খোলা বাতাস সুবাস দিয়ে তা'দের মাতিয়ে তুলেছে, তা'দের আনন্দ দে'খে আরণ্য পক্ষিগণও সে আনন্দে যোগ দিয়াছে, তাই কোকিল, পাপিয়ার "কুহু" রবে বনভূমি প্রফুল্লিত; ভ্রমর, মধুমক্ষিকার "গুন্ গুন্" শব্দে লতাস্থিত পুষ্পনিচয় তালে তালে নৃত্য করিতেছে; ভ্রমরেরা তা'দের সঙ্গে প্রীতির কত খেলাই খেলিতেছে,—সে খেলা দেখিয়া শ্যামল-ক্ষেত্রের কৃষিজীবীরাও আনন্দিত মনে ধান্যপূর্ণ গো-যান চালাইয়া স্ব-গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। মোট কথা, এখন আনন্দ সকল দিকেই—জলে হংস সারসের আনন্দ, স্থলে অরণ্যরাজি পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেরই আনন্দ। বঙ্গে লক্ষ্মী-দেবীর আগমনে সারা বাঙ্গলা

জুড়ে যে মায়ের অর্চ্চনার জন্য আয়োজন হইতেছে, ধনী দুঃখী সকলেই আজ আনন্দসাগরে সাঁতার কাটিছেন, বাকি তবে কে? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা, কাহারও গলার ফাঁস কেটেছে, কেউ এখনও জীবন্তে মরার মত সে কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যিনি এ পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন, এখন তাঁহাকে আমরা "মুক্ত" বলিতে পারি। এ মুক্তি যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল; কিন্তু আগমনের প্রতীক্ষা করা বড়ই বিষম—বড়ই চিত্ত উন্মাদক! ভুক্তভোগীই এ রসাস্বাদনে উপযুক্ত ব্যক্তি, অন্যত্র "নাবমন্তব্যম্"।

আমরা ঐ ভুক্তভোগীদের শ্রেণীভুক্ত। বসন্তের শেষাশেষি আমরা এ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল! সারা বছরের পড়া ও চিন্তার মধ্যে থাকা মানুষের পক্ষে কি বিষম! প্রাকৃতিক প্রীতি হইতে দূরে থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকারে ডুব দেওয়া জীবের পক্ষে কি ক্লেশকর নহে? বিশেষ যাঁদের এ অধ্যয়ন কেবল অর্থোপার্জ্জনের পথ-প্রদর্শক, জ্ঞানার্জ্জনে আদৌ অবসর বা ঈপ্সা নাই, সে যেন জীবন্তে নরকভোগ!

বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন মানবকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করে বটে, কিন্তু আমরা কি তাহা ঠিক হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করি? আত্মজ্ঞান ও প্রচার কি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য? কখনই নহে; এ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, অধিকাংশ স্থলেই কিন্তু "পাস্" করাটা একটা টাকা রোজগারের পথ। অবশ্য বিদ্যাশিক্ষা না হইলে এখনকার দিনে এক পা নড়া যায় না, এখন কেন, জীবনকে জীবত্বের মধ্যে চালাইতে গেলে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন প্রধান অবলম্বন; কিন্তু কই, তা হইতেছে কৈ? আমরা ছাত্রজীবনে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত কাণ্ড করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিই, তাহার পর ছাত্রজীবন ত্যাগ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করি, সে পদ কত দায়িত্বপূর্ণ, তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাই না, আবার পাইলেও সে ভাব মনে উদয়ও হয় না, তখন স্বার্থপরতার বিষ-বহ্নি মানবহৃদয়কে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে—কোথায় বা সে আত্মোন্নতি, আর কোথায়ই বা সে পরোপকার? হায়! সবই তখন এ নর-জীবন হইতে ক্রমে ক্রমে মুছিয়া যায়; অর্থাভাব, অসহায়, অক্ষমতা ইত্যাদি কত গুণই মনুষ্য-হৃদয়কে অধিকার করে; কিন্তু যিনি প্রথম হইতেই এ সকল অনুভব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ও আপত্তি কখনও ভ্রমেও হৃদয়ে উদয় হয় না; কারণ পূর্ব্ব হইতেই

ঐ রোগের ঔষধ পড়িতে থাকে; কাযেই সংগ্রামের পূর্ব্বেই সে রোগ কাটিয়া যায়, তখন তিনি সংসার-সংগ্রামে জয়ী হ'ন,—সুখ শান্তি সবই এ জীবনে আসে; এতদ্ব্যতিরেকে যে দুঃখ, তার ত প্রমাণ দেখিতেছিই, কিন্তু আমরা এমনি মুগ্ধ যে, সে চিন্তা করিতে হৃদয়ে একতিল স্থানও দিই না। যাই হোক, মনুষ্য-জীবনে আত্মোন্নতি ও পরোপকারই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

অতঃপর আমরা কয়জন বন্ধু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কিছুদিনের অবসর লইয়া কোথায় যাইব ভাবিতে লাগিলাম। আর একটা কথা, আমরা পল্লী-গ্রামবাসী; সহরে সুখস্বাচ্ছন্দ্য যতই হউক না কেন, খোলা মাঠ, আম কাঁঠালের বাগান ও খড়ের ঘর, পুকুরের জল, পাখীর গান আমাদের বড়ই ভাল লাগে। এখানকার (কলিকাতার) বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, গাড়ী, কলের গান, স্কোয়ার, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থগুলি যেন আমাদের হৃদয়কে জ্বালাইতে থাকে; তবে উপায় নাই, শুধু কেবল "যো দিয়া দনৎ সো দেগা চানা" যিনি বিপদ দিয়াছেন, তিনিই উদ্ধারের উপায় করিবেন, এই ভাবিয়া এখানে আছি। যখন তিনি উপায় করেন, তখনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে গমন করি।

বাস্তবিক পল্লীই প্রকৃতির লীলাভূমি। পল্লীর বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষরাজি, নেত্ররঞ্জন-ক্ষেত্রশোভিত-শস্যশ্যামলতায় নিসর্গ-রূপসীর বিলাস-চঞ্চল সুশোভন পদবিক্ষেপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পল্লীর মন্দবাতান্দোলিত বৃক্ষ-পত্রের অস্ফুট মর্ম্মর নিস্বনে ও পল্লীপ্রান্ত-বাহিনী স্বল্পতোয়া তটিনীর অবিরাম উচ্চারিত অব্যক্ত কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রকৃতি দেবীর সুধা-সঙ্গীত শ্রবণ-গোচর হয়, অবিরল ফুল্ল-কুসুম-পরিমলবাহী মৃদুল হিল্লোলে তাহারই অমৃত-স্পর্শ অনুভব করা যায়। পল্লীর দেবালয়ে সান্ধ্য আরতির বাদ্য ও পুরমহিলার শঙ্খধ্বনি, ক্ষুদ্র দীপালোক প্রকৃতি দেবীর বিজয় গাঁথা হাসিয়া হাসিয়া গাহিয়া থাকে। পল্লীর এমন সরস সদানন্দ-মিশ্রিত পৃথ্বী-উদ্ভূত সন্তানগণ যে জীব-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সরলতা, দয়া, প্রেম যে তা'দের হৃদয় ঢাকিয়া থাকিবে, এ ত প্রকৃতি-সিদ্ধ। সেই জন্য আজও এত দুর্দ্দিনে, এত নররক্তপিপাসু তাণ্ডবকারিগণের বিকট নৃত্য ধরাতলে সংঘটিত হইলেও পল্লীভূমিতে—ভারতের পল্লীভূমিতে সে স্রোত এখনও সমভাবে উপনীত হয় নাই। এখনও প্রকৃত মনুষ্যত্ব তা'দের হৃদয়ে অনেকাংশে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সে কতদিন থাকিবে? একটু গোমূত্র

সংযোগে যেরূপ কলসপূর্ণ দুগ্ধ নষ্ট হয়, তদ্রূপ এই জনগণের আচার ব্যবহারে শীঘ্রই সে মনুষ্যত্ব তা'দের লোপ পাইবে। তাই আমরা আজ ভারতের ভাবী হিতাকাঙ্ক্ষিগণকে আহ্বান করিতেছি, যদি এখনও ভারতের সম্মান, ভারতীয় গৌরব, এদেশবাসীর মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে শস্যশ্যামল ভারতের পল্লীভূমে আগমন করিয়া সে কার্য্যে ব্রতী হউন। ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র পল্লী, সহর নহে। সহর বিলাসের আশ্রয়, কিন্তু সে বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ এক ভারতের পল্লীভূমি, সুতরাং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে সে স্রোত সহরে আসিবে। মনুষ্য-হৃদয়েই জ্ঞানের বিস্তার হয়, পশুতে সে কার্য্য সমাধা হয় না। সে প্রয়াসও জলে জলবিম্বের লয়প্রায়। সুতরাং মানুষ করা যদি আজ ভারতের উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষের হৃদয় চাই, সে হৃদয় পল্লীগ্রামে, সহরে নাই। তাহার প্রমাণ আমরা নিম্নেই দিতেছি, পাঠক! অনুগ্রহ পূর্ব্বক লক্ষ্য করুন?

আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিব, কিন্তু বিধাতার কি উদ্দেশ্য জানি না, আমাদের এক বন্ধু আমাদের অজ্ঞাতসারে তাঁ'দের দেশে যাইবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমন কি, আমরা এখান হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্তও সে কথা জানি নাই। তাহার পর রাত্রি ৮॥০ টার সময় যখন সকলে একত্র মিলিলাম, তখন শুনিলাম আমাদের যাত্রা হইবে অন্যত্র। আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কোথায় যাইব?" তখন আমার সেই বন্ধুটী ও তদ্দেশবাসী এক-জন ভদ্রলোক একখানি কাগজ আমার হাতে দিলেন। আমি দেখি, তাহাতে লেখা আছে "বিষ্ণুপুর"। গাড়ী রিজার্ভ হইয়াছে, এখানি তাহারই রসিদ। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম—কোথায় "পুরী" আর কোথায় "বিষ্ণুপুর!" আমি তখন বন্ধুর উপর জুলুম করিয়া সেখানকার জল, বায়ু, স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বন্ধুটী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ ভাল, গেলেই বুঝ্‌বে।"

যাহা হউক, সে রাত্রি আমরা নানারূপ গল্পগুজবে কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যূষে (২৬এ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩২০) আমাদের রওয়ানা হইতে হইবে। যদিও যাত্রার ফের হইল, তথাপি হৃদয় আরও নাচিতে লাগিল যে, এবার পুরীর বদলে বন্ধুর দেশ দেখা হইবে, তা' মন্দ নয়—এ একটা সৌভাগ্য বটে!

আমাদের মন এতই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল যে, পাছে ঘুম না ভাঙ্গে এজন্য

ঘড়িতে এলারম্ পর্য্যন্ত দিয়া আমরা শয়ন করিয়াছিলাম। যখন ৪টা রাত্রি, এলার্ম বাজিল, আমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া সাজপাট গুছাইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। গাড়ী ঠিক ৭টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা আমাদের জিনিষপত্র ট্রেণে তুলিয়া লইলাম। এখানে বলা আবশ্যক, আমাদের গন্তব্যপথ বেঙ্গল নাগপুর রেল পথাভিমুখে। গাড়ী ছাড়িতে তখনও প্রায় আধঘণ্টা বাকি, আমরা স্ফূর্ত্তির সহিত স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলাম। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় হয় হয়, এমন সময় গাড়ীতে এত ভিড় হইল যে, লোক শেষে বসিতে না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিতে লাগিল। অথচ গাড়ীগুলি এমন অসুবিধাজনক যে, বড় বড় গাড়ী—এক একটা গোয়ালের মত, কিন্তু বাহির হইবার পথ দু'টী। সে ভিড়ে গাড়ী হইতে নামা দায়। যাহা হউক, এইরূপে গাড়ীপূর্ণ করিয়া ৭—৩০ মিঃ সময়ে ট্রেণখানি ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে যাত্রী নয়, যেন কোটরগত ছারপোকার দল সারি দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে গাড়ী—"রামরাজাতলা" ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইল। তখন কতক লোক নামিল, কিন্তু যা' নামিল তা'র চারিগুণ লোক গাড়ীতে আরোহণ করিল। শেষে যখন "সাঁতরাগাছি" ষ্টেশনে গাড়ী আসিল, তখন লোক এত সারবন্দি যে উঠা দায়। কতকগুলি লোক ঠেলে গাড়ীতে উঠিল, একটী ভদ্র-লোক'ত গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট গাড়ীর পাদানিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, লোক এত দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সে গোয়ালের ক্ষুদ্র দরজা দু'টী বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনি অনেক কাকুতি মিনতির পর শেষে গাড়ীর ভিতরে স্থান পান। এইরূপ ভাবে সাতটী ষ্টেশন পার হইয়া "উলুবেড়িয়া"য় আসিয়া তবে ভিড় কমিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এত কাণ্ডে কি বি, এন, রেলের সুনাম হয়? অথচ "খড়্গপুর" জংশনে টিকিট চেকারদের তিনবার টিকিট দেখার তলবে অস্থির! টিকিট না কিনিলে দোষী, কিন্তু টিকিট কিনিয়া যে এত লোক দাঁড়াইয়া চলিল, তাহার জন্য দোষী কে? অথচ বি, এন্ রেল কোম্পানীর এই অসুবিধা পুনঃ পুনঃ কাগজে দেখিতেছি, কিন্তু কোন প্রতীকার নাই কেন? ই, বি, এস্, আর কি ই, আই, আরের মত গাড়ী করিলে কি হয় না? আমরা গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে দৃষ্টি-সংযোগ করিতে অনুরোধ করি। আরও শুনিলাম, এ লাইনে রাত্রের গাড়ী নাকি ভাল, কিন্তু দিনে যারা চড়ে, তা'রা কি পয়সা দেয় না? যদি দেয়, তবে এ ব্যবস্থা কেন?

তৎপরে আমরা ক্রমে লোকের এই দুর্দ্দশা দেখিবার দায় হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া "মেদিনীপুরে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এদিককার ষ্টেশন-গুলি অনেক লম্বা। চারিদিকে বেশ নানা ফুলের গাছ, আমগাছ, সাবুগাছ, তা'দের তলে জল দিবার জন্য বেশ আল বাঁধা, ফুলে চারিদিক আলোকিত। পাতাবাহারও মধ্যে মধ্যে আছে। প্রথম প্লাটফরম, তারপর রাস্তা, তা'রপর এক সার গাছ, তারপর রাস্তা, তারপর ফুলের গাছ ও রেলের বেষ্টনী। এর মাঝে মন্দিরের মত দু'দিকে চূড়াধারী কাষ্ঠের খোদিত ষ্টেশনের ইংরাজী, বাংলা ও ফার্সীতে লেখা নাম। ষ্টেশন মাষ্টারের অধি-কাংশ ঘর টিনের ও টাইলের, কেবল জংশনের ঘরগুলিই পাকা। মোটামুটি ষ্টেশনগুলির দৃশ্য বড় সুন্দর। ষ্টেশনের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই নাগপুরী। এই রেল লাইনের দৃশ্য বড়ই মনোরম। প্রথমেই শোণ, তারপর কংসাবতী দামো-দর প্রভৃতি বহু নদ নদীই এই লাইনের মাঝে থাকিয়া ভারতের পবিত্রতার পরিচয় দিতেছে! নদীর উপর রেলওয়ে পুলও বহুদূরব্যাপী। দামোদরের বন্যার জল জমার চারিধারে এখনও নিকটস্থ অনেক খানা ডোবা পূর্ণ করিয়া আছে। আবার লাইনের দু'ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Hillock, গাড়ী এক এক জায়গায় যেন পাতালপুরীর মত দু'দিকে পাহাড় ভেদ করিয়া চলিতেছিল। ঐ পাহাড়গুলির অধিকাংশই বালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর জমিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। পাথরগুলির রং এঁটেল মাটির মত ও ফাটা ফাটা; তার উপর চারিধারে বড় বড় শাল-বন। শুনিলাম, ঐ শাল-বাগানগুলি প্রত্যেক ৩।৪ বৎসর অন্তর ৩।৪ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। প্রকৃতি হইতেই এ বনের উৎপত্তি। উপরে নীলাকাশ, নিম্নে ভারতের নানা নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, শাল, পিয়াল, কাঁওল (পাকা গাবের মত একপ্রকার ফলের গাছ) বন, শ্যামল ধান্যের ক্ষেত্র; ধানগুলি কাটিয়া লইয়া গিয়াছে,—আছে কেবল তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্ন গুচ্ছ-ভাগ। জগতের সর্ব্বত্রই এমনি; কি নর-জগতে, কি বৃক্ষ-জগতে, সর্ব্বত্রই জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়, থাকে তাহার স্মৃতি, সে কেবল তাহার পরিচয় দিবার জন্য জগতে থাকিয়া যায়। যিনি মনুষ্য, মনুষ্যত্বই যাঁহার সমুদয় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তিনিই এ জগতে চির-বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার এ দেহতরি লয় হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি-বিজড়িত স্মৃতিপট অনন্তগগনে চির জাজ্বল্যমান থাকে। সেই জন্যই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি স্কট্ একদিন গাহিয়াছিলেন—

Breathes there the man with soul so dead,
Who never to himself hath paid,
This is my own, my native land !

* * *

If such there breath, go, mark him well !
For him no minstral raptures swell ,
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can-claim,
Despite those likes, power, and helf,
The wretch, concentred all in self,
Living, shall forfeit fair renown,
And, doubly dying, shall go down
To the vile dust, from whence he sprung,
Unwept, unhonoured, an unsnng.

হৃদয়হীন মনুষ্য যে অকালেই লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। সুশোভন নয়নরঞ্জন অট্টালিকা, বলিষ্ঠ অশ্বযুক্ত যান, অসংখ্য ভৃত্য, সুন্দর ধনরত্নপূর্ণ প্রকোষ্ঠ ও নবনীতবৎ অনুপম দেহ;—সকলই এ জগতে থাকিয়াও তাহার উপযুক্ততা প্রদর্শন করে না। কারণ যে জিনিষ, সে যদি তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম সাধন না করে, অম্ল যদি তিক্ত হয়, মিষ্ট যদি কটু হয়, তবে তাহারা যেমন স্ব স্ব উপাধিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সর্ব্বরত্নভূষিত-নরকুলতিলকও এ জগতে 'নর' আখ্যা হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

মঙ্গলময় বিধাতা প্রতিনিয়তই আমাদের দেখাইতেছেন যে, স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তোমাদের কর্ম্ম, আর সেই কর্ম্ম সাধন করিতেই তোমরা জন্মিয়াছ। যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-চ্যুত হও, তাহা হইলে তোমাদেরও এমনি পতন ঘটিবে। কিন্তু কই, আমরা কি তাহা একবার ভাবি, না তদনুরূপ কার্য্য করি? যদি করিতাম, তবে "এ জগতে সুখ নাই, এ জীবনে সুখ নাই, হায়! সারা জীবন কষ্ট করিয়াই মরিলাম" ইত্যাদি এ সকল আক্ষেপ আর কখনও আমাদিগকে করিতে হইত না। হায়! দিন দিন আমরা কি অন্ধই না হইতেছি! মঙ্গলময়ের বিধান সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছি, তবুও আমাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় না, অথচ আমরা অহঙ্কার করি, আমরা কত জ্ঞানী, কত সুখী!

এই সকল দৃশ্য দর্শন দ্বারা আমরা মঙ্গলময়ের এই লীলা স্পষ্টই অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে সকলেরই সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল; তখন একজন গাহিতে লাগিলেন,—

ধন, ধান্য, পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক (সে যে) সকল দেশের সেরা;
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবেনাক' তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার "জন্মভূমি!"

* * * *

এই গানটী গাহিয়া তিনি মাতৃভূমির যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও গুণপণা আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে গাঁথিয়া দিলেন! সে সঙ্গীত সে সময় আমাদের হৃদয়কে যে কি মাতৃ-প্রেম-রসে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ দ্বারা কি আনন্দ, কি প্রেম ও প্রীতি লাভ করা যায়। আমরা বঙ্গবাসী সকলকেই এইরূপ অবকাশমত এ ভারতের অনন্ত উপাদান সংগ্রহ ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অনুরোধ করি। ভাব-জগতে রাজত্ব করা অপেক্ষা দর্শন ও অনুভূতিই অধিকতর আনন্দদায়ক।

এইরূপ নানাপ্রকার আনন্দদায়ক মনোহর দৃশ্যসমূহ দর্শন করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আহারাদি ট্রেণেই করিলাম, কারণ, পূর্ব্ব হইতেই আমাদের খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম, ভক্ষণ কাণ্ডই কেবল বাকি ছিল, তা এই বাষ্পীয়যানেই সারিয়া লইলাম। জলও ষ্টেশনেই পাইলাম, সুতরাং আমাদের উদরদেবও নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতেছিলেন।

অতঃপর বেলা ১২॥০ টার সময় আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনটী "বিষ্ণুপুর" নামেই খ্যাত। গাড়ী থামিল, আমরা ট্রেণ হইতে নামিলাম। আমাদের বন্ধুটীকে দেখিয়াই ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আলাপ-পরিচয়ে আমরা বেশ প্রীত হইয়াছিলাম। এখানে গাড়ী পাঁচ মিনিট থামে, সুতরাং সে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া অগ্রসর হইল, আমরাও আমাদের জিনিষ পত্র অশ্বযানে উঠাইতে আদেশ দিলাম। আমাদের যাত্রার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই

বন্ধুটী ষ্টেসনমাষ্টারকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। তবে এখানে অধিকাংশই গোযান, দু'চার খান অশ্বযানও পাওয়া যায়; সেগুলি প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে অধিকৃত থাকে, কাযেই অশ্বযানের আশা পথিককে ত্যাগ করিয়া—গোযানের ব্যবস্থাই করিতে হয়।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণশালী ভদ্রলোক। আমরা পরে জানিলাম, তিনি পূর্ব্বে দশ বৎসর গভর্ণমেণ্ট ষ্টীমার সার্ভিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি ম্যাণ্ডেলাই, পেগু প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নয় বৎসর যাবৎ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও মহত্ত্বতার প্রমাণ-স্বরূপ একটী ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

আমরা যে দিন ওখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি, সে দিন একজন রেলওয়ে সিগনালার মত্তাবস্থায় আফিসে হাজির হন। সে সময় একটী সংবাদ টেলিফোন দ্বারা ঐস্থানে আসিতেছিল, কিন্তু তিনি তখন পূর্ণ বিকৃতমস্তিষ্ক-অবস্থায় ঐ টেলিফোন ধরেন এবং একটী কথা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে না পারিয়া, কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা টেলিফোনেই সংবাদদাতাকে গালি বর্ষণ করেন। তাহা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে আফিস হইতে বাহির করিয়া স্নান করিতে আদেশ করিলেন, সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। লোকটীর বয়স হইয়াছে, পাকা চুলে কলপ দিয়াছেন, তবুও রোগ গেল না। লোক-পরম্পরা শুনিলাম, মাষ্টার মহাশয় এইরূপ নেশা প্রভৃতির ঘোর শত্রু। তিনি নিজে ত স্পর্শ করেনই না, এমন কি, অধীনস্থ সামান্য কুলী হইতে আসিষ্ট্যাণ্ট কাহাকেও উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিতে দেন না। আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, এরূপ কর্ম্মজীবী লোক আজকাল প্রায় পনের আনা নেশার বশীভূত, বয়সে কম বা বেশী জ্ঞান নাই, ওরূপ রেল বা ষ্টীমার সার্ভিসে কার্য্য দ্বারা ঐ গুণলাভ ও চরিত্র পূর্ণমাত্রায় নষ্ট করিয়া অসহ্য রোগাক্রান্ত হয়; কিন্তু এই ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের চরিত্রে ঠিক তাহার বিপরীত দেখিলাম, তিনি ব্রাহ্মণ ও উন্নত চরিত্রের লোক। তাঁহার সঙ্গিগণও ঠিক তদ্রূপ; তবে উপরোক্ত ব্যক্তি নবাগত। তিনি কুৎসিত ব্যবহার দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ঐ দণ্ডেই তাহাকে "ডিস্‌মিস্" করিতে পারিতেন এ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব আছে, তাই তিনি আমরা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "ও লোকটী আজ তিনদিন

আসিয়াছে, তা'র মধ্যেই এই কাণ্ড! আমি এখনি ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারি, কেবল দিতেছি না—ওর পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া! ও'র ত কোন জ্ঞান নেই, নইলে আজ বুড়ো বয়সেও চুলে কলপ দিয়ে মদ খেয়ে এরূপভাবে ব্যাড়ায়! ও'কে দূর কর্‌লে ত ও'র কিছু ক্ষতি হ'বে না, হ'তে হ'বে কি ওর পরিবারবর্গ খেতে না পেয়ে মর্‌বে। সেই জন্যেই আমি এখনও কিছু কর্‌চিনে, দেখি আরও দু'একদিন।"

বাস্তবিক সেই দণ্ডেই তাহার কুৎসিত ব্যবহারের জন্য টেলিফোন্‌ করা হইল, তাহাতে উপর হইতে তাহার জন্য আরও ২।১ বার দেখিতে অনুরোধ হইল।

হায়! দেশের কি দুর্দ্দিন! চরিত্রহীন হইলে মানুষের এমনি মনুষ্যত্ব লোপ পায়! যাহার প্রতি তাহার স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি সকলে চাহিয়া আছে, যাহার অভাবে তাহাদের উদরান্ন মিলা ভার, সে আজ কি পশু হইয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি, প্রেম, স্নেহ সকলি বিসর্জ্জন দিয়া অসার কামতৃপ্তির জন্য বৃদ্ধ বয়সেও কুৎসিত বৃত্তি দ্বারা আনন্দ লাভ করিতেছে!

কিন্তু আমরা মাষ্টার মহাশয়ের ক্ষমা সূচক মহদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া এতদূর বিস্মিত হইলাম যে, এ সংসর্গের মধ্যেও যে এমন দুর্লভ রত্ন থাকে, তাহা এই আমাদের প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহার উদার হৃদয় ও মহৎ কর্ম্মসাধন দ্বারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করে। ভগবান্‌ তাঁহার মঙ্গল করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

অতঃপর আমরা অশ্বযানে আরোহণ করিয়া ষ্টেশন হইতে বাঁধা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। একপোয়া রাস্তা পার হইয়া বিষ্ণুপুর নগরে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করিল। রাস্তার দু'ধারে দোকান, মাঝে বালুকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডমিশ্রিত সুন্দর রাস্তা। এইরূপ কয়েকটী দোকান অতিক্রম করিয়া কোর্টের পার্শ্বে আমাদের গাড়ী উপস্থিত হইল। এখানে কোর্ট দুইটী, একটী ফৌজদারী, অপরটী দেওয়ানী। দেওয়ানী আবার তিনটী মুন্সেফ দ্বারা পরিচালিত হয়। বাঁকুড়া জিলায় বিষ্ণুপুর একটী সব্‌ডিভসন্‌। কোর্ট অতিক্রম করিয়া বরাবর পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। শেষে থানা, মিউনিসিপ্যাল অফিস, মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসালয়, বাজার, মেয়ে স্কুল প্রভৃতির নিকট দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়া আমাদের গাড়ী বন্ধুর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বন্ধু সাদরে আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। সে দিন আর কিছু দেখা হয় নাই, কেবল আহারাদিতেই কাটিয়া গেল।

পরদিবস বৈকালে জলযোগ সারিয়া আমরা দেশ পরিদর্শনে বাহির হইলাম। এখানে আমরা দিন কুড়ি ছিলাম; কথা ছিল আট দিনের, কিন্তু বন্ধুর আত্মীয়বর্গের অনুরোধে ও ছুটীর মরসুম বলিয়া এতদিন থাকিতে বাধ্য হইলাম। ইহার মধ্যে পাঁচদিন আগ্রহ সহকারে নানা স্থান ও নানা অরণ্যপূর্ণ জায়গা দেখিয়া বেড়াইয়াছিলাম। বক্রী কয় দিবস কোন কার্য্য উপলক্ষে যাপন করা হইয়াছিল; কি জন্য তাহা পরে বলিব। এক্ষণে ওখানকার দ্রষ্টব্য বিষয় ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিষ্ণুপুর একটী কেল্লা। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা ও কঙ্কর মিশ্রিত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত ঢেউ খেলাইয়া সারা বিষ্ণুপুরটীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার ধারে ধারে লম্বা খাত, অধিকাংশ সময়ই তাহা জলপূর্ণ থাকে। সহরের চতুর্দ্দিকেই একটী না একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। এদেশে উহাকে "বাঁধ" বলে। ঐ বাঁধগুলির জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি সুস্বাদু। এই বাঁধগুলির মধ্য নিম্নে কয়েকটীর নাম উল্লিখিত হইল—

লাল বাঁধ,
কৃষ্ণ বাঁধ,
কালিন্দী বাঁধ,
যমুনা বাঁধ,
পোকা বাঁধ প্রভৃতি।

ইহার মধ্যে "লাল বাঁধের" জলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা এখানকার মিউনিসিপ্যাল কর্তৃক কেবল পানীয়ার্থেই ব্যবহৃত হয়, কেহ উহাতে স্বয়ং বা গো, মহিষাদি স্নান করাইতে পারে না। অধিক দিনের রোগাক্রান্ত রোগিগণের পক্ষে এই বাঁধের জলপানই রোগনিবারণের একমাত্র ঔষধ বলিয়া চিকিৎসকগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। এ'টী এদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত।

"কৃষ্ণ বাঁধটী"ও বৃহৎ ছিল, তবে এখন সংস্কার অভাবে শৈবালপূর্ণ হইয়া জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে। ঐ বাঁধের জল এক্ষণে নদীর আকারে পরিণত হইয়া [illegible] মিশিয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ ইহার তীরেই শবদাহ কার্য্য সম্পন্ন করে। এ'টী এখানকার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ও রাজ-



তপস্বিনী গৌরী

"কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম্।
দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্ ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥"

কুমারসম্ভবম্।

ENGRAVED & PRINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS.

বাটীর নিকটবর্ত্তী। ঐ শবদাহ স্থানে "শ্মশান-কালীর" একটী বৃহৎ মন্দির আছে। ঐ বিগ্রহ পাষাণ নির্ম্মিত ও বিষ্ণুপুররাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার কিছু দূরে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ আছে, শুনিলাম উহা রাজাদের সময় চালিত হইত। এখন তাহার চক্রগুলি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে। এখান হইতে দক্ষিণদিকে দৃষ্টি করিলে একটী বৃহৎ বালুকাময় ঢিপি দৃষ্ট হয়, ঐ স্থলে বিষ্ণুপুররাজের তিনটী কামান আছে। শুনিলাম উহা শারদীয় পূজার সময় ব্যবহার করা হয়। তথা হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বার। উহার মধ্য দিয়া যাতায়াতের দু'টী খিলান ছিল, একটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অপরটী আছে। ঐ ভগ্ন ভাগের অংশ দিয়া উহার উপরে উঠিবার একটী সিঁড়ি ছিল, তাহার কতক অংশ আজিও বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্য দিয়া গমন করিয়া যাইলে একটী খাত ও তদুপরি ক্ষুদ্র সাঁকো, উহা পার হইয়া একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ ও দ্বিতল-সমান উচ্চ গেট। এইটী রাজবাটীর প্রবেশ-দ্বার। এর দু'দিকে দুই বৃহৎ কপাট ছিল, বর্ত্তমানে সে কপাটও নাই, আর কিসের দ্বারা যে উহা নির্ম্মিত ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না।

তাহাতে বৃহৎ অর্গল ব্যবহৃত হইত। তাহার প্রমাণ স্বরূপ আজিও দেওয়ালের দু'ধারে গর্ত্ত ও আটকাইবার জন্য লৌহনির্ম্মিত এক একটী লৌহ ফাঁস বিদ্যমান আছে। এই গেটটী দ্বিতল ছিল। প্রথম তলে দেওয়ালের গাত্রে কতকগুলি ফোকর আছে, ঐ ফোকর গুলি দিয়া শত্রু আগমনের সময় গুলি ছোড়া হইত। উহা এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, গেটের ভিতরে শত্রুর গুলি প্রবেশের সাধ্য নাই, অথচ তাহারা তাহাদের মারিতে পারিবে। আরও দেখিলাম, একতল হইতে দ্বিতলের উপর উঠিবার একটী সিঁড়ি আছে; ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া শত্রুগণের আগমনাদি নিরীক্ষণ করিতে পারিত। এইখান হইতে দেখিতে পাইলে গোলা, গুলি বর্ষণ করিত ও তিনটী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত। কিন্তু যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হইত ও শত্রুগণ গেটের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইত, তখন তাহারা নিম্নতলে আসিয়া ঐ ফোকর দিয়া গুলি বর্ষণ করিত। এইরূপ ভাবে ঐ খিলানে দ্বারের তিনটী কপাটের চিহ্ন আছে। প্রথম দ্বারটী শুনিলাম অনেক দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বোক্তটী ও এইটী আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ সকল দ্বারগুলি সর্ব্বদাই সৈন্যপরিবৃত থাকিত। প্রথম দ্বারে শত্রু জয়ী হইলে দ্বিতীয় দ্বারে যুদ্ধ করিতে

হইত, সেখানে যদি জয়ী হইত, তখন এই শ্রেষ্ঠ দ্বারে যুদ্ধ করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দ্বারের উত্তর ভাগে ঐ ফাঁকগুলি ও সৈন্যদের দ্বিতলে গৃহ ছিল, ঐ গৃহের ছাদ বিনা কড়ি ও বরগার সাহায্যে প্রস্তুত। যদিও উহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়াছে, তথাপি বক্রী অংশ দেখিলাম—কেবল দেওয়ালের পূর্ব্ব পশ্চিম দু'ধারে কড়ির মত মোটা আঙ্গুল দশ লম্বে ইষ্টক-সজ্জা, তাহার উপর দ্বিতলের মেজে, সেও প্রস্থে পাঁচ হাত, লম্বে দশ বার হাত হইবে। কেমন করিয়া যে রহিল ইহাই আশ্চর্য্য! এই গেটটী লম্বে ৩০।৪০ হাত হইবে। ইহার দু'দিকে দু'টী দ্বার ও মধ্যেও কবাট ব্যবহারের মত প্রস্তুত করা হইয়াছে। এ'টীর এক ছাদ ভিন্ন অন্য সকল গঠনগুলি বৃহৎ বৃহৎ এদেশীয় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ মধ্যের দ্বারটীর চৌকাঠ লৌহ-নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ আর দু'টীও ঐরূপ হইবে। এই গেটের মধ্য দিয়া রাজবাটী আসার মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, উহা উত্তরদিক হইতে পূর্ব্বদিকে "লাল বাঁধ" পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্ব রাজবাটীর কিছুই বিদ্যমান নাই; কেবল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত একটী সামান্য অট্টালিকাই রাজবাটী বলিয়া কথিত।

এই রাস্তা দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে একটু যাইলে "মৃন্ময়ীর" মন্দির। ঐ দেবী দুর্গা—লক্ষ্মী-গণেশাদি-বেষ্টিত শারদীয়-প্রতিমা।

প্রতিমাটী মৃত্তিকানির্ম্মিত ও সুন্দর কারু-কার্য্যপূর্ণ। ইঁহার উপরি-ভাগে বৃষসমেত ব্যোমকেশ অবস্থিত। মায়ের মূর্ত্তি বড়ই মনোহর! গলে মৃত্তিকানির্ম্মিত মাল্য যেন সদ্য প্রস্ফুটিত মল্লিকা মালার ন্যায় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই প্রতিমার পশ্চিম ভাগে লক্ষ্মীর পাদদেশে "মহারাজ শ্রীনীলমণি সিংহ" এই কথা লেখা আছে। ঐ মন্দির একটী পূজার দালান বিশেষ; অনুমানে বোঝা যায়, ঐ বিগ্রহ অন্যূন এক শত বৎসরের হইবে। এখন উহার অবস্থা ভগ্নপ্রায়। কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতির হস্তপদাদি ভগ্ন হওয়ায় মৃত্তিকা ও খড় দর্শন করা যাইতেছে। শুনিলাম, দেবীর মূর্ত্তি পুরাতন, তবে মুখটী নূতন, উহা জনৈক বিকৃতমস্তিষ্ক রমণী-কর্ত্তৃক ভগ্ন হয়, পরে এই নূতন মুখটী বসান হইয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, তাহাও ভগ্নাবস্থায় আছে। রাজবাটীর চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ কারুকার্য্য-সুশোভিত দেব-মন্দির, উহার কয়েকটীতে বিগ্রহ আছে, কয়েকটী শূন্য অবস্থায় ভগ্ন হইতে বসিয়াছে। এখান হইতে পূর্ব্বদিকে কিছুদূর যাইলে বামভাগে একটী উচ্চ

চতুষ্কোণ স্তম্ভ দেখা যায়, ঐটী "গুম্‌গড়" নামে খ্যাত। উহার গায়ে একটী নালা আছে, নিম্ন হইতে ওটী কি তাহা বুঝা যায় না, আমরা ব্যগ্র হইয়া নিকটবর্ত্তী একটা তেঁতুল গাছে উঠিয়া দেখিলাম, উহা একটী চৌবাচ্চা-বিশেষ। উহার গভীরতা প্রায় ১০ হাত—লম্বা প্রায় ১৫ হাত হইবে। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসে পূর্ণ। শুনিলাম, উহাতে একটী ফোয়ারা ছিল। জল পরিস্কৃত হইয়া ঐ ফোয়ারায় আসিয়া, পরে রাজবাটীর স্নানের জন্য কলের জলের ন্যায় রাজবাটীতে সরবরাহ হইত। এবং সেই অভিপ্রায়েই গাত্রে একটী জল বাহির হইবার নালা আছে। কেহ কেহ বলেন, উহাতে গুরুতর অপরাধীদের নিক্ষেপ করা হইত; কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে? যাহার গভীরতা এই, উচ্চতাও রাস্তা হইতে একতল সমান, তাহা হইতে যে পলায়ন সম্ভবপর নয় তাহা তর্কবিরুদ্ধ, বিশেষ সে কালে। উহার গাত্রে লেখা আছে—"শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ।" সম্ভবতঃ উনিই উহার প্রতিষ্ঠাতা।

উহা অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইলে একটী খাত ও উচ্চ পাড় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পাড় অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে এখানকার এন্‌ট্রেন্স স্কুল ও বোর্ডিং দেখা যায়। সেখান হইতে পশ্চিম দিকে বরাবর একটী পাড়—পার হইলে একটী বৃহৎ ময়দানে আসা যায়। ঐ স্থানে একটী বৃহৎ দেবালয় আছে। উহাকে "রাসমঞ্চ" বলে। ওটী নিম্নে খিলান গাঁথা, দৈর্ঘ্যে—৫০।৬০ হস্তেরও উর্দ্ধ হইবে, প্রস্থে হাত কুড়ি বাইশ হইবে। ইহার দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেবল খিলান করা ফোকর ও উপরে এক একটী চূড়া, এই চূড়াবেষ্টিত মন্দিরের মধ্যভাগে একটী বৃহৎ কারুকার্য্য-শোভিত চূড়া অবস্থিত। পার্শ্বের চূড়া কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আছে কেবল মধ্যের "গম্বুজটী।" শুনিলাম, বিষ্ণুপুর-রাজকর্ত্তৃক ৩৬০টী বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, রাসের সময় ঐ বিগ্রহগুলি এখানে আনাইয়া রাসলীলা করিতেন। শুধু যে এই ৩৬০টী মন্দিরই বিষ্ণুপুর-রাজ্যে আছে তাহা নহে, এতদ্ব্যতীত রাজগণকর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যয়ে বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে, বহু শিব প্রভৃতির মন্দির আছে। রাজার উদ্দেশ্য ছিল, যেখান হইতেই আসুন বা গমন করুন, দেব-দর্শন হইবেই হইবে। আরও শুনা যায়, ঐ সকল মন্দিরে প্রত্যহ দীপদানের জন্য দৈনিক এক মণ সর্ষপ তৈল ব্যয়িত হইত। এবং ঐ দেবালয়ের মাল্যদান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাসভূমি, জলাশয় ও কিছু-কম একশত বিঘা জমী দান করিয়া এখানে বাস করান। এক কথায় রাজা

কর্ত্তৃকই ইহারা প্রতিপালিত হইত। এখানকার যত অধিবাসী আছে, সকলেই বিষ্ণুপুররাজ কর্ত্তৃক এককালে পোষিত হইয়াছিল ও আজ সেই নিষ্কর জমী, বাগান, বাগিচা সুখে ভোগ দখল করিতেছে। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। এই রাজ-বংশ বীরশ্রেষ্ঠ বীর হাম্বির সিংহ হইতে উদ্ভূত। শুনা যায়, বীর হাম্বির একজন পরাক্রান্ত হিন্দুস্থানী লোক ছিলেন। এক সময়ে চৈতন্য দেবের কতকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ গাড়ী বোঝাই হইয়া পুরী অভিমুখে যাইতেছিল, হাম্বির-দল তাহা ধন-রত্ন মনে করিয়া কাড়িয়া লইয়া হাম্বিরের নিকট আনয়ন করে। ওদিকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য দেবকে পুরীতে সংবাদ দান করেন; তখন তিনি তাঁহার কয়েক জন প্রধান শিষ্যকে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহাদের আগমনে ও সেই অমৃত মাখা ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া হাম্বির এতদূর প্রীত হয়েন, যে তিনি তদ্দণ্ডেই বৈষ্ণব-মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হয়েন এবং দেশের উপকারার্থে ও বিষ্ণুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থে—আপনাকে নিয়োজিত করেন। এই অভাবনীয় ঘটনাই বিষ্ণুপুর-রাজ-বংশের বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা প্রদানের ও মনুষ্যত্ব দানের প্রধান কারণ। শেষে তাঁহারা এতদূর বিষ্ণুভক্ত হয়েন যে, মহাত্মা রাজা রামকৃষ্ণের সময় বিষ্ণুপুরবাসী সকলকেই দিবাভাগে স্নানের পর কিছুক্ষণ হরিনাম জপ করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে হইত। রাজা স্বয়ং তাহা অনুসন্ধান করিতেন। একবার ঘটনাক্রমে এক জালিক দ্বিপ্রহরের সময় মৎস্যাদি ধৃত করিয়া ফিরিয়া আসে, ও স্নানান্তে—হরিনাম জপের জন্য তাহার স্ত্রীকে মালা আনয়ন করিতে বলে, তাহাতে সে বলে, "আর ব্যাগার দিয়া কায নেই, খেয়ে দেয়ে মালা নিয়ে খুব রাজার ব্যাগার দিও।" তদুত্তরে জেলে বলিল, "না, রাজা টের পেলে এখনি মুণ্ড ছেদন করবেন, তাতে কায নেই, একবার নিয়ে এস, ব্যাগারটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খাই।" অগত্যা জেলেনী তাহা আনিল, সে বার কতক জপ করিয়া ভাত খাইল। দৈবযোগে রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়া ঐ কথা শুনিতে পান এবং পর দিবস তাহাকে রাজ সভায় ডাকাইয়া সমুদায় জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাচারা জেলে ভয়ে সব বলিয়া ফেলে। তখন রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এটা ব্যাগার মনে কর! বেশ তোমার খাবার দাবার জন্যে অত বেলা হয় তাই—"হরিনাম জপ" ব্যাগার, আচ্ছা আজ থেকে তোমার সংসারের সকল ব্যয়ভার আমি নিলাম, তুমি সারাদিন এমনি করিয়া আমার ব্যাগার দিবে।"

রাজার কথা শুনিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পুলকিত হইল ও সে বহুবার রাজাকে প্রণাম করিল এবং আজীবন হরিনাম জপ করিয়া কালে একজন মহৎ লোক হইয়াছিল। এই ঘটনায় শেষে উক্ত জলাদি "রাজা রামকৃষ্ণের ব্যাগার" বলিয়া প্রচলিত হয়। এই জলাশয়াদি সমস্তই বিষ্ণুপুর-রাজকর্ত্তৃক খনন করা হয়।

পূর্ব্বে যে সকল দেবালয়ের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে এই "রামকৃষ্ণ"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরগুলিও নিতান্ত কম নহে, উচ্চে এক একটী মন্দির ত্রিতল সমান উচ্চ ও খিলান করা। ইহার মধ্যে খড়ের ঘরের মত গাঁথা "যোড়া মন্দির" বড় সুন্দর। বিখ্যাত সুবর্ণ-নির্ম্মিত কলিকাতার "মদন গোপাল" বিগ্রহও ইঁহাদের। ঐ সকল মন্দিরের নিকট ভোগের ঘর, সেবাইতের ঘর, নাট-মন্দির প্রভৃতি ছিল, আজ তাহা ধ্বংসোন্মুখ।

ঐ রাসমঞ্চ দেখিয়া আবার আমরা এই রাস্তায় আসিয়া লাল বাঁধের ধারে আসিলাম। লালবাঁধ দেখিয়া একটু দক্ষিণে "কালাচাঁদের" বাগান যাইতে পথিমধ্যে শুনিলাম, রাজাদের দু'টী বৃহৎ কামান পড়িয়া আছে। ঐ দু'টীর নাম দল ও মাদল। ব্যগ্র হইয়া তাহা দেখিতে গেলাম, গিয়া দেখি,—একটী বালুকা ঢিপির পরপারে রাস্তার ধারে আম্রতলে তাল-বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ একটী কামান পড়িয়া আছে, উহার নাম দল; অপরটী নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরের মধ্যে পড়িয়া আছে। ঐটী লম্বে প্রায় ১৫ হাত, প্রস্থে এক হাত, উহার গভীরতাও আধ হাত হইবে।

শুনিলাম, গভর্ণমেণ্ট উহা কেল্লায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এত ভারি যে হাতীতেও তাহা গাড়ীতে উঠাইতে পারে নাই, কাযেই তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। আরও শুনিলাম যে, ঐ কামান দু'টীর দেবতার ন্যায় নিত্য পূজাদি হইত। আজও গ্রামবাসী সকলে তাহাতে সিন্দুর দান করিয়া থাকে। যেমন স্থানটী ফোর্ট ছিল, তেমনি চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ কামান, সৈন্যশ্রেণী, অস্ত্রশস্ত্র বিষ্ণুপুরকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিত। যে কামানগুলি সহজসাধ্য, সেগুলি গভর্ণমেণ্ট কেল্লায় আনিয়াছেন, আছে কেবল "দল মাদল" এবং পূর্ব্বোক্ত কামান তিনটী। এ দেশবাসী ঐ সকল বালুকা ও প্রস্তর-জমান ঢিপিগুলিকে "মুচ্ছা" বলিয়া থাকেন। ঐ কামানের নিকটে "নন্দলাল" ও "কালাচাঁদ" প্রভৃতির তিনটী মন্দির আছে। মোট কথায়—বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে মাটে মাঠে সর্ব্বত্রই দেবালয় বিরাজমান।

এখান হইতে ফিরিয়া লাল বাঁধের উত্তর দিয়া একপোয়া রাস্তা অতিক্রম করিলে পিয়াল, গাঁওল, বৈঁচি ও শালবন-সমাকীর্ণ একটী উচ্চ পাড়, দেখিলে পুষ্করিণীর পাড় বলিয়াই বোধ হয়। উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে একটী মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী বৃহৎ প্রস্তর-বেষ্টিত বক্রসোপান-শ্রেণী-সুশোভিত পুকরিণী, এটীকে লোকে "গোলগড়" বলে। ঐ পুষ্করিণীর গভীরতা যদিও আজ অনেক পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি এক বাঁশের কম নহে; আমরা পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম। শুনিলাম এটীর নিম্নভাগে গুপ্তগৃহ ছিল, যদি জীবনসংশয় বিপদ উপস্থিত হয়, তখন রাজপুরমহিলারা এই মন্দির ও পুষ্করিণীর নিম্ন-গৃহে আশ্রয় লইবেন ও রাজগণ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইবেন। এজন্য রাজবাটী হইতে একটী সুড়ঙ্গদ্বার এই মন্দির পর্য্যন্ত ছিল। তাহা বর্ত্তমান অধিকারিগণ সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন। উপরে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্য ঐ মন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল। আরও শুনা যায়, নবাবের আক্রমণে বিষ্ণুপুররাজ যখন পরাজিত হ'ন, তখন বহুমূল্য যাবতীয় ধন সম্পত্তি ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। যাহা হউক, মন্দিরের চারিধার বহুদূর-ব্যাপী মুচ চা-বেষ্টিত ও অধুনা জঙ্গলাকীর্ণ।

আমরা পাঁচদিন ঐ সকল দর্শন করিলাম, কিন্তু একটী কারণ বশতঃ এখানকার বিশেষ ইতিহাস সংগ্রহে অনাস্থা জন্মিল। এত সুন্দর দেবভূমি—যাহা "গুপ্ত বৃন্দাবন" নামে অভিহিত, সেখানকার লোক আজ আধ্যাত্মিক জগতে এত হীন কেন?

আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম, রাজার বংশধর এখন কেহ নাই। শেষ রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর পুত্র বলপূর্ব্বক এই রাজ্য অধিকার করেন। রাজার দুই স্ত্রী ছিলেন। ছোট রাণীর ষড়যন্ত্রেই ঐ ব্যক্তি রাজ্য অধিকারে সমর্থ হন এবং বড় রাণীর সত্বলোপ করিবার চেষ্টা করেন। গরিবের হস্তে ধন পড়িলে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল; ঐ ব্যক্তি চরিত্র-হীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে লাগিলেন। অনেক স্থলে এরূপভাবে বন্ধক রাখিলেন যে, শেষে নিলামে ৫।৭ টাকায় এক শত বিঘা জমী বাগান সমেত বিক্রয় হইতে লাগিল। প্রভু মদনগোপালও সেই দায়ে পড়িয়া বাগবাজারের মিত্রদের হাতে বন্ধক পড়িলেন। নিজের সম্পত্তি নয়—পরের, যত যায় যত থাকে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করাই প্রধান কর্ম্ম, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনিই উক্ত মৃণ্ময়ীর গাত্রে লিখিত নীলমণি

সিংহ। যে যেমন লোক, সহচরও তেমনি হয়, সুতরাং বিষ্ণুপুরবাসী অনেকেই তাঁহার ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া নিজেরাও তাহা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। এ আজ একশত বৎসরের কথা। উত্তরোত্তর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কনিষ্ঠা রাণী ও নীলমণি সমচরিত্রের লোক হইলেন। দেবালয়ের বিগ্রহসকল একটী গৃহে আসিয়া একত্রীকৃত হইল, দেবালয় ভাঙ্গিয়া জঙ্গলপূর্ণ হইতে লাগিল। এই সকল কুৎসিত ব্যাপার বিষ্ণুপুররাণীর মজ্জাগত হইল, কিন্তু "অতিদর্পে হতা লঙ্কা" ! একদা নীলমণি মত্তাবস্থায় ব্যাঘ্র শিকারে বহির্গত হইলেন, কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে গুলিপূর্ণ পিস্তল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিজ বক্ষে প্রবেশ করিল—নীলমণির ইহলীলা সাঙ্গ হইল! তারপর? তারপর দু'পক্ষে দলাদলি বাধিল, অবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহাই উভয়ে ভাগ করিয়া লইলেন। দুই রাণীর দু'টী পক্ষ হইল, লোকজন সবই পৃথক্। এখন উভয় পক্ষে বিবাদ চলিতেছে, এক পক্ষ রাণী শ্রীমতী প্রসন্নকুমারী দেবী, অপর পক্ষ নীলমণি সিংহ; কোন পক্ষেই কেহ উত্তরাধিকারী নাই, গভর্ণমেণ্টও সত্ত্ব প্রমাণ না করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ ও ডিক্লারেসন্ দিতেছেন না; এখন বলিতে কি, রাজবংশের বার্ষিক আয় আড়াইশত টাকা। অতি দীন অতি হীনাবস্থায় চলিতেছে, সুবিধা—বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের, স্ত্রীলোক কে কি দেখে, দু'দিকেই লুট হইতেছে।

বিষ্ণুপুরের এত গৌরব, এত কাণ্ড সব গিয়াছে, লোক এখন ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও অধার্ম্মিকের চূড়ান্ত এবং মোকদ্দমা-বাজ হইয়াছে। ঘরে খড় নাই, কিন্তু প্রত্যহ সকাল হইতে বারটা পর্য্যন্ত কোর্টে আছে, প্রত্যেকের নামে ৪।৫টা মোকদ্দমা আছেই। এমন লোক নাই যে মোকদ্দমায় নাই। কতকগুলি লোকের পেশাই সাক্ষ্য দান করিয়া রোজ ।০, ৵০, ॥০ পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা; কিসে পরের ধন ফাকি দিয়া লইব, দিবারাত্রি এই চেষ্টা! কেহ কাহারও দায়ের সময় অর্থ সাহায্য করিলে, পরে তাহা প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা এদেশে নাই; তাগাদা করিলে দিবে না, তখন বাধ্য হইয়া মোকদ্দমা করিতে হয়। জমীর ধানের ভাত খায়, আর ব'সে ব'সে মোকদ্দমা করাই কায। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কোর্টে এত উকীল—ছ'পয়সা রোজেও তাঁ'রা খাটেন! এটী প্রত্যক্ষ ঘটনা।

দেশে যদিও একটী ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়,—একটী মাইনর স্কুল, মিশনরী-

দের একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয় ও দু'একটী পাঠশালা আছে; কিন্তু স্থান কুৎসিত বলিয়া শিক্ষার অত আড়ম্বর সমস্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তৈলহীন দীপবৎ মিটি মিটি জ্বলিতেছে! গরিব, অসহায়-দিগের দেখিবার ও তাহাদিগের বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। শিক্ষিত উকীল মণ্ডলী, মোক্তার মণ্ডলী, অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক সবই আছেন, কিন্তু দেশের গতি ফিরাইতে কাহারও স্পৃহা নাই। যাহাদের লইয়া আমাদের এত বিলাসিতা—এত আড়ম্বর চলিতেছে, সেই শ্রমজীবী কৃষকগণের সন্তান-সন্ততিও আজ অর্থাভাবে লেখা-পড়া শিখিতে পারিতেছে না; ইচ্ছা থাকিলেও দারিদ্র্য-দোষ মানবের চিরশত্রু!

দুঃখের কথা বলিতে কি, আমরা যখন ঐ সকল মহাশয়দিগের নিকট একটী শ্রমজীবি-নৈশবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে উল্লেখ করি, তখন তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন,—"দেশে যে মুটে মজুর আক্রা, তাহাতে যদি তা'দের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে মজুর মুটে মেলা ভার হইবে; তখন আর বাঁচ্‌তে হ'বে না। আর দেখ্‌তেও পাওয়া যাচ্চে, যে চাষার ছেলে, সে যদি ইংরাজী লেখাপড়া শেখে, তখন সে চাষ বাস ছেড়ে না খেতে পায় সেও ভাল, তবু লাঙ্গল চষা তা'র দ্বারা হ'বে না—বলি এই ত শেষে দাঁড়াবে? কলুর ছেলে লেখাপড়া শিখে বামুনের উপর চাল্ চাল্‌বে, এই'ত তোমাদের শিক্ষার কাণ্ড? ইত্যাদি।"

তদুত্তরে আমরা বলিলাম,—"মহাশয়! সে'ত ভালই, যখন মুটেরা মোট বওয়া ছাড়্‌বে, তখন আমাদের এ আলস্যটা যা'বে; আমরা তখন আপনা-আপনিই মোট বইবো! দ্বিতীয়তঃ যা বল্লেন, সেটা চাষার কেন—ভদ্রলোকের ছেলেদেরও এমন ঘট্‌ছে, এ যে শিক্ষার দোষ! কিন্তু আমরা'ত তা' কর্‌ব না,—আমরা ইচ্ছা করি, সকলকেই সাধারণ ইংরাজী, বাঙ্‌লা, অঙ্ক শিক্ষা দিয়ে তা'দের যাহার যে ব্যবসা, সেই ব্যবসায় কিসে পয়সা রোজগারের উপায় হয়, তাই করা এবং গোড়া হ'তে তেমনি ধরণের বই পড়ান! আপনি যা' বল্লেন, সেটা ইংরাজী শিক্ষার Rust বা মরিচা! আমরা ওঁদের সদ্‌গুণ নিতে জানি না, জানি দোষ নিতে—সে দোষ কা'র? শিক্ষকও তা' আমাদের বুঝান না, কাযেই আমরা ইংরাজী শিক্ষার পর এক একজন পাকা খোস নবীশ ইংরাজ হই, জ্ঞান হউক বা না হউক তা'তে আসে যায় না। এখন বলুন, যদি ঐ রকম শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে উপকার কি হয় না?

তা'তে তাঁরা বল্লেন, "বাবা! যা' বোঝ কর, আমরা বুড়ো হাবড়া—আমাদের টান ক্যানো? নিজেরা পার,—কর, বেশ, আমাদের দ্বারা কিছু হ'বে না।"

আমরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমরা বিদেশী, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর কি না, তাহাও একবার ভাবিলেন না, অথচ ইঁহারা এদেশের মধ্যে শিক্ষিত, বয়োবৃদ্ধ ও ধনাঢ্য।

যাহা হউক, ভগবানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঐ স্থানের কয়েকজন উৎসাহী লোক লইয়া একটী "শ্রমজীবি-নৈশবিদ্যালয়" স্থাপন করিলাম। দেখিতে দেখিতে ছাত্রসংখ্যাও খুব বাড়িতে লাগিল। আমরা আমাদের জনৈক বন্ধুর উপর বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। এক্ষণে বন্ধুবরের চেষ্টায় ও ভগবানের অনুগ্রহে আরব্ধ কার্য্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিলে আমাদের সমধিক আনন্দের সীমা থাকিবে না।

জনৈক পরিদর্শক।

কোজাগর-নিশি।

মেঘময়ী বরিষার তন্দ্রা-অলসতা,
আশ্বিনের পৌর্ণমাসী প্রফুল্লবারতা
ঘুচা'য়ে— সরা'য়ে দেছে। গন্ধে রূপে রসে
শেফালী সরোজবালা মৃদু মন্দ-হাসে
মেলেছে নয়ান! চেয়ে দেখি চারি-ভিতে
কুললক্ষ্মীকুল দিইতেছে হাস্কাহাতে
চারু আলিপনা; আজি সারা গেহময়
কমলা চরণ-চিহ্ন! সাজিভরা পুষ্পচয়!
বিশ্বভাণ্ডে ভরি' সুধা—ওকে হাস্যময়ী,
আসিছ—নামিছ—মৌনগানে মধুময়ী
ভাসাইয়া দশদিশি? বরিব তোমারে
আজি নব-উন্মেষিত হৃদি-পদ্ম-পরে!
সুমঙ্গল আগমন মহোৎসবে তব
শুভ্র কোজাগর-নিশি জাগিয়া রহিব!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃদয়-কবচ।

আজ দশ বৎসর অতীত হইল, সে আমাকে অন্ধকারে ফেলিয়া চিরতরে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে।

আমি কেবল তাহারই জন্য মণিহারা ফণির প্রায়। মণিটীর অভাবে আমার আশা-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে আমার এই অতুল সম্পত্তিতে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বিষয়-বাসনা আর ভাল লাগে না, উহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি এখন অশান্তিময় সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হইলে, অশান্তিময় দুস্তর সমুদ্র হইতে তীরে উঠিতে পারিব না। আমি সেইজন্য বড়ই বিমর্ষ,—মুখে হাসি ফোটে না,—আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যে যোগদান করিতে ইচ্ছা করে না,—হৃদয় মরুভূমি-প্রায় হইয়াছে।

আমি একদা নীরবে একখানা কেদারায় হেলান দিয়া, সজলনয়নে, নিবিষ্টান্তঃকরণে, কাহারও পূর্ব্ব স্মৃতি উদ্ঘাটন করিতে, আমার হৃদয়-কন্দরে চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দর দর ধারায় অশ্রুরাশি নিঃসৃত হইয়া বক্ষদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। ইহাতে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্ঘাটন করা দূরে থাকুক, বরং চারিদিক্ হইতে দুঃখরাশি ভীমবেগে উপস্থিত হইয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আমাকে গ্রাস করিতে লাগিল। আমি উহার যন্ত্রণায় বড়ই বিব্রত এবং শোকার্ত্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলাম। বহিশ্চক্ষু অন্ধ হইল,—কোন জিনিষও আমার নেত্রদ্বয়-সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে নীত হইল না। ক্রমশঃ শোকরাশি ভীষণ হইতে ভীষণতর আকৃতি ধারণ করিয়া, আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিল। শোকের আধিক্য হওয়াতে, আমি পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলাম এবং সময় সময় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম।

তৎপর এ অভাগার কি হইল, আমাদের প্রিয় পাঠকপাঠিকাবৃন্দ শুনিতে বোধ হয় একান্তই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছেন। আমি যাহার জন্য বিব্রত এবং শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সে আর কেহই নহে,—আমার জীবনের সাথী "রজনী।"

অনন্তর যৎপরোনাস্তি বিষাদিত এবং ব্যথিত হইয়া সেইখানে একখানা

কৌচের উপর শয়ন করিলাম এবং আমার জীবনের সঙ্গী সেই রজনীর সহিত পুনর্ম্মিলনহেতু মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলাম। যম কি এখন এই হতভাগার প্রতি মুখ তুলে চাহিবেন? তিনি কি এতই অনুগ্রহ করিবেন যে, আমি তাহার সহিত পুনর্ম্মিলনে সমর্থ হইব? ইত্যাকার চিন্তালহরী আমার হৃদয় মধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল এবং সংসারের প্রতি ক্রমেই বিরাগ ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল,—উহা আগাছাপূর্ণ উদ্যানবৎ বোধ হইতে লাগিল। সময় সময় ইচ্ছা হয়, হলাহল পান করিয়া জীবন-জ্বালা নির্ব্বাণ করি। আত্মহত্যা! আত্মহত্যা যদি পুরুষ-সমাজে একান্ত দোষণীয়, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিগর্হিত, তথাপি আত্মহত্যা করিব। পুরুষ-সমাজে আমার নামে কলঙ্ক রটাইব। আমার গর্হিত কার্য্যে যদি পিতৃপুরুষগণ কলঙ্কিত হন, তথাপি পশ্চাৎপদ হইব না।

বিষের কৌটা হাতে করিলাম। আমি উহা বহুদিন পূর্ব্বেই সযতনে কৌচের নিম্নভাগে একটী ক্যাস বাক্সে রাখিয়াছিলাম। অদ্য সেই কৌটা বাক্স হইতে আমার হাতে আসিল। কৌটা হাতে করিলাম বটে,—কিন্তু হস্তদ্বয় স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং উহা স্খলিত হইয়া ভূমি চুম্বন করিল;—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি ঈদৃশ ব্যাপারে বড়ই ভীত হইলাম এবং আকস্মিক বর্ত্তমান ঘটনার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমার কর্ণকুহরে কে যেন মৃদু বারি বর্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল;—"ছি তুমি বড়ই চঞ্চল; তুমি কি করিতে যাইতেছ? আত্মহত্যা? সে যে গুরু-তর পাপ; তাহা কি তুমি বিদিত নহ? সাবধান! ক্ষান্ত হও! এ বীভৎস কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হও! তুমি যাহার জন্য শোকাচ্ছন্ন, ব্যথিত, বিষাদিত এবং মৃত্যুপথে দাঁড়াইয়াছ, তাহাকে সত্বরেই দেখিতে পাইবে।"

এতাদৃশ আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া, আমি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলাম। আমার মনোমধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতে লাগিল। কে এমন বাণীর দ্বারা আমাকে বিপথ হইতে পথে আনয়ন করিল? এমন কোন্ দয়াল পুরুষ আছে যে, আমার মরম ব্যথায় ব্যথিত, আমার বিষণ্ন বদন হেরিয়া বিষাদিত, আমাকে শোকাচ্ছন্ন দেখিয়া শোকাভিভূত হইতে পারে? তবে কি আমার—সেই—'রজনী'—দয়াপরবশ হইয়া প্রেতমূর্ত্তিতে আমাকে সাবধান করিয়া গেল?

কৌচের উপর শায়িত অবস্থায়, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে,

নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং নিদ্রিতাবস্থায় যাহা দেখিলাম, তাহা আমার কৃশ, জীর্ণ, শোকাচ্ছন্ন শরীরকে ক্রমেই সতেজ, বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত করিয়া তুলিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি নির্ম্মল আকাশ-তলে, একটী প্রশস্ত উদ্যান-মধ্যস্থিত শ্বেত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান একটী সরসী-তটে দণ্ডায়মান। সরসীর চতুষ্পার্শ্বে ফল-পুষ্প-শোভিত। বকুল, মাধবী, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পনিচয় বিকশিত হইয়া, মনোহর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। সুখস্পর্শ মলয়ানিল মৃদুল হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া, কুসুম-সম্ভার দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপৃত করিতেছে। মধুমক্ষিকাসকল মধুর গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া, মধু আহরণ পূর্ব্বক বনস্পতিচয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বিহগকুল বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া, সময় সময় মধুর ঝঙ্কার প্রদান করিয়া, শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করিতেছে। শশধরের পূর্ণ জ্যোতিঃ সরসী-বক্ষে পতিত হওয়ায়,সরসী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া, তাঁহার রূপের বিমল ছটায় জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন। এরূপ মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিয়া, আমার নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইল। সুখস্পর্শ মলয়ানিলের মৃদুমন্দ প্রবাহে, আমার অসীম স্ফূর্ত্তি এবং আনন্দ বর্দ্ধন হইতে লাগিল। আমার শরীর ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও বলিষ্ঠ বোধ হইতে লাগিল। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সরসীতটে পায়চারি করিতে করিতে, বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। তৎপর কোন কারণ বশতঃ আমি মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নেত্রদ্বয় পরিচালিত করিবামাত্র, উত্তর আকাশে, অতিদূরে, একখণ্ড রজত-সদৃশ উজ্জ্বল শুভ্রমেঘ অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এই মেঘ-খণ্ডের আকস্মিক আবির্ভাবের কোন কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ক্রমেই ভাসমান হইয়া, নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। উহা ক্রমাগত আমার সম্মুখীন হইতেছে বলিয়া, আমি বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার শরীর অবসন্ন এবং অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

উহা কি আমার মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত? না আমাকে সঙ্কটাপন্ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে? এই দুইটীর মধ্যে, কোনটীই সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে মেঘখানি অবি-

লম্বেই আমার নিকটস্থ হইবে বিবেচনায়, আমি অনন্যোপায় হইয়া শিরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক, স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে, অপঘাত মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, সরসী-তটে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, সেই রজত-সদৃশ শুভ্র মেঘখানি যেন সহাস্য বদনে, আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া, আমাকে অভয় প্রদান করিতেছে! এতাদৃশ ভাব অবলোকনে আমার হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইল। আমি তখন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, একাগ্র চিত্তে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অভয়দাতার সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমি অনিমেষ লোচনে, সেই রজতসদৃশ শুভ্র মেঘখানির পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলাম। সুন্দর মেঘখানি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মৃদুমন্দ বাতাসে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার নৃত্যের তুলনায়, শিখিগণের নৃত্যও পরাজয় স্বীকার করে। মেঘখানি আমার অনতিদূরে অবস্থান করিয়া, শূন্যে মৃদুমন্দ বাতাসে দোদুল্যমানাবস্থায় নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত ভাব ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া, আমাকে প্রেম-সমুদ্রের বক্ষদেশে আনয়ন পূর্ব্বক, উহার বীচিমালার মৃদু স্পন্দনে আমার হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার করিল। আমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনে ক্রমেই হাসির রেখা প্রকাশ পাইল। যখন এতাদৃশ প্রেম-পূর্ণ আনন্দ-স্রোত, আমার হৃদয়-সমুদ্রে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সেই মেঘখানির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শুভ্র মেঘখানি শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অপূর্ব্ব উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রদান করিতে লাগিল। উহা পূর্ব্বাপেক্ষা শতাধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত এবং পরিষ্কৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই পরিবর্ত্তনশীল শুভ্র মেঘখণ্ডের প্রতি বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে দেবগুণ-সমন্বিত, দিব্য তেজঃপুঞ্জ একজন মহানুভব ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আমি সেই উদার অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট মহানুভব ব্যক্তির সম্মুখে, নির্নিমেষ লোচনে, স্পন্দনশূন্য হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আমি যেন এই মহানুভব ব্যক্তির সুন্দর ভাবপূর্ণ মুখখানি কোথাও দেখিয়াছি। ইহা আমার নিকট বহুদিনের পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই মুখখানি আমার প্রিয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। সেই মুখখানি যে আমার অনেক প্রিয়তম

বন্ধুর, ইহাতে আর কোনই সংশয় রহিল না। তৎপর আমার সেই হৃদয় ধনকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক, হৃৎকন্দরে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার নিমিত্ত, হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া আবেগ-ভরে, সেইদিকে ছুটিলাম। আমার হৃদয়মণিকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য আমি যতই অগ্রসর হইতেছি, উহা ততই পিছনে সরিয়া যাইতেছে। আমি ঈদৃশ বিস্ময়কর ব্যাপারে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এতাদৃশ ঘটনার কোন কারণ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তথাপি প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের ধনকে প্রাপ্ত হইবার আশায় প্রাণপণে ছুটিলাম—আমার আশা নিরাশায় পরিণত হইল। পক্ষান্তরে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া, মাতা বসুমতীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তৎপর দেখিলাম, আমার হৃদয়ের ধন পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে যতদূর ব্যবধানে অবস্থান করিতেছিল, এখনও ঠিক ততদূর ব্যবধানে অবস্থান পুর্ব্বক আমার প্রতি প্রেম কটাক্ষপাত করিয়া, আমার মানস-ক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রেম-বীজ বপন করিতে লাগিল।

ইহাতে আমি চঞ্চল না হইয়া, ধীর প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক গভীর গবেষণার সহিত তাহার বিষয় লইয়া, আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মোহান্ধকার ক্রমেই আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল। এতক্ষণে দেখিলাম,—আমার হৃদয়-মণি শূন্যে দণ্ডায়মান, আর আমি বসুমতীর-ক্রোড়ে! পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই মহানুভব ব্যক্তি আর আমার হৃদয়-ধন—একই ব্যক্তি—সেই 'রজনী'।

তৎপর সে আমাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, ঈষদ্ধাস্য বদনে সাগ্রহে কি যেন বলিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল— "তুমি এখনও স্মৃতি-কবচ বক্ষে ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ? তুমি এখনও আমাকে পাইবার নিমিত্ত, আশা রাণীকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিতেছ? তুমি এখনও তোমার ঈদৃশী আশা ফলবতী হইবার জন্য, মৃত্যুকে আশ্রয় করিতেছ? সে যাহা হউক, আমি তোমারই প্রাণের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি; তোমার সহিত আমার মিলন অসম্ভব। কারণ তুমি ইহলোকে,—আমি পরলোকে। তোমার সহিত পুনরায় মিলন হইবার মাত্র দুইটী উপায় আছে। হয় তোমাকে মর্ত্ত্যলোক

পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আগমন করিতে হইবে; না হয় আমাকে স্বর্গ লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে হইবে। তবে এস্থলে আমাকেই স্বর্গলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে হইল। আমি তোমার প্রেমপূর্ণ ভালবাসার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে, একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তুমি যেন চুম্বক লৌহের ন্যায় আমাকে সজোরে তোমার দিকে আকর্ষণ করিতেছ। তোমার ভালবাসার কি মোহিনী শক্তি! তুমিই আমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু! যদি কেহ সংসারে আমার উপকারী ব্যক্তি থাকে, যদি কেহ আমার মরম ব্যথায় ব্যথিত হইতে পারে, যদি কেহ আমার বিপদে সহায় হইয়া প্রবল শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, যদি কেহ আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে,—তবে সে একমাত্র 'তুমি'। যাও! তুমি ফিরে যাও; আমি তোমার পূজ্যাস্পদ মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে ভ্রাতৃরূপে লাভ করিব। আমি তোমার সম্মুখে, আমার হস্তস্থিত এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ছেদন করিতেছি। যে দিন আমি তোমার গৃহে ভূমিষ্ঠ হইব, সেই দিন তুমি আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুল ছেদিত দর্শন করিয়া, আমি যে তোমার সেই—'রজনী', তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে'।

এই কথাটী শেষ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমার সেই—'রজনী' অন্তর্হিত হইল।

আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আমার সেই কৌচের উপরে লম্বমানাবস্থায় পূর্ব্ববৎ শায়িত রহিয়াছি। আমি যে অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন দেখিলাম, ইহা কি সত্য? আমি কি আমার হৃদয়ধনকে পুনরায় ফিরিয়া পাইব? স্বপ্ন 'ত' অলীকও হইয়া থাকে; তবে কি ইহা আমার অলীক স্বপ্ন?

আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং আমার হৃদয়-রাজ্যে আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল। স্বপ্ন-দর্শিত ঘটনাগুলি সফল করিবার মানসে, আমি আমার হৃদয়-রাজ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, উঁহাদের চরণসেবায় নিযুক্ত হইলাম এবং আমার হৃদয়-মণিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া, ঐকান্তিক মনে, ভগবৎ-সকাশে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তৎপর আমি একদিন আমার

মাতৃমুখ-নিঃসৃত একটী অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তিনি বলিলেন—"আমি গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, শারদীয় পূর্ণচন্দ্র যেন হাসিতে হাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইল এবং আমার জঠরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাকে অনির্ব্বচনীয় শান্তি প্রদান করিতে লাগিল। তৎপর কিসের যেন একটা শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

ইহা শ্রবণ করিবামাত্র আমার বুঝিতে আর বাকি থাকিল না। আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। দশমাস দশদিন অতীত হইলে, আমি একটী নবজাত কুমারকে ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইলাম। সূতিকা-গৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, নবজাত শিশুটীর বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুল ছেদিত রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। স্বপ্নের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিবে, এরূপ ধারণা আমার মনোমধ্যে পূর্ব্বে কখনও স্থান পায় নাই। আমি আমার প্রাণের বন্ধু সেই 'রঞ্জনী'কে অদ্য ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া, উহাকে আমার 'হৃদয়-কবচ' করিয়া রাখিলাম।

শ্রীপীতাম্বরচন্দ্র চৌধুরী।

সংসার-মরীচিকা।

শৈশবে বুঝিতে নারি যৌবনের সুখ,
যৌবনে না বুঝি আমি বার্দ্ধক্যের দুখ;
বৃদ্ধকালে মৃত্যুতরে হয় অভিলাষ,
সংসারে প্রবেশকালে কত ছিল আশ!
ভেবেছিনু পাব আমি কতই যে সুখ,
পেতেছি এখন শুধু নিত্য কত দুখ,
এবে দেখি ঝঞ্ঝাটের বোঝা শুধু মাথে,
দারুণ ভাবনা সদা থাকে মম সাথে।
এ জীবনে কভু আমি ভাবি নাই এত।
ঘেরে শত দুঃখে, হলে শৈশব অতীত॥

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

শিক্ষার দোষ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নৈশ-সম্ভাষণ।

আকাশ হইতে ধরাতলে জ্যোৎস্নাধারা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার আলোক মাখিয়া প্রকৃতি রাণী সৌন্দর্য্যপ্রতিমা সাজিয়া খল খল হাসিতেছিলেন। হাসিতে দিগন্ত উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন কৃষ্ণাদ্বিতীয়া—এই মাত্র অন্ধকার অপগত হইয়াছে। শাশুড়ী ও বধূ জ্যোৎস্না-পুলকিত বারেণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছে,—রন্ধন গৃহের কায সারিয়া, আহার সমাপ্ত করিয়া বধূ শাশুড়ীর জলপানের দুগ্ধ, ইক্ষু গুড় ও দুটী মুগের অঙ্কুর ভিজা লইয়া গৃহে যাইতেছিল; শাশুড়ী বলিলেন—"বেশ আলো আছে—এই খানেই দে মা, হাওয়া বড় ভাল লাগছে। ঘরে গরম।"

বধূ শাশুড়ীর জল খাবারের পাত্রখানি তাঁহার সম্মুখে নামাইয়া দিয়া, তারপরে আরও কিছু কায করিয়া আসিয়া শাশুড়ীর নিকটে বসিয়াছিল, এবং শাশুড়ী জলযোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন, বধূ তাহা শুনিতেছিল ও প্রয়োজন হইলে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেছিল।

সহসা প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নার তরল আলোকের উপর ল্যাণ্ঠনের তীব্রোজ্জ্বল আলোকপাত হইল। শাশুড়ী-বধূ চমকিয়া সে দিকে চাহিলেন,—শরহস্ত ব্যাধ-সন্দর্শনে তরুকোটরস্থ পক্ষীণীকুলে যেমন কাঁপিয়া চমকিয়া, ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, শাশুড়ী বধূ তেমনই হইয়া উঠিলেন। ল্যাণ্ঠনধারী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শাশুড়ী বধূ চিনিয়াছিলেন—সে হীরালাল।

বধূ তাড়াতাড়ি সে পাপচক্ষুর অন্তরালে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। শাশুড়ী উত্তেজিত কণ্ঠে, পরুষ স্বরে বলিলেন—"কি গো, রাত্রে আমাদের বাড়ী কেন?"

হীরালাল—দাম্ভিক হীরালাল—অসংযমী হীরালাল—পাপী হীরালাল মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইল, ইহারা সহজ লোক নহে। মুহূর্ত্তে মনে করিয়া লইয়া, সবিশেষ আয়াস স্বীকার না করিলে শ্যামার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া

আসিয়াছি, তাহা প্রতিপালন হইবে না। মুহূর্ত্তে তাহার পাপ চিত্তে উদয় হইল, যে রত্নের জন্য হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে—যাহার জন্য এত করিতেছি—যাহাকে লাভ করিতে না পারিলে, আমার শিক্ষা দীক্ষা সকলই বৃথা—,সে রত্ন—সে অমূল্য ধন শরীরপাত করিয়াও লাভ করিতে হইবে। সে একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল,—"রাত্রে কি আসিতে নাই ?"

অবিচলিত কণ্ঠে ননির মা বলিলেন,—"না।"

হীরা। কেন ?

ন-মা। কি প্রয়োজন ?

হীরা। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ আসে না।

ন-মা। না,—প্রয়োজন থাক্‌লেও আমাদের পুরুষ মানুষ বাড়ীতে নাই—কাযেই আসতে নাই।

হীরা। তাতে কোন দোষ নাই।

ন-মা। তোমাকে সে শিক্ষা দিতে হবে না—তুমি এস না।

হীরালালের মুখের উপর এমন কথা বলিয়া নিজের কাঁধের উপর মাথা রাখিতে সমর্থ হয়, এমন কেহ সে গ্রামে আছে কি! সহসা হীরালালের মনে এই গভীর চিন্তার উদয় হইল।

যেমন এই চিন্তার উদয় হইল, তেমনই মীমাংসা হইয়া গেল। মীমাংসা এই হইয়া গেল যে, কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে বড় মৃদু পন্থা অবলম্বন করিয়াই এতটা গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই সে মুখের উপর সামান্য একটা বিধবার নিকটে এত অপমানের বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া লইল।

তখন সে দৃঢ় কণ্ঠে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—"না না, আর আমি তোমাদের বাড়ী আসিব না। এমন কত রাত্রে বউকে সঙ্গে লইয়া তোমায় আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইতে হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, হীরালাল পদার্থটা কি ?"

দপ্‌ করিয়া দাবানল জ্বলিল। হু হু করিয়া আগ্নেয় গিরির প্রস্রবণ ছুটিল। ননির মাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধের রক্ত-রাগ ফুটিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিরে ছোট লোকের বেটা, ছোট মুখে বড় কথা! তোর সাত পুরুষের খবর আমি জানি—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুই যে কথা বল্‌লি, ভগবান তার শাস্তি দেবেন—তোর মুখে কুড়ি হবে—পোকা প'ড়বে—খসে প'ড়বে।"

হীরালাল ব্যঙ্গ-গর্ব্বের কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল,—"বামনাই রেখে দাও বুড়ী—হয় বউ দেবে, নয় বিষয়ের মায়া—গ্রামের মায়া ছাড়্‌তে হবে।"

ন-মা। কেন, তুমি আর তোমার বাবা কি গ্রামের লাট সাহেব? দেশে কি মানুষ নাই—জগতে কি ধর্ম্ম নাই—উপরে কি দেবতা নাই?

হীরা। সব আছে,—দেখে নিও, হীরুর ক্ষমতা কত।

ন-মা। তুইও দেখে নিস্—এই বুড়ো বামুনের মেয়ে তোর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে করে।

হীরা। কে কাহার শ্রাদ্ধ করে, তা দেখিস্ বুড়ী।

ন-মা। তোর সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ আমরাই ক'রেছি, তোর শ্রাদ্ধ আমরাই কর্‌ব। তুই আমার বাড়ী থেকে এখনি বের—নইলে ঝাটায় তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

হীরা। যাইতেছি,—কিন্তু মনে রাখিস্ বুড়ী—দিন রাত্রি কাঁদিয়াও এ কার্য্যের—এ কথার—এ গালাগালির প্রতিকার হবে না।

তখন ননির মাতা নিজ মস্তকের চুল ছিঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া, নানাবিধ কথায় হীরালালকে অভিশপ্ত করিতে লাগিলেন। হীরালালও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় কিয়ৎক্ষণ গালাগালি দিয়া তারপরে বাড়ী চলিয়া গেল।

তখন বধূ আসিয়া শাশুড়ীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

ননির মাতা বধূর যত্নে শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন বটে,—কিন্তু কি প্রকারে যে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, তাহার স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন।

শাশুড়ী নিদ্রিতা হইতেছেন না,—পিশাচের কথায় নিতান্ত অপমানিত ও মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে বধূ অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইল,—শাশুড়ীকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দিল। তারপরে বলিল,—"তোমার ছেলেকে পত্র লেখ, তিনি বাড়ী এসে যা হয় করুন।"

শাশুড়ী বলিলেন,—"তাকে লিখে কি হবে। সে বিদেশে থাকে,—সেখান থেকে একথা শুনে কেবল ব্যথা পাবে বই ত নয়। সকাল হোক, আমি ওর বাপের কাছে যাব—পাড়ায় পাঁচ জনের কাছে যাব—ওর শ্রাদ্ধ কোর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।"

বধূ বলিল,—"তবে তাই করিয়ো, এখন ঘুমাও। মন খারাপ হয়েছে—রাত্রি জাগিলে অসুখ কোর্‌বে। রাত্রি বোধ হয় এখন বারটা।"

খাশুড়ী। হাঁ, আমার একটু ঘুম আসছে—আমি ঘুমাই ; তুমিও ঘুমাও।

বধূ সন্তুষ্ট হইয়া নিজ শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

শাশুড়ী বধূকে প্রতারণা করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার আদৌ নিদ্রা আসিতেছিল না। কিসে হীরালালের পতন হইবে, কিসে হীরালালকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, সেই চিন্তাতেই তাঁহার দেহ আগুণ হইয়া গিয়াছিল। তবে তাঁহার নিদ্রা আসিতেছে, একথা না বলিলে বধূ ঘুমায় না—তাই বলিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইলেন, নিজে কিন্তু হীরালালের দুর্ব্যবহারের দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালালের মাতা।

মনির মাতা পরদিবস অতি প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। অন্য দিন প্রাতঃসন্ধ্যাদি প্রাতঃকালেই সমাপ্ত করিতেন, সে দিন আর তাহা করিলেন না। কারণ, তাঁহার প্রাণের মধ্যে তখন ক্রোধের ভীষণ বহ্নি জ্বলিতেছিল,—এ জ্বালা কথঞ্চিৎ উপশমিত না হইলে, ইষ্টচিন্তনে কখনই আনন্দ লাভ হইতে পারে না। অতএব তিনি স্থির করিয়া বসিলেন, আগে হীরালালের অপমানের প্রতিশোধ লইয়া আসিয়া, তৎপরে জপ-তপ যাহা কিছু করিতে হয় করিব। কিন্তু তখন বধূ উঠে নাই বলিয়া বাটী হইতে যাইতে পারিতেছিলেন না। একটু পরেই বধূ উঠিল।

শাশুড়ী বলিলেন,—"মা, তুমি সদর দরোজা বন্ধ রাখিয়া ঘরের কায কর, আমি একবার পোড়ার-মুখোর বাবার কাছ থেকে আসি।"

বধূ শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। স্পষ্টতই বুঝিতে পারিল,—তাহার শাশুড়ীর সারারাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এবং নরপিশাচের বাক্য-বাণে সে হৃদয় দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাতরে বলিল,—"মা, অত উতলা কেন হইতেছ? কুকুরের কামড় হাঁটুর তলায়।"

শাশুড়ী কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে কহিলেন,—"অসহ্য হ'য়েছে মা, বড় অসহ্য হ'য়েছে। ছোট মুখে বড় কথা! আমি বিদ্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বেটার বৌ—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাগ্যি বোসের পৌত্তুর কি না ঐ সকল কথা ব'লে গেল। যে বেটাদের একসময় গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সমাজ-সমাজিকতা ছিল না। থাকতো আ'জ তোমার শ্বশুর, তবে ওর বাবার নাম ভুলিয়ে দিত। যাক্‌,—আমি একবার দেখে নেব, বেটার বাবার কটা মাথা।"

আর তিনি অপেক্ষা করিলেন না। অবমানিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বধূ বিষণ্ণ মনে সদর দরোজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়া বাড়ীর মধ্যে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা হইল।

তখন কেবল বালারুণ-কিরণে পল্লীর শ্যামল বৃক্ষশীর্ষ স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল,—কেবল কৃষকপল্লী হইতে কৃষকেরা বলদ ও লাঙ্গল লইয়া মাঠে গমন করিয়াছিল,—কেবল রাখালেরা গ্রাম্য পথে গাভী বৎস লইয়া গোষ্ঠ-যাত্রা করিতেছিল,—কেবল কৃষক-বধূকুল কুম্ভ-কক্ষে জল আনিতে শ্যামসুন্দরের দীঘিতে গমন করিতেছিল এবং ভদ্রমহিলারা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, আর ভিখারিণীকুল "জয় রাধে" বলিয়া টুক্‌নী হস্তে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

হীরালালের মাতা কেবল স্নান করিয়া আসিয়া, রকে দাঁড়াইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছিল, এবং হীরালালের যুবতী স্ত্রী পার্শ্বের গৃহে নবপ্রসূত শিশুর মুখে স্তন্য দান করিতেছিল।

ম্লান মুখে উত্তেজিত ভাবে তত সকালে পুরোহিত ঠাকুরাণীকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, হীরালালের মাতার কেমন একটা সন্দেহ হইল। বলিল,—"আসুন, মা ঠাকরুণ আসুন; অনেক দিন পায়ের ধূলা প'ড়ে নাই। আমার খোকার কপাল প্রসন্ন,—সে সবে আ'জ আট দিন জন্মেছে, এর মধ্যে কুলপুরোহিত-ঠাকুরাণীকে ভক্তি-ডোরে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।"

ননির মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হীরালালের মাতার জ্ঞান হইল, সে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের পূর্ব্বের ঝঞ্ঝাবায়ু। বড় ভাল জ্ঞান হইল না—কে জানে তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভয়ের বিপুল উত্তেজনা জাগিয়া বসিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখখানা অত ভারি কেন মা? সব ভাল ত?"

ননির মাতা কর্কশ কণ্ঠে—উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"যে দৈত্য তুমি গর্ভে ধ'রেছ মা, তার আর ভাল থাক্‌বো কি!"

তাড়াতাড়ি আর্দ্র বস্ত্রখানি রকের উপর ফেলিয়া দিয়া, একখানি কম্বলের ছোট আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া, হীরালালের মাতা বলিল,—"বসুন মা, সব শুন্‌ছি, আপনি কার কথা বোলছেন,—হীরুর কি?"

ননির মা। বসিব না—হয় তোমরা এর প্রতিকার কোরবে, আর নয় আমি তোমার বাড়ী আত্মহত্যা কোরবো—তবে ছাড়বো। ওমা, আমি বিদ্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বেটার বৌ—আমাকে কি না—

হীরালালের মাতা ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণীর চরণ দুইটী চাপিয়া ধরিল। হীরালালের মাতা—সদ্যঃস্নাতা—কেবল আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে—তখনও আর্দ্র কেশরাশি পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল—সেগুলি ঘুরিয়া আসিয়া ননির-মাতার চরণ স্পর্শ করিল। বলিল—"মা, মা;—হীরু অবোধ—আপনি তাহাকে শাপ দিবেন না। একটু ধানের অঙ্কুর বেরিয়েছে। আট দিনের শিশু—ব্রাহ্মণের—বিশেষতঃ কুলপুরোহিত-ঠাকুরাণীর শাপে সে গলিয়া যাবে। আপনি রক্ষা করুন।"

ন-মা। এমন লক্ষ্মী বউর পেটেও কি অমন দৈত্য জন্মে। সে যা' ব'লেছে—যা' ক'রেছে—আর যা' করবে ব'লেছে—তার প্রতীকার না করলে আমি গোবরের শিব পূজা করবো—মা কালীর কাছে ধন্না দেব—মাথা খুঁড়ে রক্ত বার কোরবো।

হী-মা। একটু অপেক্ষা করুন—আমি কর্ত্তাকে ডাকাই, তিনি এলে আপনি সব বলুন—নিশ্চয় প্রতিকার কোরবেন। আপনারা কুলপুরোহিত—আপনাদের সঙ্গে কি কোন রকম অন্যায় আচরণ শোভা পায়।

দাসীকে বলিল, "শীঘ্র কর্ত্তাকে ডেকে আন্।" দাসী তখনই চলিয়া গেল।

হীরুর মা ননির মাতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসনে উপবেশন করাইল। ঝটিকা উঠিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে,—ননির মাতা তেমনই গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। হীরুর মাতা কি একটা কায সমাপ্ত করিয়া আসিবার জন্য গৃহান্তরে গমন করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।



পিতার গুণগ্রাহীতা।

হীরালালের পিতা সীতানাথ বসু গ্রাম্য তহশীলদার। তাঁহারই বাড়ীর অদূরে—গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে 'হাটখোলার' মধ্যে জমীদারের কাছারীবাড়ী। কাছারীতে তিন খানি ছোট বড় খড়ের ঘর—একখানিতে তহশীলদার মুহুরী ও পাইক পেয়াদা লইয়া প্রজাগণের নিকটে খাজনা আদায় করেন,—সুতরাং সেই গৃহটীই 'খাস কাছারী'। দ্বিতীয়খানি অপেক্ষাকৃত একটু উত্তমরূপে নির্ম্মিত—দরোজা জানেলাদ্বারা সুরক্ষিত। তাহাকে 'মালঘর' বলা হয়। ঘরের মধ্যে একটা লৌহসিন্ধুক ও দুইটা কাঠের আলমায়রা আছে। এই গৃহে আদায়ী টাকা ও কাগজ পত্র থাকে। এবং জমীদার মহাশয়েরা বা তাঁহাদের সদর কর্ম্মচারিগণ যখন কাছারী পরিদর্শনে আসেন, তখন সেই গৃহে অবস্থান করেন। তৃতীয় গৃহখানি ক্ষুদ্র এবং বাঁশের বেড়া ও দরমার দুয়ারে সজ্জিত তাহা রন্ধন-গৃহ। বিদেশী তহশীলদার থাকিলে বা জমীদার কিম্বা সদর-কর্ম্মচারী আসিলে তথায় রন্ধনাদি কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সীতানাথ প্রত্যুষে উঠিয়া কাছারীতে গমন করিতেন। হীরালাল বেলা আটটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন, তারপরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা, চা' পান ও প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া কাছারীতে গমন পূর্ব্বক পিতার কার্য্যে সহযোগিতা করিতেন।

ননির মাতা বাহিরে কম্বলাসনে গম্ভীর-ম্লান অথচ ক্রোধ-কালিমা মাখা মুখে বসিয়াছিলেন; পার্শ্বের গৃহ হইতে হীরালালের মাতা তাহা দেখিতেছিল, এবং এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, ঠাকুরাণীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, হীরু তাঁহাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে! কেন এই প্রভাতকালে অভিশাপের আগুণে তাহার অনিষ্ট করিতে আগমন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণের মেয়ে—বিশেষতঃ কুলপুরোহিতের স্ত্রী—তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে পড়িলে কি হীরুর বা তাহার ঐ নবজাত শিশুটীর মঙ্গল হইতে পারে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না—বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বিবর মধ্যে সাপিনীর গর্জ্জন শুনিয়া রিক্ত-হস্তা কুলমহিলা যেমন দূর হইতে চাহিয়া দেখে—নিকটে আসিতে সাহস করে না, হীরালালের মাতাও তেমনি দূরে থাকিয়া দর্শন করিতেছিল,

অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারিতেছিল না। ভয়—হীরু কি করিয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হীরুর অপরাধ বর্ণনা করিতে গিয়া পাছে অভিশাপ দিয়া ফেলেন! দোহন-করা দুগ্ধ গাভীস্তনে ফিরিয়া গেলেও যাইতে পারে—বৃন্ত-বিচ্যুত কুসুম বৃন্তে পুনর্যোজিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ের অভিশাপের আগুণ একবার জ্বলিয়া উঠিলে আর নিবিবে না। দশরথ ত 'কুলদগ্ধ হ'তে পারে ব্রহ্মাগ্নির' ভয়ে বিশ্বামিত্রের করে রামলক্ষ্মণকে দান করিয়াছিলেন। কাযেই স্বামী না আসা পর্য্যন্ত সে কার্য্যব্যপদেশে আসিতে পারিতেছে না, এই ভাণে গৃহের বাহির হইতেছিল না।

তবে সে অবস্থায় অধিকক্ষণ তাঁহাকে থাকিতে হইল না, দাসীর নিকটে সংবাদ পাইয়া সীতানাথ বাটী আসিলেন।

রকের উপর পুরোহিতঠাকুরাণী উপবিষ্টা দেখিয়া নিম্ন হইতেই প্রাণায়াম করিলেন। পুরোহিতঠাকুরাণী সবিশেষ কোনরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন না—গলা ঝাড়িলেন মাত্র। সীতানাথ উঠিয়া উপরে আসিলেন। স্বামী-সন্দর্শনে অনেকটা আশ্বস্তা হইয়া হীরালালের মাতা দ্রুতপদে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও দুই একটী স্ত্রীলোক সেখানে আসিল। পার্শ্বের বাড়ীর দীনু দত্তের বিধবা বর্ষীয়সী ভগিনী সারদা, একটী শিশু ভ্রাতষ্পুত্র ক্রোড়ে করিয়া কি কার্য্যব্যপদেশে সে বাড়ীতে আসিয়াছিল, সেও অদূরে দাঁড়াইল।

সীতানাথ একটু হাসিয়া নম্রস্বরে বলিলেন,—"সকালে বৌ ঠাকুরুণের চরণ ধূলিতে অধমের বাড়ী পবিত্র হইয়াছে—আজ সুপ্রভাত।"

উত্তেজিত অথচ অভিমানের সুরে ননির মাতা বলিলেন—"সে দিন কি আর আছে সীতানাথ? এখন তোমরা বড় লোক। তুমি গাঁয়ের তহশীলদার—তোমার ছেলে যা' ব'লে এসেছে—তা' তুমি শুনেছ কি না—জানি না। জানাতে এসেছি—হয় প্রতিকার কোরবে, নয় আমি দেবতার কাছে ধন্না দেব—সমাজের সকলের কাছে বলে দেখ্‌বো—তোমার পুরুত বন্ধ ক'র্‌ব।"

গৃহিণী ভীত চকিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। আরও কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে সীতানাথ বলিলেন,—"হীরুর কথা ব'লছেন?"

ন-মা। হাঁ সেই পিশাচের কথাই বল্‌চি। তার পাপে তোমার বংশ ছারখার হবে।

গৃহিণী চমকিয়া উঠিলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বামা পিসি বলিলেন—"ওমা, সে কি গো! হীরুর মত ছেলে দশ খানা গ্রামে মিলা ভার!"

বামাপিসী সংপ্রতি কয়েক খণ্ড পূতিকাদণ্ডের প্রত্যাশায় সে বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিল।

সীতা। হীরু আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছে?

তখন অনলবর্ষী স্বরে খাজনা আদায়ের ভার গ্রহণ হইতে গত কল্যকার শ্যামা-সংবাদ ও নৈশ-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত সকল কথা বিস্তৃত ভাবে এবং সঠিকরূপে ননির মাতা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া বামাপিসী দ্বিগুণ পূতিকাদণ্ড প্রাপ্তির আশায় আশান্বিত হইয়া সে কথার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। সারদা কোলের নগ্ন শিশুটী মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিল—"এও কি সম্ভব!"

সীতানাথও বলিলেন,—"অসম্ভব! হীরু আমার সে প্রকৃতির লোকই নয়। তাহার অনেক গুণ বৌঠাকরুণ;—দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার—আমাদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কোথায় কোন্ দেশে দুর্ভিক্ষ, সেখানে চাঁদা পাঠায়, কোথায় জলে ডুবিয়া মানুষ মরিতেছে, সেখানে চাঁদা পাঠায়, সভা-সমিতিতে টাকা পাঠায়। কত ভাল ভাল কেতাব পড়ে। হীরু আমার"—

ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ননির মাতা বলিলেন,—"তবে কি আমি আমার কুৎসার কথা তোমার নিকটে মিথ্যা করিয়া বলিতে আসিলাম?"

সারদা ব্রীড়াবনত বদনে বলিল—"তা কি সম্ভব! একটা কিছু ঘটনা এর মধ্যে আছেই।"

সীতা। ভাল, আমি হীরুকে ডাকাইতেছি।

পার্শ্বে সীতানাথের মধ্যমা কন্যা তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল—"দাদাকে ডাক্‌ব?"

সীতানাথ বলিলেন—"ডাক্‌ত।"

তরঙ্গিণী দৌড়িয়া গেল। পার্শ্বের ঘরে বসিয়া হীরালালের স্ত্রী সমস্ত শ্রবণ করিল; পাছে স্বামীর এই মহাপাতকের অভিশম্পাত আসিয়া তাহার নব প্রসূত খোকার মস্তকে পতিত হয়, এই জন্য সে খোকাকে টানিয়া কোলে তুলিল এবং মাতৃ-অঞ্চলের অক্ষয় কবচের মধ্যে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ভক্তির কথা



বেদ পাঠে বা গ্রন্থার্থ ধারণা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মহাত্মা রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন "শাস্ত্র পড়ে ধর্ম্ম শেখা, ম্যাপে যেন কাশী দেখা" তাঁহাকে পাইবার জন্য যে বড়ই কাতর হয়, তিনি তাহাকে বরণ করেন। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, কেন না তিনি ভক্তবৎসল। তুমি নীচ হও বা উচ্চ হও, শূদ্র হও বা ব্রাহ্মণ হও, তাঁহার ভেদ-দৃষ্টি নাই। তাঁকে ডাকলেই তিনি আসেন। তাঁর ছোট বড় বিচার নাই। "অতেব ব্রাহ্মণ কিম্বা চণ্ডাল দুরাচার, কৃষ্ণের সরকারে নাই জাতির বিচার" ভগবান ভক্তময়, ভক্তই তাঁর সর্ব্বস্ব। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" ॥ হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রিয়তমা লক্ষ্মী এবং মদীয় নিজ আত্মাও সেরূপ প্রিয় নহে। তিনিই সত্য নিত্য, দেহাদি অনিত্য, এই স্থির বিশ্বাস রাখিয়া, যে তাঁহার কৃপাপাত্র হইতে চায়, কৃপাপাত্র হইবার জন্য তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করে, স্বতঃই তাহার জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। কৃপাপাত্র হইবার জন্য আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তিযোগ।

ভক্তিযোগে জ্ঞান সমুদ্ভূত হইলে সাধক প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন,—তিনি প্রভু আমি দাস। যখন এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া কেহ তাহাতে চিত্ত ধারণা করে তাঁহার উপাসনা করে, তখনই ভক্তির কার্য্য করা হয়। চিত্ত! বিচার করিয়া দেখ, নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে পূর্ব্বে সাধারণ জ্ঞানরূপ দৃঢ় বিশ্বাস চাই। পরে বিশ্বাস হইতে স্বরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইয়া জ্ঞানের পরিপাক হইলেই তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ নিশ্চয় হইয়া যায়। তখন ক্রমে বৈরাগ্য, বিবেক, শ্রদ্ধা, স্মরণ, মনন, ধ্যান, লালসা ইত্যাদি শক্তির বিকাশ হয়, ইহাই প্রবুদ্ধ হওয়া। তবেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। চিত্ত! কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি উদয় হন। মাহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন, কেমন কালী থাক্‌তে পারে"।

কিন্তু দেখো চিত্ত! কোন মতলব করিয়া হরিনাম করিও না। অর্থাৎ অন্য কিছু করিতেছ, কিন্তু হরিনাম করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতেছ; এরূপ করিও না।

এ জগতে অনেক প্রকার সাধক আছেন। এক প্রকার লোক আছে, যাহারা এই প্রকৃতির অধীন যে তাহারা আপনাদিগকে ভাল করিবার জন্য পশু পক্ষীর মত কোন চেষ্টা করেন না, ইহারা বড়ই অধম।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক, চুরি হইয়া গেলে যাহাতে আর চুরি না হয়, তজ্জন্য সাবধান হয়, ইহারা সাধক মনের প্রত্যাহার করে ঠেকে শিক্ষা লাভ করে। ইহারা নীতি-জগৎ পর্য্যন্ত উঠিতে চেষ্টা করে। আর এক প্রকার ব্যক্তি আছে,—যাহারা অন্য লোকের চুরি হইয়াছে শুনিলেই সব বুঝিতে পারে এবং পূর্ব্ব হইতেই সদা সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে, সর্ব্বদা চিত্তকে পূজা, ধ্যান, জপ, সমাধি অভ্যাসে এত নিযুক্ত রাখিয়া দেয় যে, তাহাদের চিত্ত আর প্রকৃতির হাতে পড়িয়া রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হয় না। তাহারা সর্ব্বক্ষণেই তাঁহার সেবা, তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা, তাঁহার সাজ-সজ্জা, তাঁহার স্থান তাঁহার জন্য আয়োজন এই সব লইয়া মনকে পূর্ণ আনন্দে এবং উৎসাহে পূর্ণ করিয়া রাখে, চিত্তের অন্য দিকে যাইবার বিষয় ভোগ করিবার যো থাকে না, ইহারাই ধার্ম্মিক।

চিত্ত! যাহাতে ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পার, যাহাতে রাগদ্বেষ আর তোমায় উৎপীড়ন না করিতে পারে সেই অভ্যাস কর। "বলত বলত বলি যাই, হরতে লাগারহ ভাই" ঠিক হইয়া যাইবে; সর্ব্বদা লাগিয়া থাক। সর্ব্বদা ডাক। তুমি নীচ হও বা দুরাচার হও, ক্ষতি নাই অভ্যাস আয়ত্ত কর।

"করত করত অভ্যাস জড়মতি হ্যায় সুজান, রসতি আরৎ যাৎসে শিলপর পড়ত নিশান" স্মরণ ভিন্ন তোমার কোন কর্ম্ম নাই—স্মরণ কর কিন্তু মনে ভুলে মুখে ডে'ক না। তুমি নিয়ম রক্ষার জন্য সকাল সন্ধ্যে উপাসনা করিতে বস, খুব জাক জমকে পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে শিব পূজা করিতে করিতে বল, ভাই মেয়েটা অনেক দিন গিয়াছে, তার খবর পাই নাই, নমঃ শিবায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিতে জপিতে ভাব, তাই ত তাড়াতাড়ি চলিয়া এলাম, বৌমাকে দুটী ডাল ভিজাইতে বলিলাম না, গিয়া কি ছাই রাঁধিব? চিত্ত! একে স্মরণ বলে না।

যোগিবর কবির বলিয়াছেন—

"মালতো কর্‌মে ফিরে, জিহ্বা ফিরে মুখ্‌ মাহি,
মহুয়া তো চৌদিশ্‌ ফিরে, ইয়োতো সমীরন নাহি।"

কেমন করিয়া স্মরণ করিতে হইবে, তিনি বলিয়াছেন—

আঁখ্‌ড়িয়া ঝাঁইপড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিওড়ি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি॥
নয়ন্‌গুণে ঝাড়ি লইয়া, রংহট্‌ বহে নিশি যাম,
পাপিয়া যেঁও পিয়া পিয়া করে, কব্‌রে মিলেঙ্গো রাম।

এমনি করিয়া ডাক নিশ্চয়ই সে আসিবে। সে তোমায় কতই ভালবাসে। সে তোমায় একক্ষণও ছাড়িয়া থাকে না, কিন্তু তুমি তারে চাও না, তুমি তারে ভুলিয়া কত যত্নে খুটি নাটি কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাক। তাই সে অভিমান করিয়া তোমায় দেখা দেয় না, হায় মূর্খ চিত্ত! তুমি এ জগতের দুটো মিষ্ট রুষ্ট কথা শুনিয়া ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইও না। তার মতন আদর করিতে কেহ জানে না, তার মতন ভাল বাসিতে কেহ তোমায় পারে না। তুমি ঘুমাও, সে সারারাত নীরবে বসিয়া বসিয়া তোমায় বীজন করে, তবুও তোমার মোহ ভাঙ্গে না। সে কত ব্যথা পায়, তুমি ত বুঝ না। সে কিছুই চাহে না, ধন, রত্ন, রূপ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি কিছুই চাহে না। চায় সে সমগ্র প্রাণ—শুধু প্রাণের ভিখারী। ঐ শুন সে কত আদর করিয়া তোমায় বলিতেছে, তুমি অন্য কিছু ভাবিও না, তোমার সুখ, দুঃখ, ভয়, ভাবনা যাহা কিছু আছে, আমায় দাও, আমায় দিয়া তুমি—নিশ্চিন্ত হও। তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি ভারবাহী ভারীর ন্যায় বহন করিয়া আনিয়া দিব। তোমায় কিছুই বলিতে হইবে না। তুমি শুধু অনন্য চিত্তে আমায় স্মরণ কর।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥

বল চিত্ত! এত ভালবাসা তুমি কোথায় পাইয়াছ? চিত্ত! কাতর হইয়া তাহাকে ডাকিলেই সে উদয় হয়। কিন্তু কাতরতা অজ্ঞানীর হয় না এবং মুক্তেরও হয় না। অজ্ঞানীর মত প্রাণকে কাতরতা অবজ্ঞা করিতে শিখাইও না। অজ্ঞানী হইয়াও যে বলে, আমার ভয় নাই। যে মিথ্যা কথা কয় সে মূঢ়। চিত্ত! তুমি মূঢ় হইও না। নিজের অবস্থা দেখ কাতরতা আপনিই আসিবে, নিজের বিপদ বুঝিতে চেষ্টা কর। নিজের বিপদ বুঝিলেই

তখন আপনা হইতেই বলিতে হইবে, "ন গতি বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং প্রভো।"

তখন বলিবে "ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ। কুমার্গঃ করজ্জু প্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।"

মৃত্যু সংসার-সাগর নাই বলিলেই সব হইল না। সকলে মরে আমিও মরিব, সকলে দুঃখ পায়, আমিও পাই, যখন সময় হইবে তখন ভাল হইবে। এ সব মূর্খের কথা—এ সব লোক বড়ই মূঢ়। তার কৃপায় কি না হয়? নিজের পুরুষার্থ লইয়া মৃত্যু-সংসার পার হইতে চেষ্টা কর, পূর্ণমাত্রায় পুরুষার্থ প্রয়োগ কর, যখন দেখিবে তাহাতেও হয় না; তখন তুমি কাতর হইবে, তোমার অভিমান চূর্ণ হইবে, তখনকার কথা—

"সাধব হাস পরিণাম নিরাশা
তুঁহ জগতারণ দীন দয়াময়
অতত্র তোঁহারি বিষোয়াসা"

তখন তুমি তাঁর কৃপাপাত্র। তিনিই পুরুষার্থ রূপে তোমার মধ্যে উদয় হইবেন, বিশ্বাস রাখ আত্মাই সুখ আত্মাই জ্ঞান। স্থায়ী আর কিছুই নাই, জ্ঞানের বিষয়ও আর কিছুই নাই। দেহ আত্মা নহে, আত্মা সচ্চিদানন্দ গুরু-মুখে শ্রবণ কর। শুনিতে শুনিতে ঐ কথাই শাস্ত্রে দেখিতে দেখিতে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। একেবারে চিত্ত তাহাতে না রাখিতে পার, তাহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর। নিষ্কাম কর্ম্ম—অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেখিবে, যখন বেশ করিয়া উহা অভ্যাস করিতে পারিবে, তখন বিষয় আসিলেও কোন কর্ম্ম হইবে না। মনে মনেও ভগবানের জন্য কর্ম্ম হইবে। ইহাই অভ্যাসের ধর্ম্ম। সকল সময়ে সকল কর্ম্মে ভগবানের পূজা করিতেছি, ইহা দৃঢ়াভ্যস্ত হইলে চিত্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য হইবে। বিষয় সম্পর্ক থাকিলেই না রাগদ্বেষ! যদি দেখ মন, বিষয় অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না! তখন শমদমাদি অভ্যাস করিবে, তবেই সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যাস হইবে। আমি দাস তুমি প্রভু, এই ভাব পরিপুষ্ট হইলে ক্রমে অপরোক্ষ জ্ঞানে আসিতে পারিবে। তাঁর কর্ম্ম করিতে যখন বড়ই আনন্দ বোধ হয়, তখন অন্য কর্ম্ম হয় না। মনে হয় তুমি আমার দেহকে উৎসাহে পূর্ণ করিয়া চালাইয়া লইতেছ। তুমিই করিতেছ, আমি কিছুই নই; তখন আমি ভুলিয়া তোমা-কেই আমি করিয়া ফেলিবে। তোমা ভিন্ন আমার পৃথক্ সত্তা নাই, এই

ভাব দাঁড়াইবে। যে তুমি বিনা প্রয়োজনে কার্য্য কর, সেই তুমি লোক-শিক্ষার্থ আমাকে তুমি করিয়া কার্য্য করাইয়া লইতেছ, তখন আমি তুমি ভেদ থাকে না। যে তুমি নিত্য সত্য আনন্দস্বরূপ বিরাজ করিতেছ, তুমিই তখন থাকিবে, আমি তুমি হইয়া যাইবে, তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান—ইহাই অবিদ্যা নিবৃত্তি, ইহাই পরমানন্দ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ।

জনৈকা বঙ্গমহিলা।

সমুদ্র-দর্শনে।

কি ভীষণ কোলাহল শোনা যায় দূরে,
পার্থ কি করিয়া জয়
অমর অসুর-চয়
লভিয়া বিজয় নাম আসিয়াছে ফিরে?
অথবা সুভদ্রা-সুতে,
ঘিরিয়া কি সপ্তরথে
করিছে ভৈরব নাদে ভীষণ সংগ্রাম?
তার কি এ কোলাহল হয় অবিরাম?
(এ, যে) শুধু হেরি নীল জল কোলাহলময়,
গরজি গরজি রোষে
আকাশে রয়েছে মিশে
ছুটে আসে শ্বেত শুভ্র ফেন শিশুচয়,
একিগো কল্লোলময় সাগর দুর্জ্জয়?
অবিশ্রান্ত কোলাহল উদ্দাম উচ্ছ্বাস
(এ, যে) সীমাশূন্য রেখাশূন্য সিন্ধুজলোচ্ছ্বাস।

শ্রীমতী রেণুকণা দত্ত।

শিক্ষক ও শিক্ষা।

মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখনই সে সর্ব্ববিদ্যায় পারগ হইয়া উঠে না। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই থাকিবে। তবে তাহা মায়ার আবরণে আবৃত থাকে মাত্র।

মানুষ যতই বড় হইতে থাকে, যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই মায়ার আবরণ কাটিয়া যায়। তারপর যখন জ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন হিন্দুমতে মুক্তি এবং বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে।

মনুষ্যের উন্নতি অবনতি—স্বর্গ নরক—বন্ধ মুক্তি প্রভৃতি শিক্ষার উপর সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত।

জ্ঞান অতিবিশুদ্ধ অতিপবিত্র—'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহবিদ্যতে'। আমরা দেখিয়া শুনিয়া স্পর্শাদি করিয়া, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

জগতে আপনা হইতে কিছু হয় না, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব। জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানতা হইতে আসিতে পারে না। আমার ঐ কথাটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানী শিক্ষকের নিকট হইতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা জ্ঞান দিতে অসমর্থ।

আজকাল বাজারে সংবাদ পত্রের ছড়াছড়ি। অনেকেই নামের প্রত্যাশায় শিক্ষকতার ভাণ করিয়া লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখেন। লিখেন ত মাথামুণ্ড;—সকলেই ফেঁউ ফেঁউ করিতেছেন, তিনিও গোলে হরিবোল দেন। যত কৃত্রিমতা সমস্তই প্রবঞ্চনা অর্থাৎ যাহা কিছু কৃত্রিম তাহাই মিথ্যা—অসত্য এবং যাহা কিছু অকৃত্রিম, তাহাই সত্য।

যাহা হউক, আমাদের আলোচনার বিষয় শিক্ষক-নির্ব্বাচন। আমরা দেখাইয়াছি যে, মানুষের ভবিষ্যৎ তাহার শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

এ ক্ষেত্রে সুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা যে কতদূর, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এ শিক্ষক মানে কেবল বিদ্যালয়ের পড়াধরা শিক্ষক নয়। এ শিক্ষকের প্রয়োজন সকলের, আমি তোমার নিকট শিখিব; কি শিখিব? না যাহা তোমার গুণ বা দোষ।

এইখানেই একটী কথা। মনে করিয়া রাখা দরকার! মানুষ ইচ্ছা করিয়া দোষ করে না বা অন্ততঃ সে দোষ করিতে ইচ্ছা করে না। যাহারা পাপ

...তাহারা কার্য্য গুলিকে করিয়া ফেলে মাত্র। ইহার ব্যতিক্রমও যে হয় না, এমন নহে। শিক্ষককে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণই শিক্ষা।

শিক্ষককে অনুকরণ করিলে তাঁহার গুণসমূহ যেমন আমাতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দোষসমূহও আমাতে অলক্ষিত ভাবে আসিয়া পড়ে। আমরা ইহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি না অথবা বুঝিয়াও বুঝি না, কিম্বা বুঝিয়াও এড়াইতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করিয়া তাহাদিগকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়।

সংসারে অন্তঃসার-বিহীন বাচাল পণ্ডিতের অভাব নাই। রামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন "গুরু মিলে লাখ শিষ্য নাহি মিলে এক।"

কথাটা ঠিক। সকলেই বলে পাপ করিও না। কিন্তু পালন করে কচিৎ দুই এক জন।

এরূপ শিক্ষকের প্রয়োজন, যিনি নিজে নিজ উপদেশ সমূহ পালন করেন।

শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাধনা।

বহুকাল একাসনে একস্থানে বসি
কঠোর তপস্যারত আছে যোগিবর ;
একমনে একভাবে সারা দিবা-নিশি
মধুময় রাম নাম জপে নিরন্তর।
কত জল, কত ঝড় প্রলয়-হুঙ্কারে
মথিত করিয়া গেছে শীর্ণ দেহখানি,
তবু কভু কোন এক মুহূর্ত্তের তরে
কঠোর সাধনা ছাড়ি ওঠে নাই মুনি।
কত দীর্ঘ বর্ষ গেছে, তবু একাসনে
সমভাবে বসি যোগী জপিতেছে নাম ;
বাহ্য-জগতের শব্দ নাহি পশে কাণে,
নাহি মনে মুক্তি ভিন্ন অন্য কোন কাম
বল্মিক করেছে গ্রাস সারা অঙ্গখানি,
তবু মুখে উচ্চারিত রাম রাম ধ্বনি।

শ্রী[illegible] সিংহ।





সীতা লক্ষ্মণ

সীতার বনবাস।

ENGRAVED & PRINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS.
115, Amherst St., Calcutta.

নূরজাহান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

গিয়াস্-পত্নী বলিলেন, তা আর কি করা যাইবে। ইহাই যে আমাদের দেশের রীতি! স্বয়ম্বর-প্রথার অনুসরণকারী হিন্দুরাও অবশেষে এই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, সম্রাজ্ঞী বোধ হয় তাহা জানেন।

যোধবাঈ। আমার বোধ হয়, স্বয়ম্বরপ্রথাই খুব ভাল ছিল; কারণ কন্যাগণ আপন আপন পছন্দ মত বরের গলে মাল্য দান করিয়া চির-জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিত।

গিয়াস্-পত্নী। আমিও আমার স্বামীকে ঠিক্ এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, যুবতী বালিকা কখনও কোনও পাত্রের দোষ-গুণ বিচার করিতে পারে না। সে কেবল আপনার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ-মত স্বামী পছন্দ করে।

যোধবাঈ। তাঁহার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা তাহার অন্তঃকরণই অধিকতর বিচারক্ষম। পুরুষে কেমন করিয়া স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ বুঝিবে?

গিয়াস্-পত্নী। কিন্তু কি করা যায়, পুরাতন প্রথা, কাযেই কোনরূপে ইহা ত্যাগ করা যায় না।

যোধবাঈ। আমার বিবাহ-সময়ে কিন্তু এই পুরাতন-প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন হয়। ভালবাসা সমস্ত প্রথাকে পরাজিত করিয়া থাকে।

এমন সময়ে আকবরের ইউরোপীয়ান্ পত্নী মেরী বলিলেন, আহা! যদি আমাদের দেশের মত তোমাদের দেশের মেয়েরা আপন আপন স্বামী পছন্দ করিতে পারিত এবং স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশতলে বেড়াইয়া বেড়াইতে পারিত, তবে কেমন সুন্দর হইত!

যোধবাঈ। আহা! মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করা কেমন মনোরম! আমরা ত এ সংসারে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী!

গিয়াস-পত্নী। আমার স্বামী বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পর-পুরুষের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা বা কথাবার্ত্তা বলা কর্ত্তব্য নহে।

এইভাবে যোধবাঈ, মেরী ও গিয়াস-পত্নীতে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথার দোষ-গুণাদি কীর্ত্তন-মূলক অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এদিকে সেলিম-গত-প্রাণা মেহের অন্যের সহিত আপন পরিণয়ের আভাস শুনিয়া ছিন্ন-মূল ব্রততির ন্যায় প্রায় ভূম্যবলুণ্ঠিতা হইতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে আনন খানি শারদ কৌমুদীর ন্যায় হাস্যময়ী ছিল, অকস্মাৎ তাহা ম্লান হইল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে সাশ্রু নয়নে অতি কষ্টে দণ্ডায়মানের পর মেহের প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে, সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব সেলিম অবস্থান করিতেছিলেন।

মেহেরকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্টা দেখিয়া সেলিম নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। মেহের তদ্দর্শনে বিস্মিতা, চমৎকৃতা এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। অনেকক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু কাঁহারও মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না।

অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে সেলিম বলিলেন, সুন্দরি আমার প্রার্থনা—করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর।

মেহের। যুবরাজ কি আজ অন্যত্র বিশ্রামের স্থান পান নাই?

সেলিম। সত্য বলিয়াছ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি কোথাও বিশ্রামের স্থান পাই না। আমার পা দু'খানি কেবল তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহে—নয়ন কেবল তোমার ঐ চন্দ্রসদৃশ মুখখানি দেখিতে চাহে—কর্ণ কেবল তোমারই অমৃত নিস্যন্দিনী বাক্যাবলি শুনিতে চাহে, আর—আর কি বলিব সুন্দরি, আমার হৃদয় কেবল তোমাতেই ডুবিয়া থাকিতে চাহে!

মেহের একটু ক্রোধান্বিত ভাবে বলিলেন, আপনি কেন আমায় সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন? আমাকে এখন একটু নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে দিন।

সেলিম। সুন্দরি! তুমি আমার কষ্ট জানিয়া শুনিয়াও কেন আমাকে প্রতিনিয়ত জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিতেছ। সম্ভবতঃ তুমি মানুষের মনের বেদনা অনুভব করিতে পার না।

মেহের। যুবরাজ! আপনি বলিতেছেন—আমি বেদনা অনুভব করিতে জানি না! কিন্তু আপনার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—হৃদয় আমার অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। যুবরাজ! যুবরাজ! আপনার পায়ে ধরি, আপনি এ হতভাগিনীকে বিস্মৃতির

অতল-তলে বিসর্জ্জন দিয়া শান্তি-সুখ উপভোগ করুন। কেন আমাকে চাটু-বাক্যে প্রতারিত করিতেছেন?

সেলিম। সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয়ে যে আঘাত করিয়াছ, এখন তাহা হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত-ধারা নির্গত হইতেছে। তত্রাপি তুমি বলিতেছ, আমি তোমাকে চাটুবাক্যে প্রতারিত করিতেছি!

মেহের। আপনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কেন এরূপ করিতেছেন? সম্রাজ্ঞী ও আমার মাতা—এতদুভয়ে যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন; অতএব আমাকে এখন নির্জ্জনে বসিয়া বিশ্রাম করিতে দিন।

সেলিম। সুন্দরি! তোমার মাতা ও সম্রাজ্ঞীতে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, আমি তাহা সমস্তই শুনিয়াছি; শুনিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনাও পাইয়াছি। কিন্তু সুন্দরি! একবার তুমি প্রাণ খুলিয়া বল আমাকে ভালবাস, আমি তখন সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিব।

মেহের। সে কথা ত আপনাকে আমি প্রথম সাক্ষাতের দিনেই বলিয়াছি। স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় চঞ্চলমতি নহে! স্ত্রীলোক যাহাঁকে ভালবাসে, তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে চির-জীবনের জন্য ভালবাসে। কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষে তাহা করে না। পুরুষ, স্ত্রীলোককে আপন ইন্দ্রিয়লালসার সামগ্রী মনে করে এবং লালসা চরিতার্থ হইলে তাহাকে তৃণ-খড়ের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে।

সেলিম সহর্ষে মেহেরের গণ্ডে একটী মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন;—আমি তোমার পিতার নিকট এই সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে প্রস্তাব উত্থাপন করিব। যদি তিনি ইহাতে সম্মত না হন, তবে আমি আমার পিতাকে অনুরোধ করিব।

মেহের। আমিও আমার মাতা-পিতার নিকট এ সম্বন্ধে বলিব। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা কখনই আমাকে চিরদুঃখ-সাগরে ভাসাইবেন না।

সেলিম। আমার বিশ্বাস,—তোমার পিতা কখনই অন্যের সহিত তোমার বিবাহ দিয়া আমার অসন্তোষভাগী হইবেন না।

মেহের। কিন্তু তিনি যেন কেমন এক অদ্ভুত ধরণের লোক।

সেলিম। মেহের, তুমি জানিও আমার শিরায় একবিন্দু শোণিত থাকিতে আমি কখনও মেহের-শূন্য জীবন যাপন করিব না।

সেলিম কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, মেহের! আমার

হৃদয়সর্ব্বস্ব মেহের! এ জগতে আমি আর কিছুই চাই না। তোমার একটু ভালবাসার বিনিময়ে আমি এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিতে পারি। তোমাকে লইয়া কুটীরবাসী হইলেও সেই আমার স্বর্গ।

মেহের। যুবরাজ! না জানি ভগবান আমার ভাগ্যে কি লিখিয়াছেন! আপনি ত শীঘ্রই সম্রাট্ হইবেন এবং নিশ্চয়ই তখন এ হতভাগিনীকে ভুলিয়া যাইবেন।

সেলিম। তোমাকে ভুলিব! মেহের, তুমি একথা আর মুখে আনিও না! অধিক আর কি বলিব মেহের, আমার যদি বক্ষ চিরিয়া দেখাইবার শক্তি থাকিত, তবে দেখাইতাম—এ হৃদয়ে তোমারই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। যদি সেই অসভ্য পারশী আমার এই সুখের পথের পরিপন্থী হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার শির ধূলায় গড়াগড়ি যাইবে।

মেহের উত্তর দিতে উদ্যতা হইয়াছেন---এমন সময় অকস্মাৎ প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মোচিত হইল। উভয়ে দেখিলেন, সক্রোধে মেহের-জননী দ্বারে দণ্ডায়মানা।

কিছুক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবার পর তিনি বলিলেন, যুবরাজ! তোমার আচরণ দর্শনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট্, তুমিই কি না আজ কোথায় অকৃত্রিম নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্তে প্রজাবর্গকে চরিত্রবান্ করিবে, তাহা না করিয়া দিনে দুপুরে আমার সরলা কন্যার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতেছ!

যুবরাজ সলজ্জভাবে বলিলেন, আগে অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়েকটী শ্রবণ করুন।

গিয়াস-পত্নী। লোকে বলে,—চক্ষু অপেক্ষা আর প্রত্যক্ষ সাক্ষী নাই। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার জন্য আর কি শুনিব যুবরাজ! এস মেহের এস!

সেলিম। মেহের নিজেই আপনাকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বলিবে। তখন বুঝিতে পারিবেন, আমি তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই।

মেহের বলিল—"মা"!

"চুপ কর হতভাগি!" এই বলিয়া সজোরে মেহেরের হাত ধরিয়া সম্রাজ্ঞীর কক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে গিয়াস্-পত্নী বলিলেন, দেখিতেছি সংসারটা দুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ।

সাগ্রহে যোধবাঈ বলিলেন, কেন কি হইয়াছে?

গিয়াস-পত্নী। আমার কন্যা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় যুবরাজ সেলিম সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনেক প্রকার ভালবাসার কথা বলিতেছিলেন। আমি দরজা খুলিয়া দেখিলাম তাহারা উভয়ে উভয়ের সম্মুখে বসিয়া কত প্রকার ভালবাসাপূর্ণ কথাবার্ত্তা বলিতেছে। ধর্ম্মের কুসুম একবার মুকুলে চয়িত হইলে তাহা আর প্রস্ফুটিত হয় কি? কিন্তু আমি যুবরাজকে সরলা বালিকার ধর্ম্ম-বাঁধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আশা করি, আপনি এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান ও ইহার প্রতীকারের একটা উপায়াবলম্বন করিবেন।

যোধবাঈ। আমার পুত্র একটু মাথা পাগলা রকমের। যাহা হউক, আমি তাহাকে ভৎর্সনা করিব। কিন্তু এ ঘটনার বিষয় আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। সৌভাগ্য যে তুমি দেখিয়াছিলে!

গিয়াস-পত্নী সম্রাজ্ঞীকে নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় মেহের-উন্-নিসা সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন,—

মহারাজ্ঞি! আমার প্রার্থনাটী একবার কৃপা করিয়া শুনুন। আমি বিশেষরূপে জানি, আপনি আমার মাতা-পিতার ন্যায় কঠোরান্তঃকরণ-বিশিষ্টা নহেন। আপনার পুত্র আমাকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসেন এবং—এবং এই বলিয়া লজ্জায় নতমুখী হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে মেহের বলিলেন, আমিও তাঁহাকে ভালবাসি। তাঁহার সহিত প্রথম দর্শন দিনেই আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তিনি আমাকে অনুচিত কিছুই বলেন নাই। তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমিও তাঁহাকে ভালবাসি, তাই তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আপনি দেশের মাতা—দেশের রাণী, আপনার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন—আমার মাতা-পিতা আমাকে অকুল পাথারে ডুবাইতে যাইতেছেন, আপনি তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মেহের উন্-নিসা বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আমাকে একজন অপরিচিত লোকের হস্তে অর্পণ করিতে চান। তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই বা ভালবাসি নাই। মহারাজ্ঞি! আর অধিক কি বলিব, আমি একটী হৃদয় ক'জনকে দিব?

কন্যার কথা শুনিয়া মেহের-জননী ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন।

যোধবাঈ মেহেরের কথা শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইলেন। তিনি তাহার মাতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি মেহেরের উপর অত রাগ করিও না। সে যেমন তোমার কন্যা, সেইরূপ আমারও কন্যা। সে আজ প্রাণের কথা—হৃদয়ের ব্যথা আমার কাছে খুলিয়া বলিয়াছে বলিয়া কি উহার উপর অত রাগ করিতে আছে? তুমি ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা জান না; যদি জানিতে, তাহা হইলে আর উহার প্রতি অত রাগান্বিত হইতে না।

গিয়াস-পত্নী। আমি বালিকা-বয়সেই বিবাহিতা হই। তদবধি আমি স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। স্বামী পূর্ব্ব হইতে পরিচিত হউক বা না হউক, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কে ভালবাসার পাত্র?

যোধবাঈ। এই কারণেই তুমি তোমার কন্যার কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে পারিতেছ না। মায়ের মত ধৈর্য্যাবলম্বিনী হও, সমস্ত বিচারের ভার আমাকে অর্পণ কর, দেখিবে তাহাতে তোমাদের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না।

এই কথা বলিয়া তিনি মেহেরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে সমস্ত বিষয় বলিয়া ভাল কাযই করিয়াছ। আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা দিব না।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মেহের সম্রাজ্ঞীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মাতৃ-সমভিব্যাহারে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

———

কথাদু'টী।

কথাদু'টী, প্রিয়সখে, কও ফুল্লমনে—
প্রাণে ব্যথা দিও না'ক আর ;
ছুটিয়াছি কত দিন আকুল পরাণে
কথাদু'টী শুনিতে তোমার ॥
নাহি চাহি বিশ্বপানে—করিয়াছি কত
মনে মনে তোমারি সাধনা ;
তুমি মোর চিন্তামণি হয়েছ নিয়ত
—পূরাবে না এ দীন-কামনা ?
মনে পড়ে, প্রাবৃটের বারিধর-তলে
খেলেছিনু কিবা ফুল্লপ্রাণে ?
শুনি তব ভাষা, বিশ্ব যাইতাম ভুলে
এবে, সখে, আছে সবি মনে ?
অনন্ত জলধি যথা নীলাম্বরচ্ছায়
ধ'রে রাখে সতত উরসে,
তেমনি তোমার ছবি স্মৃতি-তুলিকায়
চিরতরে এঁকেছি মানসে !
সেধেছি তোমায় এত—বিনিময় তরে
চাহি শুধু—বেশী কিছু নয় !
কথাদু'টী কও সখে—কও প্রাণভরে
কও—কও—দাও বিনিময় !
কথাদু'টী তব দীন-মুক্তাপ্রাপ্তি-সম
মধুচক্রমধু-বিজড়িত !
চন্দ্রামলকর-সম মোহে মন মম
বড় সাধ—শুনি অবিরত !
তাই কথাদু'টী সখে—কও ফুল্লমনে
—প্রাণে ব্যথা দিও না'ক আর ;
বিনিময় দাও সখে, সদয় পরাণে
আমিই যে তোমার—তোমার !

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

নিদয়া।



গল্প।

(১)

আধা বয়সে দুই শত টাকা পণ দিয়া সৃষ্টিধর যখন চঞ্চলাকে বিবাহ করিয়া আনে, তখন চঞ্চলার বয়স দশ বৎসর। সৃষ্টিরও সংসারে আর কেহ ছিল না। মনে করিয়াছিল – বালিকা পত্নীটীর হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তে শেষের দিন কয়টা একটু সুখে শান্তিতে কাটাইয়া যাইবে।

"কিন্তু হ্বাদে বিধি বিধি হ'ল বাম" প্রথমটা আসিয়াই চঞ্চলা এমন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতে লাগিল, যে সৃষ্টির বড় দুঃখ হইল। ভাবিল, কি অন্যায়ই করিয়াছি! তারপর অনেক কষ্টে খেলনা সন্দেশ নূতন কাপড় চোপড় ইত্যাদিতে যদিও কথঞ্চিৎ শান্ত হইল,—কিন্তু সৃষ্টির উপর বক্র হইয়াই রহিল। তাহাকে দুটো রাঁধিয়া বাড়িয়া দেওয়া ত দুরের কথা, নিজের পরণের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাচিত না—সৃষ্টিকেই মাঠ হইতে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া একই সঙ্গে রান্না বাড়া এবং স্ত্রীর পরিধানের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাচিয়া দিতে হইত।

লোকে হাসিত, ঠাট্টা করিত, বলিত—সৃষ্টি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে ভাল! সৃষ্টি নীরবেই সমস্ত শুনিয়া যাইত। নিজের এই কার্য্যের জন্য দুঃখিত হইয়াছে বলিয়াও বোধ হইত না, স্ত্রীর নাম হইলেই অবুঝ স্ত্রীর পরে একটা সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুকম্পায় তাহার সমস্ত মুখে একটা অপূর্ব্ব স্নেহের রেখা ফুটিয়া উঠিত, একান্ত কেহ চাপিয়া ধরিলে এবং স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব তুলিলে বলিত—এখনও অবুঝ আছে, একটু বড় হইলেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বাদশ, ক্রমে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল, তবু চঞ্চলার বোধ হইল না! স্বামীর স্কন্ধে সেই প্রথমে যেমন বিনা সঙ্কোচে আরোহণ করিয়াছিল, এখনও সেইরূপ স্কন্ধের বোঝা হইয়াই রহিল! বেচারাকে একটু নিষ্কৃতি দিয়া হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিল না! কিন্তু সৃষ্টির তাহাতে দুঃখ নাই; সে যে চঞ্চলাকে ভালবাসিতে পারিয়াছে, এই অনুভবে তাহার সমস্ত বক্ষ ভরিয়া রহিত!

একদিন আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বষ্টি ডাকিল—চঞ্চলা!

চঞ্চলা ঘরের মধ্যে তখন পাড়ায় নবীন বোসের পুত্র কুমারীশকে দিয়া তাহার মাসীর বাড়ীতে একখানা পত্র লিখাইতেছিল। তাহার মা বাপ কেহ ছিল না;—মাসীই তাহাকে মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। স্বামীর আহ্বানে মুখটী বেজার করিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—কি ব'লো? মাগো, একখানা পত্র লেখাবারও অবসর নাই!

স্বষ্টি কহিল, আমাকে এক ঘটী জল দিবি চঞ্চলা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

চঞ্চলা অঞ্চল দোলাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—আমার এত অবসর নেই, তুমি নিজেই গড়িয়ে নাও গে—

স্বষ্টি কহিল, আমাকে জল দেওয়ার চেয়ে কি তোর চিঠি লেখাই বেশী হ'লো? হাঁরে কথার স্বরে একটা ক্ষোভ জাগিয়া উঠিল।

চঞ্চলা কহিল, তুমি কি আমার একখানা চিঠি লিখে দেবে, লিখ্‌তে জানো?

কুমারীশ বয়সে কিশোর হইলেও নারীর এই কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চঞ্চলাকে কহিল, জলটী দিয়েই এসো না, খেটে খুটে এলো!

চঞ্চলা উঠিয়া জল দিয়া আসিয়া আবার কুমারীশের কাছে বসিয়া পত্র লেখাইতে লাগিল। কহিল, কি লিখিলে বলো দেখি?

কুমারীশ কহিল, যা বলেছো তাই লিখেছি।

চঞ্চলা কহিল, আর একটু লিখে দাও, আর আমাকে এই আষাঢ় মাসের মধ্যে নিয়ে যায় যেন। আর আমি থাকিতে পারিতেছি না।

স্বষ্টির কর্ণেও কথাটী প্রবেশ করিল, সে তখন তামাক সাজিতেছিল, কহিল—আমি তোকে মার্‌ছি না ধর্‌ছি?

স্বষ্টি ছেলেবেলা হইতে চঞ্চলাকে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া তুই তোকারিই করিত।

চঞ্চলা কহিল, আমি কি তাই লেখাচ্চি নাকি; আমি তোমার ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বো না, তাই মাসীমাকে জানাচ্চি।

স্বষ্টি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এখনও চঞ্চলা বালিকাই রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিল—তাহার এ ভুল ভাঙাইতে হইবে। জানাইতে হইবে,—আমি তার স্বামী, আর এই স্বামীর ঘরই নারীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল। তৎপরে সে নীরবে তামাক টানিতে লাগিল।

চঞ্চলা বাক্স খুলিয়া খামের দরুণ কয়টা পয়সা কুমারীশের হাতে দিয়া সৃষ্টিকে আদেশ করিল,—কুমারীশকে তাহাদের বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস।

সৃষ্টি তামাক টানিতে টানিতেই কুমারীশের সঙ্গে দাঁড়াইতে গেল।

পথে একবার সসঙ্কোচে সৃষ্টি কুমারীশকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ভাই, সত্যই চঞ্চলা—যা ব'ল্লে, তাই চিঠিতে লিখে দিলে নাকি?

কুমারীশ কহিল, না সৃষ্টি দা, তুমি কি আমাকে তাই পেলে! তোমার বউএর বোধশোধ নাই ব'লে কি আমাদেরও নাই। আমি মুখে বল্লাম বটে, যে, যা ব'ল্লে তাই লিখে দিলাম, কিন্তু আসলে তা নয়।

সৃষ্টি কহিল, বেশ বেশ ভাই। যা ব'লবে তাই ওমনি লিখে দিও না। ইস্কুলে প'ড়ছো—দুকথা বেশ বানিয়ে তোমারাও ত লিখ্‌তে পারো, তাই লিখে দেবে। আর তার ত খাওয়া মাথারও কষ্ট নাই।

কুমারীশ কহিল, তা কি আমরাও দেখ্‌তে পাচ্চি না, কষ্টে-সৃষ্টে যা রোজগার করো, সে ত তোমার বউই সব খেয়ে ফেলে, একটী কথাও তুমি বলো না।

সৃষ্টি কহিল, না ভাই আমিও কিছু বলি না, ভাবি,—ছেলে মানুষ, কেউ সঙ্গী সাথী নাই, খাওয়া মাথাতে যদি ভুলে থাকে; তাই কিছু বলি না।

কুমারীশ মনে মনে হাসিয়া কহিল, বেশ নির্ব্বোধের মত চঞ্চলা তোমাকে ঠকাইতেছে! আর তুমি ভালবাসিয়া নিশ্চিন্ত আছো। কুমারীশ যেন চঞ্চলা সম্বন্ধে অনেকখানি কথাই জানিত। শুধু সে ইস্কুলের বালক বলিয়া ফুটিয়া বলিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকিত মাত্র। বাড়ীর দোরে পৌঁছিয়া সৃষ্টিকে বিদায় দিয়া কহিল—যাও। সৃষ্টি ফিরিয়া আসিল।

(২)

বাড়ী প্রবেশ করিয়া সৃষ্টি দেখিল, চঞ্চলা এখনও বিছানায় পড়িয়া ঘুমায় নাই। ইহার আগে আগে এত রাত্রিতে এমন সময় সে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গিয়াছে, জাগাইয়া তুলে কার সাধ্য! কিন্তু আজ সে ঘরের দাওয়ার খুঁটিটায় হেলান দিয়া পৈঠার ধারে পা ঝোলাইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাঙা মেঘের কোলে চাঁদ উঠিয়াছে, আর সেই চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহার অনিমেষ আঁখি দুটী কোন্ দুরান্তরের পানে কিসের সন্ধানে উধাও হইয়া গিয়াছে, এ কি সুন্দর চাওয়া তার।

এ কি সুন্দর চাওয়া তার! চাঁদও যেন তার সুডৌল মুখখানির দিকে অনিমেষ চাহিয়াছিল! বিকচোন্মুখ চঞ্চলার পানে চাহিয়া সৃষ্টিধরের সমস্ত হৃদয় যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে নূতন একটা সৌন্দর্য্য-রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই ত তাহার লক্ষ্মী! এই ত তাহার গৃহের আনন্দ-প্রতিমা! আর তাহাকে চেষ্টা করিয়া মানুষ করিতে হইবে না! সে-ই এখন তাহার সংসারের সমস্ত ভার লইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে,—একটু সুখের মুখ দেখাইবে।

সদ্য ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়টা লইয়া—কাছে আসিয়া চঞ্চলার পার্শ্বটীতে বসিয়া ডাকিল চঞ্চলা,—চঞ্চলা সৃষ্টির পানে চাহিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। সৃষ্টি অঞ্চলটী ধরিয়া কহিল, থাক্ আমি এখন ভাত খেতে যাবো না। দাঁড়াও না, দু'দণ্ড বসে কথা কহা যাক্!

এই কয়টী দিনমাত্র চঞ্চলা চাষের সময় বলিয়া ও পাঁচজনাকার অনুরোধে—ধিকারে স্বামীর জন্য রাঁধিতেছিল। ভক্ত স্বামীটীরও এই কারণে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার সীমা নাই। সে যে কি করিয়া স্ত্রীকে তাহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাই মুখে যা আসিল, তাই আবেগ ভরে বলিয়া গেল।

চঞ্চলা কোন উত্তর না দিয়া মুখটী ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সৃষ্টি ভাবের প্রাবল্যে চঞ্চলার হাতটী চাপিয়া কহিল। আচ্ছা চঞ্চল! তুই কি আমায় ভালবাসিস্ না? না, বুড়ো ব'লে আমাকে পছন্দ হয় না? চঞ্চলা হাতটী ছাড়াইয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল!

সৃষ্টি পুনরায় চঞ্চলার হাতটী চাপিয়া কহিল,—তুই ভাল বাসিস্ না বাসিস্; তবু চঞ্চল তোকে আমি ভালবাসি! তোকে ভালবেসে যে আমার কত সুখ, তা কি ক'রে ব'লবো! বুড়ো হয়ে গিয়েছি বটে, তবু প্রাণটী তাজা আছে, জীবনে আর কখন ত কারো পানে চাই নাই!

চঞ্চলা কোন কথা না বলিয়া সৃষ্টির হাতটা ছাড়াইয়া, অশ্রুটা সম্বরণ করিয়া লইতেই যেন ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সৃষ্টিও ভাবিল, তবে কি চঞ্চলার মনে কোন কষ্ট দিলাম? ভাবিয়া দেখিল,—অন্যায় ত কিছু বলে নাই,—যা সত্য, যা বলা উচিত, তাই বলিয়াছে; তবু আশঙ্কায় তাহাকে একবার ঘরের মধ্যে আসিতে হইল।

আসিয়া দেখিল, চঞ্চলা তাহারই জন্য ভাত বাড়িতেছে। চক্ষের কোণে অশ্রুটা শুকাইয়া গিয়া সেটা একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সৃষ্টি অকারণে খানিকটা হাসিয়া কহিল, চঞ্চল! তুই এখানে ভাত বাড়ছিস্, আমি ভাবলাম বুঝি কাঁদছিস্! কিন্তু সত্যই, অন্যায় কখন তোকে বলি নাই। অন্যায় কখন ব'লবোও না। আমাকে তুই ভালবাস্‌বি ত?

'ঢং দেখে বাঁচি না' বলিয়া একটা বক্র কটাক্ষের সহিত চঞ্চলা ভাতের পাথরটা সৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া পানের ডাবোরটা লইয়া বাহিরে গিয়া পান সাজাইতে লাগিল।

সৃষ্টি কহিল,– তোর খাওয়া হ'য়েছে ত চঞ্চল?

চঞ্চলা কহিল, হঁা।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সৃষ্টি অনেক কথাই চঞ্চলাকে নিবেদন করিল। চঞ্চলা তার একটা কথার উত্তরও দিল না। এই প্রৌঢ় যে কি কারণে এই বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই দুঃখে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ছিল। পাশ ফিরিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিল।

(৩)

সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া চঞ্চলা দেখিল, পৃথিবী পরিপূর্ণতায় ভরিয়া রহিয়াছে, শুধু তাহারই কি যেন নাই। সে-ই যেন রিক্ত! আপনার দিকে চাহিয়া, তাহার ভিতরটা যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার মধ্যে যে অমৃত সরোবরটা ছিল, সেটা কে সেঁচিয়া শুকাইয়া দিয়াছে, সেদিন আর চঞ্চলার গৃহস্থালীর কায-কর্ম্মে মন লাগিল না; গৃহকর্ম্ম ফেলাইয়া রাখিয়া বিছানাতেই পড়িয়া রহিল।

অনেক বেলার পর সৃষ্টি মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কি রে চঞ্চল, এখনও যে শুয়ে রয়েছিস্। রাঁধিস্‌নি? অসুখ ক'রেছে?

চঞ্চলা কহিল, হাঁ।

সৃষ্টি নিজেই স্নান করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল। তখন চঞ্চলা আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া কুমারীশদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কুমারীশের মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা খুড়ী-মা, কুমারীশ ঠাকুরপো ইস্কুলে গেছে?"

যদিও কুমারীশের মা ও সে ভিন্ন-জাতি, তবু গ্রাম-সম্পর্কে একটা সম্পর্ক পাতানো ছিল; কায়স্থ ও কৈবর্ত্ত বলিয়া আকাশ-পাতালের ভেদ ছিল না।

কুমারীশের মা কহিল, হাঁ ইস্কুলে গেছে।

চঞ্চলা কহিল, আমি মাসীমাকে একখানা চিঠি দিয়েছি, ডাকে গেল কি না, তাই জানতে এলেম।

কুমারীশের মা কহিল, তা যাবে বৈ কি, বসো।

চঞ্চলা ঘরের দাওয়াটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল,—আমার আর মা এখানে মন টিক্‌ছে না। মাসীমার ঘরে বড্ড যেতে ইচ্ছা হচ্চে।

কুমারীশের মা কহিল,—তা ইচ্ছে হয় বৈকি মা, এখন যাবে—

এমন সময় কুমারীশের এক বিধবা দিদি আসিয়া কহিল—কি কৈবর্ত্ত বউ! এত বেলা হ'য়েছে, সৃষ্টির জন্য রাঁধিস নাই?

চঞ্চলা কহিল,—পারি না দিদি। রোজই কি ওমনি রাঁধা যায়?

বিধবা কহিল,—তা আর যায় না? স্বামীর জন্যে রাঁধতে আবার কষ্ট আছে বুঝি?

চঞ্চলা সে কথার কোন উত্তর দিল না।—বিধবা হাসিয়া কহিল,—সৃষ্টিধর একটু বয়সওয়ালা ব'লে বুঝি তোর পছন্দ হয় না, না? তা হাঁরে পাগ্‌লী, স্বামী আবার বুড়ো অবুড়ো আছে?

চঞ্চলা খানিক চুপ থাকিয়া কহিল, তা যাই বলো দিদি, আমার কিন্তু এখানে পোষায় না। সেই যে রোজ দুবেলা রাঁধো বাড়ো—দাও থোও—সে আমি পেরে উঠি না!

বিধবা অমলা কহিল,—তবে তুই কেবল সুখ চাস্, না? বেশ বড়-লোকের ঘরে খাট্‌তে খুট্‌তে হবে না—ব'সে ব'সে খাবি?

চঞ্চলা সস্মিতমুখে কহিল—হ্যাঁ—

অমলা হাসিয়া কহিল,—দুঃ, ওকথা ব'ল্‌তে নাই। ভগবান তোকে যে ধনের অধিকারী ক'রেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস্। দেখ্‌বি, তাতেই সুখ পাবি। বড়লোকের ঘরে—শুধু টাকার গদির ওপরে ব'সেই কি সুখ আছে রে পাগলী!—কত সোণার ঘরে, সোণার প্রতিমা বউ যে, স্বামীর ভালবাসা পাওয়া দূরের কথা, একবার চোকের দেখাও পায় নাই। তোকে ত সৃষ্টিদা ভালবাসে!—কাঙালের তাই ত সোণা রে—বলিয়া, চঞ্চলার বাল্যকালে সৃষ্টিধর তাহার জন্য কত কি করিয়াছিল—এক একটী করিয়া তাহাকে সমস্ত শুনাইয়া গেল। কবে কোন দিন সে কাহার বাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সৃষ্টি বুকে করিয়া তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে; কবে পড়সীদের বাড়ী নারিকেল

তেল মাখাইয়া দড়ি দিয়া তাহার মাথাটী বাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে, অমলা সকলই কহিয়া গেল।

চঞ্চলাও ভাবিয়া দেখিল!—ভালবাসা সে পাইয়াছে বটে, সত্যই ভালবাসা পাইয়াছে, কিন্তু এমন বৃদ্ধের কাছ হইতে কেন? যমে যাহার মরণের ডাক পাঠাইয়াছে, বার্দ্ধক্য যাহার জীবনের নবীনতার উপর শুভ্রতার ছাপ ফেলিয়াছে,সেখানেও হয় ত ভালবাসা আছে সত্য,—কিন্তু প্রতিদান দিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার একটা অবসর কোথায়? মধ্যে যে একটী পর্ব্বত ব্যবধান করিয়া আছে! পদে পদে মৃত্যুগণ্ডী অতিক্রম করিয়া তবে যাইতে হইবে! নবীন জীবনে এতটা কি পোষায়? আপন মনেই একটী ভাঙা নারিকেল মালাকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া মেঝের উপর বসাইতে লাগিল—এমন সময় জুতা পায়ে দিয়া কুমারীশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

চঞ্চলা কুমারীশের পানে চাহিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, কি ঠাকুরপো, এলে ইস্কুল হ'তে? আমার চিঠিখানা ডাকে দিয়েছিলে ত?

কুমারীশ কহিল,—হাঁ—দিয়ে দিয়েছি।

চঞ্চলা খানিক সেখানে বসিয়া থাকিয়া, পুনরায় আপনার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, স্বামী সৃষ্টিধর রান্না-বাড়া সমাপন করিয়া নিজে খাইয়া, চঞ্চলার জন্যও খাবার বাড়িয়া ঢাকা দিয়া বাসন কয়টী ধুইবার যোগাড় করিতেছে!

চঞ্চলা কহিল,—থাক্, বাসনটা না হয় আমিই ধুয়ে ফেল্‌বো!

সৃষ্টি কহিল—"বেশ, দয়া যে হ'য়েছে নিদয়ার, এই আমার ভাগ্যি" বলিয়া হাসিয়া তামাকটী সাজিয়া টানিতে টানিতে মাঠে চলিয়া গেল।

চঞ্চলা বাসনটী মাজিতে মাজিতে মনে মনে ঠিক দিতে লাগিল—বুড়ার কাছ হইতে কি আদায় করা যায়? সন্তানের জননী হওয়া সম্বন্ধে সে হতাশই হইয়াছিল! ঠিক করিল, তাহাকে গহনার জন্য ধরিব। সেই গহনা ক'টাই মাত্র তাহার জীবনের গর্ব্ব হইয়া রহিবে। লোকের কাছে বলিতে পারিবে, তাহার স্বামী আর কিছু দিতে না পারুক, এই গহনাই দিয়াছে। স্থির করিল, বুড়া যখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া একটু আরামে বিশ্রাম লইবে, তখনই ধরিয়া কথা পাড়িবে। চঞ্চলার অনুরোধ সে এড়াইতে পারিবে না। সে যে তাহাকে ভালবাসে,—প্রাণ দিয়াই ভালবাসে।

কথাটা চঞ্চলাকেও পাড়িতে হইল না। সৃষ্টিধরই একদিন ভাত খাইতে খাইতে চঞ্চলাকে বলিয়া উঠিল, একটা জিনিষ নিবি চঞ্চলা?

প্রথমটা চঞ্চলা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতিই জানাইল! তারপর যখন শুনিল, সে জিনিষটা সোণার, আর তার খুব আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী তাগা অনন্ত, তখন একবার সৃষ্টির পানে কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি দাও, খুব ভালবাস্‌বো, সত্যি বল্‌ছি—খুব ভালবাস্‌বো!

সৃষ্টিধরও আর একবার কথাটা স্বীকার করাইয়া লইয়া কহিল, তাহ'লে দ্যাখ্‌ ভালবাসবি ত?—না আমায় আনাড়ী বুঝে দম্ দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌বি?

চঞ্চলা ভঙ্গীর সহিত একটু চাহনি হানিয়া মুখটা ফিরাইয়া কহিল, না, আমি নিশ্চয় ভালবাস্‌বো,—যদি আমায় দাও!

সৃষ্টি কহিল,—তবে দাঁড়া। দুদিন আমায় কিন্তু ছুটি দিতে হবে। আমার মামার বাড়ীর গাঁয়ে বিক্রি আছে কিনা, আমায় নিজে যেয়ে আন্‌তে হবে। আমি চলে গেলে বাড়ীতে একলা থাক্‌তে পার্ব্বি ত?

চঞ্চলা অধীর হইয়া কহিল,—সেজন্য তোমার কিছু ভাবনা নাই গো, তুমি আজই যাও না!

সৃষ্টি কহিল,—দাঁড়া, ধান পান দুটো বিক্রি করি—ওম্নি গেলেই হ'লো,—টাকা চাই!

চঞ্চলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা কহিল, তবেই তুমি এনেছ,—আর আমিও গহনা প'রেছি!—

সৃষ্টি কহিল, আচ্ছা দেখিস্।

সত্যই একদিন মাসের শেষাশেষি সৃষ্টি সকাল বেলায় উঠিয়া তাহার মামার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। চঞ্চলার মনটা সেদিন ভারি খুসী হইয়া উঠিল,—কল্পনায় পড়্‌সীদের ও মাসীমাকে নিমন্ত্রণ করিল।

সন্ধ্যাবেলাতেই কুমারীশ তাহার ঘরের দুয়ার দিয়া যাইতেছিল; চঞ্চলা তাহাকে ডাকিয়া কহিল; একখানা পত্র লিখে দেবে ঠাকুরপো! বাড়ীতে মাসীমাকে পত্র দেবো।

কুমারীশ কহিল, সময় নাই। তারপর সৃষ্টির খবর লইয়া যখন শুনিল যে, সৃষ্টি ঘরে নাই, তখন কি ভাবিয়া সম্মত হইল। কহিল, চলো যাওয়া যাক্।

চঞ্চলা একখানা আসন পাড়িয়া দিয়া ও দোয়াত কলম কাগজ যোগাড় করিয়া দিয়া, কুমারীশের নিতান্ত কাছটীতেই আসিয়া বসিল।

কুমারীশ সাদা কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কহিল, বলো কি লেখা যাবে।

চঞ্চলা কহিল, লেখ আমি ভাল আছি, আর মাসীমার অনেকদিন কুশল সংবাদ পাই নাই। বাড়ীর কে কেমন আছে, অতি অবশ্য তার উত্তর দেয় যেন। আর মাসীমা, একবার এ বাটীতে আসিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার কথাটাও মনে হইতেছিল এবং সেই কথাটা লেখাইবার জন্যই কুমারীশকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া কথাটা কুমারীশকে খুলিয়া বলিতে পারিল না।

কুমারীশ কহিল, আর কিছু লেখাবার নাই?

চঞ্চলা কহিল,—না।

কুমারীশ পরিহাস করিয়া কহিল,—আচ্ছা আমি একটা কথা লিখে দিই, লিখি যে, তোমার স্বামী সৃষ্টিধর তোমায় খুব ভালবাসে।

চঞ্চলা লজ্জায় মুখটা ফিরাইয়া কহিল। দ্যোৎ, ওসব কথা লিখ্‌তে আছে বুঝি?

কুমারীশ কহিল, কেন নাই?

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত অনেকটা হইয়া পড়িয়াছিল; তবু কুমারীশ আজ চলিয়া যাইতেছিল না। চঞ্চলাও আজ কুমারীশকে যাও বলিয়া উঠাইয়া দিতে পারিতেছিল না। যেন তাহার ক্ষুধিত প্রাণটী অনেক দিনের একটা বুভুক্ষা মিটাইয়া লইবার অবসর পাইয়াছে; সুতরাং জোড় করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। সহসা বাহিরের দরজাটী খোলার শব্দ হইল!

কুমারীশ চমকাইয়া কহিল, কে?

চঞ্চলা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—সৃষ্টিধরই আসিতেছে।

সৃষ্টিধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দুই জনেই চকিত হইয়া উঠিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন দুইজনাকার মধ্যেই একটা গোপন কিছু ছিল, হঠাৎ তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া কুমারীশ আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

একে সন্ধ্যা রাত্রিতে কুমারীশকে চঞ্চলার ঘরে একা দেখিতে পাইয়াই সৃষ্টির কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপর তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চঞ্চলার পানে চাহিয়া কহিল, চঞ্চলা?



ভারত সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী।

চঞ্চলা সৃষ্টির পা ধুইবার জলটা আনিয়া দিয়া কহিল, কি ?

খুব একটা শক্ত কথাই সৃষ্টির ঠোঁটের আগে আসিয়াছিল ; কিন্তু চঞ্চলার ঢল ঢল যৌবন-লীলায়িত মুখখানির দিকে চাহিয়া, সে একেবারে ভুলিয়া গেল। তাহার সকল ক্রোধ, স্নেহে ও প্রেমে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল ! গদগদ স্বরে কহিল, না চঞ্চলা, তোকে আমি কিছু বল্‌বো না—তুই সুখেই থাক্ ? তার পর কথাটা ফিরাইয়া কহিল, তোর কেমন অনন্ত এনেছি দেখ্‌বি ? আয়, পরিয়ে দি ! সযত্নে চাদরের খুঁট হইতে অনন্তটী বাহির করিয়া চঞ্চলার হাতে পরাইয়া দিয়া কহিল, কেমন মানিয়েছে বল্ দেখি ! আবেগ ভরে তাহার বিম্বাধরে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া লইয়া কহিল—এইবার আমায় ভালবাস্‌বে ত চঞ্চল !

চঞ্চলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া স্বামীর জন্য ভাত বাড়িতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনন্ত পাইয়া তাহারও যেন হঠাৎ স্বামীর প্রতি কেমন একটা ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—সযত্নে ভাত বাড়িয়া কহিল, এসো ভাত খাওসে।

সৃষ্টির কোন উত্তর আসিল না।

চঞ্চলা কাছে গিয়া দেখিল, সৃষ্টি দাওয়াটায় উবুর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, গোঁয়াইতেছে, চোক মুখও লাল হইয়া উঠিয়াছে।

চঞ্চলা আতঙ্কিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত কহিল—কি হলো গো তোমার ! দুই হাত দিয়া খুব জোড়েই টানাটানি করিল।

সৃষ্টি কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—জোর ক'রে বুকের একটা ব্যথাকে চেপে রাখ্‌তে গিয়েছিলেম চঞ্চল ! কিন্তু কেমন যেন বুক ভেঙ্গে গেল, চেপে রাখ্‌তে পার্লেম না চঞ্চল, তবু তোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা নাই। এখনও ইচ্ছা হচ্চে, আমার এই ভাঙা বুকের রক্ত দিয়েই তোর পা দুখানি রাঙিয়ে দিয়ে যাই।

চঞ্চলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প'ড়সীরা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, ব্যাপার কি ?

চঞ্চলা কাঁদিয়া কহিল,—তোমরা দেখ, কি হ'য়েছে জানি না। ভাত বাড়তে ব'লে আর ভাত খেলে না।

ডাক্তার আসিয়া কহিল,—সন্ন্যাস রোগেই ধরিয়াছে। বাঁচিবার আর আশা নাই শুনিয়া চঞ্চলা চক্ষে অন্ধকার দেখিল। ভাবিল, স্বামী চলিয়া

গেলে তাহার থাকিবে কি? কে আর তাহার এতটা আব্দার সহিয়া তাহাকে এমন ভাবে করুণা করিবে? ভবিষ্যৎ সংসারটার পানে চাহিয়া, সে একেবারে শিহরিয়া উঠিল। তাহার উপর সন্ধ্যাবেলাকার ব্যাপারটা মনে পড়িয়া, বাণবিদ্ধা হরিণীর স্থায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন, তাহার পরে অভিমান করিয়াই স্বামী চলিয়া যাইতেছে।

সবলে দুই হস্তে সৃষ্টির পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া চঞ্চলা অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে কহিল,—ওগো আমি দোষী নয়, দোষী নয়। তুমি আমায় মন্দ ঠাউরে চলে যে'য়ো না! আমায় ক্ষমা করো! হু হু করিয়া দুই চোকের জলে নারী ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মরণোন্মুখ সৃষ্টিধর চঞ্চলার একখানি হস্ত আপনার বুকের উপর লইয়া ব্যাকুল ভাবে শেষ চাহনিটী চাহিতে চাহিতে, নীরবে প্রাণত্যাগ করিল। মরণের পরও তাহার চোকের কোণে লাগিয়াছিল—একবিন্দু মায়ার অশ্রু।

* * * *

সেই রাত্রেই প্রতিবেশীরা সৃষ্টির মৃতদেহ সৎকার করিতে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। নিশিশেষে আকাশে ম্লান চন্দ্র উদিত হইয়াছে, বাতাসও একটা হু হু বেদনা ভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া বহিতেছিল। একাকিনী চঞ্চলার কাছে শুইয়াছিল, প্রতিবেশিনী কানাইএর মা। মাত্র এই রাত্রিটীর মত দয়া করিয়া সে আসিয়াছিল। সহসা একটা দুঃস্বপ্নে জাগিয়া উঠিয়া কানাইএর মা দেখিল, রান্নাঘরের কাছটাতে খুব আলো, যেন আগুণ লাগিয়াছে! পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল চঞ্চলাও নাই! ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই বস্ত্রে চঞ্চলা আগুণ ধরাইয়া দিয়াছে।

কানাইএর মা চীৎকার করিয়া পড়সীদের ডাকিল এবং জল ঢালিয়া আগুণ নিভাইয়া দিল; কিন্তু তবু তাহাকে বাঁচান গেল না। একই চিতায় স্বামী ও স্ত্রী দুইএর দাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। যাহারা চঞ্চলাকে সবিশেষ জানিত বা না জানিত, তাহারা সকলেই "নিদয়ার" অপূর্ব্ব আত্মাহুতিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার কথাটা দেশের স্ত্রী মহলে আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

আবার।

আজি এ ভগ্ন জীর্ণ বীণায়,
কা'র প্রেরণায় উঠেছে তান ;
কাহার পরশ-আবেশে জেগেছে
সুপ্ত রাগিণী, লুপ্ত গান।
ছিন্নতন্ত্রী দিয়াছে যুড়িয়া,
টানিয়া বেঁধেছে নূতন সুর ;
শূন্য যা'ছিল পূর্ণ করেছে,
নিকটে এনেছে ছিল যা'দুর।
কে তুমি এসেছ, কোন দেশ হ'তে,
কোন শুভ যোগে হেথায় নামি ,
কেন এ চাতুরি, কেন লুকাচুরি ?
তুমি কি ভেবেছ চিনি না আমি ?
চিরদিন ঐ রূপের নেশায়
মত্ত হইয়া আছে এ প্রাণ ;
জনমের তরে জীবন আমার,
ডুবায়েছে ঐ রূপের বান।
আঁধারে, আলোকে, ভূলোকে, দ্যুলোকে,
পূর্ণ তোমারি রূপের ছটা ;
তবু লুকাইতে এত আয়োজন ?—
তবু গোপনের একি এ ঘটা !
বঞ্চনা আর ক'রোনা আমায়,
আসিয়াছ যদি আবার কাছে ;
আবার শিখাও সে মহামন্ত্র,
যাহাতে মানব-জীবন বাঁচে।
আবার বিরাট ছন্দে গাঁথিয়া,
শুনাও সে গান অমিয় ভরা ;
জীর্ণ যন্ত্রে ঝঙ্কার শুনি,
পলাইয়া যা'ক্ মরণ-জরা।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনফুল।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদীর উৎপত্তিস্থানের স্রোত সচরাচর কিছু প্রখর হয়। আমরা এস্থলে যে নদীর কথা উল্লেখ করিব, তাহারও স্রোত বড় প্রখর। ফেনমণ্ডিত জলরাশি গভীর কলনাদ তুলিয়া তীরবেগে ছুটিতেছে; উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ পর্ব্বত-মালার ছায়া পড়ায় জলরাশি কৃষ্ণবর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। নদীগর্ভের স্থানে স্থানে বিশালকায় শিলাসমূহ উন্নত মস্তকে বিরাজ করিতেছে। বেগবতী নদীর জলস্রোত ঐ সকল শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া গভীর কল্লোলে ঈষৎ উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং পরক্ষণেই ফেনমণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণ জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া ছুটিয়া চলিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ নদীগর্ভের স্থানে স্থানে ঐ সকল উৎক্ষিপ্ত জলরাশির শুভ্রতা বড়ই নয়নবিমোহন দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছে।

বৈশাখ মাস, বেলা অপরাহ্ন। আকাশ কাল মেঘে ছাইয়া গিয়াছে; এখনও বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু প্রচণ্ডবেগে ঝড় বহিতেছে। ভারতের সুবিখ্যাত একটী নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে কিছু দূরে, প্রকাণ্ড একটী পর্ব্বতের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র পানসি বাঁধা রহিয়াছে। পানসির ভিতর দুই বন্ধু সুরেশচন্দ্র এবং অমরনাথ ও একজন নাবিক। সুরেশচন্দ্র এবং অমরনাথ অদ্য নদীটীর উৎপত্তি স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিতে আসিয়াছিলেন। নদীগর্ভ হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছায়, প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র পান্‌সি ভাড়া করেন। পরে বেলা প্রায় ২টার সময় তাঁহারা পান্‌সি খুলিয়া স্রোতের মুখে রওনা হইয়াছিলেন;—এক্ষণে ঝড়ের ভীষণ তাড়নায় এই পর্ব্বতের পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। উভয়েরই বাড়ী কলিকাতায়। স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কিছু দিন হইল, ইঁহারা এস্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রজনীর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বন্ধুদ্বয় বড় চিন্তিত হইলেন। ভয়ে ভয়ে সুরেশ-চন্দ্র নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, কেমন বোধ হচ্ছে?"

নাবিক একপার্শ্বে একখানি কম্বলের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া কম্বলখানা একটু ফাঁক করিয়া বলিল, "নৌকার গায়ে ঝড় ত তেমন লাগচে না, নৌকাটা একপ্রকার স্থির ভাবেই আছে। পাহাড়ের গায়েই ঝড়ের বেগটা আট্‌কে যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টির বেগ বড় বেশী, ছই ফুঁড়ে ভিতরে জল আস্‌চে। আমি কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন,—"তাই ত! কি কুক্ষণেই আজ বেরিয়েছিলুম!"

প্রচণ্ডবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র নৌকার অভ্যন্তরে তিনটী প্রাণী স্থির নির্ব্বাক—কেহ কোনরূপ শব্দ করিতেছে না। সকলেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া আপন আপন মনের সহিত তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দিয়াছে। বাহিরেও প্রকৃতির সহিত জল-ঝড়ের একটা ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছে। ঝড়ের বেগ এত অধিক যে, পর্ব্বত-গাত্র হইতে বৃক্ষাদির ভগ্ন শাখা-প্রশাখা নদী-গর্ভে আসিয়া পড়িতেছিল। সহসা একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা ক্ষুদ্র তরণীর উপর আসিয়া পড়িল। প্রচণ্ড আঘাতে নৌকার ছহি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। নাবিকের একটী হস্ত ভগ্ন হইল। যুবকদ্বয়ও অঙ্গের স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। অতি কষ্টে সকলে ভগ্ন ছহির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সহসা নাবিক চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! নৌকার নোঙ্গর উঠে পড়েচে।" যুবকদ্বয় অতিশয় ভীত হইলেন। অমরনাথ বলিলেন "নৌকাখানা তা হলে আপনি স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্চে নয়?"

নাবিক উত্তর ক'রিল,—"আজ্ঞে হাঁ। হালটাও দেখ্‌চি ভেঙ্গে গেছে! আপনারা একটু সাবধানে থাকুন, নৌকা ডুবে যেতে পারে!"

ক্ষুদ্র তরণীখানি ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়া চলিল। চতুষ্পার্শ্বে জলের গভীর কল্লোল শ্রুত হইতেছিল। ঘোর বিপদাশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আরোহিত্রয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল; অধিকক্ষণ কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হইল না। সহসা একটী জলমগ্ন প্রস্তরে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। আসন্ন বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া যুবকদ্বয় ত্রাসে গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আর্ত্তস্বর বাতাসে বিলীন হইতে না হইতেই আরোহী-সমেত ভগ্ন নৌকাখানি নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল বিশাল গগনপটে কুত্রাপি একখণ্ডও মেঘ দৃষ্ট হইতেছে না। চন্দ্রোদয় হইয়াছে, স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল ধরণীর বক্ষে ক্ষুদ্র তটিনীটী আবার পূর্ব্ববৎ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর উভয় তীরই শৈলমালা-শোভিত। একস্থানে পর্ব্বত-নিম্নে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল। প্রস্তরের পার্শ্বে নদীর জল ছল ছল করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। তদুপরি এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা উপবিষ্ট ছিল; বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। তাহার পরিধানে একখণ্ড ক্ষুদ্র মলিন বস্ত্র। অনাচ্ছাদিত অঙ্গের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। আলুলায়িত কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে পশ্চাতে শিলাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। বালিকা একাকিনী ছিল না; তাহার উরুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া একটী সুন্দর যুবক নিদ্রা যাইতেছিলেন। বালিকা একদৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার সুন্দর মুখখানিতে লজ্জার কোনরূপ চিহ্নই প্রকাশ পাইতেছিল না। সে নীরবে উপবিষ্ট ছিল, কোনরূপ শব্দ করিতেছিল না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি শিলাতলে এক প্রকার টপ্ টপ্ শব্দ করিতেছিল।

বহুক্ষণ পরে যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তিনি দেখিলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি শয়ন করিয়া আছেন। একবার চারি চক্ষের মিলন হইল। যুবকের জ্ঞানের সঞ্চার হইতে দেখিয়া বালিকার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমার অঙ্গে চন্দ্রকিরণ খেলা করিতেছিল। যুবক বালিকার অপার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

যুবক আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত অমরনাথ। উভয়েরই পরিহিত বস্ত্র সম্পূর্ণ আর্দ্র। অমরনাথ বুঝিতে পারিলেন, এই কিশোরীই তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী। তিনি বালিকার হর্ষোৎফুল্ল আয়ত লোচনের দিকে চাহিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তুমি ?”

অমরনাথের কথা শুনিয়া বালিকা ঈষৎ হাস্য করিল মাত্র, কোন উত্তর করিল না। অমরনাথ সস্নেহে বালিকার হস্ত দুটী স্বীয় হস্তে লইয়া পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিই কি আমায় জল থেকে তুলেছ? আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিলেন, তুমি তাঁকে দেখ নি?"

বালিকা আবার হাসিল। কি মধুর সে হাসিটুকু! অমরনাথের বুকের ভিতর তাড়িত খেলিয়া গেল। তিনি মুগ্ধনেত্রে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা ঊর্দ্ধে কিসের একটা শব্দ হইল। বালিকা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। বুদ্ধিমতী বালিকা উভয় হস্তে অমরনাথকে ধরিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দূরে সরাইয়া দিল। কিন্তু হায়, আত্মরক্ষার অবসরটুকু তাহার ঘটিয়া উঠিল না। দেখিতে দেখিতে একখণ্ড প্রস্তর পর্ব্বতগাত্র হইতে বেগে আসিয়া তাহার উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কি গুরু পদার্থ নদীর জলে পড়িয়া নিমজ্জিত হইল। বালিকার করুণ আর্ত্তস্বর প্রত্যেক পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাতাসে বিলীন হইয়া গেল। আর ঐ দেখ, বালিকার পার্শ্বে অমরনাথ কঠিন প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইতেছে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নদীর জলে সহসা একটা মানুষ ভাসিয়া উঠিল। লোকটী সন্তরণ পূর্ব্বক ক্রমে অমরনাথের নিকট তীরে আসিয়া উঠিল। চন্দ্রালোকে অমরনাথ চিনিলেন, এই তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহারই বন্ধু সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি কিছু সুস্থ হইলেন।

সৌন্দর্য্যের রাণী সরলতার মূর্ত্তি কিশোরীর দেহলতিকাখানি প্রস্তরাঘাতে হতচেতন হইয়া এখনও তাঁহারই সম্মুখে শিলাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। হায়! যে নিজ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই খরস্রোতা নদীগর্ভ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই কথা যতই অমরনাথের মনে উদয় হইতে লাগিল, ততই যেন এক অসহ্য যাতনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। তাঁহার উভয় গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল। তিনি বাষ্পজড়িত

কণ্ঠে সুরেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই সুরেশ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "ভাই তুমি পুরুষ মানুষ; অল্পক্ষণের জন্য শোক ত্যাগ কর। এস, আগে ধরাধরি ক'রে পাথরটা সরিয়ে ফেলি।"

অনন্তর উভয়ে ধরাধরি করিয়া প্রস্তর উল্টাইয়া ফেলিলেন। হায়! বালিকার কটিদেশ এবং পদদ্বয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সুকুমার দেহ কি অতবড় একটা প্রস্তরের আঘাত সহ্য করিতে পারে? অমরনাথের প্রাণের ভিতর তখন কি হইতেছিল কে বলিতে পারে? তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত—দেখিলে বোধ হয়, ঘোরতর মনোবিকার হেতু যেন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

উভয়েই নীরব; কাহারও মুখে কথা নাই। বহুক্ষণ পরে অমরনাথ ধীরে ধীরে বালিকার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং সযত্নে তাহার দেহখানি স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্রও অমরনাথের সম্মুখে শিলাতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমরনাথ একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "কেন এমন হ'ল?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "ভাই, আমিই সব অনর্থের মূল। আমি অনেকক্ষণ জল থেকে উঠেছি। এই পাহাড়েরই চারিদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। এইখানে এসেই নীচে মানুষের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলুম। যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, এই আশায় ধীরে এসে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলুম; হঠাৎ পায়ের নীচের পাথরখানা খ'সে গেল, আমিও একেবারে নদীর জলে গিয়ে পড়লুম। তারপর যা হয়েছে, তুমি ত সব জানই? ভাই অমর, আমাকে ক্ষমা কর।"

অমরনাথ কোন কথা কহিলেন না। সুরেশচন্দ্রও অমরনাথের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। তিনি বালিকার নাসিকাপ্রান্তে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন, তখনও ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে। শুশ্রূষা করিলে এখনও বালিকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, - ভাবিয়া তিনি সত্বর পরিহিত বস্ত্রের এক অংশ ভিজাইয়া, নদী হইতে জল আনিলেন এবং বালিকার চক্ষে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বালিকার দেহখানি একবার কম্পিত হইল। অমরনাথ শিহরিয়া উঠিলেন,—পূর্ব্ববৎ জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বালিকা ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল।

অমরনাথ সস্নেহে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। বালিকা অতিকষ্টে হস্ত দুইখানি উত্তোলন করিয়া অমরনাথের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিল। অমরনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আবেগভরে বালিকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাহার মুখে একটী মধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির রেখা আর বিলুপ্ত হইল না! সব শেষ হইয়া গেল! বালিকার তুষার-শীতল দেহখানি অমরনাথের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

তন্ময়তা।

(১)

তুমি আমারি মোহন মুরলী
হৃদি বরজে বাজ গো,
শান্তি-সরোজ তুমি আমারি
ঊষর প্রাণে রাজ গো;
প্রাণের দৌর্ব্বল্য-লাজ গো!
তুমি আমারি আশা-প্রসূন
জীবন প্রভাতে ফুট গো,
চৈতন্য, সন্তোষ, পুলক, ভক্তি
জীবনে জাগিয়ে উঠ গো!

(২)

তুমি আমারি ঊষার সমীর
পুলক আন প্রাণে গো!
তুমি আছ অন্তরে বাহিরে
কেবা তোমারে জানে গো;
পাই তোমারে ধ্যানে গো!

স্বরগ-সুধা দৈন্যের শকতি
প্রীতির লীলা-ভূমি গো,
জীবন-পথ করিয়ে আলো
ব্যাপিয়ে থাকো তুমি গো!

(৩)

তোমারি সৌম্য মূরতি-মাঝে
কি প্রেম-সুরভি রহে গো;
শ্রান্ত হৃদয়ে মধুর-বাণী
পাপিয়া তান বহে গো;
তুমি আমারি জাহ্নবী-যমুনা-
মিলিত প্রয়াগ-ক্ষেত্র গো,
কি স্বর্গ সুন্দর জাগে প্রাণে
হেরি ও মুগধ নেত্র গো!

(৪)

আঁধার জীবনে জ্ঞান-সবিতা
প্রেমের রশ্মি ঢালো গো;
আঁধার পরাণে জীবন-ইন্দু—
শত-দীপ স্নিগ্ধ জ্বালে গো
নিরাশা কর আলো গো!
জড়িয়ে থেকো ছেড়ো না আমায়
আমি যে তোমারি গো;
তোমারে চাই জীবনে মরণে—
তুমি যে আমারি গো!

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

পূজার তত্ত্ব।

(গল্প)

জগৎ-জননী, ত্রিতাপহারিণী, মহামায়ার সপ্তমী পূজার দিন, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়, নবীন বাবুর অন্তঃপুরসংলগ্ন একটী কক্ষে মহিলাগণের মজ্‌লিস বসিয়াছে। গৃহিণী ওরফে নবীন বাবুর স্ত্রী মজ্‌লিসের নেত্রী, আর কয়েকজন প্রতিবাসিনী, নবীন বাবুর একমাত্র পুত্রবধূ সরলা এবং কয়েকজন চাকরাণী এই মজলিস্-গল্পের শ্রোত্রী।

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ লো পুঁটী, তোর বড়দিদির জন্য এবার পূজার সময় কি তত্ত্ব পাঠালে?"

পুঁটী। বড়দিদির তত্ত্ব আন্‌তে, পূজোর আগে বাবা কল্‌কেতায় গিয়েছিলেন। অনেক টাকা খরচ ক'রে, এবার তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। বড়দিদির শাশুড়ী ঠাকুরুণ বড়ই কড়া মেজাজের লোক; তত্ত্ব কম দেখ্‌লে দিদিকে আস্ত রাখবে না। তাই দেখে শুনে বাবা মনের মতন তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

গৃহিণী। ওগো ছোট বৌমা, তোমার বাপের বাড়ী থেকে, এবার কি কি জিনিষ এলো?

ছোট বৌ। অন্যান্য বছর দুর্গাপূজার সময় যেরূপ তত্ত্ব আস্‌তো, এবার তার চেয়ে খুব বেশী। এবার দাদা বি, এ, পাশ ক'রে, নিজের বুদ্ধিমতে ভগ্নীকে তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

গৃহিণী। হেমা, তোর ন'দিদির পূজোর তত্ত্ব কিরূপ গেলো?

হেমা। অপর্য্যাপ্ত! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত, কোনখানে বাদ যায় নি। কিবা খাবারের ঘটা, কিবা পর্‌বার ঘটা। পাকা দুটাশো টাকা খরচ করে, কাকাবাবু তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। নইলে ন'দিদির শ্বশুর বলেন, আবার ছেলের বিয়ে দেবো। পছন্দসই তত্ত্ব না হলে, দিদিকে শ্বশুরবাড়ী টিক্‌তে হতো না।

গৃহিণী। ওগো সুধার মা, তোমার বড় বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কি কি তত্ত্ব এলো?

সুধার মা। নিতান্ত মন্দ নহে। কতবার বল্‌তে বল্‌তে, এবার মহাশয়েরা কিছু টাকা খরচ করে পাঠিয়েছেন। গত বছোর পূজোর তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে,

এবার একটু ভালরূপ পেয়েছি। ভাই! বউয়ের মা বাপগুলো আজ কাল বড় কৃপণ হয়েছে, যেমন রোগ, তেমনি ওষুধ দিলে রোগ আরোগ্য হয়।

গৃহিণী। মাসীমার সেজো বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কি তত্ত্ব এলো?

মাসীমা। বল্‌বো কি মা দুঃখের কথা, কতবার মুখ ঝুক্‌ করে, তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে, এবার একরূপ ভদ্রলোকের বাড়ী পাঠানরূপ পেয়েছি। মোটের উপর সেজো বৌয়ের মা বেটী কৃপণের ধাড়ি, আমিও সেইরূপ করি আড়ি; এবার তত্ত্ব এসেছে খুব তাড়াতাড়ি; মনের মতন মন ভুলান সাড়ী; দিয়েছে স্বামীসোহাগী চুড়ি; পাঠিয়েছে বেয়ান মেয়ের বাড়ী।

গৃহিণী। মা দুর্গার আগমনে, এ বৎসর তোমাদেরই পোয়াবারো। চারু, তোদের রাধারাণীর জন্য কি পাঠান হ'লো?

চারু। জ্যেঠাইমা, দুঃখের কথা বল্‌বো কি! রাধারাণীর সৎশাশুড়ী ঠাকরুণ পূজোর আগে পত্র লিখেছিলেন, এবার একটা কলের গান না পাঠালে তত্ত্ব ফিরিয়ে দেবেন। দাদা তাই দেখে শুনে, দেড়শো টাকার কল ও অন্যান্য ন্যায্য তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। কালে কালে দেশের দশা হ'লো কি? হ্যাঁ জ্যেঠাইমা, তোমার বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কি কি তত্ত্ব এলো?

গৃহিণী। (মুখ অন্ধকার করিয়া) এখনও মহাপ্রভুদের সাড়া হয় নি। আজ মা জগদম্বার সপ্তমী পূজো, কোন তত্ত্ব ফত্ত্ব বাড়ীতে আস্‌তে দেখলুম না ত?

চারু। (সরলাকে লক্ষ্য করিয়া) হ্যাঁ বৌ, তোমার বাপ এ পূজোর সময় তত্ত্ব পাঠাবেন না?

সরলা কিছু অপ্রতিভ হইয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল,—"গরিব লোক, না পাঠালেও পারেন।"

গৃহিণী মুখখানি কেলেহাঁড়ির তলার মতন করিয়া, ব্যঙ্গ ভাবে কহিলেন, "গরিব আছে ত আমার ব'য়ে গেলো। যদি তত্ত্ব পাঠাতে অপারগ হয়, তবে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে, মেয়েকে মেরে ফেলে নি কেন?

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া, সরলার রক্তিম বদনখানিতে ভয়ঙ্কর বিষাদের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—সম্বৎসর অন্তে আজ একটা মহা আনন্দের দিন। এ দিনে যে বেটা না খেতে পায়, সেও পাঁচ দুয়ারে ভিক্ষে করে এনে, জামাই বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠিয়ে দেয়। দেবার মনন থাকলে, কতরূপে দেওয়া যায়।

এমন সময় একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল,—"শচীন্দ্র বাবুর শ্বশুর বাড়ী থেকে তত্ব এসেছে।"

মহিলা-মজ্‌লিসটী আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, গরিব হোলে কি হয়, ভদ্রলোক ত! কেহ বলিল, একটী বৎসর পরে কিছু খরচ না কর্‌লে লোক-সমাজে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে। কেহ বলিল, বৌয়ের বাপ্‌ অতি সরল প্রকৃতির লোক! ইত্যাদি নানারূপ বক্তৃতা হইয়া, সরলার পিতাকে অতি উচ্চে,—উচ্চতর স্থানে আসন প্রদান করা হইতেছিল।

সরলার পিত্রালয় হইতে যাহারা তত্ব লইয়া আসিয়াছে, প্রথমেই বহির্ব্বাটীতে তাহাদের সহিত নবীন বাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছে। নবীন বাবু তত্বের অবস্থা দেখিয়া, বাহিকাদ্বয়কে বলিলেন, "এখানে রাখ্‌লে কেন, বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও!"

তত্ব-বাহিকাদ্বয় তত্ব লইয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং মহিলা-মজ্‌লিসের সম্মুখে গিয়া তত্ব রাখিয়া দিল।

গৃহিণী একদৃষ্টে তত্বের দিকে চাহিয়া, মুখখানি ফিরাইয়া লইয়া, ক্ষণকাল পরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোথা থেকে তত্ব আন্‌লে?"

বাহিকা-দ্বয়। তোমার ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে।

গৃহিণী। তারা আছে—না—গেছে?

বাহিকা-দ্বয়। ও কি কথা মা ঠাকরুণ? না থাক্‌লে আমরা এ তত্ব আন্‌লুম কোথা থেকে!

গৃহিণী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, এরূপ তত্ব মরা মানুষে দিয়ে থাকে। ওগো পাড়া-প্রতিবাসীরা, তোমরা দেখ দিকিন, এমন তত্ব কোন্‌ বেটা পাঠিয়ে থাকে? এর চেয়ে না পাঠালেই ত বেশী মান থাক্‌তো! (সরলাকে লক্ষ্য করিয়া) ওগো বউ ঠাকরুণ, দেখ তোমার বাপ কত টাকা খরচ ক'রে তত্ব পাঠিয়েছে। আক্কেলটা একবার দেখে নাও?

বামার মা সরলার দিকে চাহিয়া বলিল,—তাই ত বউমা, তোমার বাপের কি জ্ঞান নেই? মেয়ে জামাইয়ের দুই যোড়া করিয়া কাপড়, একটী মেয়ের একটী জামাইয়ের জামা, জামাইয়ের একযোড়া জুতা, একখান সিন্দুর, একথালা সন্দেশ,—আর তোমার শাশুড়ীর একখানি সস্তা সাড়ী—এই হ'ল কি তত্ব গা?

মহিলা-মজ্‌লিস্‌টী, সরলাকে টিট্‌কারী এবং আগন্তুক বাহিকাদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

গৃহিণী চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম করিয়া, বাহিকাদিগকে বলিলেন, তোমরা এ তত্ত্ব ফিরিয়ে নিয়ে যাও? আমি যদি আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারি, তবে ঢের ঢের তত্ত্ব পাব।

বাহিকারা বলিল, "গরিবলোক, এর বেশী সাধ্য হয় না। ক্ষমতা নিয়ে কথা মা ঠাকুরুণ?"

গৃহিণী। তোদের বেশী বচন ঝাড়্তে হবে না। যে পথে এসেছিস্, সেই পথে চলে যা! প্রভুদের বলিস্, আবার ছেলের বিয়ে দেবো। তাদের মেয়ের উপায় তারা যেন করে!

মজ্‌লিসটী শুদ্ধ গৃহিণীর পক্ষ সমর্থন করিল। সকলেই বাহিকাদ্বয়কে ভর্ৎসনা করিতে করিতে, তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গৃহিণী বলিলেন, "ওরে হ'রে, মাগী দুটোকে গলা ধরে বের করে দে ত? আর এ তত্ত্ব—না—ফত্ত্ব, রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে আয়?"

বাহিকাদ্বয় গৃহিণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধান্তঃকরণে তত্ত্ব ফিরাইয়া লইবার জন্য উদ্যোগী হইল। অন্তঃপুর হইতে আসিবার সময় বলিল—"ওগো গিন্নী ঠাকৃরুণ, যদি কখনও মেয়ে বিয়োও, সেই সময় এ অপমানের প্রতিশোধ পাবে; বড়,—ছোট হতে বেশীদিন লাগে না! বিধাতা এর বিচার কর্‌বেন।"

এই বলিয়া তত্ত্ববাহিকাদ্বয় চলিয়া গেল। গৃহিণী এবার সরলাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পিতৃবংশ নির্ব্বংশ হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সরলা যাহাতে মনোবেদনা পায়, তাহাই বলিতে লাগিলেন। একে একে প্রতিবাসিনীরা সকলেই সরলার পিতৃনিন্দা করিয়া মজ্‌লিস ভঙ্গ করিল। একাকিনী সরলা বসিয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সরলা, অভয়ার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল—মা দশভুজা, সম্বৎসরান্তে তোমার স্নেহের পুত্র-কন্যাদিগকে স্নেহ বিতরণ লালসায় এ বঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়াছ! মা দুর্গতিনাশিনি, আমি কি তোমার সন্তান নই? তোমার আগমনে, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়, জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! মা গো, তুমি ত সতী রমণীর সাধনার সামগ্রী তবে জগদম্বে, এ হতভাগিনীর উপর বিরূপ হ'লে কেন? মা মহামায়া, আর কখনও যদি এ বঙ্গভূমিতে এস, তবে আমার মত ক্ষুদ্রা বালিকাকে প্রাণে মারিও না! মা শঙ্করি, দীর্ঘ একটী বৎসর পরে তোমায় পাইয়া, এ হতভাগিনী তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ

কর্‌লো? তনয়ার দোষ ক্ষমা ক'রো। শাশুড়ীর তীব্র কটূক্তি শ্রবণ আমার পক্ষে প্রাণান্তকর না হ'লেও বাপ মায়ের—বিশেষতঃ একমাত্র ছোট ভা'য়ের নিপাত-কামনা—পিতামহ প্রভৃতির নামে অভিশম্পাত আর সহ্য করিতে পারি না। তনয়ার দোষ ক্ষমা কর মা! মা অম্বিকে! তোমার "পূজার তত্ত্ব—এই ক্ষুদ্র প্রাণ" ঐ অলক্তকরঞ্জিত শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। দাসীর সামান্য উপহার সাদরে গ্রহণ কর!

গিরিজায়ার সপ্তমী পূজার দিন, দ্বিপ্রহর রজনীর সময় উদ্বন্ধনে, সরলা পূজার তত্ত্বের গঞ্জনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র দাস কাব্যবিনোদ।

বিরহে।

তুমি আমারে ছাড়িয়া সুদূর প্রদেশে
জানি না রয়েছ কেমনে
হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে!
আমি আর যে পারি না সহিতে যাতনা,
প্রাণ জ্বলে যেন আগুণে,
মরম বেদন-দাহনে।
তুমি দুদিনের তরে কেন ওগো প্রিয়া
কলকণ্ঠ স্বরে গাহিলে?
হৃদি কেন মোর নাচালে?
আমি এবে যে গো দেখি আঁধার জগৎ
নয়ন তুলিয়া চাহিলে!
একি দশা মোর করিলে?
তুমি হাসি-ভরা মুখে এস কাছে এস,
থেকনা'ক আর ভুলিয়া;
দেখ এসে আঁখি মেলিয়া,—
আমি এসেছি পূজিতে বিভুর চরণ
অমল কমল তুলিয়া,
তোমার মিলন মাগিয়া।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

আশ্রম।



আশ্রম বলিলে আপাততঃ আমরা কি বুঝিতে পারি, এ বিষয়ে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র যাহা মানবের অথবা প্রাণী-মাত্রের মানস-পটে সমুদিত হয়, উহাই সেই শব্দের অর্থ। আশ্রম শব্দ উচ্চারিত হইলেই তপোবন-বাসী মুনিঋষিদিগের নাতিক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর আসিয়া আমাদের চিত্তপটে আন্দোলিত হইতে থাকে, সুতরাং আমরা বুঝি—মুনিঋষিরা তপোবনে গমনপূর্ব্বক যে স্থানে বসিয়া তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন, সেই পর্ণময় কুটীরই আশ্রম নামে অভিহিত; অর্থাৎ মুনিঋষিদিগের বাসস্থানের নামই আশ্রম। যথা—কপিলাশ্রম, ভরদ্বাজাশ্রম ইত্যাদি। আমাদের এ মতে মুনিঋষিগণেরই আশ্রম-সম্ভাবনা, অন্যের নহে; অথচ শাস্ত্রে বিবিধ আশ্রমের কথাই দেখা যায়। তবে আশ্রম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? যা হ'ক্, একবার আশ্রম শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যা'ক্, বিশেষ কিছু পাওয়া যায় কি না?

আ শ্রাম্যন্তি স্বং স্বং তপঃ সম্যক্ চরন্তি অত্র ইতি আশ্রমাঃ। আ-শ্রম+অল্।

যে স্থানে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজ নিজ তপস্যাচরণ করিতে পারা যায়, তাহাকে আশ্রম কহে। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনরূপ তপস্যাচরণ করেন, উহাকেই তাঁহার আশ্রম বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং আশ্রমটা কেবল মুনি-ঋষিদিগেরই একচেটিয়া নহে, উহা সর্ব্বসাধারণেই প্রয়োজ্য; তাই শাস্ত্রে উহার নানাত্ব উক্ত হইয়াছে।

চত্বারঃ আশ্রমাঃ—ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-পরিব্রাজকাঃ। বশিষ্ঠ।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক; অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও ভিক্ষাশ্রম এই চারিটী আশ্রম।

উপনয়নের পর জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুগৃহে বাস ও অঙ্গের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করিতে হয়. ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া দারপরিগ্রহান্তে স্বধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক গৃহস্থ হইতে হয়, এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পুত্রোৎপাদনানন্তর বনে বাস অকৃষ্টপচ্য * ফলাদি ভক্ষণ ও ঈশ্বরের আরাধনা, ইহাই বানপ্রস্থ্য।

গৃহাদি সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগানন্তর মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন পরিধান করিয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, নির্জ্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে বাস এবং একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা, ইহারই নাম ভিক্ষাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম।

ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। জাবালোপনিষৎ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তাহার পরে বনবাসী হইবে, পরিশেষে প্রব্রজ্যা অর্থাৎ ভৈক্ষ্য অবলম্বন করিবে। অথবা বিরক্ত হইলে যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে।

এই চারিটী আশ্রমের মধ্যে 'গার্হস্থ্য' আশ্রমই আমাদের প্রস্তুত বিষয়; সুতরাং আশ্রমান্তরের বিষয় এ প্রবন্ধে বিশেষ সমালোচ্য নহে।

বেদাধ্যয়নাদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপনান্তে গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। প্রাচীন মুনিঋষিগণ গৃহস্থাশ্রমই আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যথাশাস্ত্র দার পরিগ্রহ করিতে হয়। অন্যথা তিনি গৃহী নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য হয়েন না।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

হলায়ুধ।

গৃহ হইলেই তাহাকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীই গৃহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গৃহিণী ব্যতীত গৃহ গৃহনামের অযোগ্য—সংসারীর বিড়ম্বনা মাত্র।

ন তদ্‌গৃহং যত্র বধূবিবর্জ্জিতম্। নারদ।

দেবর্ষি নারদ কথা-প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, যে গৃহ বধূ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ যে গৃহে বধূ নাই, সে গৃহ গৃহই নয়। সুতরাং—

গৃহেষু দারেষু তিষ্ঠতি অভিরমতে যঃ সঃ গৃহস্থঃ। গৃহ-স্থা+ড।

শাস্ত্রানুসারে দার পরিগ্রহ করিয়া যিনি গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ। উদাসীন ও সাধক ভেদে গৃহস্থ দ্বিবিধ, যথা—

---

* স্বভাবতঃ উৎপন্ন।

উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ।
কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ।
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকম্।
একাকী বিচরেদ্‌যস্তু উদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ॥

গরুড়-পুরাণ।

গৃহস্থ দুই প্রকার; উদাসীন ও সাধক। কুটুম্বভরণে অর্থাৎ আত্মীয় পরিজনাদির ভরণপোষণে তৎপর গৃহী—সাধক এবং ঋণত্রয় * পরিশোধ পূর্ব্বক ভার্য্যা ও ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গাবলম্বী একাকী বিচরণকারী—উদাসীন নামে আখ্যাত।

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ॥ তন্ত্রশাস্ত্র।

গৃহস্থ আহ্নিক কৃত্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়ন বা গৃহকর্ম্ম করিবে। কদাপি নিরুদ্যম অবস্থায় অবস্থান করিবে না।

পরস্বে পরদারেচ ন কার্য্যা বুদ্ধিরুত্তমৈঃ।
পরস্বং নরকায়ৈব পরদারাশ্চ মৃত্যবে॥ বামনপুরাণ।

বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ ব্যক্তি পরধনে বা পরদারে কদাচ অভিলাষ করিবে না। যে হেতু পরস্বাপহারীর নরক ভোগ ও পরদারগামীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

অধীত্য বেদান্ কৃতসর্ব্বকৃত্যঃ
সন্তানমুৎপাদ্য সুখানি ভুক্ত্বা।
সমাহিতঃ প্রচরেদ্দুশ্চরং যো
গার্হস্থ্যধর্ম্মং মুনিধর্ম্মজুষ্টম্॥ মহাভারত।

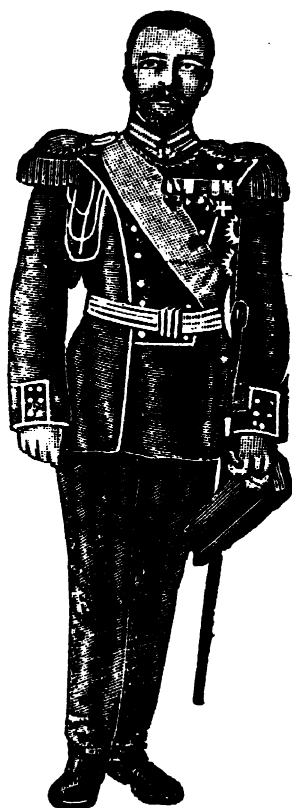
যে গৃহী বেদসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক গৃহোচিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়া, সন্তান উৎপাদনানন্তর যথারীতি সুখভোগ করিয়া সমাহিত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া মুনিদিগের ধর্ম্মাদি দ্বারাও সেবিত দুস্তর গৃহস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকেন, তিনি সর্ব্বথা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের সহিত গৃহস্থাশ্রমের কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না, প্রত্যুত উপকারই সাধিত হইয়া থাকে।

* দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ।



জর্ম্মণ "সম্রাট্।"



রুষিয়ার "জার"।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—ইহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং ইহাদের সহিত গার্হস্থ্য আশ্রমের বিরোধও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব এই আশ্রমত্রয়ের মধ্যে কোনটী ভাল—সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়, তৎসম্বন্ধেই যথাকথঞ্চিৎ সমালোচনা পূর্ব্বক আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—দুইটী আশ্রম হইলেও পরস্পর প্রভূত সাদৃশ্য থাকায়, বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বর্ত্তমান বলিয়া আমরা ইহাদিগকে একটী নামেই আখ্যাত করিব।

সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম;—উভয়ের মধ্যে কোনটী ভাল? সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্ম করিতেই সংসারে আসা। তুচ্ছ জীবনের আশঙ্কায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা ভাল, না বীরোচিত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধে জয়লাভ করা বা পরাজিত হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হওয়াই ভাল, ইহার প্রকৃত উত্তর কি? এ যে বিষম সমস্যা!

সন্ন্যাসিগণ এই ধর্ম্মক্ষেত্র সংসার-রূপ সমরক্ষেত্রে বিবিধ বাধা-বিপত্তির ভয়ে ভীত বলিয়াই ত স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বেশে একটী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেন। এবং দেহস্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সমূলে বিনষ্ট করিয়া, বিশেষতঃ যাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সমধিক উত্তেজিত হইতে পারে, তাদৃশ প্রলোভনপূর্ণ উত্তেজক রাজ্য হইতে দূরে—অতিদূরে থাকিয়া জিতেন্দ্রিয় নাম ধারণানন্তর সন্ন্যাস নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া (দূরে রাখিয়া) অর্থাৎ চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরাল করিয়া বিজন বনে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করেন; কারণ পুত্রকলত্রাদি তপোঽনুষ্ঠানের অন্তরায় স্বরূপ, সুতরাং তাহাদিগকে চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাহারা জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরাল হয় কি? যদি তাহাই না হইল, তবে আর গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাওয়া কেন? বরং উহাদিগকে চর্ম্ম-চক্ষুর সমীপে রাখিয়া যাহাতে জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরাল করা যায়,—নিকটে থাকিলেও মনোবিকার উপস্থিত না হয়, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অন্যথা পুরুষত্বের পরিচয় কি হইল? মহাকবি কালিদাস জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন :—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে—
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ।

অর্থাৎ বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকিতেও যাঁহাদের অন্তঃকরণে বিকৃতি-ভাব উপস্থিত না হয়, তাঁহারাই যথার্থ ধীর—জ্ঞানী।

এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আসিয়া সাধারণ কারণে ভীত হইয়াই যদি পলায়ন করিতে হয়, তবে আর সংসারে আসা কেন? জীব কর্ম্ম করিব বলিয়াই ত কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করে, কর্ম্ম করিতে হইলে যে কোন রূপেই হউক, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবেই হইবে। সমুদ্র-মধ্যে যাতায়াত করিতে হইলে তাহার উত্তাল তরঙ্গমালায় নিপতিত হওয়া ত অবশ্যম্ভাবী, তবে যদি কাহারও ভাগ্যবলে তরঙ্গ তখন উপস্থিত না হয়, কিন্তু এরূপ লোক কয় জন? তাই সকলেই যদি ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়া বসিত, তাহা হইলে সংসারের অবস্থা কি হইত?

যে মহাপুরুষগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অমিত বিক্রমে যাবতীয় বাধা-বিপত্তির মস্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া সংসারে জয়লাভ করেন, তাঁহারা কি পলায়নপর ভীরু সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা সমধিক প্রশংসা-ভাজন বা শক্তিশালী নহেন? পক্ষান্তরে শত্রু-কবলে নিপতিত হইলেও তাঁহারা ইঁহাদের অপেক্ষা প্রশংসার পাত্র, সন্দেহ নাই।

পাঠকবর্গ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমরা সন্ন্যাস আশ্রমটা "কিছু না" বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছি; আমরা বলিতেছি, একমাত্র সন্ন্যাসই মানবের ধর্ম্মপথ নহে, উহা ধর্ম্মপথের একটী ক্ষুদ্রতম শাখাবিশেষ, পথটী বড়ই সঙ্কীর্ণ—প্রশস্ত নহে। গৃহস্থাশ্রমই প্রশস্ত রাজমার্গ, তবে রাজমার্গে গমনাগমন করিতে হইলেই বিশেষ সাবধান হইতে হয়, অন্যথা বিপদাপদের ঘাতপ্রতিঘাতে সংসারীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। গৃহস্থকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিণামে এমন কি নরকের কীট অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম হইতে হয়। তাই ভয়ে দু'এক জন এই সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়া থাকেন।

ভূমৌ মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ।
সংবিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনঃ॥

গরুড়পুরাণ।

ভূমিতে শয়ন, ফলমূল ভোজন বেদাধ্যয়ন, তপস্যাচরণ এবং ন্যায়ানুসারে সংবিভাগ, ইহাই বনবাসীর ধর্ম্ম।

ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ভিক্ষুক ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের মুখ দর্শন করিবেন না, দারবী অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্ত্রী-পুত্তলিকাকেও স্পর্শ করা ভিক্ষুকের পক্ষে একান্ত অকর্ত্তব্য।

তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ।
সন্ন্যাসীহ স বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ॥

গরুড়পুরাণ।

বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত যে ব্যক্তি তপস্যাদ্বারা দেহ ও মনকে সাধনায় আকৃষ্ট করিয়া পরমেশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকেই সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। ইত্যাদি বহু প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, সন্ন্যাসিগণ যথেষ্ট কঠোর সাধনা করেন। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমী কি উঁহাদের অপেক্ষা অধিক কঠোর সাধনা করেন না?

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥

মনু।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া, পরিবারাদি ভরণ-পোষণের সমুদায় ভার উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র ও ধনাদিতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যস্থভাবে গৃহেই অবস্থান করিবে ইত্যাদি। ইহা কি সামান্য কঠোর সাধনা!

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও যিনি—প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত সম্পূর্ণ রাজত্ব দানে পরাঙ্মুখ হন নাই; অবশেষে স্ত্রী, পুত্র—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধে তৎপর হইয়াছেন।—

যাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া স্বহস্তে সংসারের একমাত্র অবলম্বন প্রিয়তম পুত্ররত্নের মস্তক ছেদন করিয়াও স্বীয় কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে বিমুখ হন নাই।—

স্বীয় শিশু সন্তানগণ ধূল্যবলুণ্ঠিত গাত্রে—যাঁহার চারিদিকে পড়িয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এবং ঘোর আর্ত্তনাদে এমন কি প্রতিবাসীদিগেরও কর্ণবিবর বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে; সুযোগ বুঝিয়া মহাজনগণও

তখন প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাক্যানলে বেচারাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, জীর্ণগৃহের অন্তরালে থাকিয়া এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াও পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে রমণীরত্ন মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় অচল অটল ভাবে দুর্গতিনাশিনী মাতা জগদম্বার পাদ-পদ্মে পতির মঙ্গল কামনায় কান্নাতিপাত করিতেছেন; এতাদৃশ ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে থাকিয়া—দারিদ্র্যের এ হেন সর্ব্বগ্রাসী বিসদৃশ কবলে পতিত হইয়াও যিনি স্বীয় কর্ত্তব্যের ব্যবস্থায় সততই যত্নপর হইতেছেন, এবং মনের আবেগে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতভাবন ভবানীপতির চরণ-কমলে করযোড়ে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছেন; ইঁহারা কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী-দিগের অপেক্ষা অতি কঠোর তপঃসাধন করেন নাই? তবে আর গৃহী অপেক্ষা বনী বা সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়; বরং আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, প্রাচীন মুনিঋষিগণ ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে উক্ত হইয়াছে :—

সর্ব্বাশ্রমাণামধিকো গৃহাশ্রম উদাহৃতঃ।
যস্মাত্তস্মিন্ সমায়ান্তি ভিক্ষার্থমাশ্রমাস্ত্রয়ঃ॥

সমস্ত আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, যে হেতু অপরাপর আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই ভিক্ষার নিমিত্ত এই গৃহাশ্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গার্হস্থ্যং নাত্র সংশয়ঃ॥

মহাভারত।

আশ্রমসকলের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্।

গৌতম।

আশ্রম সকলের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূল কারণ), কেননা অন্য সকল আশ্রম প্রজাশূন্য।

বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ।
গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি॥
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দাতা চৈব গৃহস্থঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥

শঙ্খ।

বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি এবং দ্বিজগণ, ইঁহারা সকলেই গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। গৃহস্থই যাগ যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন এবং গৃহস্থই দাতা হইয়া থাকেন, এই সকল কারণে গৃহস্থাশ্রমীই সকল আশ্রমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি বহু প্রমাণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক প্রদর্শিত হইল না।

অতএব দেখা যায় যে, সকল প্রকারেই গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল। এখন আশ্রমোচিত ধর্ম্মের সামান্য একটুকু আভাস মাত্র দিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনম্।
গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তমাঃ॥

যথাবিধি অগ্নিত্রয়ের সমাধান, অতিথিসেবা, যাগ যজ্ঞ, দান ও দেবার্চ্চনাদি গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্ম।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেনঃ—

যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাণযাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, ইহা লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া স্ব স্ব বর্ণবিহিত অনিন্দিত কার্য্য দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবে। ঋত এবং অমৃতের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অথবা মৃত বা প্রমৃতের দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিন্তু জীবিকার জন্য কদাচ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবে না।

ভূপতিত ধান্যাদিকণাসমূহ এক একটী করিয়া উচ্চয়ন করাকে উঞ্ছবৃত্তি, ধান্যাদির মঞ্জরি উচ্চয়ন করার নাম শিলবৃত্তি। এই উঞ্ছশিল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে ঋতস্বরূপ বলিয়া জানিবে।

অযাচিত ভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, সে-ই অমৃত-বৃত্তি। ভিক্ষাজীবনকে মৃত-বৃত্তি এবং কৃষি-জীবনকে প্রমৃত-বৃত্তি বলে। বাণিজ্যের নাম—সত্যানৃত, তদ্দ্বারাও জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু সেবা বা চাকরি—যাহাকে শ্ববৃত্তি বলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদার।

নিবেদন।

যখন তোমার ধ্যানে
হই আমি নিমগন,
কোথা হ'তে এসে প্রভো!
দেও মোরে দরশন।
যখন আপনা ভুলি'
হরি! ডাকি হে তোমায়,
হৃদয়ের কুটিলতা
সব দূরে চলি' যায়।
অনাবিল শান্তি-প্রেমে
হয় হৃদি ভরপূর,
পূত মন্দাকিনী-স্রোত
গায় হৃদে সুমধুর।
আকুল হরষে মেতে
তোমা-ময় হ'য়ে আমি,
তোমারি পবিত্র প্রেমে
থাকি ডুবে দিবা-যামী।
সদা যেন এই ভাবে
লয়ে থাকি তব নাম,
পুণ্য-পথে তুমি ছাড়া
কে চালাবে ভগবান!

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষার দোষ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অভিসম্পাত।

তরঙ্গিণী যখন তাহার দাদার ঘরে উপস্থিত হইল, তখন হীরালাল চা' পান সমাপ্ত করিয়া বহির্গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বাহির হইতেছিল।

তরঙ্গিণী বলিল—"বাবা ডাক্‌ছেন।"

হীরালাল করধৃত যষ্টিগাছটীর মস্তকে ফুৎকার দিতে দিতে যেন কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"কোথায়?"

তর। বাহিরের রকে।

হীরা। কেন?

তর। কি জানি।

হীরা। বাবা কাছারি যান নাই?

তর। গেছিলেন,—মা আবার ডাকিয়ে এনেছেন।

উত্তোলিত যষ্টির আঘাতে মেঝেয় শব্দ তুলিয়া হীরালাল বলিলেন,—"কেন?"

সে শব্দে ঈষচ্চমকিত হইয়া তারপরে তরঙ্গিণী বলিল,—"জানি না।"

হীরা। সেখানে আর কে আছে?

তর। মা আছেন, ওবাড়ীর সারদা পিসী আছেন,—সে পাড়ার চক্রবর্ত্তী ঠাকুরুণ আছেন,—আরও কে কে আছে।

হীরালালের শরীরের রক্ত যেন একটু বিরুদ্ধগতিতে প্রবাহিত হইল। বক্রস্বরে বলিলেন—"হতচ্ছাড়া মাগী কেন এসেছে। বল্‌গে যা, আমি এখন যাব না।"

তর। বাবা ডাক্‌ছেন।

হীরা। সে মাগীর কথাতেই ডাকাইতেছেন। মাগী বজ্জাতের ধাড়ী—হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। বেটী চোর——

তর। ওমা, অমন কথা বলিয়ো না দাদা;—তিনি বামুনের মেয়ে—বৃদ্ধা—

হীরা। রেখেদে বামুনের মেয়ে—অমন বামুনের মেয়ে ঢের দেখেছি।

তর। বাবা ব'সে আছেন—ডাক্‌ছেন—চল না, ঐ রাস্তা দিয়ে বেরুবে।

"চল" এইকথা বলিয়া হীরালাল গৃহের বাহির হইলেন। তরঙ্গিণী তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভ্রাতা ও ভগিনী রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন।

তখন সেখানকার সকলেরই দৃষ্টি হীরালালের উপর পতিত হইল। ঘৃণায় কেবল ননির মাতা তাহার মুখাবলোকন করিলেন না।

হীরালাল পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমাকে ডাকছেন কেন? আমি একটু বিশেষ কাযে বাহির হইতেছিলাম।"

সীতা। তা' যা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ডাকাইয়াছি।

হীরা। কি কথা বাবা—বল, আমার মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

সীতা। ইনি ননিঠাকুরের মা—এঁকে তুমি চেন?

মহিষের মত আরক্ত বক্র দৃষ্টিতে ননির মাতার দিকে নেত্রপাত করিয়া হীরালাল গর্ব্বিতকণ্ঠে কহিলেন,—"চিনি, কেন বাবা?"

সীতা। তুমি ইঁহাদিগকে কি বলিয়া আসিয়াছ?

হীরা। ওসব কথার মধ্যে তুমি থাকিয়ো না, বাবা। ও মাগীরা বড় খড়ীবাজ,—ওদের চরিত্র-কথা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।

নিশীথ-নিশ্চিন্ত মানুষের শিরে সর্পাঘাত হইলে সে যেমন চমকিত, ভীত, ব্যথিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ননির মাতাও তেমনি হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় ও অভিমানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিস্ফারিত ও আরক্ত নয়নে হীরালালের পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার পিশাচ সন্তানের কথা নিজ কাণে শুন্‌লে? আমি চক্রবর্ত্তী-বংশের বধূ—আমার মুখের উপর এই কথা। এখনও ঐ দস্যুকে দমন করিতেছ না।"

সীতা। স্থির হও বউঠাকরুণ,—সকলে পাগল হইলে ত আর চলে না।

হীরালাল মৃদু হাসিয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—"বল কি বাবা;

সকলে পাগল কি? ঐ ঠাকুরুণই ক্ষেপেছেন, মর্ম্মকথা তোমাকে গোপনে বলিব।"

অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে ননির মাতা বলিলেন—"সীতানাথ, ছেলের মায়ায় আত্মকর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ, দেবতা-ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিতে বিস্মৃত হইয়াছ,—অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ শুনিতে বধির হইয়াছ,—কিন্তু এমন দিন চলিবে না। যদি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া থাকি,—যদি বিনা কারণে তোমার ছেলে আমাদিগকে অপমান করিয়া থাকে—তবে ভগবান্ ইহার বিচার করিবেন। ঐ ছেলের জন্যে হাহাকার করিতে হইবে।"

ননির মাতা আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতা।

সীতানাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সীতানাথের স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। অপর সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

হীরালাল রণবিজয়ী বীরের মত গর্ব্বোন্নত আননে মৃদু হাসিয়া বলিলেন,--"বাবা কি ভয় খেলে নাকি?"

সীতানাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন,—"বামুনের মেয়ে।"

হীরা। তাই কি?

সীতা। শাপ দিয়ে গেলেন।

হীরা। বাবা, শাস্ত্র জান না—তাই ওরকম কথা ব'লে ফেল্লে। যদি শাস্ত্র জান্‌তে, তবে বুঝতে পার্‌তে আমরা কি?

হীরালালের মাতা ক্ষুণ্ণ ও ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—শাস্তর উনি জানেন না, আর তুই-ই বা কোন্ ভশ্চায্যির টোলে পড়িয়াছিলি বাবা? বামুনের মেয়ে—বিশেষ তোদের কুলপুরোহিতের বংশ—ওদের সঙ্গে অমন করিস্‌নে বাবা। বামুনের শাপ—বড় ভয়ঙ্কর।

হীরালাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসির তরঙ্গাভিঘাতে

সেখানকার সকলে হাবুডুবু খাইয়া ফেলিল। কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হাসির বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া হীরালাল বলিলেন—"মা, আমি কোন ভশ্চায্যির টোলে পড়ি নাই বলিয়াই কি আমার শাস্ত্র-জ্ঞান হয় নাই? শাস্ত্রজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে পতিত-ভূমিতে কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় আপনি গজাইয়া উঠে। বিশেষতঃ আমরা ক্ষত্রিয় জাতি বামুন বেটারা চিরকাল আমাদেরই নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছে। যাক্, তোমরা সে সকল গুরুতর কথা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। আমার একটু বিশেষ কায আছে,—আমি চলিলাম।

সীতানাথ বাবু মনে মনে পুত্রের বিদ্যাবত্তার শত ধন্যবাদ দিলেন। ভাবিলেন, এমন ছেলে যে বংশে জন্মে সে বংশ পবিত্র ও ধন্য।

হীরালালের মাতাও সেইরূপ মনে করিলেন, কিন্তু তিনি ননির মাতার অভিসম্পাতটা হজম করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই স্থির করিয়া না উঠিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন।

বামাপিসী প্রভৃতি সকলেই হীরালালের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

তখন হীরালালের পিতা বলিলেন—"যাক্ বাবা, অত হাঙ্গামে কায নাই। ওরা গরিব মানুষ——

হীরা। না বাবা, তুমি ও সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে পারিবে না। ঐ বুড়া বজ্জাত মাগী আমার অনেকগুলি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

সীতা। উনি যে বলিলেন—দশ টাকা।

হীরা। তা নইলে আর বোলছি কি বাবা—মাগী ধড়িবাজের যাশু।

সারদা বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ গো, তখনই জানি, ভিতরে একটা কিছু না থাকিলে কি আর অমন হ'য়েছে! গ্রামে ত কত লোক আছে।"

ননির মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ওগো, ঠাক্রুণ, চালাকি খেল্‌তে গিয়ে বাঁধনে পড়ে গেছেন। হীরু ত আর সে রকম প্রকৃতির লোক নয় যে, ফাঁকি দিয়ে টাকা খাবে।"

হীরা। আসল কথা বলি শোন—ওদের বিষয় আমাকে পত্তনী বিলি দেবে বলিয়া কয়েক তারিখে প্রায় এক শত টাকার উপর লইয়াছে। এখন আর সে দিক দিয়া যাইতে চাহে না,—এখন বউটীকে দিয়ে টাকাগুলি নির্ব্বিবাদে হজম করিতে চায়।

হীরালালের মাতা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত মুখখানায় যেন চিন্তা ও আশঙ্কায় ঘন কালিমা ছাইয়া পড়িল।

হীরালালের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল। শাশুড়ী-বধূর মনের মধ্যে যেন বৈশাখী ঝটিকার পূর্ব্ব-সূচনা বলিয়া জ্ঞান হইল। সীতানাথও কথাটা ভাল বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। বলিলেন,—"হীরু, যাই হোক্, তুমি আর ওদের সম্পর্কে যাইয়ো না। লোকে নিন্দা ক'রবে।"

হীরা। বস্—বাবার পাগলামি দেখ,—আমার টাকাগুলো পথে পথে যাবে।

হী-মা। তা' যাক্ বাবা—ওতে লোকে নিন্দা ক'রবে—ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে।

হীরা। ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি তোমাদের নিকট লুক্কায়িত আছে মা। গীতাশাস্ত্র যদি পাঠ করিতে, তবে বুঝিতে পারিতে,—কায করাই কর্ত্তব্য। মানাপমান—ফলাফল কিছু দেখিবার প্রয়োজন করে না। এখন আমি চলিলাম।

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হীরালাল বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

হীরালালের পিতা হীরালালের মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি বল ?"

অপ্রসন্নমুখে হীরালালের মাতা বলিলেন,—"তুমি কিছু বলিলে না, কাযটা কিন্তু ভাল হইল না।"

সীতা। ভালমন্দ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গৃহিণী আর কোন কথা কহিলেন না। কোন স্পষ্টবাদী ও ভবিষ্যৎ-জ্ঞানে অভিজ্ঞ লোক সেস্থানে উপস্থিত থাকিলে, সীতানাথকে বুঝাইয়া দিতে পারিত,—স্নেহের মোহান্ধকারে ডুবিয়া পুত্রকে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছাড়িয়া দিতেছ, কালে ইহার ফলপ্রাপ্ত হইবে। মোহে ডুবিলে সদসৎ বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কে ছিলে আমার।

(১)

পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা অয়ি বরাননে,
পুণ্য-প্রেম-মন্দাকিনী-পূত বারিধারা
মন্দার-কুসুম-গুচ্ছ অয়ি সুলোচনে—
প্রিয়তমা, প্রেমময়ী প্রেয়সী আমার ?
শেফালিকা-সুরভিত সোণালী সন্ধ্যায়—
শান্ত হয় উদ্দাম এ জীবনের জ্বালা ;—
স্বপ্ন সঙ্গে এসে যদি বল একবার—
—ওগো কে ছিলে আমার।

(২)

নীল নীরদের মঞ্জু চন্দ্রাতপ-তলে
হীরক, কৌস্তুভ ভরা অনন্ত আকাশে,
নির্ম্মল কৌমুদী-মাখা লতিকা-বিতানে,
বসন্তের মৃদুল সে চন্দন হাওয়ায়,
হাস্যময়ী বিলাসিনী ধরণীর মাঝে,—
স্বপ্ন সম অতীতের ওগো মানময়ী ?
তৃপ্ত হই যদি ক'য়ে যাও একবার—
—ওগো কে ছিলে আমার।

(৩)

মনে পড়ে কোকিলেরে ব্যঙ্গ করি ডাকা,
মনে পড়ে গণা সেই আকাশের তারা,
সেই দীঘি, সুপ্ত নিশি, রক্তনা'ল ফুল,
ঘুম ভাঙ্গা সেই কথা আধ আধ ভুল,
হাসি কান্না সুখ শান্তি পলে পলে পলে—
মনে পড়ে গত কথা সকলি তোমার ;
মুছে যায় সব ব্যথা, সব যাই ভুলে—
ফিরে এসে কভু যদি বল একবার—
—ওগো কে ছিলে আমার—
তুমি—কে ছিলে আমার।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

অবসর—



সম্পাদক—শ্রীলালবিহারী দত্ত।

ভালবাসা।



ভালবাসার সীমা নাই। ভালবাসা অসীম, অপরিমেয়, অবিজ্ঞেয়। যেখানে সমস্ত প্রাণটা দিয়া ভালবাসিয়াও তৃপ্তি-লাভ হয় না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না, সেই খানেই সেই অপূর্ণভাবেই কি জানি কেমন মধুরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই জন্যই কবি ভালবাসা জানাইতে গিয়া ভাষা-সাগর মন্থন করিয়া আশানুরূপ শব্দ পাইলেন না,—বলিলেন,—

"স্বভাবে অভাব আছে পূরাব কেমন করে ?
প্রাণে যত ভালবাসা তত ভালবাসি তোরে ॥"

সত্যই তাই। ভালবাসার সহিত তুলনা করিবার জন্য স্থাবর জঙ্গম, ব্যোম রসাতল, তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, কিন্তু উপমার উপযুক্ত বস্তু পাইবে না। যাহা দেখিবে, তাহাই যেন অপূর্ণ, অযোগ্য, অকিঞ্চিৎকর। স্বভাবেই যখন সর্ব্বত্র অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন তাহাতে ভালবাসার উপমাস্থল হইতেই পারে না। এই যে নব বসন্তে সুনীল নভোমণ্ডলে পূর্ণ শশধর, এই যে ফুল্ল জ্যোৎস্না-পুলকিত মধুর যামিনী, এই যে কুসুম-সৌরভ-বাহী মলয়-মারুত, এই যে পিকবরের কূজন, দ্বিরেফ-গুঞ্জন, এই যে রজতধারা পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর সৈকত ভূমিতে রঙ্গ ভঙ্গ—সকলেরই মাধুর্য্য সমষ্টি, ভালবাসার তুলনার কিছুই নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহাতেই কবি প্রকৃতিকেই অপূর্ণা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া যখন উপমার বস্তু প্রাপ্ত হইলেন না, তখন অগত্যা বলিলেন, "প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।" ভালবাসার প্রগাঢ়তায় এমনই ঘটে বটে; তখন আত্মহারা হইতে হয়। যাহার নিজের অস্তিত্ববোধ রহিল, যাহার আপন পর জ্ঞান রহিল, সে ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিল না। বুঝিল না, ভালবাসার প্রতিবর্ণে কি নিগূঢ় অর্থ নিহিত আছে, কি গভীর রহস্যে উহা পূর্ণ।

প্রেমের পূর্ণ মহিমা বুঝিয়াছিলেন,—বৃন্দাবনের গোপিকামণ্ডলী। তাঁহারা হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, বস্ত্রাবরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্ত প্রাণে, প্রকৃতির উলঙ্গতায় শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। যে প্রেমে যমুনা উজান বহিয়াছিল, যে প্রেমে বেতসবিতানে, নিকুঞ্জবনে, লতামণ্ডপে, কুঞ্জে কুঞ্জে সকলেই বিভোরা হইয়া চতুর্দ্দিকেই নটবররূপ প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ

করিতেন, সেই প্রেমে মাতোয়ারা না হইলে প্রেমের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা যায় না। এই প্রেম স্বর্গীয় পবিত্র বিশুদ্ধ নির্ম্মল। এই প্রেমে কৃষ্ণ কালী হইয়াছিলেন। তাই মা আমাদিগের কালী হইয়াছেন। শ্যামা শ্যাম আমাদিগের বড় প্রিয় নাম। তাই প্রাণ ভরিয়া আত্মহারা হইয়া শ্যামা জননীকে ভালবাসিতে হইবে। শ্যামাঙ্গী বঙ্গভূমির প্রতি চাহিয়া দেখ। জননী নিরাভরণা, শিবোপরি দণ্ডায়মানা, এলোকেশী, নৃমুণ্ড-মালিনী, লোল-জিহ্বা—তথাপি অভয়া, বরদায়িনী। যে মার করে অসি দেখিতেছ, পূর্ব্বে ঐ হস্তেই মোহনবাঁশী ছিল; এই মুক্তবেণী—পূর্ব্বে যুক্তবেণী মোহনচূড়া ছিল, মুণ্ডমালা বনমালারূপে বিরাজিত ছিল—কটিতটের কিঙ্কিনী পীতধড়াকারে পরিশোভিত হইতেছিল, শব শিব ছিল। কেন মা এমন হইলেন, জান কি? যেরূপে গোপাঙ্গনা মজিত, যমুনা আকৃষ্ট হইত, সেরূপ এখন ত আর সাজে না! মা তোমাদিগেরই জন্য করালবদনী, অসুরনাশিনী, ভীমরূপা হইয়াছেন। ভক্তের জন্য, পুত্রের জন্য মায়ের এইরূপ গ্রহণ, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? জননীর এত দয়া, এত স্নেহ—তোমরা কি তাহা লাভের যোগ্য পাত্র বলিয়া প্রমাণ দিতে পারিবে না? প্রাণ ভরিয়া, মন খুলিয়া ভালবাসার মতন ভালবাসা মাকে দাও। তোমাদের স্বদেশ-প্রেম যেন উচ্চ আদর্শস্থানীয় হয়, যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও তোমাদের স্বদেশ-প্রেমের উপমা পাওয়া না যায়। বিভোর প্রাণে তদ্গত-চিত্তে যেন কবিবরের সহিত গলা মিশাইয়া গাহিতে পার—

"স্বভাবে অভাব আছে পূরাব কেমন ক'রে।
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে॥"

এইরূপ প্রেমের উদয় হইলে দেখিবে, শব শিব হইয়াছেন, মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে—আয়ান প্রতারিত হইয়াছে, তোমাদেরই জয়গানে ত্রিসংসার মুখরিত হইয়াছে। তখন আবার জননী ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম রূপে দেখা দিবেন—অধরে মধুর মুরলী দিয়া জগৎ বিমোহিত করিবেন—মধুর ভাবে ভারতবর্ষ পূর্ণ হইবে। আর তোমাদিগেরই মধুরভাবে জগৎ আকৃষ্ট হইয়া পদতলে লুণ্ঠিত হইবে—তোমরাই জগতে নমস্য হইবে।

পারিবে কি? ভালবাসার মতন ভালবাসিতে পারিবে কি? বুঝি বা পারিবে? প্রাবৃটের প্রবল বাত্যা বৃষ্টিপূর্ণ রজনীর অবসানে উষার মধুর আলোকে ভূমণ্ডল যেরূপ উদ্ভাসিত হয়, জীবগণ আনন্দে কোলাহল করিতে

থাকে—তদ্রূপ কোলাহল যখন শ্রুতিগোচর হইতেছে—ভারতবাসী স্বার্থপরিত্যাগ করিয়া, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া মাতৃসেবায় যখন প্রাণপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন রাত্রি যে অপগত হইয়াছে, উষার সমাগম হইতেছে—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাই বলিতেছিলাম, ভাই! পশ্চাৎপদ হইও না, ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া জগতে আদর্শ চিত্র স্থাপিত কর। যে ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, যে সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, কর্ম্মের দোষে, বুদ্ধির বিভ্রংশে, স্বার্থের বশে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতায় তাহা যদি হারাইয়া ফেল, তাহা হইলে চিরকালই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। বড় সাধ করিয়া, বহু আরাধনার ফলে, প্রেমের পাত্র আনিয়াছ; উপেক্ষা করিও না, কালবিলম্ব করিও না, আলস্য ঔদাস্যে অভিভূত হইও না, তাহা হইলে হৃদয়ে প্রেমাস্পদের আর দর্শন পাইবে না—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরহানলে দগ্ধ হইয়া দীন-দরিদ্রের উপেক্ষণীয় হইয়া কালযাপন করিতে হইবে,—আর নিজের অযোগ্যতার জন্য সংসারের সকলের নিকট শত ধিক্কার পাইবে।

শ্রীঃ—

মৃত্যু।

শরীর হইতে আত্মা হইলে বিচ্ছেদ,
মৃত্যু বলি' আমরা সকলে করি খেদ।
প্রতিপলে পরমায়ু হইতেছে ক্ষীণ;
দাতা, ভোক্তা, সকলেই মৃত্যুর অধীন।

শৈশব, কৌমার কিম্বা হউক যৌবন,
বাসের অযোগ্য দেহ হইবে যখন;
তখনি সে দেহ ছাড়ি' আত্মা যা'ন চলি',
আমরা আকুল হ'য়ে মৃত্যু তা'কে বলি।

বালক, যুবক, বৃদ্ধ, কুৎসিত, সুন্দর,
অতি বিজ্ঞজন কিম্বা মূর্খতম নর;
ধনবান কিম্বা ঐ ভিক্ষুক সুদীন,
রাজা, প্রজা সকলেই মৃত্যুর অধীন।

মৃত্যু নাহি হয় বশ বিদ্যা-উপার্জ্জনে,
মৃত্যু নাহি হয় বশ কুলে, শীলে, ধনে;

সুবর্ণ সঞ্চয়ে মৃত্যু নাহি হয় বশ,
সেও মরে, থাকে যা'র বিশ্বভরা যশ।

জনমের পরে দেহ ক্রমে বৃদ্ধি হয় ;
যৌবনের পরে পুনঃ জরার উদয়,
জরাজীর্ণ দেহ কি রহিবে চিরদিন ?
অসম্ভব ! হ'তে হ'বে মৃত্যুর অধীন।

আত্মা কিন্তু অমর, মরণ নাহি তাঁর ;
দেহ নাশে নাহি হয় দেহীর সংহার।
জীবিত কি মৃত কোন ব্যক্তির কারণ,
বিজ্ঞজন শোকে কভু মুগ্ধ নাহি হ'ন।

জন্মিলে মরণ আছে জানিও নিশ্চয় ;
মরিলে জনম তা'র পুনর্ব্বার হয়।
অতএব যাহা নাহি হয় পরিহার,
তা'র তরে শোক, দুঃখ, ভয় কেন আর ?

প্রস্তুত হইয়া থাক মৃত্যুর কারণ ;
তা'র তরে শোক, দুঃখ, ভয় অকারণ।
মৃত্যুকে না চাও যদি, তা'রে কর ভয় ;
তবু সদা সঙ্গে থাকে, সে বড় দুর্জ্জয়।

দিবানিশি মৃত্যুভয়ে ভীত তব মন ,
কাঁপে বুক মৃত্যু-কথা করিলে স্মরণ,
যা'রে এত ভয়, সেত নিত্য সহচর ;
ছায়া-সম সঙ্গে থাকে বিশ্বের ভিতর।

মৃত্যুভয়ে বল কোথা পলাইবে ভাই ?
মৃত্যুর অবাধ গতি বিশ্বে সর্ব্ব ঠাঁই,
জলে, স্থলে, ব্যোমে, বায়ু-সাগরে, অনলে,
সর্ব্বত্র মৃত্যুর লীলা চিরকাল চলে।

প্রাণভয়ে ভগিনীকে কারাগারে দিয়া,
কংস রাজা রেখেছিল শৃঙ্খলে বাঁধিয়া।

কোথা কংস ? সেও গেছে মৃত্যুপথ দিয়া ;
এ দেখেও মৃত্যুভয় ! শান্ত কর হিয়া।

দুর্দ্দান্ত রাবণ রাজা, যমে করি জয়,
ভেবেছিল মৃত্যু আর হ'বে না নিশ্চয়।
কোথা সে রাবণ ? কোথা স্বর্ণলঙ্কা তা'র ?
মৃত্যুকর-স্পর্শে সব হ'ল ছারখার !

যখন আসিবে মৃত্যু প্রসারিয়া কর,
কত স্নেহে লবে তুলে বক্ষের উপর ;
সহস্র বন্ধন ছিন্ন করি' সে সময়,
যেতে হ'বে তা'র সাথে, এ কথা নিশ্চয়।

দারা, পুত্র, মিত্র আদি আত্মীয় স্বজন,
কেহ পারিবে না ধ'রে রাখিতে তখন।
রাশি রাশি সুবর্ণ কি মণি মুক্তাহার,
প'ড়ে র'বে তুমি যবে ছাড়িবে সংসার।

আজীবন যে সম্মান ক'রেছ অর্জ্জন,
যে যশের কথা দেশে ঘোষে সর্ব্বজন ;
সে যশ-গৌরবে মৃত্যু নাহি হ'বে বশ,
যথাকালে পা'বে তা'র স্নেহের পরশ।

এই মুহূর্ত্তেই কিম্বা বহু বর্ষ পরে,
কোথায় কখন মৃত্যু আসিয়া যে ধরে।
কেহই জানে না তাহা ; শাস্ত্র হেথা মূক,
প্রস্তুত হইয়া থাক দৃঢ় করি' বুক।

যে স্বর্গের আশা করি সংসার ভিতরে,
নানা জনে নানা রূপে পুণ্য কর্ম্ম করে ;
সে স্বর্গের চাবি ঐ মরণের হাতে,
হাসি-মুখে চ'লে যাও তবে তা'র সাথে।

সে বড় আপন, ওগো সে বড় আপন ;
বিনাপণে খুলে দেয় সংসার-বন্ধন।
ভ্রান্তি তবু গেলনা ত ! তা'রে কর ভয় ;
সে যে বন্ধু, সে যে মিত্র, সে যে কৃপাময় !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাচিঙ্গ।



বিনশ্বর জগতের দুঃখ-জড়া-মৃত্যু-প্রপীড়িত জীবগণের উদ্ধার মানসে ভগবান্ বুদ্ধদেব বিশ্বব্যাপী করুণা লইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজ্যসম্পদ তৃণবৎ পদ-দলিত করিয়া সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় দীনবেশে কত স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ কত শতাব্দী, কত যুগ, অতীতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপিও তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন পুণ্যশ্লোক ভারতবর্ষ সগৌরবে ধারণ করিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বুদ্ধদেব তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-প্রচার-হেতু যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে, এখনও তাহা অনেকের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

আজ যে স্থানের উল্লেখ করিতেছি, সেই স্থানে স্বয়ং বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহা কৃত্রিম বা পাষাণের উপর খোদিত নহে। সমতল মৃত্তিকার উপর প্রকৃত পদ-যুগলের চিহ্ন।

চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ নানাবিধ বনচর-শব্দ-মুখরিত নয়নানন্দদায়ক, উত্তুঙ্গ-শৈলমালা-পাদদেশোদ্ভূত, শস্য-শামল-তটশালিনী পুণ্যসলিলা শ্রীমতী নদী-তীরস্থিত হস্তিগ্রাম (বর্ত্তমান হাইদগাঁও) ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র পদচিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্য-শালী মনে করিতেছে। এইস্থানে সমতল ভূমির উপর ভগবান বুদ্ধদেবের একটী মন্দির আছে। তাহাকে “ফরাচিঙ্গ” বলে। বৌদ্ধ-ভাষায় “ফরা” শব্দের অর্থ “বুদ্ধ” ও “চিঙ্গ” শব্দের অর্থ “মন্দির বা চিহ্ন”; সুতরাং “ফরাচিঙ্গ” বলিলে বুদ্ধদেবের মন্দির বা চিহ্ন বুঝায়। মন্দিরটী স্মরণাতীত কাল হইতে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবল রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও আপনার দেহ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি একজন সহৃদয় বৌদ্ধ তাহার চুণকাম ও একটী পানীয় জলোপযোগী সরোবর খনন করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মন্দিরটী সমতল ভূমির উপর সুদৃঢ়রূপে গঠিত। চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত দেওয়াল। ভিতরে প্রবেশ করিবার কি দেখিবার কোন দরজা বা জানালা নাই। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের প্রকৃত পদচিহ্ন আছে বলিয়া প্রকাশ। সেইজন্য প্রতি বিষুব সংক্রান্তিতে ইহার সম্মুখস্থ মাঠে প্রকাণ্ড

মেলা বসিয়া থাকে। বহু-দূরাগত হিন্দু বৌদ্ধগণ আগমন করিয়া এই মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতঃ আপনাকে ধন্য ও পবিত্র মনে করেন। দীপ জ্বালাইয়া দিয়া স্বীয় স্বীয় মানসিক প্রদান করিয়া থাকেন। মন্দিরের গাত্রে এত দীপ জ্বলিতে থাকে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন একটী সমুজ্জ্বল হীরক-শৈল সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে।

ইহার স্থাপন সম্বন্ধে দেশে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

পুরাকালে চট্টগ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত পর্ব্বতমালা হইতে ভৈরব নদ বলিয়া একটী প্রকাণ্ড নদ উদ্ভূত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বর্ত্তমান কর্ণফুলী ইহার করদ নদী ছিল। ভৈরব নদ কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহার স্মৃতি-স্বরূপ এখনও কেলীসহর, ধলঘাট, হাবিলাস দ্বীপ প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই ভৈরব নদের তীরে একজন সমৃদ্ধিশালী হিন্দু সওদাগর বাস করিতেন। অদ্যাপিও তাঁহার বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ ইষ্টকাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। তাঁহার বাণিজ্যপোতের ভগ্ন কাষ্ঠাদি মৃত্তিকা-খনন কালে দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল জানা যায় না। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর "নবীন যোগিরাজ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

যখন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে শারদ-চন্দ্রমা-শান্ত শীতল জ্যোৎস্নার ন্যায় শান্তি বিকিরণ করিতেছিল, সওদাগরের চিত্ত-চকোর সেই স্বর্গীয় দুর্লভ সুধা পান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ দর্শনে সশিষ্য তাঁহার আবাসভবন চক্রশালা গ্রামে পদার্পণ করিলেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব প্রথম যে স্থানে অবতরণ করেন, তাহা "রাজঘাটা" বলিয়া খ্যাত। অদ্যাপিও সেই রাজঘাটায় বসিয়া শ্রীমতীর মেলার সময় হিন্দুগণ স্নান করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব বিষুব সংক্রান্তির দিন শুভ মুহূর্ত্তে রাজঘাটায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতি নবীন বাসন্তী-সুষমায় সজ্জিতা। ফুল্ল-বনকুসুম-ভারাবনতা নানাবিধ তরুলতা, বসন্ত-বিহঙ্গম-মধুর-কাকলী-ঝঙ্কৃতা শ্যামল-বনরাজি, গিরি-নির্ঝরিণীর সুমধুর জলপ্রপাত, নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ বিশাল সবুজবর্ণ ক্ষেত্র, উত্তালতরঙ্গ-বিশিষ্ট ভৈরবনদের ভৈরব গর্জ্জন, মেঘ-নির্ম্মুক্ত বিশাল নীলাকাশ সন্দর্শন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ভগবানের অন্তরে বিশ্বপ্রেম উছলিয়া উঠিল। তিনি একটী বিশাল বটবৃক্ষ-মূলে আত্মহারা

হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ আম্রকাননে (বর্ত্তমান আমতলী) অবস্থান করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে, সওদাগরকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তৎপর নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া—ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া—আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন, এবং এই সময় সওদাগরকে "নবীন যোগিরাজ" আখ্যা প্রদান করেন।

ভগবান বুদ্ধদেব যে স্থানে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার পবিত্র পদচিহ্নোপরি এই "ফরাচিঙ্গ" মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে এই পদচিহ্ন নষ্ট হইবে মনে করিয়া সওদাগর তাহার কোন দরজা কি জানালা রাখিয়া যান নাই। যদি কোন দরজা কি জানালা থাকিত, তবে সেইখানে এইরূপ অকৃত্রিম চিহ্ন বোধ হয় লুপ্ত হইয়া যাইত।

কালক্রমে সমস্ত চক্রশালা বৌদ্ধধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু প্রবল-পর্ত্তুগীজ আক্রমণে ভীত হইয়া সমস্ত বৌদ্ধ জাতি দক্ষিণ দিকে পলায়ন করে। বর্ত্তমানে চক্রশালা গ্রামে একটী বৌদ্ধও দৃষ্ট হয় না। চক্রশালা গ্রামে "নবীন যোগিরাজের" অনেক স্মরণ-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার খনিত "নবীন পুকুর," "যোগীর পুকুর" তাঁহার কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে মেলার সময় হিন্দু বৌদ্ধদিগের আন্তরিক ভক্তি দেখিলে মহাত্মা জয়দেবের সেই শ্লোকটী মনে পড়েঃ—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।"

শ্রীনগেন্দ্রলাল চৌধুরী।

সাধুতার জয়।



ধর্ম্মের জয় পাপের পরাজয়, কোন কোন ঘটনায় তাহা যথার্থ প্রমাণিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ের নিদর্শন প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অদ্য 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সধনা-চরিত আলোচনা করিতেছি।

সধনা জাতিতে কসাই হইলেও ভ্রমেও কখন হিংসাবৃত্তি সাধন করিতে অগ্রসর হন নাই; অন্যের নিকট হইতে মাংস খরিদ করিয়া তাহা বিক্রীত হইলে যাহা কিছু লাভ হইত, তাহাতেই কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। মাংস বিক্রয়ের জন্য যে বাটখারা ব্যবহার করা হইত; তাহা প্রকৃত পক্ষে বাটখারা নহে, উহা 'নারায়ণ শিলা' সধনা না জানিয়া শালগ্রাম শিলাকে প্রস্তর খণ্ড মনে করিয়া বাটখারা রূপে ব্যবহার করিতেছিলেন। দৈবাৎ একদিন এক চতুর বৈষ্ণব, সধনার কাছে শালগ্রাম শিলারূপ মনোহর বাটখারা দেখিতে পাইয়া বহু কাকুতি মিনতি ও সুকৌশলে উক্ত বৈষ্ণব, উদার-হৃদয় সধনার নিকট অপর শিলাখণ্ড অর্পণ করিয়া, ঐ শালগ্রাম শিলা গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, দু চা'র দিন বিশুদ্ধ মন্ত্রে তাঁহার পূজাদি চলিতে লাগিল।

এ স্থলে 'ভক্তমালের কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

রাত্রিযোগে কহে তাঁরে ঠাকুর স্বপনে।
তুমি কেন আমারে হে আনিলে এখানে॥
সধনার কাছে আমি সুখে থাকিতাম।
তার মুখে মোর নাম-গুণ শুনিতাম॥

এরূপ বিস্ময়কর স্বপ্ন দর্শনে, বৈষ্ণব সধনাকে পরম ভক্ত জ্ঞান করিয়া শিলাখণ্ড প্রত্যর্পণ করিয়া আসিলেন। সধনা বৈষ্ণবের মুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাতিবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক, ভিক্ষা দ্বারা নিজ উদর পূর্ণ করিতে করিতে ঠাকুরের সেবা পূজাদি চালাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, সধনার ৺জগন্নাথ দর্শনে অভিলাষ হইল; শালগ্রাম-শিলা সঙ্গে লইয়াই যাত্রা করিলেন। শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পথে একদিন এক গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় লইলেন; গৃহস্থ-পত্নীর চরিত্র দূষিত ছিল, রাত্রিকালে সে নিজ পাপ-বাসনা সধনার নিকট ব্যক্ত করিল; পরম

সাধু সধনা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অপবিত্রা রমণী কিন্তু সধনার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, তাহার পতিই তাহার বাসনা চরিতার্থ করিবার একমাত্র অন্তরায়, এই মনে করিয়া হতভাগিনী নিজ স্বামীর মস্তক ছেদন করিয়া আনিয়া সাধুর সম্মুখে ধরিল। কি মর্ম্মান্তিক, অহো! সধনা এই অপবিত্রা কামিনীর এইরূপ কার্য্য দর্শনে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যথোচিত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

পতির মস্তক ছেদন করিয়াও সধনার মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না দেখিয়া, যুবতী সাধুকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'চুরির জন্য সধনা আমার স্বামীর মস্তক ছেদন করিয়াছে'। চীৎকারে লোকজন আসিয়া পড়িল, হত্যার কথা প্রকাশিত হইল,—সধনাই যে প্রকৃত হত্যাকারী তাহাই স্থির হইল। সাধু সধনা মানব-হত্যাকারী বলিয়া হাকিমের নিকট আনীত হইলেন। উদারহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ সধনা আতিথ্যের বিষয় স্মরণ করিয়া, দুষ্টা রমণীকে জড়িত না করিয়া নিজ অপরাধ বিচারকের নিকট স্বীকার করিলেন। বিচারে তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইল। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দীনের আশ্রয় বিপদ-বারণ মধুসুদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে এই গুপ্ত-হত্যার কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যুবতীর পাপ ঢাকা থাকিল না; পূতচরিত্র সধনা মুক্তিলাভ করিলেন; রমণী স্বামী-হত্যার প্রতিফল স্বরূপ সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল; আর সধনা নারায়ণের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে কটকে উপনীত হইলে, পাণ্ডাগণ ৺ভগবান জগন্নাথদেবের কৃপাদেশানুসারে তাঁহাকে লইয়া মহাসমাদরে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিলেন। সধনা প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া পরম পবিত্র ও আনন্দিত হইলেন। যাহারা সধনাকে পথে কসাই বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া সাধুর পাদোদক সেবন ও শিরে ধারণ করিল।

আমরাও সাধু সধনার চরিত্র আলোচনা করিয়া, মুগ্ধ এবং ধন্য হইলাম। বুঝিলাম, পাপের ক্ষয় এবং পুণ্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়।

চিল্কা-হ্রদ।

গত বৎসর আমি ও আমার জনৈক বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রলাল গোস্বামী রামেশ্বর তীর্থে ভ্রমণ করিতে যাই। পথে, যে সকল নয়নের ও মনের প্রীতিপ্রদ বস্তু অবলোকন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে চিল্কা-হ্রদ একটী। ট্রেণে বসিয়া এই হ্রদের অতি মনোরম দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। নিকটে হ্রদবক্ষে শ্যামল বৃক্ষ-লতাদি পরিশোভিত কয়েকটী দ্বীপ দেখিলাম। আমাদের গাড়ী কখনও একেবারে জলের কিনারা দিয়া, অথবা কখনও উপকূল দিয়া গমন করিতে লাগিল।

চিল্কা-হ্রদটী এত বৃহৎ, যেন সমুদ্র; এক কূল হইতে অপর কূলের রেখা পর্য্যন্তও নয়নগোচর হয় না। যেন, জল ও আকাশ একত্রে মিশিয়া গিয়াছে। নানা প্রকার জল-বিহঙ্গম বিবিধ প্রকারের ধ্বনি নিঃসরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। গাড়ী আপনার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। আমরা গাড়ীতে বসিয়া ইহার মনোহর গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের গাড়ী "রম্ভা" ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিল। এখানে অনেক ভদ্রলোক অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা এই হ্রদে নৌকাযোগে পরিভ্রমণ করিবেন। "ভুসন্দপুর" ষ্টেশন হইতে "হুমা" ষ্টেশন পর্য্যন্ত ৩ মাইল রেলের ধারে ধারে চিল্কা-হ্রদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই হ্রদ উড়িষ্যা প্রদেশের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। দুই শত গজের কিঞ্চিৎ অধিক একটী বালুকাময় ভূমিখণ্ড হ্রদটীকে বঙ্গোপ-সাগর হইতে বিভক্ত করিয়াছে। ট্রেণ হইতে সাগরের রেখা পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয় না। বহির্ভাগাবস্থিত অদৃশ্যমান সাগর-লহরীর গর্জ্জন হ্রদের অনেক দূর হইতেই শ্রুত হয়। চিল্কা-হ্রদ পশ্চিমে উচ্চ শৈলশ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ, কোন কোনও স্থানে ঠিক ঋজুভাবে ইহার তীরে দণ্ডায়মান এবং কোনও স্থানে ঠিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, জলের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণে ক্ষুদ্র পর্ব্বতময় "ওয়াটার শেড্" দ্বারা সীমাবদ্ধ। এইগুলি স্বাভাবিক ভাবে উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রদেশ বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর দিকে ইহা অসীম বালুকাময়

পুলিন, শ্যামল তরুরাজি-পরিপূর্ণ তীরভূমি এবং বৎসরে বৎসরে নদীর গতির দ্বারা প্রস্তুত দ্বীপ-শ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ।

একটীমাত্র অপ্রশস্ত মোহানা, বালুকাময় স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হ্রদটীকে সাগরের সহিত সংযোজিত করিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র কয়েক শত গজ প্রশস্ত। এই মোহানার মধ্য দিয়া সাগর হইতে অতি প্রচণ্ডবেগে স্রোত প্রবাহিত হইয়া হ্রদাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; কোন কোনও সময়ে বৃহৎ বৃহৎ উর্ম্মিরাজি উত্তোলন পূর্ব্বক ইহার মধ্য দিয়া স্রোত প্রবাহিত হয়। এই সময়ে উত্তপ্ত নদী সদৃশ এত ফেনরাশি উদ্গীরণ করে যে, নৌকাগুলি ইহার মধ্যে বিচরণ করিতে এমন কি থাকিতেই পারে না।

এই হ্রদটী ৪৪মাইল দীর্ঘ। ইহার উত্তরার্দ্ধাংশ ২০মাইল প্রশস্ত এবং দক্ষিণার্দ্ধাংশ ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত আঁকাবাঁকা ও কেবলমাত্র ৫মাইল প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে ইহার ক্ষেত্রফল তিনশত চুয়াল্লিশ বর্গ মাইল এবং বর্ষাকালে চারিশত পঞ্চাশ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার গভীরতা ৩ হইতে ৫ ফিট্ পর্য্যন্ত এবং কোন কোনও স্থানে ৬ ফিট্ও আছে। ইহার তলদেশ সাগরাপেক্ষা মাত্র কয়েক ফিট্ নিম্ন।

পৌষ ও আষাঢ় মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহার জল অত্যন্ত লবণাক্ত, কিন্তু যখন বৃষ্টি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হয় এবং নদীর জল পূর্ব্বদিক হইতে হ্রদে পতিত হয়; তখন সামুদ্রিক জল ধীরে ধীরে নির্গত হইয়া যায় এবং চিল্কার জল ঈষৎ লবণাক্ত হইতে নির্ম্মল স্বচ্ছজলে পরিণত হয়।

এই হ্রদে মৎস্যজীবীরা ক্ষুদ্র নৌকারোহণ পূর্ব্বক অথবা ঘুণী পাতিয়া মৎস্য শিকার করে। এক সময়ে এই হ্রদের চারিদিকে ছয় সাত হাজার শিবমন্দির ছিল, কিন্তু এক্ষণে কোন কোনও স্থানে অল্প কয়েকটী মন্দির ধ্বংসাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক শ্বেতাঙ্গপুরুষ পক্ষী শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। এহ্রদে খুব বড় বড় কাঁকড়া পাওয়া যায়। অনেকে এই কর্কট ভক্ষণের নিমিত্তই এখানে আসিয়া থাকে। এখানে "এরা" নামক এক প্রকার কদাকার জাতীয় বিহঙ্গম দৃষ্ট হয়। এই পক্ষীগুলির পালক নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। চিল্কাহ্রদে হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রক জলজন্তুও আছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

অর্থাৎ।

পরমাসুন্দরী কন্যা পুত্রবধূরূপে
যদি আমি পাই,
গুণে হয় গুণবতী ভারতী সমান
তবু নাহি চাই ;
অর্থাৎ কি হেতু—বলি তাই,—
যদ্যপি জনক তা'র সম্প্রদান তরে
না মিটায় খাঁই ;
না যদি কাঞ্চন মূল্য পাই
শুনিব না কোন (ও) কথা—'বরপণ' চাই।

কুলের বড়াই মিছে ও হবু বেহাই !
পাবে না 'রেহাই'
হাসি-মুখে মন-সুখে টাকা ছাড় দাদা
ঘুচাই বালাই ;
অর্থাৎ 'যাচাই' দরটাই
নিন্দনীয় বটে কিন্তু অতি মনোহর
তাই টাকা চাই ;
সভা-সমিতির মুখে ছাই
যে আমি সে আমি তা'র নড় চড় নাই।

কাল মেয়ে কাণা খোঁড়া হাবা কিম্বা বোবা
কিছু কি তাকাই !
ছেলেটীরে দিব ছেড়ে জলের মতন—
চিনেছি টাকাই ;
অর্থাৎ এ 'কন্যাদায়ে' ভাই
সব কথা রাখি আমি বড় ভাল লোক
'রেস্ত' যদি পাই ;
বাঁচ কিম্বা মর ক্ষতি নাই
'বরপণে' রাজী হ'লে বাজিবে সানাই।

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মিলন ও বিচ্ছেদ।

কিসে সুখ? মিলনে না বিচ্ছেদে? তুমি নটবর, প্রেমিক, রসিক—বলিতে পার কি কিসে সুখোদয় হয়? যাহার জন্য প্রাণ কাঁদে—যাহার দর্শন লাভাশায় নয়ন ও মন ব্যাকুলিত হয়, যাহার অঙ্গস্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—চৈতন্য তিরোহিত হয়, যাহার বিচ্ছেদে অশনে বসনে, শয়নে স্বপনে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হয় না—তাহার সংশ্লিষ্ট সেই কি-যেন-কি-নাই—সেই মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কি-যেন-কেমন-একটা মধুর ভাব—এক অব্যক্ত অপূর্ব্ব সুখকর আশার স্পন্দন কি বাঞ্ছনীয়? না মিলনের সুখ, আশার শান্তি, কামনার শেষ সীমা অভিপ্রেত? জলদ-পটলজাল-সমাচ্ছন্না, ঘন তামসময়ী রজনীতে চঞ্চল চপলার চকিত ক্রীড়া মধুর, না অসংখ্য তারকাবেষ্টিত পূর্ণ শশধর-শোভিত কৌমুদী-বিধৌত যামিনী মধুর? গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থান প্রিয়, কি শুদ্ধ গঙ্গা অথবা শুদ্ধ যমুনার রঙ্গভঙ্গ নয়নানন্দদায়ক? বিজন অরণ্যমধ্যবর্ত্তী গিরিশিখরে বন-ফুলের সৌরভ প্রাণোন্মাদক, না মানব-হস্ত-রচিত উদ্যানজাত কুসুম-নিচয়ের সৌগন্ধ চিত্তাকর্ষক? কে ভাল, কে আকাঙ্ক্ষিত, তুমি প্রণয়ী—প্রকৃত প্রেমতত্ত্বাভিজ্ঞ মহাপুরুষ, তুমি বলিতে পার! তাই আজি শ্রান্ত মনে, দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, বলিয়া দাও, কে ভাল, কাহার সেবায় সুখাধিক্য ঘটে।

কবি বলেন—

"আশার পিপাসা সখি! হলো ত ফুরায়ে গেল।
আলিঙ্গন হ'তে সখি! আঁখির মিলন ভাল॥"

জানি না এই কবি তত্ত্বদর্শী কি না, তবে তিনি যে মিলনের অপেক্ষা বিচ্ছেদের পক্ষপাতী, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতই মানুষ যখন পিপাসায় শুষ্কতালু হয়, তখন অচিরে শীতল সলিল-লাভের আশা তাহার হৃদয়ে যে উৎসাহের, যে আনন্দের উদ্রেক করে, আকণ্ঠ-জলপানের পর তাহার সে উৎসাহ, সে আনন্দ থাকে কি? পিপাসা মিটিলেই জলের মূল্য কমিয়া গেল—আর বারি-লাভের ইচ্ছাও থাকে না। জলের মধুরতা, মিষ্টত্ব, মনোহারিত্ব—যতক্ষণ পিপাসা প্রবল থাকে। কিন্তু তাহার পর—পিপাসা সমাপ্তির পর অমৃতও বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। তাই কবি, আলিঙ্গন অপেক্ষা করিয়া আঁখির মিলনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই যে তাহাকে পাই-পাই-পাই না ভাব, সেই ঔৎসুক্য চিত্তে তাহার দর্শন আশা, অথচ

বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবার সুযোগ নাই—মধুর ভাবোদ্দীপক নহে কি? উৎসাহ, উদ্যম, প্রয়াস, যত্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষ যেন অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে—কর্ম্মঠ থাকে। কিন্তু যাহাতে আলস্য, অবসাদ উপস্থিত করে, তাহা কি ভাল? কবি ইহা ভাবিয়া বিচ্ছেদের প্রশংসা করিয়াছেন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর, সর্ব্বত্রই ইহাই পরিলক্ষিত হইবে। যে জাতি যখন স্বাধীনতা মহারত্ন লাভাশায় ব্যস্ত, তাহার মধুর আস্বাদন পাইবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে; সে জাতি তখন কর্ম্মবীরের ন্যায় সংসারে বিচরণ করিতেছে, বিপদের উপর বিপদের তরঙ্গ মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বাধা বিঘ্নের আক্রমণের পর শত সহস্র বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, নির্য্যাতন নিগ্রহের পরিসমাপ্তি নাই—তথাপি সেই প্রাণের বস্তু লাভের জন্য স্থাণুবৎ অবস্থান করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর যখন অভীপ্সিত বস্তু লাভ হইল, যখন উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিল, তখন বিশ্বাস-বিভ্রম, ঐশ্বর্য্যোন্মত্ততা আচ্ছন্ন করিল। আবার অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

যাহা একস্থানে সত্য, তাহা অন্যস্থানেও সত্য। প্রণয়-ক্ষেত্রেও এইরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে। গোপবালা যখন বিরহ-বিধুরা, তখন বড়ই চঞ্চলা মুখরা। কিন্তু শ্যাম-মিলনের পর অবসাদ আলস্যে নিমীলিতনেত্রা বিরহিণী প্রিয়জনের অদর্শনে যখন বড়ই কাতরা হন, তখন নাগররত্নকে পাইবার জন্য কতই ক্লেশ, কতই চেষ্টা, কতই কামনা করিয়া থাকেন, তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্যা হইয়া অনন্যমনা হইয়া প্রণয়ী-ধ্যান জ্ঞাননিয়তা হইয়া, সুখ দুঃখ-বিস্মৃতা হইয়া পাগলিনীর ন্যায় কার্য্য করিতে থাকেন। সেই সময়ের উদ্ভ্রান্ত ভাব রসজ্ঞের নিকট অতি মধুর নহে কি? কি এই ভাবের পরি-সমাপ্তি মিলনে হয়। সংসারে আশাই মৃত-সঞ্জীবনী অমৃত-প্রদায়িনী। আশাতেই জীব-জগৎ পরিচালিত। আশা-কুহকিনী মায়াবিনী, মরুভূমিতে মরীচিকা। এই নিমিত্তই ভগবদ্ভক্ত পরম সাধু বলেন,—"প্রভো! সালোক্য সাযুজ্য-প্রমুখ সমাধি চাহি না, নির্ব্বাণ মুক্তির প্রার্থী নহি—জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।" যাহা পরিসমাপ্তি, যাহা নির্ব্বাণ, তাহাতে সুখ কোথায়! "সোঽহং বলিলে সমস্তই শেষ হইল। ভোজনে সুখ, ভোজনান্তে স্ফীতোদরে কণ্ঠশ্বাস হইলে সুখ কি? তাই নমস্য কবি, বিচ্ছেদে সুখানুভব করিয়াছেন। তুমি রসিক-প্রবর, এখন বল, মিলনে সুখ, না বিচ্ছেদে সুখ হয়?

শ্রীঃ—

রাঠোরের বীরত্ব।



(ঐতিহাসিক চিত্র)

পিতৃদেবকে, ধ্বান্তাচ্ছন্ন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে রুদ্ধ করিয়া ও ভ্রাতৃরুধিরে হস্ত রঞ্জিত করিয়া, দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব, ভারতের কীর্ত্তিময়ী নগরী দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, ভ্রাতৃহন্তা ক্রুর সাজাহান-তনয়, সমগ্র ভারতে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। দুরাত্মার কঠোর হস্তে, হিন্দু-দেব-দেবীর মন্দিরসমূহ লয়প্রাপ্ত হইতেছে। জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দুদিগের আর দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই।

নিরীহ হিন্দুদিগের প্রতি, দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেবের এতাদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া, যশোবন্তসিংহ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তদীয় ফুল্ল-কমলতুল্য বদনমণ্ডল মলিন ও প্রফুল্ল ইন্দীবরতুল্য লোচনদ্বয় বর্ষাজলক্লিন্ন নীরজ সদৃশ ম্লান হইল। তিনি প্রাণপণ করিয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ, প্রবল শত্রু ও মণিব দুরাত্মা সম্রাটের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঔরঙ্গজেব, যশোবন্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহার প্রাণ-হননের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যশোবন্তের একজন বিশ্বস্ত অনুচর সম্রাটের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই বিশ্বস্ত, তেজস্বী অনুচরের নাম মোকন্দদাস। যাহা হউক, অবশেষে—সেই ক্রুরমতি, পাষণ্ড ঔরঙ্গজেব, যশোবন্তের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন -নয়নের মণি ও বার্দ্ধক্যের যষ্টিস্বরূপ পৃথ্বী-সিংহের প্রাণ বিনাশ করিলেন।

পৃথ্বীসিংহের সঙ্গে সঙ্গে যশোবন্ত সিংহের আশা-ভরসা সমস্ত সরসীর অতল জলে ডুবিয়া গেল। কিন্তু মোগল-কুল-পাংশুল, যবন-সম্রাট ঔরঙ্গজেবের এই নৃশংস আচরণে, বীরকেশরী, রাঠোর-সর্দ্দার মোকনদাসের হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তদীয় জ্যোতির্ম্ময় লোচনদ্বয় হইতে বহ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। রাজসভামধ্যে দুর্বৃত্ত ঔরঙ্গজেবকে সাতিশয় অপমানিত করিবেন বলিয়া, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন।

একদিন, ভারত-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন সময় মহাতেজা মোকনদাস

সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া রোষকষায়িত লোচনে তীব্রস্বরে বলিলেন, "দুর্বৃত্ত যবন-রাজ! তোর এ অযথা অত্যাচার আর সহ্য হয় না। নির্দ্দোষ হিন্দুগণকে ইতর জীব-জন্তুর ন্যায় পদদলিত করিয়া রাজ্য-শাসন করিতে কামনা করিস্? নিরীহ, সরল পৃথ্বীসিংহকে হত্যা করিতে তোর ঐ কঠিন হৃদয় একটুকুও কাতর হইল না? কিন্তু পিশাচ, সাবধান! এখনও রাত্রিদিন হয়; এখনও দেবতা আছেন—ধর্ম্ম আছেন। রাজপুত এখনও এত দুর্ব্বল হয় নাই! এখনও বলিতেছি, সুনিয়মে রাজ্যশাসন কর্,—হিন্দুদের প্রতি আর অত্যাচার করিস্ না;—নতুবা, এই দুই হাতে করিয়া তোর ঐ পাপ মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ভারত মহাসাগরের অতল-জলে নিক্ষেপ করিব।"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাঠোর-সর্দ্দার মোকনদাসের তীব্র বাক্যবাণ ঔরঙ্গজেবের অন্তস্তল ভেদ করিল। তিনি, মোকনদাসকে, নিরস্ত্র অবস্থায় এক দ্বাদশ-হস্ত দীর্ঘ ভীষণ শার্দ্দূলের পিঞ্জর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। মোকনদাস বিনাবাক্যব্যয়ে, নির্ভীকচিত্তে, প্রফুল্লান্তঃকরণে অদূরস্থ ভীষণ ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই বৃহৎকায়, নরভুক্ শার্দ্দূল পিঞ্জরাভ্যন্তরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল; অমিত বিক্রমশালী রাঠোরকুলতিলক মোকনদাস ঘৃণা-ব্যঞ্জকস্বরে ব্যাঘ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যবনের শার্দ্দূল! রাজপুতকুল-গৌরব যশোবন্ত সিংহের শার্দ্দূলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" এই অশ্রুতপূর্ব্ব, বিস্ময়কর অভ্যর্থনা শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্ররাজ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং ক্ষণেকের নিমিত্ত, মহাতেজা মোকনদাসের অনলোদ্গারী লোচনদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া—ভয়ব্যাকুল চিত্তে মস্তক অবনত করতঃ তদীয় সম্মুখ হইতে অন্তরে চলিয়া গেল। সেই যমকায়-সদৃশ, সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপী শার্দ্দূলকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে দেখিয়া রাঠোর-বীর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যবন-সম্রাট্! দেখুন, রাঠোরের বীরত্ব দেখুন! মহাকায় ব্যাঘ্র সম্মুখীন হইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ভয় করিল! যবনের ন্যায়—রাজপুত কাপুরুষ নহে! রণ-বিমুখ শরণাগত শত্রুকে বধ করা রাজপুতের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।"

রাঠোর-সর্দ্দার মোকনদাসের ঈদৃশ বিস্ময়কর বীরত্ব দর্শন করিয়া নির্দ্দয় ঔরঙ্গজেবও অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি মোকনদাসকে বলিলেন, "রাঠোর-বীর! তোমার এই অসাধারণ বিক্রমের অধিকারী হইবার কোন সন্তান-সন্ততি আছে?"

অপ্রমেয়-শক্তিশালী মোকনদাস নির্ভীক-চিত্তে জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "আপনার মত দুরাচারের অধীনে যে কর্ম্ম করে, তাহার আবার সন্তান-সন্ততি জীবিত থাকে? যাহা ছিল—তাহা যে আপনারই চক্রান্তে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।"

মোকনদাসের অত্যদ্ভুত বীরত্বব্যঞ্জক বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া, কঠিন-হৃদয় ঔরঙ্গজেব তদীয় প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সভাসদ্‌গণ! আমি মোকনদাসের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; তাঁহাকে 'নাহর খাঁ' উপাধি প্রদান করিলাম।

রাঠোর-কুল-শিরোমণি মহাবীর মোকনদাসের চির-পবিত্র হৃদয়, এইরূপ অসাধারণ সাহস ও অতুলনীয় বীররসে পূর্ণ ছিল। এই তেজস্বী রাঠোর-সর্দ্দারের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না! প্রত্যেক হিন্দুর স্মৃতিপটে এই মহাপ্রতাপবান্ বীর মোকনদাসের গৌরব-কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শ্রীপুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পত্নী।

তোমারি নয়ন ছিল প্রিয়দরশন,
তোমারি মুরতি হেরি সুখী দু'নয়ন।
তোমারি কবিতা পড়ি ভুলেছিনু দুখ,
তোমারি মৃত্যুতে আজ হারাইনু সুখ।
তোমারি কথাতে ছিল অমৃত মাখান,
তোমারি কারুতে আঁকা ময়ূর নিশান।
তোমারি কারণে ছিল দুঃখ দূরে সরে,
তোমারি মরণে পুনঃ সব এল ফিরে।
তোমারি বিরহে সদা ভাসি দুঃখ-নীরে,
তোমারি বিহনে আছি "জীয়ন্তেই" মরে।

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

সন্তানের মায়া।

(গল্প)

১

"ওগো, দুধের বোতলটা দাও ত, খোকা ভারি কাঁদছে!" স্ত্রী তরুলতা এই কথা বলিল।

বিজয়বাবু নিকটে দাঁড়াইয়া পদ্মার ঢেউ দেখিতেছিলেন, পত্নীর কথা কাণে পৌঁছিতেই তিনি ফিরিয়া বিছানার নিকট আসিলেন। তরুলতা আবার বলিল—"দুধ দাও, খোকা খাবে।"

একপার্শ্বে ছিপি আঁটা একটা বোতলে খানিকটা দুধ ছিল। বিজয়বাবু বোতলটা আনিয়া স্ত্রীর হাতে দিতে গেলেন, কিন্তু হাতে আর পৌঁছিল না, পতি-পত্নীকে চমকিত করিয়া সহসা উহা ডেকের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অভ্যন্তরস্থ শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থটুকুও আধারের সঙ্কীর্ণ স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিমেষমধ্যে চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িল।

সমস্ত দুধটুকুই নষ্ট হইয়া গেল দেখিয়া তরুলতার মুখ কালি হইয়া গেল। বিজয়বাবু পত্নীর মুখের ভাব দেখিয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন—"ষ্টিমারটা একবার খুঁজে দেখ্‌ব? লোক ত ঢের রয়েছে—একটু দুধ কি আর কারু কাছে পাওয়া যাবে না?"

"দেখতে হবে বৈকি! খোকা খাবে কি নৈলে!"

"আচ্ছা দাও একবার খোকাকে আমার কাছে, দেখে আসি। বোতলটা ছাই কেমন ক'রে যে হাত থেকে প'ড়ে গেল!" বিজয়বাবু এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর ক্রোড় হইতে খোকাকে তুলিয়া লইলেন।

স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া তরুলতা বলিল—"একটা কিছু দেব?

"না, আগে দেখে আসি" বলিয়া বিজয়বাবু প্রস্থান করিলেন। বিজয় বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। ছুটী লইয়া তিনি বাটী গিয়াছিলেন, ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ায় আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, দুইটী পুত্র, একটী কন্যা ও বৃদ্ধ ভৃত্য বলহরি ব্যতীত আর কেহই ছিল না। বিজয়-বাবু যখন খোকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন, বলহরি তখন দূরে বসিয়া তামাকু সাজিতেছিল, এসকলের কিছুই সে জানিতে পারিল না।

বিজয়বাবু যাইতে যাইতে দেখিলেন, যাত্রীরা দলে দলে ডেকের উপর চলাফেরা করিতেছে। অনেককেই তিনি দুধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট আশার কথা শুনিলেন না। ক্রমে সারাটা ষ্টিমারই ঘোরা হইল, দুধ কিন্তু মিলিল না; হতাশ হইয়া বিজয়বাবু, স্ত্রী যেখানে বসিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেইখানে ফিরিয়া চলিলেন।

যাইতে যাইতে একস্থানে তিনি দেখিলেন, একজন পাঞ্জাবী রেলিংএর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দূরে কি দেখিতেছে। তিনিও সেইদিকে চাহিলেন, দেখি-লেন, দূরে পদ্মার স্ফীত চঞ্চল বক্ষের উপর একখানি নৌকা ভাসাইয়া জেলেরা মাছ ধরিতেছে, নৌকাখানি ফেনমণ্ডিত বড় বড় তরঙ্গের সহিত উঠিতেছে, পড়িতেছে, নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি পাঞ্জাবীর নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, শিশুর ক্রন্দনধ্বনি কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই পাঞ্জাবীর দৃষ্টি-আকর্ষণ করিল। পাঞ্জাবী বিজয়বাবুর দিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র কি জানি কেন তাহার মুখের ভাব হঠাৎ যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল। এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যেন চক্ষু দুইটী হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে বিজয়বাবুর নিকটে আসিয়া পাঞ্জাবী হাত বাড়াইয়া খোকাকে আপনার কোলে লইল। ক্ষুদ্র শিশু অবাক্ হইয়া একবার পাঞ্জাবীর ও একবার তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। খোকার ভাব দেখিয়া পাঞ্জাবী ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে আপনার প্রশস্ত বুকের উপর তুলিয়া লইয়া সাদরে মুখচুম্বন করিল। পাঞ্জাবীর কোলে আসিয়া পূর্ব্বেই খোকার ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছিল, এখন ভয়টুকুও আবার ভাঙ্গিয়া গেল, শিশু তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটী পাঞ্জাবীর বুকের উপর রাখিয়া আরামে শয়ন করিল।

বিজয়বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া পাঞ্জাবী কহিল—"কি হয়েছে বাবু আপনার? মুখ ত ভাল মালুম্ দিচ্ছে না?"

বিজয়বাবু বলিলেন—"বড় মুস্কিলে পড়েছি বাপু! যেটুকু দুধ সঙ্গে এনে-ছিলুম, তা সবই নষ্ট হয়ে গেল; সারাটা ষ্টিমার খুঁজলুম, কোথাও একটু পেলুম না। খোকা খাবে কি, ভেবে তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছি নে, এই ভাবনাই এখন আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে।"

পাঞ্জাবী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল—"দুধ! দুধ আমার কাছে আছে, আসুন আমি দিচ্ছি।"

বিজয়বাবু পাঞ্জাবীর সহিত তাহার বিছানার নিকট গমন করিলেন। বিছানার একপার্শ্বে একটা বাটি ঢাকা ঘটী ছিল, পাঞ্জাবী তাড়াতাড়ি সেটা আনিয়া বিজয়বাবুর হাতে দিয়া বলিল—"খোকার দুধ খাওয়া হইলে লোটাটা আমায় ফিরিয়ে দেবেন।"

বিজয়বাবু বাটি তুলিয়া দেখিলেন,—লোটাতে অনেকটা দুধ রহিয়াছে, বলিলেন—"এতটা দুধ নিয়ে কি করব? তুমি কিছু রেখে দাও,—খোকা ত সব খেতে পারবে না!"

"না না, নিয়ে যান আপনি, ও দুধে আমার কিছু দরকার নেই, যেটুকু বাকি থাকবে, সেটুকু খোকার আর একবার খাওয়া চলিবে।"

"এযে অনেকখানি রয়েছে!"

"তা থাক, আপনি নিয়ে যান।"

অগত্যা বিজয়বাবুকে সকলটুকুই লইতে হইল। পাঞ্জাবীর নিকট হইতে খোকাকে লইয়া, সেই বিদেশী অপরিচিতকে স্বীয় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

২

জগন্নাথগঞ্জের ঘাটে ষ্টিমার লাগিল। যাত্রীর দল জিনিষপত্র লইয়া কোলাহল করিতে করিতে বোটে নামিতে লাগিল। বোট হইতে তীরে নামিবার জন্য পাশাপাশি দুইখানা মোটা তক্তা ফেলা ছিল। লোকের শ্রেণীতে ক্রমে সে তক্তা দুইখানা ভরিয়া গেল, ঠেলাঠেলি বকাবকি করিতে করিতে তাহারা তীরে নামিতে লাগিল। তক্তার উপর ভিড় দেখিয়া বিজয়-বাবু পরিবারবর্গ সমেত বোটেরই একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, ভিড় কমিলে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিলেন। মুটিয়ারা মালপত্রগুলি একে একে আনিয়া তাঁহার নিকট হাজির করিতে লাগিল, একটা বড় গোছের ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া তিনি সেগুলি দেখিয়া লইতে লাগিলেন।

এদিকে আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। যাহারা ষ্টিমারে উঠিবে, তাহারা এতক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, বোটের লোক নামিয়া গেল দেখিয়া, এখন সকলেই আপন আপন বোঁচ্‌কা বুঁচকী লইয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে তক্তার উপর দিয়া ষ্টিমারের দিকে ছুটিল। বিজয়বাবুর কুলিরা অবশিষ্ট কয়েকটা জিনিষ লইয়া এই সময় তক্তার উপর দিয়া নামিতে-

ছিল, সহসা সেই প্রবল মনুষ্যস্রোতের মুখে পড়িয়া তাহারা হটিয়া গিয়া পুনরায় বোটের উপর আশ্রয় লইল।

পাঞ্জাবী ময়মনসিং যাইতেছিল, ষ্টিমার হইতে সেও এইখানে নামিয়াছিল। বিজয়বাবু জিনিষ পত্র লইয়া যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরেই সে আপনার দ্রব্যাদি গুছাইতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বিজয়বাবু উঠিয়া গেলেন। নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথা যাবে?"

বিজয়বাবুকে দেখিয়া সে ভারি খুসী হইল, তাঁহাকে ধরিয়া আপনার বিছানার মোটের উপর বসাইয়া বলিল—"আমি ময়মনসিং যাব বাবু।"

"সেইখানেই কি তুমি থাক?"

"আজ্ঞে হঁ্যা।"

"তোমার ছেলে মেয়ে কটী?"

"ছেলে মেয়ে? হঁ্যা—ছেলে একটা ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা নেই; এই রাক্ষসী নদী তাকে খেয়েছে বাবু—সে আজ এক বছরের কথা।"

"তোমার স্ত্রী আছে ত?"

"না, তাকেও খেয়েছে এই নদী।"

কথাটা বলিতে বলিতে পাঞ্জাবীর চক্ষু দুইটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে বড় বড় ফোঁটাগুলি উভয়গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর করিয়া বক্ষের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বিজয়বাবুও হৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পাঞ্জাবী হস্তদ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিল—"বাবু, কি জানি কেন ষ্টিমারের উপরে আপনার ছেলেকে দেখে, আজ সেই কথা আমার মনে প'ড়ে গেল। দেখতে এক রকম না হ'লেও, আমার ছেলে ঠিক এত বড়টী ছিল।"

বিজয়বাবু বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের কথা! তা তুমি বিয়ে কর, আবার ছেলেপুলে হবে; এমন ক'রে কি মানুষ বেশী দিন থাকতে পারে?"

পাঞ্জাবী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"না বাবু, সে ইচ্ছে আর নেই।"

তারপর অনেক কথাবার্ত্তা হইল; শেষে বিজয়বাবু উঠিলেন, বলিলেন—"যাই একবার দেখি গে, কুলিরা এসে পৌঁছিল কি না।"

ঠিক এই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে কতকগুলা লোক গোলমাল করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে লোকের জনতা খুব বাড়িয়া উঠিল।

চতুষ্পার্শ্ব হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া সেখানে জমা হইতে লাগিল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য বিজয়বাবু ও পাঞ্জাবী উভয়েই সেই স্থানে উপনীত হইলেন। বড় ভিড়! বিজয়বাবুই প্রথমে ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিলেন; আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, দেখিলেন, তাঁহারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত! প্রকাণ্ড একটা মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর তাঁহারই ক্ষুদ্র শিশু গভীর ক্রন্দন তুলিয়া ত্রাসে এদিক ওদিক হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে।

প্রতিমুহূর্ত্তে পদ্মার বড় বড় ঢেউগুলা আল্গা চাপের গোড়ায় প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা মারিয়া সেটাকে কাঁপাইয়া দিতেছিল। নদীর জলকল্লোলের সঙ্গে যেন মরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছিল। ভয়ার্ত্ত শিশুর গভীর ক্রন্দন সকলেরই প্রাণে দারুণ ব্যথার সঞ্চার করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উদ্ধারার্থে সেই চাপের উপর যাইতে কেহই সাহস করিতেছিল না। সে দৃশ্য দেখিয়া বিজয়বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। চোখের সম্মুখে সন্তানের মৃত্যু দেখিতে হইবে ভাবিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, কোনমতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, উন্মাদের ন্যায় সেই চাপের দিকে ছুটিলেন।

ঠিক এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। চমকিত হইয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন, সেই পাঞ্জাবীই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়াছে। সে জোর করিয়া বিজয়বাবুকে আপনার নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"পদ্মা আমার ছেলেকে খেয়েছে বটে, কিন্তু আপনার ছেলেকে খেতে পারবে না, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।"

কথা কয়টা বলিয়াই সে দ্রুতপদে যাইয়া চাপের উপর নামিয়া পড়িল; তাহার দেহের ভারে চাপটা জলের দিকে আরও হেলিয়া পড়িল। খোকা হামাগুড়ি দিয়া তাহার পায়ের নিকটে আসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাদরে মুখচুম্বন করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রকাণ্ড একটা ঢেউ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া চাপের গোড়ায় আছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চাপটাও উল্টাইয়া জলে পড়িয়া গেল। দর্শকবৃন্দ হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তপরে আবার সেই হাহাকার ধ্বনিকে চাপা দিয়া চতুষ্পার্শ্ব হইতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। সকলে দেখিল, চাপটা

জলে পড়িবামাত্র খোকা নদীগর্ভ হইতে শূন্যে উঠিয়া পড়িল এবং সন্নিকটবর্ত্তী দুই তিন জন লোক হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ শিশুকে ধরিয়া ফেলিল। বিজয়বাবু খোকাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

এদিকে জলের ধারে বিস্তর লোক জমিয়া গেল। বিজয়বাবু খোকাকে তাহার মাতার নিকটে রাখিয়া আবার ভাঙ্গা চাপের দিকে ছুটিলেন। সেখানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মাঝিরা নৌকা ভাসাইয়া পাঞ্জাবীর অনুসন্ধান করিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যে পাঞ্জাবীকে বাঁচাতে পারবে, তাকে আমি এখুনি পাঁচশ টাকা বখ্‌সিস দেব।"

বহু চেষ্টা করিয়াও কেহই পাঞ্জাবীর সন্ধানলাভে সমর্থ হইল না, তাহাদিগের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। নৌকাগুলি একে একে আবার তীরে আসিয়া লাগিল।

বিজয়বাবুর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাঁহার সেই বেদনা-ভরা বুকের তপ্ত শ্বাস লইয়া পবন পদ্মার শীতল ক্রোড়ে যাইয়া গড়াগড়ি দিতেছিল; সূর্য্যদেব তখন অস্ত যাইতেছিলেন। দিক্‌চক্রবালের সীমা যে স্থানে পদ্মার বক্ষের উপর একটী রেখা টানিয়া দিয়াছিল, অরুণ-কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে সূর্য্যদেব ত্বরিত গতিতে সেই স্থানে নামিয়া পড়িতেছিলেন। নদীবক্ষে বড় বড় ফেনিল তরঙ্গের সারি সেই কিরণ মাখিয়া যেন জ্বলিতেছিল। বিজয়বাবু এতক্ষণ একদৃষ্টে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়াছিলেন, কি জানি কি ভাবিয়া এখন একবার নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, পাঞ্জাবীকে গ্রাস করিয়া সারা নদীটা যেন হাসিতেছে, বড় বড় ঢেউগুলা তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। সে হাসি তিনি আর দেখিতে পারিলেন না; দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

অটুট-বন্ধন

(১)

লক্ষ্ণৌ হইতে (যুক্তপ্রদেশ) ফতেগড়ে আজ আমি বৈকাল ৫টার ট্রেণে আসিয়াছি,—আমার বাল্য-সুহৃৎ সহাধ্যায়ী শৈলেশ্বর ঘোষের কন্যা (৯ই ফাল্গুন) শুভ পরিণয় হইবে, তদুপলক্ষে আসিয়াছি। বহুদিবস অন্তে দুই বন্ধু পরস্পর বিধির বিধানে মিলিত হইয়া উভয়েরই হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল। ঘটনাচক্রে আমরা এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছি, তাই মিলনের আনন্দের মাত্রাটা অত্যধিক হইতে লাগিল।

আমি উপহাসচ্ছলে হাসিয়া বলিলাম—"শৈল, তোমার বি'য়ে হ'চ্ছে, আমার কিন্তু আহ্লাদ হইতেছে না।" শৈলেশ্বর এ কথাটা শুনিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ, পরে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"হেম, তবে আমি বি'য়ে করিব না।" আমি বলিলাম,—"পাগল হয়েছ, আমি যে তোমায় উপহাস করিলাম।"

শৈলেশ্বর বলিল,—"এ উপহাসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে ভাই আমি অপারগ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি একটী ক্ষুদ্র বালিকার প্রণয়ে মাতিয়া আজীবনের মত আবদ্ধ হইবে, আমার ভালবাসা ভুলে' যাবে।

শৈলেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তাও কি কখন হয়? আমাদের প্রণয়ে কেহ অন্তরায় হইতে পারে না। আর বিবাহ করিয়া আবদ্ধ হইবই বা কেন, উহা একটা প্রেমের স্বপ্ন! নারীর প্রেম কি এমনই মোহময়?"

আমি ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলাম—"সখে! মুহূর্ত্তের তরেও কভু ভাবিও না যে, বিবাহ প্রেমের স্বপন! ইহা আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ, যেন জন্মজন্মান্তরের অটুট-বন্ধন। ইতিমধ্যে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে ডাক পড়িল, সে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিল।

রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা দুই বন্ধু একত্র শয়ন করিলাম, —নানারূপ গল্প হইতে লাগিল। শৈলেশ্বর বলিল,—"ভাই তুমি কবে বিবাহ ক'রছ।" আমি বলিলাম,—"তুমি তো বি, এস, সি, উপাধিলাভ করিয়া তবে বিয়ে করিতেছ, আমিও বি, এ, তে উত্তীর্ণ হই, তখন বি'য়ে করিব; কিন্তু ভাই সত্য বলিতে কি, আমার বিয়ে করিতে বড় ভয় হয়, ওযে ভয়ানক

অটুট-বন্ধন।" আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল,—"তুমি যেমন পাগল।"

পরদিন সায়ংকালে যথাসময়ে 'বর' ও আমরা আনন্দচিত্তে বরযাত্র হইয়া বেরিয়ে পড়িলাম। মনে হ'ল যেন আজ সারাটী জগতের প্রকৃতির হাসি শান্ত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় খেলিতেছে, তাহাতে ফুল্ল-কুসুম-গন্ধ মৃদুল পবন ধীরে ধীরে বহিতেছে, কবির কাম্য মুক্ত সুষমা-ব্যাপ্ত বসন্ত-মধু আভাসে মিলন মন্ত্রের প্রেম আহ্বান সন্ধ্যা-আকাশে ফুটে উঠেছে! যেন প্রকৃতিদেবী স্বয়ং পুণ্য লগ্নে অনন্ত মহিমাময়ের আদেশে প্রতিভাময়ীকে শৈলেশ্বরের সহিত মঙ্গল মন্ত্রে অক্ষয় বাণীতে বাঁধিয়া দিতেছেন।

নির্ব্বিঘ্নে বন্ধুর শুভ বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল, তৎপরদিবস বিদায় ভোজ সমাপনান্তে আমরা বৌ নিয়া বাটী আসিব - এমন সময় সুহৃদ্বয়ের মানস-প্রতিমা রাঙ্গাবাসে তনু আবৃত করিয়া—অলক্তরাগরঞ্জিত চরণ-পদ্মে মুখর নূপুর শব্দিত করিয়া সলাজ চরণে শঙ্কিত মনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাশ্রুনয়নে "ক'নের" পিতা আসিয়া আপন জামাতাকে বলিলেন,—"বাবা, আমি কিছুই দিতে পারিলাম না—কেবল মাত্র এই কন্যারত্নটী তোমায় দান করিলাম; এবং বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট চির কেণা হইয়া রহিলাম। কারণ, তিনি পীড়ন না করিয়া এই দীন গরিবকে মহাদায় হইতে উদ্ধার করিলেন। যদি তাঁহার আদর্শ কুসুমে জগৎ ভরিয়া উঠে—তাহা হইলে কন্যাদায়গ্রস্তের হায় হায় রব বহু পরিমাণে লাঘব হইবে।"

বর-ক'নে জোড়ে বিদায় হইল। আমি তাহাদের জোড়ের বন্ধনটা ধরিয়া বলিলাম,—"শৈল, এটা কি?" শৈলেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল,—"গাঁইট-ছড়া।" আমি বলিলাম—"ছড়া নহে হে, গাঁইট জোড়া অর্থাৎ অটুট-বন্ধন।"

বন্ধু আমার হাসিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"তোমার হৃদয়-প্রতিমাকে হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া হৃদয়ে তুলে লও, ওযে এখন তোমার চির আদরের, চিরবাঞ্ছিত-চিরনূতন রত্ন।" শৈলেশ্বর প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে আমার প্রতি চাহিয়া,—প্রেম দৃষ্টিপাতে নব প্রণয়িণীর কর ধরিল। আমি মুগ্ধনেত্রে বলিলাম,—"ঈশ্বর, এই নবীন দুটী প্রাণ বিশ্বাসে ঢাকিয়া রাখিও, এবং বিঘ্ন-বাধা বিপদে নিত্য একাগ্র সাধনা আনিও!

(২)

আমার বি, এ, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, আমি উদ্বিগ্ন-চিত্তে তাহার ফলা-

ফলের আশায় দিন অতিবাহিত করিতেছি, দুই চা'র দিবসের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। উদ্বেগ ও গ্রীষ্মের উত্তাপ বশতঃ আমাদের ক্ষুদ্রতোয়া গোমতী-তটিনীর সন্নিকটে ক্ষুদ্র কুটীরখানির সম্মুখে বৈকালেপদচারণ করিতেছি, এমন সময় এক তার-পীয়ন আসিয়া আমার হস্তে একখানি টেলিগ্রাম দিল, আমি ত্বরিত হস্তে তাহার খাম উন্মোচন করিয়া ফেলিলাম,—ভাবিয়াছিলাম বোধহয় পরীক্ষার ফলের সংবাদ কোন বন্ধু দিয়াছেন,—পাঠান্তে মর্ম্মাহত সংবাদে দাঁড়াইয়া ছিলাম,—বসিয়া পড়িলাম, অভাবনীয় ঘটনায় হৃদয় অবসন্ন হইয়া গেল,—টেলিগ্রামখানি ফতেগড় হইতে শৈলেশ্বরের পিতা দিয়াছেন।—

"হেম, তোমায় শৈলেশ্বর দেখিতে চাহে, তাহার অবস্থা ভয়ানক মন্দ।"

মুহূর্ত্তকাল আর আমি অপেক্ষার অবসর পাইলাম না, দ্রুত গতিতে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম, কারণ তখনই ট্রেণ ছাড়িবে।

আমি বান্ধবালয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম,—দেখিলাম তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়, জীবনবায়ু বহির্গত হইবার অধিক বিলম্ব নাই। সে ইঙ্গিতে আমায় জানাইল, তাহার জীবনের শেষ স্ত্রীকে দেখাইয়া দিতে, আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধুপত্নীকে পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, সে হস্তদ্বারা জানাইল,—তাহাকে তাহার নিকটে বসিতে। সে আড়ষ্ট জীবন্মৃতবৎ তাহার সমীপে উপবেশন করিল। আমায় বসিতে বলিলে, আমি সম্মুখস্থ চেয়ার টানিয়া তাহার নিকটে উপবেশন করিলাম,—বলিলাম—"শৈলেশ্বর জল খা'বে?" সে অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল হাঁ—

আমি তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ জল তাহার মুখে দিলাম, দিবামাত্রে তাহার কথা কহিবার একটু সামর্থ্য হইল; সে ধীরে অথচ স্থীর অকম্পিত স্বরে বলিল —"হেম, আমি জন্মের মত চলিলাম, আমার প্রতিভার তত্ত্বাবধান মধ্যে মধ্যে লইও, উহাকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কিছুতেই চাহিতেছে না! না, না তাহাকে কি ছাড়া যায়,—সত্যই হেম, এ অটুট-বন্ধন, মহামিলন পরপারে হইবে। তাহার বিশাল নয়ন হইতে ধারা ছুটিল, অভাগিনী প্রতিভাময়ীরও অবারিত অশ্রু-সলিলে হৃদয় ধৌত হইতে লাগিল। এ ভয়াবহ দৃশ্যে আমার যে কি অবস্থা হইল, তাহা ক্ষুদ্র লেখনীতে বর্ণনে অক্ষম, হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম—"ভয় কি শৈল, তুমি ভাল হইবে।" এই কথায় তাহার অধর-প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। আমি ব্যথিত—মর্ম্মাহত—গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

অন্তঃপুর হইতে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। হায় হায় রবে গৃহ মন প্রাণ সকলি কাঁদিয়া উঠিল। উঃ! সে শোকের সান্ত্বনা কি আছে প্রভু!

শৈশব-সুহৃদের দেহ জন্মের মত মহাশ্মশানে চিতানলে দগ্ধ করিয়া সারা হৃদয়টা শূন্য খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। মানব-দেহ তো নশ্বর, তবে কেন তাহাতে এত দাম্ভিকতা,এত অহঙ্কার! সকলেরি তো এই মহাশ্মশানে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে! এই মহাশ্মশানে সকলি 'এক'; সুখ-দুঃখ, পাপ-তাপ তবে কেন? পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিত, মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলি সমান, নৈসর্গিক অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য তিরোহিত হয়, তবে কেন জীব সেই মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্তমহিমা স্মরণ করিয়া তাহাতে চিত্ত-সংলগ্ন করে না।

জীবন-প্রতিম বন্ধুহারা গৃহে আর যাইতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু তাহার চরম সময়ের আদেশ স্মরিয়া তাহার পত্নীর অবস্থার সংবাদ লইতে যাইলাম, যাহা দেখিলাম, সে দৃশ্যে হৃদয় স্তম্ভিত হইল। বন্ধুজায়ার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল, কয়েক দণ্ডের মধ্যে কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু শান্ত স্থির অচঞ্চল যেন পাষাণ-প্রতিমা! নয়নদ্বয় অধিকতর উজ্জ্বলতাপূর্ণ! তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী দারুণ পুত্রশোকে নিদারুণ আর্ত্তনাদে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন, আর সেই মর্ম্মান্তিক রোলের মাঝে শুনিতে পাইলাম বলিতেছেন—"কি রাক্ষসী বৌ এলরে, আমার ছেলেকে খে'য়ে ফেলিলরে, পুত্রশোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইত্যাদি।" আমি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম,--বলিলাম—"মা, ও নিরাপরাধিনী তের কি চৌদ্দ বৎসরের বালিকা, ওর কি দোষ মা, এ-ই এখন আপনার পুত্রস্থানীয়া, উহার কি কষ্ট হইতেছে না।"

তিনি রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ও বালিকা, দু'মাস পরে ওর পতিশোক নিবৃত্ত হইবে, শুধু তাহার অভাব অনুভব করিবে—কিন্তু নিদারুণ পুত্রশোক নিবৃত্ত হইবার নহে।" অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমি নিরুত্তরে প্রতিভাময়ীর জননী-সন্নিধানে আসিলাম; তিনিও নির্ম্মম জামাতৃশোকে মৃত-প্রায় রোদন করিতেছেন, আমি তাঁহাকেও বলিলাম—"মাতঃ! আপনার কন্যার অবস্থা দেখুন—হায়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" তিনি আকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন—"বাবা, ওকে দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা প্রতিভার মরণে আমার ক্লেশ কম হইত।"

আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! দুঃসহ যন্ত্রণায় হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। ভাবিলাম—বন্ধুপত্নী, যথার্থই তুমি আজ বড় অভাগিনী! সকলেই এসময় স্বীয় শোকে হতজ্ঞান।

হায়! সংসারে একুলটী মুকুলেই শুষ্ক হইল—প্রকৃতই এ বালিকা আজ নিরাশ্রয়া অনাথিনী।

আমি তাঁহার সমীপে গিয়া বলিলাম—"প্রতিভাময়ী বৌদিদি, তুমি এখন কোন সংসারে থাকিতে বাসনা কর"! সে মুহূর্ত্তে কি চিন্তা করিল—ম্লান হাসি হাসিয়া নির্ব্বাক্ মুখে উর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। ইঙ্গিতে বুঝিলাম, উর্দ্ধ-লোকে! উন্মাদিনীর অস্বাভাবিক হাসি দেখিয়া মর্ম্মের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল! হায়, পতিব্রতা দুঃখিনীর দুঃখ দেখিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইল না কেন, প্রকৃতির ভাব ও কর্ম্মফল সমস্তই অদৃষ্ট-ঘটিত, কিন্তু এ বালিকার কি কর্ম্মফল, তাহা বিশ্বনিয়ন্তাই অবগত।

আমি বলিলাম "বৌদিদি, স্ত্রীর কর্ত্তব্যে স্বামীর উর্দ্ধগতি হয়, আত্মহত্যা করিও না; কারণ তোমাদের অভেদ-আত্মা, তুমি যে পথে চলিবে, তাহাকে তোমারই সহিত অনুগমন করিতে হইবে।

নিস্বার্থ প্রেমে তাহার পূজা কর, নিস্বার্থ প্রেমের বিশুদ্ধ উপাসনার পুরস্কার আছেই।

আমি আমার দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়খানি লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কয়েকদিন পরে শৈলেশ্বরের পিতার নিকট হইতে পত্র আসিল, "পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীতে প্রতিভাময়ী দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে।" ইহা যে ঘটিবে, তাহার আভাস আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলাম।

৩

কালের পরিবর্ত্তনে আমি এখন ঘোর সংসারী। বি, এ, পাশ হইয়াছি, বি, এল, পাশও হইয়াছি। লক্ষ্ণৌ কোর্টে ওকালতীতে আমার বেশ পসার হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া আমি বেশ আছি। কিন্তু এ দীর্ঘ কালেও বন্ধু-বিচ্ছেদ যন্ত্রণার উপশম একেবারে হয় নাই। সময় সময় তাহার জন্য এবং তাহার প্রিয়তমার ম্লান-মুরতি স্মরণ করিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইত। শৈলেশ্বরের দাহস্থানে চিহ্নস্বরূপ তাহার নামাঙ্কিত একটী প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত করিয়া আসিয়াছিলাম। কিছু অর্থ-সঞ্চয় হইয়াছে,—ইচ্ছা হইল, সেই স্থানে তাহার একটী স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করি। অতএব সেই স্থানটী

দেখিয়া শুনিয়া আসিবার মানসে ফতেগড়ে আসিলাম,—দেখিলাম বন্ধুর ফোর্টের নিকটস্থ বৃহৎ অট্টালিকা মানবশূন্য অরণ্য-প্রায়, যেন তাহার সহিত সকলি শূন্যে বিলীন হইয়াছে। জনশূন্য হইবার কারণ,—ফতেগড়ের কেল্লা জব্বলপুরে উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে কেল্লার দরুণ গোরা, সার্জ্জন, কুলী, মজুর, কেরাণী প্রভৃতির বাস ছিল, এখন কেল্লার বিহনে সকলি শূন্য হইয়া রহিয়াছে, সকলেই উদরান্নের জন্য দেশান্তরে স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু বন্ধুর প্রমাতামহের নির্ম্মিত শূন্য অট্টালিকা ভাগীরথী-উপকূলে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

আমি সেই মহাশ্মশানক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—সম্মুখে উত্তরবাহিনী গঙ্গা কুলু কুলু করিয়া প্রবাহিতা; কত অতীত স্মৃতি হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। সুদূর হইতে কি যেন শব্দ অনুভূত হইতে লাগিল। আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম,—এ যে গীত-ধ্বনি! আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিলাম, এযে আমাদের বঙ্গভাষায় এখানে (পশ্চিমপ্রদেশে) এ গীত কে গায়,—এযে মরণ-কান্না, কে কাঁদে।

আমি সাশ্চর্য্যে রুদ্ধশ্বাসে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া চলিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া দেখিলাম, পাণ্ডুবর্ণা উজ্জ্বলনয়না রোরুদ্যমানা একটী নারী;—যেন প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি। নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—একি, এযে প্রতিভাময়ী! আমি মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হইয়া স্থান-কাল বিস্মৃত হইলাম। প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম—"বৌদিদি, আপনি এখানে কেন?

তিনি শান্ত-স্থির স্বরে বলিলেন—"এখানে ব্যতীত আর আমার স্থান কোথায়।"

আমি বলিলাম—"আমার গৃহে চলুন, আমি আপনার পুত্রস্থানীয়, আপনি আমার জননীস্বরূপা।" তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার বাক্যে হৃদয় শীতল হইল। কিন্তু আমি এখানে বেশ আছি, এখানে সমাজের ভ্রূকুটীর কুটিলতা নাই, মিথ্যা কাণাকাণি নাই—শোক তাপ যাতনা জ্বালা কিছুই নাই,—দেখিতেছ না, কেমন নিভৃত নিরালয় মনোরম স্থান।"

আমি বলিলাম, তথাপি আপনি একা ত; চলুন না, সংসারাশ্রমে শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননদ, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীর সেবা করিবেন, পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদে যাতনায় সান্ত্বনা দিবেন, যত্ন করিবেন, আপনি সংসারে থাকিলে বহু উপকারে আসিবেন।"

তিনি বলিলেন—"আমি একা কে বলিল? প্রকৃতি আমার জননী, তিনিই আমার ভগিনী, নিসর্গ আমার সখা, আর ঐ দেখ আমার সহায়, উঁহার সেবাতেই সকল-সেবা হয়; ইহাই আমার নিষ্কাম কর্ম্ম।" তাঁহার অঙ্গুলী-নির্দ্দিষ্ট স্থান অবলোকন করিলাম, সে স্থানটী লতা-পাতা-ফুল-বিনির্ম্মিত একটী সুরম্য মন্দির, তাহার উপরে হরিতবর্ণের বন্যপুষ্পের দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লেখা 'শৈলেশ্বরের মন্দির'। নিকটে গিয়া দেখিলাম,—বন্ধুর দাহ স্থানে যে প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলাম, সেই স্থানে একটী লিঙ্গমূর্ত্তি রহিয়াছে। বুঝিলাম প্রতিভাময়ীর বিশুদ্ধ উপাসনার ফল! ভক্তিভরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া যুক্তকরে বলিলাম -"মাতৃসমা বৌদিদি, আমিও এই স্থানে থাকিব। আপনার সেবা করিব এবং ঐ লিঙ্গদেবের পূজা করিব। প্রকৃত শান্তি এই স্থলে বিরাজিত, আমার সে সময়ের মনের ভাব বর্ণনাতীত, বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত হইয়াছিলাম। কে বলে বাল-বিধবার পতিশোক সময় নিবৃত্ত হয়, প্রকৃত পতিব্রতার পতিশোক নির্ব্বাণ হয় না, পুত্রশোক অপেক্ষাও কঠিন দুর্ব্বহনীয়! কে কোথায় দেখেছ, পুত্রের মহাবিরহে মাতাকে যোগিনী সাজিতে!

প্রতিভাময়ী! পতি-প্রেমে তুমি যথার্থ যোগিনী,—যোগধ্যানে আত্মা উৎসর্গ করিয়াছ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি, বাসনা নির্ব্বাণ করিয়াছ,—প্রতিভা-ময়ী, তুমি দেবী না মানবী! শ্রীভগবানের মহানুভাব তুমিই বুঝিয়াছ, আমরা পাশ করিয়া মূর্খ।

তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"শান্ত হও, প্রাণের ভ্রাতা, ভাই হেম! ঈশ্বর তোমায় সকলি দিয়াছেন, বোধ হয় নয়ন-মন-রঞ্জন বস্তুও দিয়াছেন।"

আমি বলিলাম "হাঁ সকলি দিয়াছেন, কেবল শান্তি দেন নাই।" তিনি বলিলেন "এই যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জ্ঞানী জীবের ন্যায় কথা কহিতেছিলে! বিভুপদে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের কর্ত্তব্য সাধিয়া যাও, জ্বালা অশান্তি থাকিবে না। ভাই, তোমার অভাবে তোমার পরিবার কে দেখিবে? তাহাদের ভার বিধাতা তোমাতেই ন্যস্ত করিয়াছেন, যাও, ভাই গৃহে যাও।"

আমার তখন চমক ভাঙ্গিল। আমি সজলনয়নে তাঁহার আদেশ শিরে লইয়া বিদায় হইলাম,—গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে, সুদূর হইতে সেই প্রাণস্পর্শী গীত শ্রুত হইল, প্রাণের প্রত্যেক তার কাঁপাইয়া সে সুরলহরী গগনমার্গে খেলিতে লাগিল।

অসম্ভাবিত চিত্রের ছায়া লইয়া ব্যথিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সে পাণ্ডুবরণার অনৈসর্গিক জ্যোতিঃপূর্ণ আঁখি বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

প্রকৃত প্রেমের সার্থকতা অনুভব করিতে শিখিলাম, যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃত, সে পরকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয় প্রসারিত।

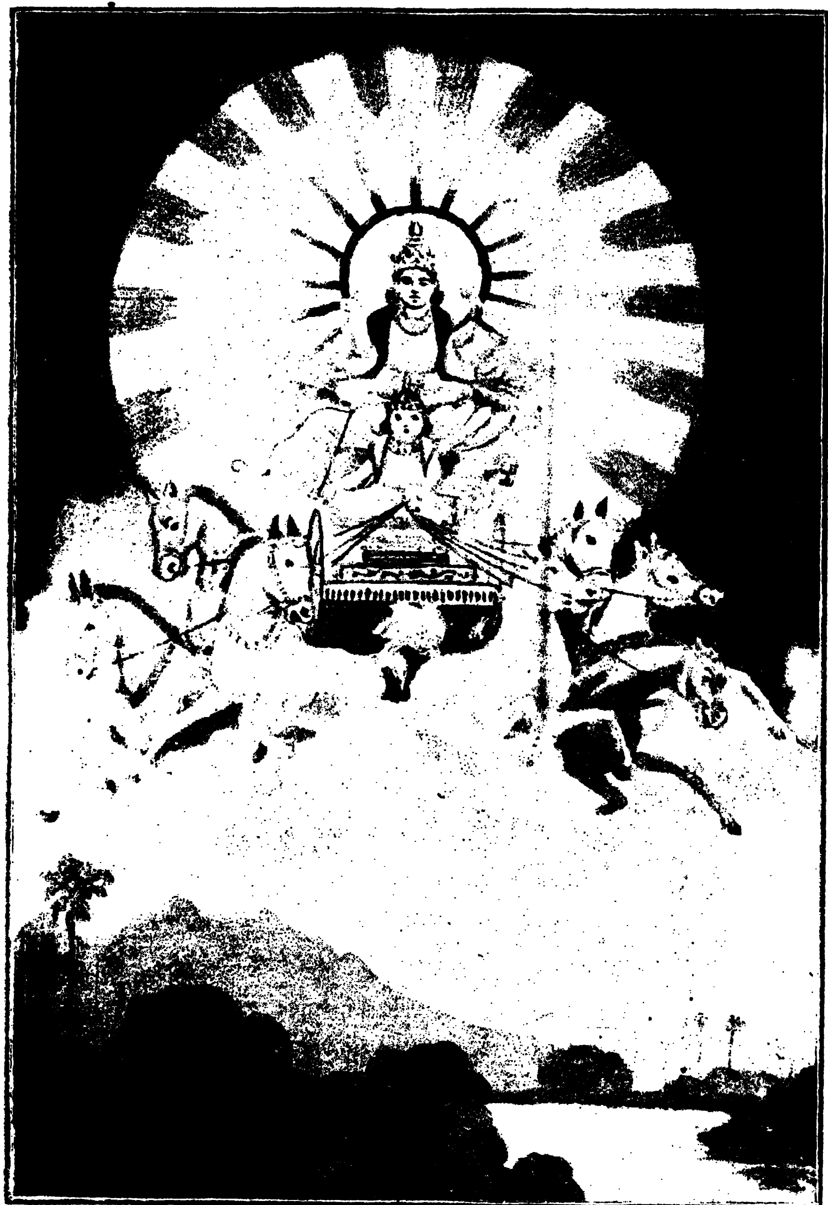
শ্রীসরযূবালা ঘোষ।

সাঁঝের বাতি।

মঞ্চের তলে সাঁঝের বাতিটী
নিভে যদি যায় পলে;
উৎসুক প্রাণে জ্বেলে দিই আমি
আবার মঞ্চ-তলে,—
আমার জীবন-সাঁঝের বাতিটী
পলকে নিভিবে যবে,
কুহেলিতে ঘেরা মৃত্যুধ্বান্তে
কোথা মোরে নিয়ে যাবে?
কোথায় আমার জ্বালিবে গো বাতি
আবার সে কোন দেশে
বল না গো পুতুলে তোমার
দেখাবে কেমন বেশে?

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

উদয়োন্মুখ সূর্য্য ।



উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং, নিখিলভুবনেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্ ।
তিমিরকরিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং, সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্বদীপম্

সূর্য্য।

উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং
নিখিলভুবননেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্।
তিমিরকরিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্বদীপম্॥

এই সূর্য্যই স্বীয় প্রভায় নিখিল বিশ্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইঁহার একটী নাম আদিত্য। শাস্ত্রে আদিত্য শব্দের অর্থ অনেক প্রকার দেখা যায়, কিন্তু আমরা আদিত্য শব্দের ভগবান্ সূর্য্য-নারায়ণ অর্থ টীই গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আদিত্য—অদিতির পুত্র, অথবা যিনি অভাবাদি বিপৎসমূহ উপস্থিত হইলে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহা বিনাশ করেন অর্থাৎ যিনি দারিদ্র্য নাশক। আদিত্যমণ্ডলস্থিত হিরণ্ময় বিষ্ণু। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জাত দ্বাদশ আদিত্য। তাহাদের নাম যথাঃ—

ধাতা মিত্রোঽর্য্যমারুদ্রো বরুণঃ সূর্য্যএবচ।
ভগো বিবস্বান্ পূষাচ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে॥

ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু।

কালিকাপুরাণে 'বিধাতা'র পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়টী, যথা—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। অন্যস্থানে সাত, অন্যত্র আটও দেখা যায়।

তৈত্তিরীয়ে অষ্ট আদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্।

শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে অদিতির পুত্র না বলিয়া দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলা হইয়াছে।

আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য,—গ্রহবিশেষ। রবি সোম প্রভৃতি নয়টী গ্রহের প্রথম গ্রহ সূর্য্য বা আদিত্য।

বৃহজ্জাতকাদিতে দেখা যায় যে, ইঁহার আকৃতি চতুষ্কোণ, বর্ণ রক্তশ্যাম-মিশ্রিত। ইনি পূর্ব্ব দিক্, পুরুষ, ক্ষত্রিয় জাতি, সত্বগুণ, কটুরস এবং সিংহ-রাশির অধিপতি। মধ্যাহ্নকালে প্রবল, ও তিক্তরসপ্রিয়।

গ্রহযাগ-সংস্কারতত্ত্বে—আদিত্য বর্ত্তুলাকার, রক্তবর্ণ, পূর্ব্বমুখ, ব্রাহ্মণ জাতি এবং কলিঙ্গ দেশ ইঁহার জন্মভূমি।

বহ্নিপুরাণে অবগত হওয়া যায়, সূর্য্য—কাশ্যপীয়বংশ দানব-বিশেষ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ মার্ত্তণ্ডোৎপত্তি বিবরণে লিখিত আছে, ইনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দেব-দানবে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দানবগণ ইঁহারই তেজে ভস্মীভূত হয়। শাস্ত্রে দ্বাদশ সূর্য্যের উল্লেখ আছে। দ্বাদশাত্মক অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার আত্মা বলিয়াই ইনি 'দ্বাদশাত্মা' নামে অভিহিত।

সুরসূর্য্যোঽর্য্যমাদিত্যঃ দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ ॥

অমর।

দ্বাদশ আদিত্যের নাম যথাঃ—

বিবস্বানর্য্যমা পূষা ত্বষ্টাপ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ ॥

বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র এবং উরুক্রম। ইঁহারা সকলেই কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে তদীয়ভার্য্যা অদিতির গর্ভে সমুৎপন্ন।

কল্পান্তরে ত্বষ্টৃকন্যা সংজ্ঞা আদিত্যপত্নী আদিত্যস্য তেজঃ সোঢ়ুমসমর্থা, অতস্তস্যাঃ পিতৃকৃতাদিত্যদ্বাদশখণ্ডা দ্বাদশাদিত্যাঃ। তেষাং দ্বাদশমাসেষু একৈকস্যোদয়ঃ। ইতি—পুরাণম্।

পুরাণে কথিত আছে, কল্পান্তরে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া পিতৃ-সকাশে গমনপূর্ব্বক স্বীয় দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করিলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। এবং সেই দ্বাদশ খণ্ড দ্বাদশ মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদিত হইয়া থাকে। যথাঃ—

অরুণো মাঘমাসেতু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা।
চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ।
জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপতে রবিঃ।
গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমোভাদ্রপদে তথা।
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকেচ দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

মাঘমাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্রমাসে বেদজ্ঞ এবং বৈশাখে তপন-নামক সূর্য্য উদিত হইয়া কিরণ-বিস্তার করেন। জ্যৈষ্ঠমাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি ও ভাদ্রমাসে যমনামক আদিত্য তাপ বিকিরণ করেন। আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র এবং পৌষমাসে সনাতন বিষ্ণু-নামক আদিত্য উদিত হইয়া থাকেন।

যাহ'ক পুরাণ মতে,—

প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দেবমাতা অদিতির গর্ভে আদিত্যের জন্ম। দেবাসুর-যুদ্ধে এই আদিত্যকর্ত্তৃকই অসুরসকল ভস্মীভূত হইয়াছিল। প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বিনয়-সম্ভাষণাদি দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণের সন্তোষ বিধান পূর্ব্বক প্রণত হইয়া যথাবিধানে ইঁহাকে স্বীয় সংজ্ঞানাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করেন। সূর্য্যদেবও পরম পুলকিত হইয়া সংজ্ঞাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাতে মনু, যম ও যমুনা নামে তিনটী সন্তান উৎপাদন করেন। কিন্তু যম ও যমী অর্থাৎ যমুনা যমজ, সুতরাং দিবকরের সেই অত্যধিক তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, আদিত্যপত্নী সংজ্ঞা স্বীয় ছায়া অবলোকন করিয়া কহিলেনঃ—

অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বকঞ্চ ভবনং পিতুঃ।
নির্ব্বিকারং ত্বয়াপ্যত্র স্থেয়ং মচ্ছাসনাৎ শুভে॥
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী।
সংভাব্যা নৈব চাখ্যেয়মিমং ভগবতে ত্বয়া॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

"ভদ্রে! আমি আমার পিত্রালয়ে গমন করিতেছি, তুমি আমার আদেশ অনুসারে এস্থানে নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক। আমার এই বালকদ্বয় ও কন্যারত্নটী তুমি সর্ব্বদা যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ভগবান্ আদিত্যের নিকট ইহা কদাচ ব্যক্ত করিবে না।" তখন ছায়া উত্তরে বলিলঃ—

আকেশগ্রহণাদ্ দেবি! আশাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গম্যতাং যত্র বাঞ্ছিতম্।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

অর্থাৎ দেবি! আমি কখনও আপনার এ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন।

ছায়া সংজ্ঞাকে এইপ্রকার বলিলে, সংজ্ঞা তাঁহার পিতৃভবনে গমন করিলেন। তথায় কিছু কাল অবস্থানের পর একদা সংজ্ঞা পিতৃসমীপে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময় প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞাকে বার বার বলিতে লাগিলেন,—"সংজ্ঞে! তুমি তোমার স্বামি সমীপে গমন কর।"

অনন্তর সংজ্ঞা জনককর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বড়বারূপ ধারণ পূর্ব্বক উত্তর কুরু গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ছায়া সংজ্ঞার বাক্যানুসারে তাহার রূপ ধারণ করিয়া ভাস্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সূর্য্যও তাঁহাকে সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞাপুত্র মনুর তুল্য বলিয়া, ছায়ার প্রথম পুত্র সাবর্ণি নামে অভিহিত হইলেন, দ্বিতীয় পুত্র শনৈশ্চর এবং কন্যা তপতী নামে অভিহিত হইলেন।

বরাহপুরাণ মতে সনাতন অদ্বিতীয় আত্মা জ্ঞান-শক্তি যখন দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব তেজ সমুত্থিত হইল, পরে ঐ তেজ হইতে সমস্ত দেবতা সিদ্ধ মহর্ষি প্রভৃতি স্বয়ং উৎপন্ন হইতে লাগিলেন। এই কারণেই ইঁহার নাম সূর্য্য। লোলীভূত উক্ত তেজ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শরীর উৎপন্ন বলিয়া উঁহা বেদবাদিগণকর্ত্তৃক রবি নামে কথিত। ইনি সমস্ত লোক প্রকাশ করেন বলিয়া ভাস্কর, প্রকর্ষতা নিবন্ধন প্রভাকর, দিবা করেন বলিয়া দিবাকর এবং সমস্ত জগতের আদি বলিয়া আদিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে দ্বাদশ আদিত্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমুৎপন্ন।

গরুড় পুরাণেও দ্বাদশ সূর্য্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

দ্বিতীয়ায়াস্তু কক্ষায়াং সূর্য্যান্ দ্বাদশ পূজয়েৎ।
ভগঃ সূর্য্যোঽর্য্যমাচৈব মিত্রোবৈ বরুণস্তথা।
সবিতাচৈব ধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাবলঃ।
ত্বষ্টা পূষা তথা চেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে॥

গরুড়-পুরাণ।

দ্বিতীয় কক্ষায় দ্বাদশ সূর্য্যের পূজা করিবে। দ্বাদশ সূর্য্যের নাম যথাঃ— ভগ, সূর্য্য, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু।

যাক্, আমরা সূর্য্যোৎপত্তি বর্ণনায় অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ফল কথা যে কোন ভাবেই হউক, প্রায় সকলেই সূর্য্যের দ্বাদশত্ব-স্বীকার

করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ইঁহার গতিবিধির সামান্য একটু আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও আনুষঙ্গিক লোকপালগণের বিবরণ বলিয়া পরে জ্যোতিঃসমূহের প্রচারাদি বলা যাইতেছে।

সুমেরুর পূর্ব্বে ও মানসের শিখর প্রদেশে সুবর্ণময় পরম পবিত্র 'বস্বোকসারা' নামক মাহেন্দ্র ভুবন।

সুমেরুর দক্ষিণদিকে মানসের শিখর-দেশে 'সংযমন' নামক যমের আবাস-ভবন।

সুমেরুর পশ্চিমে মানসের শিখর-প্রদেশে 'সুখা' নামে বরুণের পুরী বিদ্যমান আছে।

সুমেরুর উত্তরদিকে মানসের শিখর-প্রদেশে 'বিভাবরী' নামে কুবেরের অনুপম পুরী বর্ত্তমান আছে।

মানসের উত্তরপৃষ্ঠে লোকপালগণ ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ও লোকরক্ষার জন্য চারিদিকে অবস্থান করেন।

লোকপালগণের উপরিভাগে কাষ্ঠাগত সূর্য্য যেরূপে গমনাগমন করেন, তাহা বলা যাইতেছে।

যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো বৃষভধ্বজ!
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি চ।
যোজনানান্তু তস্যাক্ষ স্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সম্বৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥

গরুড়পুরাণ।

সূর্য্যের রথের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন, তাহার ঈষাদণ্ডের (যাহাতে অক্ষযুগের সন্ধি হয়) পরিমাণ রথপরিমাণের দ্বিগুণ, অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র যোজন। অক্ষের পরিমাণ দেড়কোটি সাত নিযুত (দুই কোটি বিংশতি লক্ষ) যোজন, তাহাতেই চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই চক্রের পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন-স্বরূপ তিনটী নাভি আছে, সম্বৎসর পরিবৎসরাদি পাঁচটী অর (চক্রশলাকা) এবং ছয় ঋতু স্বরূপ ছয়টী নেমি (চক্রের প্রান্তবলয়)

আছে। ইহা অক্ষয় ও সম্বৎসরময় ; সুতরাং সমগ্র কালচক্র ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানিতু সার্দ্ধানি স্যন্দনস্য বৃষধ্বজ !
অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণন্তু যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্যুগার্দ্ধঞ্চ ধ্রুবাধারং রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষেতু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে ॥

গরুড়পুরাণ।

দিবাকরের রথের দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। হে বৃষধ্বজ! অন্যান্য অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধ পঞ্চসহস্র যোজন। অক্ষের পরিমাণ যত, দুই পার্শ্বস্থ দুই যুগার্দ্ধের * পরিমাণও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র অক্ষ ঐ যুগার্দ্ধের সহিত বায়ুরাশিতে নিবদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষ ও তাহার চক্র মানসাচলে সংস্থিত আছে। তাহাতে ঐ রবিরথ সংস্থাপিত আছে।

গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি ; এই সপ্ত ছন্দঃ দিবাকরের সপ্ত অশ্ব।

প্রতিমাস-বিশেষে সূর্য্যরথ সাত সাতজন দেবাদিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সবিতুর্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ।
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালিখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥

গরুড়পুরাণ।

হে ব্রহ্মন্! উক্ত সপ্ত সপ্তগণ চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুশক্তিদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। সূর্য্যের গমনকালে মুনিগণ সূর্য্যদেবের স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে থাকে, অপ্সরাগণ নৃত্য এবং রাক্ষস সকল তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। সর্পসকল

* ঈষাদণ্ডের অগ্রভাগে বক্রভাবে অশ্ব বন্ধনার্থ যে দণ্ড নিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম যুগ।

তাঁহাকে বহন করিয়া থাকে এবং যক্ষগণ অশ্বরশ্মি যোজনা করিয়া দেয়। বালিখিল্য নামক ষষ্টি সহস্র মুনি সূর্য্যদেবের গমনকালে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকেন।

আক্রামন্ দক্ষিণে সূর্য্যঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
জ্যোতিষাং চক্রমাদায় সততং পরিগচ্ছতি।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

সূর্য্য যখন দক্ষিণ দিক্ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় গমন করেন; এবং জ্যোতিশ্চক্র অবলম্বন করিয়া নিয়ত গমন করিতে থাকেন।

যখন দিবাকর অমরাবতীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হন, তখন সংযমন নামক যমপুরে তাঁহার উদয় হয়। সেই সময় তাঁহাকে সুখা বা বারুণী পুরীতে উদিত হওয়ার ন্যায় দেখা যায়।

যে সময় বরুণ পুরীতে উদিত হন, সেই সময়ে বিভা নামক কুবেরপুরীতে অর্দ্ধরাত্র ও মাহেন্দ্র পুরীতে সূর্য্যাস্ত হয়, এবং সেই সময়েই দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্ সমূহে অপরাহ্ন হইয়া থাকে। এ সময়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাহ্ন, উত্তরদিকে শেষ রাত্রি এবং উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রথম রাত্রি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ এইরূপে উত্তর ভুবন-সমূহে বিরাজিত থাকেন।

সুখা নামে যে বারুণী পুরী আছে, তাহাতে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে বিভাবরী নামক সোমপুরীতে সূর্য্যের উদয় হয়। সেই সময়ে অমরাবতীতে অর্দ্ধরাত্রি এবং যমপুরীতে সূর্য্যাস্ত হয়।

সোমপুরী বিভাবরীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে মহেন্দ্রের অমরাবতী পুরীতে সূর্য্যের উদয় হয় এবং সংযমন পুরে অর্দ্ধরাত্র ও বরুণপুরীতে অস্তকাল হয়।

স শীঘ্রমেতি পর্য্যেতি ভাস্করোঽলাতচক্রবৎ।
ভ্রমন্ বৈ ভ্রমমাণানি ঋক্ষাণি গগনে রবিঃ॥

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ-শীল নক্ষত্রসকল অবলম্বন করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে সূর্য্যনারায়ণ দক্ষিণায়নে চারিপার্শ্বে পরিভ্রমণ করেন, এবং এই

রূপেই বারম্বার উদয়াস্ত লাভ করেন। তিনি পূর্ব্বাহ্ন সময়ে দুই দুইটী দেবালয় ও মধ্যাহ্ন কালে একটী দেবালয় আতপ প্রদান করেন। সূর্য্যের উদয় কাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত এইরূপে রশ্মিসমূহ প্রবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইলে তিনি অস্তগমন করেন।

উদয়াস্তময়াভ্যাং হি স্মৃতে পূর্ব্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাত্তপতি তাবৎ পৃষ্ঠেতু পার্শ্বয়োঃ।
যত্রোগুন্ দৃশ্যতে সূর্য্যস্তেষাং স উদয়ঃ স্মৃতঃ।
যত্র প্রণাশমায়াতি তেষামস্তঃ স উচ্যতে ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

সূর্য্যের উদয় ও অস্ত অনুসারে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি সম্মুখ, পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশে সমান পরিমাণে আতপ প্রদান করেন।

যেদিকে সূর্য্যদেব প্রথম উদিত হন, সেইদিক্ উদয় এবং যেদিকে তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যান, সেই দিক্ অস্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সমুদায়ের উত্তরদিকে সুমেরু এবং দক্ষিণে লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিত। রাত্রিকালে সূর্য্যদেব অতিদূরে গমন করেন এবং পৃথিবী দ্বারা আবরিত হন। রাত্রিতে সূর্য্যের রশ্মি দূরীভূত হয় বলিয়া তখন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও সূর্য্যের স্ব স্ব তেজঃপ্রমাণ বর্দ্ধিত হইলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহারা যে সময়ে অনুদিত থাকে, তাহাকেই অস্ত বলিয়া থাকে।

শুক্লচ্ছায়োঽগ্নিরাপশ্চ কৃষ্ণচ্ছায়া চ মেদিনী।
বিদুরভাবাদর্কস্য উদ্যতস্য বিরশ্মিতা।
রক্তাভাবো বিরশ্মিত্বাদ্রক্তত্বাচ্চাপ্যনুষ্ণতা।

অনুষঙ্গপাদ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্লবর্ণ, পৃথিবীর ছায়া কৃষ্ণবর্ণ। উদয়কালে অতিশয় দূরস্থিত বলিয়া সূর্য্যের কিরণ লক্ষিত হয় না, রশ্মির অভাবে রক্তবর্ণ দেখায় এবং রক্তবর্ণতা জন্য তাহাতে উষ্ণতাও থাকে না।

সূর্য্য যে যে স্থানে রেখা দ্বারা অবস্থিত হন, সেই সকল স্থানেই তিনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সূর্য্য সহস্র যোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য অস্তগমন করিলে তদীয় প্রভাসমূহের একাংশ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়,

এজন্য রাত্রিকালে দুরবর্ত্তী অগ্নিও অতিশয় উজ্জ্বল দেখা যায়। পুনর্ব্বার সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিগত প্রভাসমূহও অস্তগত হইয়া সূর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এই নিমিত্তই দিবাভাগে সূর্য্য অগ্নিসংযুক্ত হইয়া সন্তাপ প্রদান করেন, এবং তজ্জন্যই তাঁহার প্রকাশতা ও উষ্ণতা পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে সূর্য্য-তেজ ও অগ্নিতেজ দিবা ও রাত্রিকালে পরস্পর পরস্পরদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভূমির উত্তরার্দ্ধভাগে ও দক্ষিণার্দ্ধভাগে সূর্য্য অবস্থিত হইলে রাত্রি জল-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, রাত্রি প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই দিবাভাগে জল (চন্দ্রমণ্ডল) তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে। আবার সূর্য্য অস্তগমন করিলে দিন (সূর্য্যকিরণ) জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং রাত্রিকালে দিবা প্রবেশ জন্য জল (চন্দ্রমণ্ডল) শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ যথাক্রমে দক্ষিণোত্তর ভূমার্দ্ধভাগে সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালমধ্যে দিবা-রাত্রি জল-প্রবিষ্ট হয়।

রাত্রিতে অন্ধকার ও দিনমানে সূর্য্যের প্রকাশ হওয়ায় দিবাভাগের একটী নাম সূর্য্য-প্রকাশ ও রাত্রির নাম তামসী হইয়াছে।

এইরূপে ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ গগনমধ্যে পরিভ্রমণকালে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিশভাগ গমন করেন। এই মুহূর্ত্তকালমধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন, ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূর্ত্তিকী গতি কহে।

এইপ্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণে কাষ্ঠায় গমন করেন, এবং মাঘের শেষ দিনে কাষ্ঠার অন্তসীমায় উপস্থিত হন। তৎপর দক্ষিণ কাষ্ঠা হইতে প্রতিনিবৃত্ত সূর্য্য বিষুবস্থ হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর দিকে গমন করেন।

বিষুবমণ্ডলের বিস্তার-পরিমাণ—৩০১০০০৮১ যোজন।

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্‌সকল পরিভ্রমণ করেন। উত্তর দিকের মণ্ডলের সংখ্যা—১৮০০০০০৫৮ যোজন।

উত্তর ভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণ ভাগের নাম অজবীথি, কাষ্ঠদ্বয়ের অন্তর ১০৩১৬৬ যোজন।

কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখাদ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার পরিমাণ ৭১০০১০৭৫ যোজন।

কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দুইটী রেখা আছে। উত্তরায়ণ সময়ে

সূর্য্যদেব অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহ্যভাগে পরিভ্রমণ করেন। এই উত্তর ও দক্ষিণ পরিভ্রমণ ১৮০ মণ্ডল। (যোজন পরিমাণে মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন।) ইহারই নাম মণ্ডলের বিকম্প। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন।

কুলাল-চক্রের প্রান্তভাগ যেমন শীঘ্র শীঘ্র ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যও দক্ষিণায়নে শীঘ্র শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সূর্য্য দক্ষিণায়ন সময়ে অতি অল্পকালে সুবিস্তৃত ভূমি ভ্রমণ করেন। এই সময়ে সূর্য্য দিনমানে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সাড়ে ছয় নক্ষত্র এবং রাত্রিকালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে সাড়ে ছয় নক্ষত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কুলাল-চক্রের মধ্যভাগ যেমন মন্দগতিতে ঘূর্ণিত হয়, সূর্য্যও সেইরূপ উত্তরায়ণ সময়ে মন্দগতিতে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং অল্প ভূমি পরিভ্রমণ করিতেও তাঁহার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। উত্তরায়ণ কালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে এক দিন হয়, এই এক দিনে তিনি সাড়ে ছয় নক্ষত্র এবং অষ্টাদশ-মুহূর্ত্ত পরিমিত রাত্রিকালেও তিনি সাড়ে ছয় নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন।

এই উভয়বিধ গতি অপেক্ষা মন্দ গতিতে চক্র-ভ্রমণের ন্যায় অথবা চক্র-মধ্যস্থ মৃৎপিণ্ডের গতির ন্যায় ধ্রুব নক্ষত্র ঘূর্ণিত হয়। উভয় কাষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্রুবের মণ্ডল প্রমাণানুসারে ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। কুলাল-চক্রের নাভি যেমন একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ ধ্রুবও কক্ষস্থানে অবস্থিত থাকিয়া ভ্রমণ করে।

উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডল ভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও শীঘ্রগতি অনুসারে দিবারাত্রি হইয়া থাকে। উত্তরায়ণে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দগতি এবং রাত্রি-কালে সূর্য্যের শীঘ্রগতি হইয়া থাকে।

(বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদার।

শিক্ষার দোষ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরোহিতের পরিচয়।

ননির মাতা অভিমানে, অপমানে ও মর্ম্মান্তিক দুঃখে বড় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। হীরালালদিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় যাইবেন, প্রথমে তাহা স্থির করিয়াই উঠিতে পারিলেন না।

কিয়দ্দূর গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন,—তারপর একেবারে তাঁহাদের জ্ঞাতি উমেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উমেশ সম্পর্কে তাঁহার দেবর—তাঁহার স্বামীর পিতৃব্য-তনয়।

উমেশ চক্রবর্ত্তী লেখাপড়া আদৌ জানেন না। ননির পিতা জীবিত থাকিতে, তিনি যজমান বাড়ীতে ফলাহার করিয়া দক্ষিণাপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইতেন না। কারণ, দশকর্ম্ম করাইতে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ।

তারপর ননির পিতার মৃত্যুর পরে যখন তাঁহাদের যজমানগণের পুরোহিত-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন তাঁহাকে তাঁহারা ডাকিয়া বলিলেন—মহাশয়! আপনি কুলপুরোহিত, আপনি থাকিতে আমরা কোথায় নূতন পুরোহিত আনিতে যাইব। তদুত্তরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"সে ত বটেই। কুলপুরোহিত পরিত্যাগে সপ্তম পুরুষ নরকে পতিত হয়। ইহা ত শাস্ত্রেই আছে। আপনারা পুণ্যবান্—জ্ঞানবান্—আপনারা কি আর—আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তবে কি জানেন, ছোট কাল হইতে ওকায করা অভ্যাস নাই—দাদাই করিতেন—(দাদা অর্থে ননির পিতা) এখন কিছুদিন একটু মুস্কিল হবে। তবে আপনারা অনুগ্রহ করিলে একরূপ চালাইয়া লইতে পারিব।"

যজমানগণ একদিন একত্র সমাগত হইয়া মত দিলেন, যখন নিকটে ভাল পুরোহিত নাই,—একটু দূরে আছেন বটে, কিন্তু পয়সা ব্যয় কিছু বেশী হয়, আর তাঁর গুমোর অধিক। পুরুত ঠাকুর—পুরুত ঠাকুর ক'রে পাছে পাছে ফিরিতে হয়। তাঁর মতামত লইয়া অনেক কায করিতে হয়—একটু

যেন শাসনাধীনও থাকিতে হয় – তাতে আর কায নাই। এই ভাল—মুখ্য-সুখ্যু মানুষ—দু'পয়সা দাও না দাও—দু'টা তাড়া দাও—যা কর না কর—সব শোভা পায়,—পুরুত এমন না হইলে পোষায় না। সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে তাহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল, এবং তাহার পর দিবস হইতে উমেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোঁপ কামাইয়া মস্তকে শিখা রাখিয়া সমাজের পুরোহিত হইয়া বসিলেন। তবে ইদানীন্তন তাঁহার খ্যাতি নিতান্ত কম হয় নাই—এক-রাত্রে সাতখানি কালী পূজা করিয়া কৃতিত্বের জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন।

ননির মাতা যখন বড় দুঃখে, বড় অভিমানে, বড় হৃদয় বেদনা লইয়া তাঁহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাঙ্গণের মৃত্তিকার প্রলেপে কপালে প্রাতরাহ্নিকের চিহ্নাঙ্কিত করিয়া, দক্ষিণ-দুয়ারী মাটির ঘরের দাবায় বসিয়া থলে, হুঁকায় গুড়ুক ধূমপান করিতেছিলেন এবং তদীয় গৃহিণী অদূরে বসিয়া তরকারী কর্ত্তন ও কোন্ যজমানের পিতৃ-শ্রাদ্ধ কবে. তাঁহার মোটামুটী একটা তালিকা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন।

সহসা ননির মাতাকে বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া চক্রচর্ত্তী মহাশয় একটু বিরক্ত হইলেন। কারণ, ননির মাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বামীর যজমান অতএব তাঁহার কিছু পাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া উমেশচন্দ্রের নিকটে ব্যর্থ দাবি করিতেন। যদিও উমেশ সে দাবি কখনও গ্রাহ্য করেন নাই, তথাপি জঞ্জাল বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সকালে হঠাৎ ননির মাতাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, কোন ধনবান্ যজমানের বাড়ীতে বুঝি কোন একটা বড় কায উপস্থিত—মাগী তাহা হইতে কিছু পাইতে বাসনা করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

ঐরূপ মনে করিয়া তিনি অতিশয় গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন! এবং ঈষৎ বক্র হইয়া বসিয়া দক্ষিণ হস্তে একখানা খড়মের দ্বারা আর একখানা খড়ম বিনা কারণে মৃদু মৃদু ঠুকিতে ঠুকিতে ধূমপানে অস্বাভাবিক মনঃসংযোগ করিলেন। গৃহিণী পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া "এস দিদি।"—উদাস-অবজ্ঞাস্বরে এই কথা বলিয়াই করধৃত বার্ত্তাকুবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্বকার্য্যে মনঃসংযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। স্বাগতা দিদির প্রতি অভ্যর্থনা বাক্য বিতরণ ব্যতীত দৃষ্টিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না। যেহেতু দিদি-সম্বন্ধে তিনিও কর্ত্তার মতই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।



প্রত্যাখ্যান।

সংসার-জ্ঞান-পরিপুষ্টা সুচতুরা ননির মাতা দেবর ও দেবর-ভার্য্যার ভাববিপর্য্যয় ও মনের অবস্থা সহজেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন, এবং এইরূপ ভাব যে আ'জ প্রথমে জানিতে পারিলেন, তাহা নহে;—ইদানীন্তন তিনি যে দিবস এ বাড়ীতে আগমন করেন, সেই দিবসই তাঁহাদের ঐরূপ ভাব দর্শন করিয়া থাকেন। তবে হতাশ হইলেন না, কেন না যজমানের আয়ের অংশ বা তাহা হইতে কিছু প্রাপ্তির কথা বলিতে আসেন নাই।

যেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়াছিলেন, দাবায় উঠিয়া তাহারই অদূরে বসিয়া ননির মাতা বলিলেন,—"ঠাকুরপো, কর্ত্তা স্বর্গগমন করিয়াছেন—বংশের মধ্যে তুমিই এখন মুরুব্বি"—

মধ্যস্থলে বাধা দিয়া হাতের খড়ম মাটিতে ফেলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"না বৌ, সে কথা মিছে।"

ন-মা। কেন? তোমার চেয়ে বয়সে বড় আর কে আছে?

চক্র। কিন্তু আমায় মানে কে? এখনকার যে সব ছেলেপুলে, কেউ কি কাকে মানে বৌ? স্ব স্ব প্রধান! এই সেদিন ননি বাড়ী এসেছিল, একটীবার মুখের কথা শুধিয়েছে কি!

ন-মা। আমার ননির কথা ছেড়ে দাও। সে মুখচোরা—

চক্র। ঐ রকম সবাই বৌ—কেউ মুখচোরা, কেউ অহঙ্কেরে--কেউ বিদ্বান্‌—কেউ চাকুরে। আমরা কোন রকমে দিন কাটাই—প্রধানের দাবি রাখি না বৌ। কেন, হঠাৎ কি হইয়াছে? কি জন্যে এসেছ বল দেখি?

ন-মা। তুমি ঠাকুরপো, আগেই যেরূপ উদাসভাবে কথা বলিতেছ—তাতে কি আমার কথা শুন্‌বে?

চক্র। শুনিবার মত হইলে শুনিতে পারি---তবে কি জান বৌ, যেরূপ কাল-দিন প'ড়েছে, তাতে হাঙ্গাম হুজ্জুৎ করা চলে না।

ন-মা। না ঠাকুরপো, আমি কি কারো সঙ্গে লাঠালাঠি করিতে বলিতে আসিয়াছি। সামাজিক ব্যাপার—তোমরা সমাজের—

চক্র। যাক্‌—কি বলিতে আসিয়াছ, বল দেখি?

ন-মা। হীরু—

চক্র। কোন্ হীরু ?

ন-মা। বলিতেছি--সীতে বোসের ছেলে হীরু। তার আস্পর্দ্ধায়—তার ব্যবহারে—তার কথায় আমি একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছি—যদি এর উপায় তুমি কর, ভাল—নতুবা আমি তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।

চক্র। কি হ'য়েছে—আগে বল শুনি।

তখন ননির মাতা সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাক্ষাতে বর্ণনা করিলেন।

অতিশয় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাতের হুঁকা গৃহ-দেওয়াল-গাত্রে ঠেসান দিয়া রাখিয়া বলিলেন,—"কালের ধর্ম্ম বৌ,—কালের ধর্ম্ম! তবে ওদের সংশ্রবে তোমাদের না যাওয়াই উচিত ছিল।"

ন-মা। আমরা আর কি সংশ্রবে গিয়াছিলাম ঠাকুরপো ? গোরার কথা যা, তা'ত' বলিলাম।

চক্র। সে ত শুনিয়াছি—

ন-মা। প্রতিকার করিবে না ?

চক্র। আমি ? আমি কি প্রতিকার করিতে পারিব বৌ ?

চক্রবর্ত্তীভার্য্যা এতক্ষণ গম্ভীর মূর্ত্তিতে তরকারি কর্ত্তন করিতেছিলেন, আর স্থির কর্ণে সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন,—এতক্ষণে তিনি আসরে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন জ্ঞান করিলেন, এবং ঝটিতি করধৃত কর্ত্তিত তরকারি-খণ্ডগুলি যথাযোগ্য পাত্রে অবস্থাপিত করিয়া, পদচাপিত বঁটী হইতে পদ সরাইয়া তাহাকে শায়িত করিয়া বিশ্রাম দিলেন, নিজে স্বামী ও ননির মাতার দিকে মুখ করিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"বুঝি না বুঝি আমি একটা কথা বলি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও ননির মাতা উভয়েই সে 'একটা কথা' শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইলেন।

তখন সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে চক্রবর্ত্তীভার্য্যা বলিলেন,—"আমরা তাদের পুরোহিত। গুরু-পুরোহিতের ওসকল বাজে কথার মধ্যে থাকা উচিতই নয়।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীর স্বরে সে 'একটা কথা'র সমর্থন করিলেন। বলিলেন—"সে ঠিক কথা।"

ননির মাতা কিন্তু সে 'একটা কথা' নিতান্ত মূল্যহীন এবং অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি হতাশ-বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"হ্যালা, তোরা তিন দিনের কুলপুরোহিত—আর আমরা কত দিন ঐ কায করিয়াছি। আজ আমাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিল, কা'ল যে তোদের সঙ্গে করিবে না, কে বলিল ?"

ননির মাতার কথা চক্রবর্ত্তীভার্য্যা সমীচীন ও সাধু বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। যজমান যে তাঁহার কোন কালে কেহ ছিল, একথা বলাই তাঁহার সমূহ ধৃষ্টতা, একথা বুঝাইয়া দিবার জন্য মিষ্ট মিষ্ট করিয়া তিনি অনেকগুলি অবান্তরীয় কথা শুনাইয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন না।

ননির মা তাহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু সে সকল কথার উত্তর দিতে গেলে এখনই একটা প্রবল ঝগড়া বাধিয়া যায়, এবং ঝগড়া বাধিয়া গেলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অকৃপা হইবে আশঙ্কায় সে সকল সহ্য করিলেন। বলিলেন,—"তবে কি ঠাকুরপো, এর প্রতিকার তুমি করিবে না ?"

চক্র। আমি কি করিতে পারিব, তাই ভাব্‌ছি।

ন-মা। ওর কায বন্ধ কর—

চক্রবর্ত্তীভার্য্যা যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওমা তাও কি হয় ? ওরা আ'জ কা'ল শ্রীমন্ত—বছরে দশ টাকা মিলে—ওদের মানে আমাদের মান ?"

ন-মা। নিজের বংশের যে অপমান করে, সে আর কি মান রাখিবে ? ঠাকুরপো, চক্রবর্ত্তীবংশ এদেশে চির সম্ভ্রান্ত, ননি যেমনই হোক—আপন বংশের কথা স্মরণ করিয়া কায কর—

চক্র। আচ্ছা আচ্ছা,—তুমি এখন যাও ; আমি সীতেনাথকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যাতে যা হয়, করিব।

ন-মা। দোহাই ঠাকুরপো—বড় অপমান করিয়াছে, তুমি এর প্রতিকার না করিলে উপায় নাই।

তদুত্তরে চক্রবর্ত্তীভার্য্যা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"গিন্নি, স্থির হও। দেখা যাক্—একটা কিছু করিতে হবে।"

ননির মাতা আরও অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়া তখন বিদায় হইলেন।

ননির মাতা চলিয়া গেলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি সীতে বোসের সঙ্গে বিবাদ করিবে না কি ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃদুস্বরে বলিলেন—"উঃ! আমার ভারি গরজ, যে যত সুহৃৎ, জানা আছে? পান্তা ভাতে বাতাস দিয়ে খাই—বিড়ালের প্রত্যাশা রাখি না।"

"তাই ত বলি"—এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহিণী তখন কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকা ঢালিয়া আর এক ছিলিম তামাক সাজিবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

যোগ।

চতুরশীতিলক্ষ প্রকারের আসন
শিক্ষা করে' উগ্র-কঠোর যোগ-সাধন—
সে আমার নয়; নিবিড় গহন বনে,
পর্ব্বত-গুহায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে
তব ধ্যান,—তাও মোর হবে না—হবে না!
আমি শুধু যোড়করে ডাকিব তোমায়,
ইচ্ছামত, যথা-তথা, কলোল যেথায়!
বিন্দুমাত্র সরলতা রহে যদি হৃদে,
হবে যোগ হবে মোর—হবে তব সাথে!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।



চণ্ডিদাস ও রজকিনী।

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ
ত্রি-সন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী।

শ্রীযুক্ত শশিকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে কল্যাণী হইতে গৃহিত।

ACME PRESS, CALCUTTA.

অবসরে-উচ্ছ্বাস।

"অবসর"! লভিয়ে তোমায়
ভেবেছিনু তব সনে কাব্য-শাস্ত্র আলাপনে
ফুল্ল প্রাণে যাপিব সময়।
জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি হৃদয়ে উঠিবে ভাতি
অজ্ঞান-তিমির করি নাশ,
কিন্তু হায় দগ্ধাদৃষ্ট পূরিল না সে অভীষ্ট
অঙ্কুরেই হইল নৈরাশ।
তুমি কোন দূর দেশে কোথায় অজ্ঞাত বাসে
ত্যজি মোরে করিলে প্রয়াণ,
সংসারের কারাবাসে রুদ্ধ থাকি নির্ব্বিশেষে
আমিও না করিনু সন্ধান।
এক দুই তিন করি কেটে গেল মাস চারি
বরষার ভীষণ প্লাবন,
প্লাবিয়া এ বঙ্গভূমি অতিক্রান্ত হ'তে, তুমি
ধীরে আসি দিলে দরশন।
স্নিগ্ধ শরতের সনে নববর্ষ-উদ্বোধনে
হেরিলাম তব কলেবর,
নব সাজ সজ্জা করে মায়ায় ভুলাতে মোরে
আসিয়াছ ওগো "অবসর"!
যদি পুনঃ দেছ দেখা এ মিনতি রেখ সখা
ত্যজি দূরে নাহি যেও আর,
তব সাধু-সঙ্গে বাস করি, সদা অভিলাষ
কুতুহলে পূরাই আমার॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্য।



শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিদ্বান্ ও যোগী জগতীতলে আর আবির্ভূত হন নাই। মাত্র বত্রিশ বৎসর কাল ইনি মর্ত্ত্যভূমে জীবিত ছিলেন। অধ্যয়নাদিতে ষোড়শবর্ষকাল অতীত হয়,—এই অল্পকালের অধ্যয়নে এমন শাস্ত্র নাই—এমন বিদ্যা নাই—এমন তত্ত্ব নাই, যাহাতে ইনি অপরিসীম জ্ঞান লাভ না করিয়াছিলেন।



জনশ্রুতি, ইঁহার সবে ষোড়শবর্ষকাল পরিমিত পরমায়ু ছিল। কিন্তু ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তাদি শাস্ত্রের ভাষ্যাদি প্রণয়নে একমাত্র শঙ্করাচার্য্যই সমর্থ বিবেচনায় আর ষোল বৎসর জীবনকাল বৃদ্ধি করিয়া দেন। ফলকথা, বত্রিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য জগতে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কেহ পারেন নাই।

শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ জানিবার উপায় নাই। নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য্য মলবর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'কেরাল উৎপত্তি' নামক গ্রন্থও এই মতের সমর্থন করেন।

উইলসন সাহেব বলেন, ৮০০ কি ৯০০ শত খৃঃ অঃ পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য জীবিত ছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীর মতে ৭২০ খৃঃ অঃ শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল হইতে পারে। কারণ, শঙ্করাচার্য্য যখন কাশ্মীর দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া-

ছিলেন, তখন ললিতাদিত্য তথাকার রাজা বলিয়া জানা যায়। রাজতরঙ্গিণীর হিসাবে ১১৮৬ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজত্ব-কাল।

হাসেন সাহেব লিখিয়াছেন—৮০০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য পঞ্চম বৎসরের মধ্যেই মাতার নিকট পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহাতে পণ্ডিত হইয়া উঠেন। পঞ্চম বৎসরে গুরুগৃহে গিয়া বেদাদি-শাস্ত্রে পণ্ডিত ও ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হয়েন। অষ্টম বৎসর বয়সে শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমৎ গোবিন্দ পূজ্যপাদ স্বামীর শিষ্য হন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শিবের অবতার-বিশেষ। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩০০ বৌদ্ধধর্ম্মীকে ভারতছাড়া করিয়া তবে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই সাধারণের মত। কিন্তু সন্দেহ হয়, ভগবান্ বিষ্ণুর দশ অবতারের এক অবতার বৌদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শিব অবতার গ্রহণ করিয়া এদেশ হইতে তাড়াইলেন কেন? তবে ভগবান্ বিষ্ণু অধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন? এ সন্দেহ নিরাসন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা সুধীব্যক্তি করিবেন কি? শঙ্করাচার্য্য অনেক গ্রন্থ, অনেক ভাষ্য, অনেক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

সুখ ও দুঃখ।

দুঃখ বলে, "সুখ ভাই! তুমি পুণ্যবান্
পাইতে তোমারে সবে করে আকিঞ্চন,
আমারে পাইতে বল কেবা করে আশ?
যা'র হৃদে পশি তা'রি করি সর্ব্বনাশ,
কাঁদাই তাহারে আমি দিবস-শর্ব্বরী
অবশেষে করি তা'রে অরণ্য-বিহারী।"
সুখ বলে, "দুঃখ ভাই! দুঃখ কর কিসে?
তুমি ছাড়া আমি বল রহি কোন দেশে।"

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

রাজলক্ষ্মীর কৃপা

এক ব্রাহ্মণ এক রাজ-বাড়ীতে দৈনিক আট আনা বেতনে মুচ্ছদ্দি ছিল। প্রতিদিন রাজ-বাড়ীতে কত লোক প্রবেশ করে, এবং কত লোক বাহির হইয়া যায়, ঐ ব্রাহ্মণ তাহারই হিসাব রাখিত। সে রাজার মন্ত্রীর বড়ই প্রিয়পাত্র ছিল।

একদিন রাজলক্ষ্মী ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বলিলেন—"রে ব্রাহ্মণ, আমি আর রাজবাড়ীতে থাকিতে চাই না, তোর বাড়ীতে আমি আবাস-স্থান করিতে চাই।" তাহাতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"মা! তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিলে আমি সামলাইতে পারিব না, তবে যদি একান্তই আমাকে অনুগ্রহ করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমার নিকট তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তুমি যখন চঞ্চলা, একস্থানে যখন বরাবর থাকা তোমার স্বভাব নহে, তখন যেদিন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, সেদিন যেন আমার এই দৈনিক আট আনা লইয়া যাইও না।" লক্ষ্মী অগত্যা তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন।

দেবতার কৃপা হইলে মানবের অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। রাজার প্রধান মন্ত্রীর ভয়ানক অসুখ হইয়া পড়িল, রাজবাড়ীর কায কর্ম্ম আর চলে না। তখন রাজা বাধ্য হইয়া মন্ত্রীকে কতক সময়ের জন্য বিদায় দিয়া তাহা-রই পরামর্শ মতে ঐ ব্রাহ্মণকেই মন্ত্রী-পদে নিয়োজিত করিলেন। ব্রাহ্মণও বেশ দক্ষতার সহিত কায কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, রাজা যখনই 'কোন্ হিসাবে কত পাওনা আছে' জিজ্ঞাসা করিতেন, নব নিয়োজিত মন্ত্রী কোন হিসাব না দেখিয়াই ধাঁ করিয়া সকল কথা বলিয়া ফেলিতেন, এমনই আশ্চর্য্য যে হিসাবও ঠিক কথায় কথায় মিলিয়া যাইত। রাজা ব্রাহ্মণের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে ক্রমে ব্রাহ্মণ রাজারও অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতেন, লক্ষ্মী যখন কৃপাই করিয়াছেন, তখন যে ক'টা দিন তিনি আমার বাড়ী থাকিবেন, সে ক'টা দিন লক্ষ্মীকে আচ্ছা করিয়া খাটাইব। কোন হিসাব দেখি না, অথচ যখনই যাহা বলি, তখনই তাহা

বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, যেন বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। না হবে কেন?—দেবতার কৃপা হইলে এমনি না হইয়া আর যায় কে?

একদিন ব্রাহ্মণ মনে মনে আঁটিলেন যে, আচ্ছা, যখন যাহা বলি তখনই তাহা যেমন ঠিক হয়, এখন হইতে উল্টাভাবে বলিব, দেখি লক্ষ্মী এবার কি করেন। এই ভাবিয়া রাজসম্মুখে গিয়া দেখেন—রাজা পান চিবাইতেছেন, যেই দেখা, অমনি চটাৎ করিয়া রাজার গালে এক চড় মারিলেন। রাজার মুখের পান মাটিতে পড়িয়া গেল, তাহা হইতে প্রকাণ্ড একটা চেলা বাহির হইয়া গুড়ি গুড়ি দিয়া চলিয়া গেল। রাজা ব্রাহ্মণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

এইরূপে ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেরই ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিল। সেই রাজ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। এমন কি, স্বয়ং রাজাও ব্রাহ্মণকে না জিজ্ঞাসা করিয়া মলমূত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে যান না। ব্রাহ্মণ যাহা করেন, কি যাহা বলেন, রাজ্যের লোক তাহাতে নতশির হইয়া ব্রাহ্মণকে ভগবানের অবতার বিশেষ মনে করিতে লাগিল।

এইভাবে ব্রাহ্মণ উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া এক দিন রাজলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন মা, আর ক'দিন আছ"?

লক্ষ্মী বলিলেন,—"বাপু, আমি সর্ব্বদাই চঞ্চলা, কখনও একস্থানে বেশী দিন স্থির হইয়া থাকি না, কিন্তু এমন বেগ আর কোথাও পাই নাই, তোর কথা কি কোন কায ঠিক করার জন্য আমাকে অনেক খাটিতে হয়, কি করি না খাটিয়া পারি না।" লক্ষ্মী আরও বলিলেন--"বাপু! তোর বাড়ীতে থাকিয়া তোর জন্য পরিশ্রম করিয়া বড়ই হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছি। আর আমার স্বভাবই এই যে, এক স্থানে আমি থাকি না, এখন তোর বাড়ী হইতে যাইতে চাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা যাইবেই যখন—যাও, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে তো? দৈনিক আট আনা যেন থাকে, সেটাও যেন লইয়া যাইও না।"

লক্ষ্মী বলিলেন, "সে ভয় নাই, তোর আট আনা আমি নিব না।"

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি মা,—তুমি এখন কোথায় যাইবে মনন করিয়াছ? আমার একান্ত বাসনা, তুমি আবার রাজবাড়ীতে যাও।"

লক্ষ্মী বলিলেন, "বাপু রে! আমি যে বাড়ী একবার পরিত্যাগ করি,

পুনরায় আর সে বাড়ীতে যাই না, তবে যখন তুই আমাকে অনুরোধ করিতেছিস্, তখন কতক দিনের জন্য না হয় রাজবাড়ীতে গিয়াই থাকিব।”

* * * * * * *

এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর একদিন মধ্যাহ্নে রাজা শয়ন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় আছেন, ব্রাহ্মণ একখানা চাকু দ্বারা পেন্সিল কাটিতে কাটিতে ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছেন, আর ক্রমশঃ রাজার শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। রাজা স্বপ্নে দেখিতেছেন, ব্রাহ্মণ রাজ্যে একাধিপত্য লাভ করিয়া অদ্য তাঁহাকেই খুন করিতে আসিয়াছে! রাজা হঠাৎ জাগ্রত হইয়া ব্রাহ্মণের এবম্প্রকার ভাব অবলোকনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, রাজপুরীর দশ বার জন ভৃত্য আসিয়া রাজাদেশে ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া ফেলিল। রাজার বিচারে ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদের আদেশ হইল।

ব্রাহ্মণ মৃত্যু অবধারিত জানিয়া, রাজার নিকট অকপটে তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর কৃপাবিষয়ক যাবতীয় ঘটনা ব্যক্ত করিলেন, এবং তাঁহারই অনুরোধে রাজলক্ষ্মী পুনরায় রাজপুরীতে আসিবেন, এ কথাও রাজাকে জানাইলেন।

রাজা বলিলেন, “আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার সময় রাজপুরীর ধনাগারে ধূপ প্রদীপ দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আমরা সকলে রোয়াকে বসিব, তখন তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহা যদি স্বয়ং লক্ষ্মী আমাকে সুধায়, তবে তোমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা রহিত করিয়া তোমাকে সাবেক মুচ্ছদ্দি পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিব।”

ব্রাহ্মণ রাজলক্ষ্মীকে সবিশেষ জানাইলেন, লক্ষ্মীও তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া রাজার অভিলাষ পূরণ করিলেন। এ দিকে রাজ-বিচারে ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব পদ ঘুচিয়া পুনঃ সেই দৈনিক আট আনা বেতনে মুচ্ছদ্দি হইয়া বাকি জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

দেবতার যখন কৃপা হয়, তখন মানুষ দেবতা হয়, যাহা বলে, যাহা করে সবই সাজে। তাঁহারই অঙ্গুলী-হেলনে বিশ্ব বিমোহিত হয়। আবার যখন দেবতার অনুগ্রহ চলিয়া যায়, তখন মানবের অধোগতির একশেষ হইয়া থাকে, উল্লিখিত গল্পটী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এস গো হাসি।



রয়েছি প্রবাসে, নির্জ্জন আবাসে,
দর্শন বিনা তোমার ;
অমিয় মাখান, চারু চন্দ্রানন,
বাহিক দৃষ্টির বার।
তাই কি মানিনী, জীবন-সঙ্গিনী,
করিয়াছ মুখ ভার ?
জান না কি তুমি, তোমারে যে আমি,
করেছি জীবন-সার !
চাতক চাতকী, হ'য়ে মুখোমুখি,
আনন্দ-সাগরে ভাসি ;
পবিত্র প্রেমেতে, জগৎ মাতাতে,
হয় যদি অভিলাষী ;
সুফলের আশা, যদিও দুরাশা,
তবুও এস গো হাসি ;
তুমি যে আমার, হাসির আগার,
তাই বড় ভালবাসি।
এস) হাসিতে হাসিতে, পর-সেবাব্রতে,
মনের আবেগে ধাই।
মান অভিমান, স্বার্থের সম্মান,
হৃদয়ে না পাবে ঠাঁই।
অন্যের যাতনা, করিতে সান্ত্বনা,
বিভুপদে শক্তি চাই।
হৃদয়ে হৃদয়ে, যাইব মিশিয়ে,
নিশানা রহিবে ছাই ॥

শ্রীশতদলবাসিনী দাসী

হতভাগিনী।



দুঃখীরাম জাতিতে ধীবর ; সে সকল নদীতে মাছ ধরে, আর তাই বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, তাহাতেই তাহার সংসার চলে। দুঃখীরামের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের বৎসর অতীত হইতে না হইতে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পরে আবার বিবাহ করে, সেও উহাকে ফাঁকী দিয়া যায়। ফের আবার বিবাহ করে, অনেক দিন পরে এই স্ত্রীর গর্ভে তাহার একটী মেয়ে হয়। বাপ মা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন (সোহাগী)। খুব অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কবে যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা তাহার একটুকুও মনে নাই। লোকের কাছে শুনিয়াছে—অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, লোকের কাছে না শুনিলে সে জানিতে পারিত না। তাহার বিবাহের ৭ দিন পরে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল, বিধবা হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশেষ কিছু কষ্ট হইত, এমত বোধ হইত না। সে আর সকলের মত খায় দায়, কায কর্ম্ম করে, নদীতে বাসন মাজিতে যায়,আর হয় ত দ্বিপ্রহরে কায কর্ম্ম হইয়া গেলে বাটীর সম্মুখে বটগাছ তলায় বসিয়া কত কি ভাবে, কোন কোন দিন বৃক্ষমূলে মাথাটী রাখিয়া সমীরণের মৃদু শীতল সঞ্চালনে ঘুমাইয়া পড়ে।

স্বামীর অভাব বুঝিতে না পারিলেও তাহার কষ্ট ছিল না এমন নয়। সে বাপ-মায়ের বড় আদরের মেয়ে ছিল, তাই এত অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এ বিবাহের এত সুখ এত আশা, সব চিরকালের মত ভাসিয়া গেল। এত আদরের মেয়ে বিধবা হওয়ায় বাপ মা, খাওয়া দাওয়া একরূপ বন্ধ করিয়া দিল। সোহাগীর মা সোহাগীকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখিত,কিন্তু এ আঘাত বড় বেশী লাগিয়াছিল; – হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই আর সহ্য করিতে পারিল না। হঠাৎ হৃদ্রোগে সোহাগীর মা সোহাগীকে রাখিয়া এ জনমের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুঃখীরাম স্ত্রীর মৃত্যুতে সংসার অন্ধকার দেখিল, একে ত মেয়ের মুখের দিকে চাহিলে তাহার হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যাইত, বুক ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহার উপর এত বড় একটা শোক! সে আর সহ্য করিতে পারিল না, নানা চিন্তায় পীড়িত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী নবীন নামক এক

ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিল, নবীনের অবস্থা ভাল ছিল, তাহার কিছু নগদ টাকা ও জমাজমী ছিল। এই নবীনের চেষ্টায় দুঃখীরামের চিকিৎসার কোনও ক্রটী হইল না। কিন্তু দুঃখীরাম আর বাঁচিল না, সে সোহাগীকে নবীনের হাতে সঁপিয়া দিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইতে চলিল; সোহাগী এবার বেশ একটু শোক পাইল। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহার স্নেহের আলো জনমের মত নিবিয়াছে। সে আঁধারে পড়িয়া গিয়াছে।

নদীর মধ্য হইতে কেবল অগণিত শ্যামল বৃক্ষাবলী দেখা যাইত, ঘর বাড়ী কিছু বড় একটা দেখা যাইত না। বৃক্ষবল্লরিগুলি যে স্নেহের স্নিগ্ধকোলে ঘরগুলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা নদীর ধার হইতে গ্রামে প্রবেশ করিলে বুঝা যাইত। গ্রামের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল এখন তাহা নাই, গ্রামে দুই চারি ঘর ভদ্রলোক আছেন, তাহার মধ্যে ঘোষেরাই একটু সম্পন্ন, তাঁহারাই গ্রামের জমীদার। তাঁহাদের বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হয়, গরিব লোকে বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার মিষ্টান্নের মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করে, ঘোষদের বাড়ীর বড় ছেলে সরোজকুমার কলিকাতার কলেজে পড়েন। তিনি বড় সদাশয়,—বড় পরোপকারী, গ্রামের চাষা ভদ্র সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি,—মধুর ব্যবহার সকলের হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল, বাল-সূর্য্যের মৃদু রক্তিম কিরণ-ধারা পানে উল্লাসিত,—শিশির-সিক্ত শেফালিকার মত গ্রামের সকলেরি প্রাণ ভক্তিরস পানে মাতিয়া উঠিল। সরোজবাবু সে-বার গরিব দুঃখীদিগকে কাপড় বিলাইলেন। সকলেই সেই কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে আসিল। আমাদের সোহাগীও সরোজবাবু-প্রদত্ত কাপড়খানি পরিয়া ঠাকুর দেখিতে আসিল। সরোজবাবু তখন পূজা-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ত। মণ্ডপে দাঁড়াইয়া তিনি সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন, কোনটী বা নিজে হাতে করিতেছেন। মণ্ডপের বাহিরে একটু দূরে একটী গাছতলায় সোহাগী দাঁড়াইয়া সরোজবাবুকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। আর ভাবিতেছিল—বড়বাবুর মত দীন দুঃখীর সহায় আর কি কেহ আছে? তাঁহার মত মানুষ নাই। মানুষ? না না! তিনি দেবতা ইত্যাদিঃ—

কতক্ষণ যে সে এইরূপ ভাবিতেছিল, তাহা তাহার একটুকুও জ্ঞান নাই। এদিকে যে মহাসমারোহে পাঁঠা-বলি হইয়া গেল এবং যিনি পাঁঠা কাটিলেন—তাঁহার বীরত্বের সমালোচনা সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে

একটী কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল, তাহা তাহার একটুও খেয়াল নাই। সে চিত্রাপিতার ন্যায় একভাবে একজায়গায় দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু নবীনের গৃহিণীর ধারাল নখের মিষ্ট আস্বাদন পাইয়া সে স্বপ্নোথিতার ন্যায় চমকাইয়া উঠিল, একটু লজ্জিতাও হইল। নবীনের গৃহিণীর তবুও রোষের উপশম হইল না। সে ঘোমটার ভিতর হইতে অর্দ্ধোচ্চ স্বরে যখন বলিল,—মর, মর, কি রঙ্গ দেখবার আর জায়গা নাই ? এখন যাবি নাকি চল। তখন যদিও কাকীর মিষ্ট সম্ভাষণগুলি সোহাগীর একপ্রকার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল, তথাপি স্বপ্ন-সমুদ্রের সুখলহরের সহিত কাকীর সম্ভাষণের পার্থক্য বিশেষ ভাবে অনুভব করিল। বড় কষ্টে চোখে জল আসিল, কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয় মনে করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া বাড়ীতে চলিল।

প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ নাই। তাই সোহাগীর দেহে যৌবনের ভরপূর জোয়ার লাগিয়াছে, তাহার কাকীর বাক্যবাণ,—প্রহার তাড়না সময়ে সহিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যৌবনের অলস মধ্যাহ্ন যখন দেহে ও মনে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব সুখতীব্রতার সঞ্চার করিয়া দিত, তখন জলমগ্ন জীবের ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিত; কোথাও কূল কিনারা পাইত না। তাই অবশেষে প্রাণের ব্যথায় অস্থির হইয়া নিজের হৃদয়ে একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি করিল। আগে রাত্রিদিন নির্দ্দয় তাড়না গঞ্জনা ভোগ করিতে করিতে কষ্টের প্রখরতা কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এখন যেন সুখ-দুঃখের জ্ঞান অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া আসিল। অভিমানের আবছায়া মনে দেখা দিল; আর কি যেন একটা অব্যক্ত ভাব মনে জাগিয়া উঠিল। আগে মার খাইলে সুধু শরীরে বেদনা বোধ হইত—সেজন্য অধিকতর কষ্ট পাইত, আর এখন শরীরের কষ্ট যত হউক না হউক, মনে বড় কষ্ট হইত; এই রকমে তার একটা অভ্যাস জন্মিয়া গেল। সর্ব্বদাই সে অন্যমনস্ক থাকিত, সুতরাং কাকী তাহাকে যন্ত্রণা দিবার আরও সুযোগ পাইল। কিন্তু এত যন্ত্রণার মধ্যে কখনও কখনও ঘোষদের বাড়ী যাইবার ছুটী পাইত। যে দিন ঘোষদের বাড়ী যাইত, সেদিন মনের উল্লাসে দ্রুতগতিতে সরোজবাবুর মার কাছে কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর কাছে দাঁড়াইতে পারিলে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিত। তাঁহারা তাহার দুঃখমলিন মুখখানি দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিত।

একদিন নবীন বাজার হইতে অনেকগুলি জিনিষ আনিয়াছিল। তার

মধ্যে দুটী সুপক্ক আম্র সোহাগীকে দিয়া বলিল, তুমি ইহা যাহা ইচ্ছা কর! সোহাগী অমনি আঁবটী হাতে ক'রে ঘোষদের গৃহাভিমুখে একরকম ছুটিয়া চলিল। যাইয়া দেখিল, সরোজবাবুর স্ত্রী বারাণ্ডায় বসিয়া বই পড়িতেছেন। অর্দ্ধকম্পিত স্বরে বলিল, বৌঠাকুরুণ, মা-ঠাকুরুণ কোথায়? বৌ বলিলেন, কেন? তিনি ঐ ঘরে শুয়ে আছেন, কিজন্যে বল! সোহাগী বলিল, এই দুটী আম নিয়ে এয়েছি। এই কথা শেষ হইতে না হইতে সহসা সেখানে সরোজ-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মা নহে, সোহাগী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বলিলেন—কিরে সোহাগী? বা! বেশ দুটী আঁব এনেছিস্! তা রোদে দাঁড়ায়ে কেন, বারাণ্ডায় এসে বোস্। সোহাগীর তখন রৌদ্র-বৃষ্টি জ্ঞান ছিল না। চোখ মাটির দিকে ছিল, কিন্তু দৃষ্টি ছিল না। কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যে অব্যক্ত মধুর ভাবাবেশে তাহার প্রাণ অবশ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আবার যখন সরোজবাবু তাহাকে বারাণ্ডায় বসিতে বলিলেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তখন তাহার ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্তভাগ গায়ে টানিয়া দিয়া বসিল। সরোজবাবু ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, আহা! উহাকে একখানি কাপড় দেও না! বেচারী বড় কষ্ট পায়, আর কিছু পয়সা দিও। স্ত্রী মুখ তুলিলেন, তাঁর নয়ন-কোণে করুণাব্যঞ্জক অশ্রু দেখা দিল। সরোজবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন। সাদরে স্ত্রীকে সুমধুর সম্ভাষণাদি দ্বারা পরম আপ্যায়িত করিলেন। বলা বাহুল্য, সোহাগী সবই দেখিতে পাইতেছিল। এরূপ দৃশ্য সে আর কখনও দেখে নাই। এই অভিনব পবিত্র দৃশ্যে তাহার সুকুমার হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ আনিয়া দিল,—শরীর অভূত-পূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভগবানের পূত-পদে দম্পতীর শুভ কামনা করিয়া আনন্দনীরে ভাসিতে ভাসিতে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। আসিবার পথে সোহাগী বড় বাবু যে তাহাকে মধুর স্বরে সোহাগী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই মনে করিয়া আসিতেছিল, বড় বাবু যে তাহাকে বড় আদরে সোহাগী বলিয়া ডাকেন,এই চিন্তায় বড় সুখ পাইতেছিল, হৃদয়ের অসীম প্রীতি-প্রফুল্লতা তাহার চিরবিষাদ মলিন মুখখানিতে ঈষৎ হাসির রেখাকারে প্রতিভাত হইতেছিল; কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা যাইতে ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যে তাহার হাসিরেখা রবিকিরণ-প্রতিফলিত জলবিম্বের ন্যায় শূন্যে মিলাইবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

সে দিন সন্ধ্যাকালে সোহাগী বাসন মাজিয়া গা ধুইয়া ফিরিয়া আসিতে-

ছিল, এমন সময় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া অবশ্য গুরুতর ব্যথা পাইল—কিন্তু মুহূর্ত্তেক পরেই ব্যথার অস্তিত্ব লোপ পাইল। যখন সে দেখিল, পাথরের থালাখানি দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন ভাবী বিপদের অশুভ আশঙ্কায় তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল!! সর্ব্বনাশ! তাহার কাকী বিড়ালে মাছ খাইলে, দুধ জ্বাল দিবার সময় উল্টিয়া পড়িয়া গেলে,—বাড়ীর কোন দ্রব্য যে কোন কারণে হোক না কেন হারায়ে গেলে অথবা শুধু ঘাট হইতে দেরী করিয়া আসিলে সোহাগীর প্রতি যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা মনে করিয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আজ তাহার বড় সাধের পাথরের থালাখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঐ আড়াল হইতে সে তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছে। আজ আর কি রক্ষা থাকিবে? কিন্তু ভাবিবারও অবসর হইল না। বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র একটা ঝাউ গাছের ডাল লইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর ন্যায় কাকী আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রথমে উহা দ্বারা যথেষ্ট সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল, সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, সোহাগীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, তথাপি সোহাগী একটী কথা কহিল না, কাঁদিল না। ভাবিল, তার নিজেরই ত অন্যায় হইয়াছে। সে পিছলাইয়া না পড়িলে থালাও পড়িত না। কিন্তু মারিতে মারিতে যখন হাত অবশ হইয়া আসিল, তখন নবীনের গৃহিণী প্রহার ত্যাগ করিয়া গালাগালি আরম্ভ করিল। এবার সোহাগীর মনে বড় বাজিল—সে আজকাল প্রহারাপেক্ষা গালাগালিকেই অসহ্য মনে করিত;—গালাগালিতে বড় ব্যথা পাইত। কিন্তু যখন চীৎকার করিয়া তার মৃত পিতা-মাতার উদ্দেশে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল, যখন ঘাটে বেশীক্ষণ থাকা লইয়া জঘন্য ভাষায় তার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল, তখন তার আর সহ্য হইল না। এতকাল সহ্য করিয়াছে, আর পারিল না। সে মান অপমান লজ্জা ভবিষ্যৎ কিছুই চিন্তা করিল না,—পাগলের মত হইয়া ভীম বিক্রমে তাহার কাকীকে আক্রমণ করিল। সে আক্রমণ সে সহ্য করিতে পারিল না;—একেবারে ধরাশায়ী হইল এবং আক্রমণের পরে যখন সোহাগী তার হাতে বিষম দংশন করিল, তখন যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এ দিকে নবীনও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, তার স্ত্রী নীরব নিশ্চল

ভাবে পড়িয়া আছে, আর সম্মুখে সোহাগী কাঁপিতেছে। নবীন ব্যাপারটার কিছু বুঝিতে পারিল না। সে নিতান্ত নিরীহ ;—কিছুক্ষণ বুদ্ধি ঠিক করিতেই কাটিয়া গেল। সোহাগীকে ডাকিল—কোন উত্তর পাইল না। তার বড় ভয় হইল, ভাবিল তবে বুঝি তার সাধের গিন্নী তাকে ফাঁকী দিয়াছে। যার সহিত এক-মন-প্রাণ হইয়া বসবাস করিয়াছে. সে নবীনের সর্ব্বস্ব ছিল, আজ সেই বুঝি ফাঁকী দিয়া পলাইয়া গেল। এ চিন্তা নবীনের সহ্য হইল না। সে ভীত, কম্পিতকণ্ঠে বলিল—কেও কি বেঁচে আছে! তার স্ত্রী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মা কালীর আশীর্ব্বাদে, আগে আমায় ঘরে নিয়ে চল, তারপর সব বলছি। নবীন কি করে, স্ত্রীকে যথাসাধ্য বহন করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তার কান্না আসিল। তার স্ত্রীর অমন গোলগাল মুখখানিতে আর সে শোভা নাই,আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত! কিন্তু বাহুতে ভীষণ দংশনের চিহ্ন দেখিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যাহোক্, অবিলম্বে সমুদয় গৃহিণীর নিকট শুনিতে পাইল। যখন শুনিল যে সোহাগীর এই কায, তখন সে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। বড় একগাছি লাঠি লইয়া সে সোহাগীকে তাড়া করিল। কিন্তু সোহাগী পিছু হঠিতে হঠিতে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

চারিদিক অন্ধকার! শুধু হীরকখণ্ডবৎ সহস্র সহস্র নক্ষত্র অন্ধকার-আকাশে ঝিকমিক করিতেছে। বৃক্ষরাজির ঘনসন্নিবেশে আঁধার আরও ঘনাইয়া আসিয়াছে। শুধু জোনাকির ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র আলো চিকমিক করিতেছে, যেন কেহ চাঁদনীর রাত্রিতে চাঁদের হাসি চুরি করিয়া এই অন্ধকারে বৃক্ষ বল্লরীর গায়ে পূর্ব্ববৎ ফুটাইয়া দিতেছে। এমন সময় সুদূর বিস্তৃত নদীর ধারে সোহাগী ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সোহাগী একেবারে ঘাটের ধারে আসিয়া জলে নামিল। পা দু'খানি জলে রাখিয়া মাটিতে বসিল। নদীর গভীর কল কল শব্দের সহিত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ মিলিত হইয়া অন্ধকার রাত্রির ভীষণতা আরও বৰ্দ্ধিত করিয়া দিতেছিল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, জন-মানব-শূন্য ; শুধু সোহাগী সেখানে বসিয়া! নদীতে কচিৎ দু একখানি নৌকার মিটি মিটি আলো দেখা যাইতেছিল। সোহাগীর ভয় নাই, চোখে জল নাই ;—বাহ্য জগতে তার মন নাই। এই অন্ধকার-নিশীথে, বৃক্ষের কোলে বায়ুহিল্লোলিত লতাটীর ন্যায় তাহার হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। ভাবিতে লাগিল—তাহার কি দোষ হইয়াছে যে, এত

অল্প বয়সে তাহার স্নেহের বাজার ভাঙ্গিয়া গেল—সে কার কি করিয়াছে যে. কেবলই নির্ম্মম আঘাতে এতদিন ব্যথা পাইয়াছে—সংসারে তার যে কেউ নাই—কে আছে? বাপ মা, আর বুঝি যাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, সেও ওই আকাশের বুকে তারা হইয়া রহিয়াছে। তাহারা বুঝি তাহাকে ডাকিতেছে,—ডাকিতেছে? না নিশ্চয়ই রোজ রোজ তাহারা ডাকে,—এতদিন তাহাদের মুখপানে তাকায় নাই বলিয়াই বুঝি আজ একেবারে আশ্রয়হীনা হইল;—এখন যাইবে কোথায়? ওই—ওই বড় বাবুদের বাড়ী? সেখানে তাহাকে বারমাস থাকিতে দিবে কেন? তাঁহারা যে একটু স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখেন, তাহাতেই সে 'আপনহারা' হইয়া যায়—তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!—না,—সেখানে যাওয়া হইবে না,—তবে যাইবে কোথায়? আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা তাহারই দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার অদৃশ্য হইতেছে;—ভাবিল ওই—ওই বুঝি ডাকিতেছে—আর কেন! ওই ওখানে যাই! কিন্তু আকাশে যাওয়া যায় কেমন করিয়া? জলে ডুবিলে? অমনি তাহার একটু জ্ঞান হইল, দেখিল যেখানে সে বসিয়াছিল, সেখানে জল হইয়া গিয়াছে, জলের স্রোত কল্ কল্ করিয়া ছুটিতেছে—বুক পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে,—উঠিয়া দাঁড়াইল, কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল—ভাবিল জল কত ঠাণ্ডা;—হুহু করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল—বাতাসের সংস্পর্শে জল হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতে লাগিল—তরঙ্গের মৃদু আঘাতে তাহার সমস্ত শরীর সিক্ত হইতে লাগিল। শৈশবের অস্পষ্ট মধুর স্মৃতি তাহার মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল—সে তার বাপ-মায়ের কত আদরের ধন ছিল,—মা তাহাকে কেমন রাত্রিদিন বুকের মধ্যে করিয়া রাখিত, একটু আঁচড়ও তার গায়ে লাগিতে দিত না—আজ তারা কোথায়? তাহারা যে স্নেহের পক্ষপুটে সংসার-যন্ত্রণার প্রখর সন্তাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল, এখন তাহারা কোথায়? হতাশ হইয়া চাহিয়া দেখিল—উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে প্রকাণ্ড নদী—চতুর্দ্দিকে সর্ব্বগ্রাসী করাল অন্ধকার, আর বাতাস অধিকতর বেগে বহিতেছে। তরঙ্গের প্রবল আঘাত চোখে মুখে লাগিতে লাগিল;—সহসা—দুরাগত সঙ্গীতের ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল;—কি সুধাবর্ষী তান! ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইতে লাগিল—নৌকা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

তরঙ্গের তাড়নে, স্রোতের বেগে তার জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্রখানি তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, অদূরাগত সুস্বর-লহরী বাতাসের সহিত আসিয়া তরঙ্গের অঙ্গে মিশিয়া, তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিবার উপক্রম করিল—ক্রমে সংগীতের কথা সে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল - "ওগো, তারে যে বড় বেসেছি ভাল"—আর বেশী শুনিতে পাইল না, তাহার কর্ণ বদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়তরীখানি সেই সুরের সহিত হেলিতে দুলিতে লাগিল, ভাবিল কারে কে ভালবেসেছে? সকলেরই ত ভালবাসার লোক আছে—আমার কে আছে? এমন সময় নৌকার অস্পষ্ট ক্ষীণালোকে গায়কের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—দেখিয়াই তার প্রাণ যেন কেমন ব্যগ্র হইয়া উঠিল; তাহার বুক ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। নৌকা আরও নিকটবর্ত্তী হইল,—ওকে? বড় বাবু! শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় সঙ্গীতময় হইয়া গেল,—জ্যোৎস্নায় মৃদু মধুর, সুখশীতল, স্বর্ণরাগরঞ্জিত, তরলরশ্মি-রাশিতে হৃদয় ভরপূর হইয়া আসিল, অনন্ত বিস্তৃত ঘন-নীল হৃদয়াকাশে সরোজ বাবুর দেবতুল্য কান্তি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, করুণার মোহন হাসি তার বুকে জ্যোৎস্নায় স্বর্ণ-শোভা ঢালিয়া দিতেছিল—আবেশে সজল চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল;—আর অমনি নদীগর্ভ আলোড়িত বিধ্বস্ত করিয়া মহাশব্দে পাড় হইতে প্রকাণ্ড মাটির চাপ খসিয়া তাহার উপর পড়িয়া গেল, তারপর? তার-পর তার সকল দুঃখের অবসান হইল। সে সংসার হইতে "অবসর" লইল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

তপোবন।

হৃদয়ে যাহার শান্তি
স্নেহ-প্রীতি প্রস্রবণ—
সেই হৃদি বিশ্বমাঝে
পূত পুণ্য তপোবন।

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

সূর্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পৃষ্ঠে যাবৎপ্রভা সৌরী পুরস্তাৎ সম্প্রকাশতে।
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতস্তাবল্লোকালোকস্য সর্ব্বতঃ।

লোকালোক পর্ব্বতের পশ্চাৎভাগে, সম্মুখে ও পার্শ্বদ্বয়ে সূর্য্যপ্রভা সমভাবে পতিত হয়। এই পর্ব্বত দশ সহস্রযোজন উন্নত, ইহার চারিদিকের পরিমণ্ডল মধ্যে কিয়দংশ প্রকাশ, অবশিষ্টাংশ অপ্রকাশ। প্রকাশিত অংশ—লোক এবং অপ্রকাশিত অংশই অলোক বা নিরালোক নামে কথিত। লোকভাগ একবিধ, নিরালোক-ভাগ বহুবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সূর্য্যের লোকলোক পর্ব্বতে অবস্থান সময়কে সন্ধ্যা বলা হইয়া থাকে, ইহা উষা ও ব্যুষ্টি নামে দ্বিবিধ। রাত্রি-সন্ধ্যার নাম উষা এবং দিবা-সন্ধ্যার নাম ব্যুষ্টি।

এবং গতিবিশেষেণ বিভজন্ রাত্র্যহানি তু।
তথা বিচরতে মার্গং সমেন বিষমেন চ।

অনুষঙ্গ পাদ।

এইরূপ গতিবিশেষানুসারে দিবা রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষম ভাবে সূর্য্যদেব বিচরণ করিয়া থাকেন।

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলান্তম্!
ত্রিংশৎকলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমে তে॥

পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবা রাত্রি গণনা করা হয়। দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে এই মুহূর্ত্ত পরিমাণ ও সন্ধ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লেখা প্রভৃতি স্থানে সূর্য্যের অবস্থান কালে তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, তিন মুহূর্ত্তকে প্রাতঃকাল কহে। ইহা দিবসের পঞ্চম ভাগরূপে পরিগণিত। প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন কাল, তৎপরে তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন। অপরাহ্নের পরবর্ত্তী তিন মুহূর্ত্ত কাল সায়াহ্ন নামে অভিহিত। এইরূপ বিভাগানুসারে দিনমান পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যের বিষুব

রেখায় অবস্থান কালেই এইরূপ পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে দিনমান গণনা করা হয়। দিবা রাত্রি উভয়ই পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে।

অয়ন অনুসারে দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কারণ ঐ উভয় সময়ের মধ্যে কখন দিবাভাগ রাত্রিকে, কখন বা রাত্রি-পরিমাণ দিবা-পরিমাণকে গ্রাস করে।

শরৎ ও বসন্ত কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সূর্য্যনারায়ণ বিষুব রেখায় অবস্থিত থাকেন, এই সময়ে চন্দ্রমা অহোরাত্রে সপ্ত কলা ভোগ করেন।

নিমেষাদিকৃতঃ কালঃ কাষ্ঠায়া দশপঞ্চ চ।
কলায়াঃ ত্রিংশতঃ কাষ্ঠা মাত্রাশীতিদ্বয়াত্মিকা।
শতদ্বৈকোনকাত্রিংশন্মাত্রাত্রিংশৎ ষড়ুত্তরা।
দ্বিষষ্টিভাক্ ত্রয়োবিংশন্মাত্রায়াঞ্চ চলা ভবেৎ।
চত্বারিংশৎসহস্রাণি শতান্যষ্টৌ চ বিদ্যুতিঃ।
সপ্ততিঞ্চাপি তত্রৈব নবতিং বিদ্ধি নিশ্চয়ে।
চত্বার্য্যেব শতান্যাহুর্বিদ্যুতৌ বৈধসংযুগে।
চরাংশো হ্যেষ বিজ্ঞেয়ো নালিকা চাত্র কারণম্।
সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মানবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগ ইত্যভিধীয়তে॥

অনুষঙ্গ পাদ।

১৫ নিমিষে অথবা ১৬০ মাত্রায় এক কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা, ঊনত্রিশকে ১০০ দ্বারা গুণ করিয়া ৩৬ যোগ করিলে কিম্বা ৬২ এর সহিত ২৩ যোগ করিলে যাহা হয়, তত মাত্রায় চলা হয়। ৪০৮০০ মাত্রায় বিদ্যুতি। ৪৯০ বিদ্যুতিতে এক বৈধযুগ। চরাংশ এই প্রকার জানিবে। নালিকাই ইহার প্রতি কারণ। সম্বৎসরাদি পাঁচটী বিভাগ চতুর্ব্বিধ পরিমাণ দ্বারা বিভক্ত হইয়া থাকে। সমুদায় বিভাগের সমষ্টির নাম যুগ। ঐ সমস্ত বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয়ের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর নামে অভিহিত হয়।

এক যুগমধ্যে সূর্য্যের ১২০ পর্ব্বকাল পূর্ণ হয় এবং ১৮৩০ সূর্য্যোদয় (সাবন দিন) হইয়া থাকে। যুগকালের ঋতুসংখ্যা ত্রিশ, অয়নসংখ্যা দশ এবং মাস সংখ্যা ষষ্টি—ষাইট।

ত্রিশ অহোরাত্রে এক সৌর মাস পরিগণিত হয়। একষষ্টি অহোরাত্রকে এক অনু কহে।

সমুদায় ভুবন পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের ১৮৩ একশত তিরাশী দিন অতিবাহিত হয়। এই সৌর, সৌম, নাক্ষত্র ও সাবন নাম দ্বারা পুরাণে অভিহিত আছে।

শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে সূর্য্য যখন মধ্যম গতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিষুবত নামক শৃঙ্গ আশ্রয় করেন, সেই সময়ে দিবা ও রাত্রি-মান সমান হয়। এবং তখন তদীয় মহারথে নিযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্বসকল পদ্মরাগতুল্য রক্তবর্ণ কিরণসমূহ দ্বারা অনুলিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মেষ ও তুলারাশির শেষভাগে সূর্য্যোদয় হইলে দিবা ও রাত্রি-মান উভয়ই পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত করিয়া হইয়া থাকে।

তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।
নভো নভস্যোঽথ ইষুঃ সহোর্জ্জঃ
সহঃ সহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ॥

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

সূর্য্যঃ কিরণজালেন বায়ুযুক্তেন সর্ব্বশঃ।
জগতো জলমাদত্তে কৃৎস্নস্য দ্বিজসত্তমাঃ॥
আদিত্যপীতং সূর্য্যাগ্নেঃ সোমং সংক্রমতে জলম্।
নাড়ীভির্বায়ুযুক্তাভি র্লোকাধানং প্রবর্ত্ততে॥

সূর্য্য বায়ুযুক্ত কিরণসমূহদ্বারা সমস্ত জগতের জল গ্রহণ করেন এবং এই আদিত্যকর্ত্তৃক গৃহীত জল বায়ুযুক্ত নাড়ীসমূহদ্বারা সূর্য্যাগ্নি হইতে চন্দ্রে সংক্রামিত হয়, তাহা হইতেই লোকপরম্পরা সৃষ্ট হইয়া থাকে।

সন্ধারণার্থং ভূতানাং মায়ৈষা বিশ্বনির্ম্মিতা।
অনয়া মায়য়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

ভূতসকলের প্রতিপালন জন্যই বিশ্বসংসারে এই মায়া নির্ম্মিত, এবং চরাচর ত্রৈলোক্যই এই মায়াদ্বারা পরিব্যাপ্ত।

সার্ব্বলৌকিকমন্তোবৈ যৎ সোমান্নভসঃ স্রুতম্।
সোমাধারং জগৎ সর্ব্বমেতত্তথ্যং প্রকীর্ত্তিতং।
সূর্য্যাদুষ্ণং নিস্রবতে সোমাচ্ছীতং প্রবর্ত্ততে।
শীতোষ্ণবীর্য্যৌ দ্বাবেতৌ যুক্তৌ ধারয়তো জগৎ॥

আকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডল হইতে সার্ব্বলৌকিক সলিল নিঃসৃত হয় বলিয়া, জগৎ সোমাধার নামে কথিত। সূর্য্য হইতে উষ্ণ এবং চন্দ্র হইতে শীত প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য যথাক্রমে শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া অভিহিত, এবং এই উভয়েই সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সূর্য্য রশ্মিসমূহদ্বারা ভূত সমুদায় হইতে জল গ্রহণ করেন এবং সমুদ্র হইতেও বায়ুসংযোগে জল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ আদিত্য গ্রীষ্ম হিম ও বর্ষাকালে নিরন্তর উত্তাপ, হিম ও বৃষ্টি প্রদান করিয়া পিতৃগণ এবং মনুষ্যদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন।

এইরূপে সূর্য্যদেব অমৃতদ্বারা দেবগণকে সর্ব্বদা প্রীত করিতেছেন, এবং শুক্লপক্ষে সুষুম্ননামক রশ্মিদ্বারা চন্দ্রকে প্রতিদিন বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, আর কৃষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সোম পান করেন। সূর্য্যদেব রশ্মিদ্বারা সমুদ্ধৃত জল পৃথিবীতে বৃষ্টি করিয়া ওষধি অন্নাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং মনুষ্যগণ ঐ অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

সুরগণ অমৃতপানে একপক্ষ, পিতৃগণ স্বধাদ্বারা এক মাস এবং মানবগণ অন্নাদি ভোজন করিয়া শশ্বৎ অর্থাৎ অহোরাত্র ব্যাপিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

ভগবান্ আদিত্য স্বীয় রশ্মিদ্বারা বারি আকর্ষণ করেন এবং পুনর্ব্বার তাহা পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। চন্দ্রও এইরূপে পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চন্দ্রকিরণও ক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রের রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত জলগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন, ইহার উভয় পার্শ্বে তিনটী চক্র, প্রত্যেক চক্রে ১০০টী অর আছে। চন্দ্রের রথের অশ্ব শুক্লবর্ণ ও সর্ব্বোত্তম।

দশভিস্তু কুশৈর্দ্দিব্যৈ রসঙ্গৈ স্তৈ র্মনোজবৈঃ।
সকৃদ্যুক্তে রথে তস্মিন্ বহন্তিশ্চাযুগক্ষয়াৎ।

মনের ন্যায় দ্রুতগামী দশটী অশ্ব একবার মাত্র নিযুক্ত হইয়া যুগান্তকাল পর্য্যন্ত সুধাময় নিশাপতিকে আকাশমার্গে নিরন্তর বহন করিতেছে

সোমস্ত শুক্লপক্ষাদৌ ভাস্করে পুরতঃ স্থিতে।
আপূর্য্যতে পুরস্তাস্তঃ সততং দিবসক্ষয়াৎ॥

শুক্লপক্ষের প্রথম দিন হইতে সূর্য্যদেব পুরোবর্ত্তী থাকিয়া চন্দ্রমণ্ডলকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ করেন। কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ তাঁহাকে পান করেন, শুক্ল-পক্ষে সূর্য্যদেব পুনরায় তাঁহাকে বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। সুতরাং চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় ও শুক্লপক্ষে আদিত্য-প্রভাবে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সুধাতুর অর্থ স্পন্দন, সর্ব্বদা স্পন্দিত হয় বলিয়া সূর্য্য এবং তেজ ও জলের পবিত্রকারক বলিয়া সূর্য্যকে সবিতা বলা হইয়া থাকে। চন্দ্র শব্দের বহু অর্থ, যাহা হইতে চন্দ্র শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতুর অর্থ আহ্লাদ, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব ও শীতত্ব। সূর্য্যমণ্ডল উজ্জ্বল তেজোময় শুক্র গোলাকার কুম্ভসদৃশ, তাহাতে ঘনতোয়াত্মক চন্দ্রমণ্ডল সন্নিবিষ্ট আছে। সূর্য্যমণ্ডলও ঘনতেজোময়, তাহাতে সমস্ত দেবগণ প্রবেশ করেন। মন্বন্তরে নক্ষত্র গ্রহাদিও সেই স্থানে অবস্থান করে। গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাসকল সূর্য্য-প্রভাবেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ক্ষীণ হয় না বলিয়া তাহাদিগকে নক্ষত্র নামে অভিহিত করা হয়। যাঁহারা পুণ্যবলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, পুণ্যাবসানে তাঁহারাই গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে অবস্থিতি করেন। শুক্ল বলিয়া ইঁহাদিগকে তারকা বলা হয়।

সূর্য্য অগ্নিময় ও চন্দ্র জলময় বলিয়া অভিহিত। অমরসেনানী কার্ত্তিকেয় মঙ্গলগ্রহ, এবং ভগবান্ নারায়ণ বুধগ্রহ নামে অভিহিত হয়েন। রুদ্রদেবকে মহাগ্রহ শনৈশ্চর বলা হইয়া থাকে। দেবগুরু বৃহস্পতি এবং অসুরগুরু শুক্র নামে কথিত। রাহু ও কেতু নামে অপর দুইটী গ্রহ আছে। ইহাদের সকলেরই স্ব স্ব রথ, অশ্বাদি ও যথানির্দ্দিষ্ট স্থান কল্পিত আছে।

নবযোজনসাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ।
ত্রিগুণস্তস্য বিস্তারো মণ্ডলঞ্চ প্রমাণতঃ॥
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাদ্ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ।
তুল্যস্তয়োস্তু স্বর্ভানু র্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি॥
উদ্ধৃত্য পার্থিবচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ॥
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং নির্ম্মিতং যত্তমোময়ম্॥
আদিত্যাত্তচ্চ নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছন্তি পর্ব্বসু।

আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সোমঞ্চ পর্ব্বসু।
স্বর্ভাসা নুদতে যস্মাত্তত: স্বর্ভানুরুচ্যতে ॥

সূর্য্যমণ্ডল নব সহস্র যোজন পরিমিত এবং তাহার বিস্তার ত্রিগুণ অর্থাৎ সপ্তবিংশতি সহস্র যোজন পরিমিত। সূর্য্যবিষ্কম্ভ হইতে চন্দ্রবিষ্কম্ভ দ্বিগুণ বিস্তৃত। রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান হইয়া তাঁহাদের অধোদেশে গমন করিয়া থাকে। ঊর্দ্ধগত মণ্ডলাকার পৃথিবীর ছায়াই রাহু। রাহুর স্থান বৃহৎ ও অন্ধকার ময়, উহা পূর্ণিমায় সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে, এবং অমাবস্যায় চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। রাহু স্বীয় প্রভায় আকাশে দীপ্তি পায় বলিয়া ইহাকে স্বর্ভানু বলা হইয়া থাকে।

সূর্য্য উচ্চতাবিধায় স্বীয় কিরণমালাদ্বারা শীঘ্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু যখন দক্ষিণমার্গস্থ হন, তখন পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিনে ভূমিরেখা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া যথাসময়ে দৃষ্ট হন না এবং শীঘ্রই অস্তগমন করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই চন্দ্র উত্তরমার্গস্থ হইলে অমাবস্যার দিনে দৃষ্ট হন না। নক্ষত্রের গতিযোগে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ে বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে সমানভাবে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দক্ষিণায়নমার্গস্থো যদা ভবতি রশ্মিমান্।
তদা সর্ব্বগ্রহাণাং স সূর্য্যোঽধস্তাৎ প্রসর্পতি।
বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা তস্যোর্দ্ধঞ্চরতে শশী।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নং সোমাদূর্দ্ধং প্রসর্পতি।
নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্দ্ধং বুধাদূর্দ্ধং বৃহস্পতিঃ।
তস্মাচ্ছনৈশ্চরশ্চোর্দ্ধ স্তস্মাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলং।
ঋষীণাঞ্চৈব সপ্তাণাং ধ্রুব ঊর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ।
দ্বিগুণেষু সহস্রেষু যোজনানাং শতেষু চ।
তারাগ্রহান্তরাণি স্যুরুপরিষ্টাৎ যথাক্রমম্॥

ভগবান্ আদিত্য দক্ষিণায়ন কালে সকল গ্রহের অধোদেশে গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্র তাঁহার ঊর্দ্ধদেশে স্বীয় মণ্ডল বিস্তৃত করিয়া সঞ্চরণ করিতে থাকেন। সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল তখন শশীর ঊর্দ্ধদেশে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। নক্ষত্রের ঊর্দ্ধদেশে বুধ, বুধের ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ঊর্দ্ধে শনি, শনির

উর্দ্ধদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং তাহার উর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থান করেন। ঐ সমস্ত তারা ও গ্রহগণ দ্বিশতসহস্রযোজন উপরে যথাক্রমে অবস্থিত আছে।

গ্রহগণ ও চন্দ্রসূর্য্য দিব্যতেজঃসংযুক্ত হইয়া নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতেছে, এবং নিয়মানুসারে গমন করিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য্য· ইহারা উচ্চ, নীচ ও মৃদুভাবে অবস্থিত পরস্পর মিলিত বা ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বগ্রহাণামেতেষামাদিরাদিত্য উচ্যতে।

ভগবান্ আদিত্যই গ্রহসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেরূপ তারকামণ্ডলের মধ্যে শুক্র, কেতুগণের মধ্যে ধূমকেতু, নক্ষত্রগণের মধ্যে শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, অয়নের মধ্যে উত্তরায়ণ, বর্ষের মধ্যে সম্বৎসর, ঋতুর মধ্যে শিশির, মাসের মধ্যে মাঘমাস, পক্ষ মধ্যে শুক্ল, তিথি মধ্যে প্রতিপৎ, অহোরাত্রির মধ্যে দিবস এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে আদ্য মুহূর্ত্ত শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ গ্রহগণের মধ্যে আদিত্যই প্রধান।

আদিত্যই সুষুম্ন নামক রশ্মিদ্বারা ক্ষীণ চন্দ্রকে আপ্যায়িত করেন। অর্থাৎ মাসে মাসে চন্দ্র হইতে সুধা ক্ষরিত হয়, ইহাই সোমপায়ী পিতৃগণের অমৃত। কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার এক একটী করিয়া পান করেন, এই প্রকারে একমাস অমৃত পান করিয়া চতুর্দ্দশ কলায় উপস্থিত হন। সুধাকর এইরূপ দেবগণকর্ত্তৃক পীত হইয়া অমাবস্যার দিনে পঞ্চদশভাগে অবস্থিত হন। অমাবস্যার দিনে সুষুম্নাদ্বারা আপ্যায়িত সুধাকরের কলা দ্বিকলা পরিমিত কাল পর্য্যন্ত পিতৃগণ পান করেন। কলা নিঃশেষিত হইলে সূর্য্যদেব পুনরায় তাঁহাকে বর্দ্ধিত করেন এবং সূর্য্যকর্ত্তৃক সুষুম্নদ্বারা আপ্যায়িত চন্দ্রের কৃষ্ণকলার ক্ষয় ও প্রতিদিন শুক্লকলার বৃদ্ধি হয়।

এবং সূর্য্যস্য বীর্য্যেণ চন্দ্রস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।
দৃশ্যতে পৌর্ণমাস্যাং বৈ শুক্লঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ॥

এইরূপে সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের তনু বর্দ্ধিত হইয়া পৌর্ণমাসীতে শুক্ল ও পরিপূর্ণ-মণ্ডল হয়। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি এই ভাবেই হইয়া থাকে।

পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র অতিশয় দীপ্তি পাইয়া থাকেন। পূর্ণিমার দিনে ব্যতি-পাত কালে অপরাহ্নে পরিপূর্ণাত্মা চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

চন্দ্র ও সূর্য্য বিচ্ছিন্ন অমাবস্যায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি-

গোচর হইয়া থাকেন, এজন্য তাহাকে প্রাচীন ঋষিগণ দর্শ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অমাবস্যার দিনে পর্ব্বসন্ধি দ্বিলাবাত্মক কালকে কুহু বলা হয়; চন্দ্র অমাবস্যায় দৃষ্ট না হইলেও সূর্য্যকর্ত্তৃক সঙ্গত। দিবসার্দ্ধ ভাগ হইতে রাত্রির অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্যের সহিত মিলিত থাকিয়া শুক্লপক্ষের প্রতিপদে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিযুক্ত হন। প্রাতে দুই মুহূর্ত্তকে সঙ্গম বলে। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন; পরস্পর বিযুক্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী কালই আহুতি ও বষট্ ক্রিয়ার কাল। চন্দ্র দিবস ও রজনীতে দুই লবমাত্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন, ইহাকেই আহুতি ও বষট্ ক্রিয়ার কাল বলা হইয়া থাকে।

প্রতিপৎ ও পঞ্চদশীতে দ্বিমাত্রা-পরিমিত পর্ব্বকাল হয়, কুহু ও সিনীবালীতে সমগ্র পর্ব্বকাল দ্বিলব পরিমিত। পর্ব্ব অর্থাৎ সন্ধি, যেমন ইক্ষু বা বংশের গ্রন্থি (গাঁইট), অর্দ্ধমাস স্বরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ পর্ব্ব ঠিক সেইরূপ। পূর্ণিমা বা অমাবস্যাভেদে যে গ্রন্থি বা সন্ধি, তাহাই অর্দ্ধমাস স্বরূপ,—তাহাই পর্ব্ব। ক্ষীণচন্দ্রবিশিষ্ট কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যাই দিবাপর্ব্ব। পর্ব্বকাল পর্ব্ব-তুল্য। চন্দ্র নির্ম্মল হইলে পর্ব্বকালও কলাসমান হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই সকল কলাকেই তিথি বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই প্রকারে শুক্ল পক্ষ হয়। রজনীর পর্ব্বসন্ধি সময়ে পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র উপরক্ত অর্থাৎ রাহুগ্রস্ত হয়। পঞ্চদশ কলাতে চন্দ্র পূর্ণ হয় বলিয়া তাহাকে পূর্ণিমা বলে।

দশভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব কলাভির্দ্দিবসক্রমাৎ।
তস্মাৎ কলা পঞ্চদশী সোমে নাস্তি তু ষোড়শী।
তস্মাৎ সোমস্য ভবতি পঞ্চদশ্যাং মহাক্ষয়ঃ॥

চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবসে পঞ্চদশ কলায় পরিপূর্ণ হন, সুতরাং চন্দ্রে পঞ্চদশ কলাই আছে, ষোড়শ নাই। এজন্য পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে চন্দ্রের অত্যন্ত ক্ষয় হয়।

ভগবান্ আদিত্যের প্রভাবেই চন্দ্রের এতাদৃশ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে। সূর্য্যই ইহার কারণ।

আদিত্যমূলমখিলং ত্রিলোকং নাত্র সংশয়ঃ।

এই ত্রিলোকের মূল আদিত্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র এবং অপরাপর ত্রিদিববাসী, ইঁহাদের সার্ব্বলৌকিক যে তেজ,

তাহার মূল এই সর্ব্বলোকপতি সূর্য্য। এই জগৎ সূর্য্য হইতে জাত হইতেছে, আবার সেই সূর্য্যই লীন হইতেছে।

সূর্য্য একটী জগদ্বিখ্যাত দীপ্তিমান্ গ্রহ, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং যাঁহাতে লীন হইতেছে।

ক্ষণা মুহূর্ত্তা দিবসা নিশাঃ পক্ষাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
মাসাঃ সম্বৎসরাশ্চৈব ঋতবোঽব্দযুগানি চ।
তদাদিত্যাদৃতে তেষাং কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।
কালাদৃতে ন নিগমো ন দীক্ষা নাহ্নিকক্রমঃ।
ঋতূনামবিভাগশ্চ পুষ্পমূলফলং কুতঃ।
কুতঃ শস্যাভিনিষ্পত্তি র্গৌষধিগণাদি বা।
অভাবো ব্যবহারাণাং দেবানাং দিবি চেহ চ।
জগৎ-প্রতাপনমৃতে ভাস্করং বারিতস্করম্।
সএব কালশ্চাগ্নিশ্চ দ্বাদশাত্মা প্রজাপতিঃ।
তপত্যেষ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
সএষ তেজসাং রাশিঃ সমস্তঃ সার্ব্বলৌকিকঃ।
উত্তমং মার্গমাস্থায় বায়োর্ভাভিরিদং জগৎ।
পার্শ্বমূর্দ্ধমধশ্চৈব তাপয়ত্যেষ সর্ব্বশঃ॥

আদিত্য ব্যতিরেকে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর, ঋতু, যুগ প্রভৃতি কালের নিশ্চয় হইতে পারে না। কালনির্ণয় ব্যতীত নিগম, দীক্ষা, আহ্নিক-ক্রম ও ঋতু-বিভাগ হয় না, ঋতুবিভাগ না হইলে ফুল, ফল, মূল ও শস্য প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। লোকপ্রতাপকারী ভাস্কর ব্যতিরেকে স্বর্গ বা মর্ত্ত্য কোন লোকেই ব্যবহারের নিশ্চয় হইতে পারে না। কাল ও অগ্নিস্বরূপ দ্বাদশাত্মা সূর্য্য সার্ব্বলৌকিক একটী তেজোরাশি। এই আদিত্যই বায়ুর উত্তম মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাদ্বারা জগৎকে পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে ও অধোদেশাবচ্ছেদে উত্তাপিত করিতেছেন।

অতএব কি দেবলোক, কি নরলোক, সমস্তেরই মূল কারণ আদিত্য—সূর্য্যনারায়ণ। এক ভগবান্ সূর্য্য-নারায়ণ ব্যতিরেকে সমস্তই - মিথ্যা।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সমগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥



অবসর—



প্রার্থনা।

তাই সকলেই কায়মনোবাক্যে আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী ভগবান্ সূর্য্য-নারায়ণকে একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন ;—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপু র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদ্দার।

ঊষা।

(গান)

ভৈরবী—একতালা।

আমি, শয্যা ত্যজিয়ে শূন্যে চাহিনু
দেখি জ্যোতি হীন তারা,
বন্য কুসুম শিশির-হারে
ভূষিতা নির্ম্মল-ধরা।
ওই, পূরব দিকে লোহিত বরণে
সূরয উদিছে ভাতি,
দেখি, নিশার আঁধার তারকার সনে
গগনে যেতেছে ডুবিয়া ;
তাই কুলায় ছাড়িয়া পাখী,
পুলকিত আলো দেখি,
ওই, কলরব করি জাগায় জগতে
আছে, ঘুমে অচেতন যা'রা।
ওই, প্রভাত সমীর প্রভাত মিহির
গাহিছে প্রভাতী গান,
গিরি-সিংহ, সতি, তাহাদের সনে
মিলাইছে নিজ তান ;
দেখ, তব প্রেম অনুরাগী
ওই, জগত উঠিল জাগি'
স্বতি, তোমায় স্মরিয়া বিভু-গান গাহি
হয় গো শয়ন ছাড়া।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

বিধি-লিপি।

(অনূদিত)

ইসাবেলাকে বিবাহ করিতে জন ও হেনরী উভয়েই বিব্রত! পরস্পর পরস্পরে কি কি করিলে ইসাবেলার প্রণয়পাত্র হইবে। ইসাবেলার মনস্তুষ্টির জন্য উভয়েই এইরূপ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা হেনরীর প্রতি একান্ত বিরূপ! ইসাবেলার প্রণয়দৃষ্টি জনের উপরই পতিত; জনও ইসাবেলাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে। তবে হেনরী কি ইসাবেলাকে ভালবাসে না? কেন বাসিবে না, জন যেরূপ ভালবালে হেনরীও সেইরূপ ভাল বাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হেনরীর ভালবাসা ইসাবেলার প্রণয়-পয়োধিতে ভাসিয়া যায়। জনকে দেখিলে ইসাবেলার যেরূপ আনন্দ হয়, হেনরীকে দেখিলে ইসাবেলার সেইরূপ বিরক্তি উপস্থিত হয়। কেন হয়,তাহা ইসাবেলাই বুঝাইতে পারে। জন দিনান্তে একবার আসিয়া ইসাবেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যায় মাত্র, কিন্তু হেনরী দিনান্তে দশবার আসিয়াও ইসাবেলার চিত্তা-কর্ষণ করিতে পারে না। হেনরীর একান্তই দুরদৃষ্ট!

জন শান্ত শিষ্ট ও গম্ভীর; হেনরী চঞ্চলমতি, চপল স্বভাব। উভয়ের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, নারী-হৃদয় হেনরীকে দূরে ফেলিয়া জনকে কেন সাদরে নিকটে আহ্বান করে। উভয়ের চরিত্রগত গুণে কে কাহার অপেক্ষা হীন, তাহা সাধারণে মীমাংসা করিতে পারিবেন। কিন্তু রূপে সাধারণের চক্ষে কেহই কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। রূপে ও আকৃতিতে উভয়েই কন্দর্প-সদৃশ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এ ক্ষেত্রে ভাগ্য-বিধাতা যাহার উপর সদয়, সেই সুফল লাভ করিবে—এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

দেখিতে দেখিতে জনের সহিত ইসাবেলার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। এই নিদারুণ সংবাদে হতভাগ্য হেনরীর হৃদয়ে যে কিরূপ দারুণ আঘাত লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত; হেনরীর সকল সুখসাধ, সকল আশা একেবারে ফুরাইয়া গেল। ইসাবেলাকে লাভ করিবার জন্য হেনরীর যত সুখের কল্পনা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। হেনরী চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল; সে একবার ইসাবেলার উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিল ও পর-

ক্ষণেই মনের অবস্থা অন্যদিকে ফিরাইতে প্রয়াস পাইল—তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল। যে হেনরী ইসাবেলাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, ইসাবেলার সুখ দুঃখ যে সমভাবে অনুভব করিত—ইসাবেলার মনস্তুষ্টির জন্য ভাল মন্দ বিচার-বর্জ্জিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যই করিতে পারিত, আজ সেই হেনরীই ইসাবেলার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প! আর তাহার প্রাণে দয়া নাই, মায়া নাই—আকর্ষণ নাই, অনুভব নাই; এখন কি উপায়ে জন ও ইসাবেলার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিবে, এই চিন্তাতেই মহাচিন্তিত। প্রেমে মানুষকে দেবতা করে ও সেই সঙ্গে প্রেমে উপেক্ষিত মানবকে পিশাচের অগ্রগণ্য করিয়া তুলে।

শুভদিনে শুভক্ষণে জন ও ইসাবেলার চারিচক্ষু ও চারি হস্তের পবিত্র মিলনে তাহাদের দুইটী সম-উৎসুক প্রাণ এক হইল। হেনরীও তাহা দেখিল ও নীরবে সহ্য করিল। এ সহ্যের অর্থ দম্পতী-যুগলের সর্ব্বনাশ সাধন, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। হেনরী ইসাবেলার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে না। তাহাকে দেখিলে পাছে তাহার মনে পুনরায় মায়ার সঞ্চার হয়—তাহাকে দেখিলে পাছে সে আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়—পাছে তাহার প্রতিহিংসা পূরণ-পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়—পাছে তাহার হৃদয়ের বর্ত্তমান কঠিনতা মোহপরবশ হইয়া কোমল হয়, এই জন্য সে এখন ইসাবেলার ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতেও ইচ্ছা করে না। প্রেম-পিপাসু হেনরী এখন পিশাচ অপেক্ষাও অধম।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। হেনরী এ পর্য্যন্ত আপন অভীষ্ট-সাধনোপযোগী কোন সুবিধাই করিতে পারে নাই। এতদিন ধরিয়া হেনরী উভয়ের বিরুদ্ধে যে কোনরূপ পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতেই নিষ্ফল হইয়া আপনার মনের গুরুত্ব ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে। তাহার আর এখন কিছুতেই সুখ নাই—কিছুতেই শান্তি নাই; কেবল পৈশাচিক জল্পনা কল্পনাতেই সে একান্ত নিবিষ্ট। হায়! পরকে আপন ভাবিয়া, পরের হাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়া, না জানিয়া পরকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া সুফল পাইবার উদ্দেশ্যে বিফলমনোরথে ভগ্ন-হৃদয়ে আজ হেনরীর অবস্থা স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন আর কে বুঝিতে সমর্থ হইবে।

বৎসরও ঘুরিল—জন ও ইসাবেলা একটী পুত্র সন্তান লাভ করিল। হেনরীর কলুষিত হৃদয় ইহাতে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখন সে জন ও

ইসাবেলার বিষয় চক্ষে দেখিতে বা কর্ণে শুনিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। পথে জন ও ইসাবেলাকে দেখিলে হেনরী লজ্জায়, ঘৃণায়,ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে অন্য পথে চলিয়া যায়; জনকে দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জনের উপর মহা আক্রোশ উপস্থিত হয় ও ইসাবেলাকে দেখিয়া ইসাবেলার উপর ক্রোধ ও অভিমানের সঞ্চার হয়, কিন্তু উভয়ের সৌভাগ্যবশতঃ কোপ-পরায়ণ হতভাগ্য হেনরী কাহারও কিছুই করিতে পারে না। কেবল কল্পনাই সার,—কেবল মনের শান্তি নাশ, ইহা ভিন্ন হেনরীর আর কিছুই নাই। হতভাগ্যের হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়াছে—ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—হৃদয় পুড়িয়া ক্ষার হইতেছে! এ আগুণ নির্ব্বাণের ক্ষমতা আর হেনরীর নাই; হেনরী জ্বলিতেছে—পুড়িতেছে।

ইতিমধ্যে জনের দূরদেশে চাকুরীর বদলি হইল। শুভদিন দেখিয়া জন প্রাণের ইসাবেলাকে ও স্নেহের লুইসকে জগৎ-পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইল। ইসাবেলা ও লুইস জনের সঙ্গে পোতাশ্রয় পর্য্যন্ত গমন করিল। জাহাজে উঠিবার সময় জন, লুইস ও ইসাবেলার করুণ ক্রন্দনে অপরাপর আরোহীদেরও প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। জন এক-বার ইসাবেলাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করে, একবার স্নেহের লুইসকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার চাঁদ মুখ চুম্বন করে ও আবার নিজেও তাহাদের ত্যাগ করিয়া কিরূপে দিন যাপন করিবে, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে। জাহাজ বন্দর ছাড়িবার সময় উপস্থিত দেখিয়া বংশীধ্বনি করিল, জন আর সেথায় থাকিতে পারিল না। শেষবার স্ত্রী-পুত্রকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাহাজে গিয়া ডেকের উপর কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অনিমিষে স্ত্রী-পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল; জনের জ্ঞান চৈতন্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল, জনকয়েক সহৃদয় আরোহী জনের অবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে নানা প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইতে লাগিল। এ দিকে জাহাজ যথাসময়ে বন্দর ত্যাগ করিল; ইসা-বেলা স্নেহের লুইসকে লইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীনভাবে স্ফীত সমুদ্রবক্ষঃস্থিত জাহাজখানির প্রতি যতদূর দৃষ্টি যায়, স-দুঃখ আবেগ হৃদয়ে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল; জনও যতক্ষণ পারিল,—সতৃষ্ণ নয়নে আপন স্নেহের বস্তু প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু হায়! জাহাজের গতি ক্রমেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াতে শীঘ্রই দুইটী সতৃষ্ণ হৃদয়ের মধ্যে বিশাল জল-রাশির ব্যবধান পড়িল। ইসাবেলা ও লুইসের স্নেহ-মূর্ত্তি জাহাজস্থ জনের একেবারে নয়ন-পথ অতিক্রান্ত হইলে জন জগৎ অন্ধকার দেখিল; হতাশ হৃদয়ে চক্ষের জল

ফেলিতে ফেলিতে নির্দ্দিষ্ট কেবিনে যাইয়া শুইয়া পড়িল। এ দিকে পতি-পরায়ণা ইসাবেলা স্বামীর স্নেহ-নিদর্শন হৃদয়ের ধন পুত্র লুইসকে কোলে লইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের চরণে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে সরোদনে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

হেনরীর মনে আজ আনন্দ ধরে না! সে মনে করিল, এইবার তাহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তাহার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী জন যখন দূরদেশে গমন করিল, তখন সে যে কোন প্রকারে ইসাবেলাকে আপনার হস্তগত করিয়া বহুদিনসঞ্চিত হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবে। হেনরীও আজ জনকে বিদায় দিবার জন্য হাস্যমুখে অদূরে দণ্ডায়মান, সে কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, জন যেন আর স্বদেশে ফিরিয়া না আইসে। ইসাবেলা গৃহে ফিরিতেছে, হেনরীর সে দিকেও লক্ষ্য আছে। দুর্ব্বৃত্ত ইসা-বেলার পশ্চাদনুসরণ করিল। সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ কূট কৌশলজাল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে পরম শত্রু সুযোগ পাইয়া যে আপন পশ্চাৎ লইয়াছে, ইসাবেলা তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। হতভাগিনী পুত্র কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময়ে হেনরী তাহার সম্মুখীন হইয়া মনোভাব গোপন রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—ইসাবেলা! জন কোথায় যাইল—আবার কবে আসিবে? তুমি তাহাকে ছাড়িলে কেন? আহা, জনের জন্য তোমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি! তোমায় স্বামী-সোহাগিনী দেখিয়া আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। কাঁদিও না, কাঁদিয়া কি করিবে? কায়মনে ঈশ্বরের নিকট স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা কর, তিনিই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমাকে জানাইও, আমি প্রাণ দিয়া তোমাদের সে উপকার করিব। আমাকে পর ভাবিও না, তোমার এ বিপদে যদি তোমার কোন উপকার করিতে পারি, সে কেবল তোমাকে আপন ভাবিয়া;—ইহা তুমি নিশ্চিত জানিও। বল, বল, আমায় তোমার কি করিতে হইবে? এই বলিয়া ইসাবেলার বক্ষ হইতে শিশু লুইসকে কোলে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। ইসাবেলা তাহাকে পুত্র না দিয়া কহিল, হেনরী! আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার স্বামী ঈশ্বরের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত মনে কার্য্যস্থানে গমন করিয়াছেন; তোমাকে কষ্ট করিয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার

গ্রহণ করিতে হইবে না। আমি তোমায় শত শত ধন্যবাদ দিতেছি, যদি প্রয়োজন হয় তোমায় সংবাদ দিব। এই বলিয়া ইসাবেলা গৃহে প্রবেশ করিল।

ইসাবেলার কথাগুলি হেনরীর ভাল লাগিল না। হেনরী আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে ছল পাতিয়াছিল তাহার সুফল ফলিল না—ইহাও বেশ বুঝিতে পারিল, ও আপন মনে বলিতে লাগিল,—গর্ব্বিণী, এখনও গর্ব্ব কর? আর তোমার এ গর্ব্ব বেশী দিন থাকিবে না, তোমায় আমার পদাধীন থাকিতে হইবেই; আমি তোমায় আমার পদাধীন করিবই করিব, আজ না পারি কাল, কাল না পারি পরশু, পরশু না পারি সপ্তাহ, সপ্তাহে না হয় মাসে, মাসে না হয় বৎসরে একদিন না একদিন আমি তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিব,—তবে আমার নাম হেনরী! নীরবে আপন মনে এইরূপ আস্ফালন করিতে করিতে হেনরী আপনার গৃহাভিমুখে গমন করিল।

স্বামী-বিরহে ইসাবেলার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে; গৃহকার্য্যে, আহারে, শয়নে কিছুতেই তাহার যেন আর ভাল লাগে না; যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই বিষাদের করাল ছায়া প্রত্যক্ষ করে। তাহার মন শূন্য, প্রাণ শূন্য, জগৎ যেন তাহার কাছে শূন্যময়; আবার যখন স্নেহের পুত্তলীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন যেন জগৎ সংসার ভুলিয়া যায়, স্বামীর স্মৃতি আবার তাহার শূন্য হৃদয়মধ্যে জাগরিত হয়, অভাগিনী তখন সস্নেহে শিশুর মুখ-চুম্বন করিয়া প্রাণে যেন অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করে। কবে স্বামী নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে, তাহাকে সুসংবাদ প্রদান করিবে, এই আশার প্রতীক্ষায় ইসাবেলা পথ চাহিয়া রহিয়াছে।

এই সুযোগে ইসাবেলাকে হস্তগত করিবার জন্য হেনরীর হৃদয় একেবারে কুঅভিসন্ধি-পূর্ণ হইয়াছে। এতদিনের প্রসুপ্ত পাপ-আশা আবার তাহার প্রাণে মূর্ত্তিমতীরূপে জাগরিতা হইয়াছে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায় এখন হেনরী ইসাবেলার বাটীর নিকট দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যদি ইসাবেলার সাক্ষাৎ পায়, ছল করিয়া তাহার মন যোগাইবার জন্যই তাহার এত আয়োজন! কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত কিছুতেই মনোমত সুযোগ-অভাবে মন-আশা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না।

এদিকে দেবতুল্য জনের সরল ও অমায়িক ব্যবহারে অন্যান্য আরোহিবৃন্দের প্রায় সকলই জনের প্রতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিতান্ত অনুরক্ত

হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং বিধিক্রমে জনকে আপাততঃ একাকী সমুদ্রভ্রমণের কষ্ট বিশেষ ভোগ করিতে হইতেছে না। ইহা ব্যতীত জনের আরও একটী মহাসুবিধা হইয়াছিল, প্রায় সকল সময়েই এই সকল নূতন পরিচিতের সহিত আমোদ কথা-প্রসঙ্গে লিপ্ত থাকায় ইসাবেলা ও লুইসের হৃদয়োন্মাদকারী ভাবনায় তাহাকে অবিরত ক্লিষ্ট হইয়া দিনযাপন করিতে হইতেছিল না। অবশ্য প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা তাহার ত চিরসঙ্গিনী; যখনই তাহাদের কথা মনে পড়ে, তখনই তাহাদের সাকার মূর্ত্তি তাহার হৃদয় দর্পণে পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে তন্ময় করিয়া তুলে, তাহার হৃদয়ের ইন্দ্রিয়নিচয়কে একেবারে শ্লথ করিয়া তাহাকে জড়বৎ নিস্তেজ করিয়া তুলে, সেই সময়ের জন্য তাহাকে নিজের অস্তিত্ব ভুলাইয়া সেই সুখময়ী নিভৃত চিন্তা তাহাকে লইয়া এই বাস্তব জগৎ হইতে বহুদূরে স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গিয়া, তাহার সহিত খেলা করিতে থাকে। হায়! তখন আর তাহার মনেও হয় না যে, সে একাকী অকূল সমুদ্রে ভাসমান—পশ্চাতে তাহার একমাত্র হৃদয়সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নী স্নেহের আধার সুকুমার আত্মজের সহিত তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া অবিরত অশ্রুনীরে তাহার বিরহে শূন্যহৃদয়ে দিন যাপন করিতেছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হঠাৎ বারিধিবক্ষে প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল! পর্ব্বতসমান সমুদ্র-তরঙ্গ যেন পৃথিবী গ্রাস করিবার জন্য ইতস্ততঃ নিজ প্রভাব জানাইতে লাগিল। জাহাজের অধ্যক্ষ প্রমাদ গণিলেন! আরোহিপূর্ণ জাহাজখানি রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন! কিন্তু হায়! তাহার সকল চেষ্টা অখণ্ডনীয় বিধি-লিপি-প্রভাবে অচিরে ব্যর্থ হইল, যেন জাহাজস্থ সকলের অদৃষ্ট একসূত্রে গ্রথিত, দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজখানি নির্দ্দয় ঝড় ও তরঙ্গসমাকুলিত বিক্ষোভিত অনন্ত সাগরবক্ষে সকলের আশা ভরসা ভাসাইয়া দিয়া, অতল জলগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জাহাজখানি জলমগ্ন হইবার সময় হতভাগ্য জন একবার জন্মের মত প্রাণের ইসাবেলা ও লুইসকে স্মরণ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-নিশ্বাস ও অশ্রুজল অর্ঘ্য প্রদান করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল। জাহাজস্থ সকলের গগনভেদী হাহাকার ধ্বনি বুঝি ভগবানের নিকট পৌঁছিল না। সকলেই সমুদ্রের অতল সলিলে নিমগ্ন হইল;—কে কোথায় ভাসিয়া গেল, কে নিরূপণ করিবে! সমস্ত রাত্রি ঝড় সমভাবেই রহিল। নিশাশেষে ঊষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও থামিল; প্রকৃতি আবার স্থির ভাব

ধারণ করিল। গত রাত্রের দারুণ দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না।

পূর্ব্বরাত্রে যখন জাহাজখানি তুমুল ঝড় ও তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে একান্ত অসহায় ও উপায়বিহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ বারংবার বিক্ষিপ্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া সাগরগর্ভে ক্রমশঃই আপনার বিপুলকায় লুকাইতেছিল; তখন হইতেই জাহাজস্থ আরোহিগণ সন্নিহিত বিপদ উপলব্ধি করিয়া অধ্যক্ষের নির্দেশানুসারে আপন আপন জীবনরক্ষার জন্য সাধ্যমত সচেষ্ট ছিল। সমুদ্রের অবস্থা বড়ই নৈরাশ্যজনক ও ভয়াবহ বিবেচনা করিয়া সকলেই যেন উপস্থিত আশ্রয় নিমজ্জমান তরণীখানি পরিত্যাগ করিয়া বাত্যা-প্রপীড়িত সফেন-তরঙ্গময় ক্রোধান্ধ সাগর-বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিতে নিতান্তই নারাজ। কিন্তু ঝড় ও তুফান ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়াতে জাহাজখানি যখন একেবারেই শক্তিহীন অবস্থায় চূর্ণ বিচূর্ণ দেহপঞ্জর লইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য জন অন্যান্য আরোহিবৃন্দের সহিত জলে ঝম্প প্রদান করিতে বাধ্য হইল। কে কোথায় ভাসিয়া গেল, কেহই দেখিল না বা দেখিতে পাইল না। সন্ধান কাহারও মিলিল না, কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। এ দারুণ দুর্ঘটনা ও তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে অসমর্থ।

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া, জন ও তাহার দুইজন সঙ্গী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রমধ্যস্থ এক জঙ্গলময় বিশাল চড়াভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেথায় জল অতি অল্প, বৃক্ষের ভগ্ন শাখা-প্রশাখাদির সাহায্যে অতি কষ্টে জন ও তাহার দুইজন সঙ্গী তীরে উঠিল। ভগবানের অনুগ্রহে জন তীরে উঠিয়াই বুঝিতে পারিল, যেন তাহার জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ সমুদ্রের লবণাক্ত জল ত্যাগ করিয়া ভূমি স্পর্শ করিলেই যেন তাহার হৃদয়ে আর এক নূতন তেজের আবির্ভাব হইল। কিন্তু তাহার সঙ্গী দুইজনের অবস্থা যেন ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনজনেই একপ্রকার পরিধেয়-হীন,—এ অবস্থায় কে কাহায় লজ্জা করে; কাহারও সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাহারা যেন সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের লোনা জলে বহুক্ষণ যাবৎ থাকাতে তাহাদের শরীরের অবস্থাও অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে; তাহাদের সর্ব্বশরীর যেন নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। জন আপনার শারীরিক কষ্ট ও দুঃখচিন্তা ভুলিয়া গিয়া দুইজন মুমূর্ষু সঙ্গীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত। কি

করিয়া তাহাদের সুস্থ করিবে—কি করিলে তাহাদের জীবন রক্ষা হয়, এই চিন্তাতেই জন বড়ই অধীর হইয়া পড়িল। জন ভাবিতেছে যে, সঙ্গী দুইজনেই কোন রকমে সেবা শুশ্রূষায় বাঁচাইতে পারিলে, তবু তিন জনে সুখে দুঃখে সুদিনের প্রতীক্ষায় এই জনমানবহীন দুর্গম কান্তারে থাকিতে পারিবে—অপর কোন জাহাজ দেখিলে তাহাদের তুলিয়া লইতে পারিবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া দিন যাপন করিতে পারিবে, কিন্তু হায়! জনের ইচ্ছা ইচ্ছাময় পূরণ করিলেন কই!

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। সূর্য্যকিরণে তবু তাহাদের অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহাদের শীতল অঙ্গ ক্রমেই উষ্ণ হইতেছিল। জন সঙ্গী দুইজন অপেক্ষা অনেক সুস্থ বোধ করিয়াছিল। এখন ক্ষুধার উদ্রেকে কোথায় যাইবে—কোথায় কি পাইবে, এইরূপ নানা চিন্তা করিতেছে, এমন সময় একজন সঙ্গী উভয়কে ত্যাগ করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করিল। জনের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। সে সঙ্গীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"ভাই! এত কষ্ট সহ্য করিয়াও তোমায় বাঁচাইতে পারিলাম না। তুমি তোমার ভাবনা, গৃহের ভাবনা,—স্ত্রী পুত্রের ভাবনা, পিতামাতার ভাবনা, একেবারে পৃথিবীর সকল ভাবনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে। যাও ভাই, যাও শান্তিধামে চলিয়া যাও! এরূপ অবস্থায়, এরূপ জনমানবশূন্য নিবিড় জঙ্গলে আমরাও বা কতদিন বাঁচিব—হয় আজ নয় কাল, দুইদিন পরেই আমরাও তোমার সহিত মিলিত হইব, এ কথা তুমি নিশ্চিত জানিও।" এই বলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে জন মৃত সঙ্গীর প্রেতাত্মার শান্তির জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিল, তাহার পর উঠিয়া কি মনে ভাবিল। কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ভাই! তোমায় যখন জল হইতে উঠাইয়াছি, আর তোমায় জলে নিক্ষেপ করিব না। তুমি যতদিন পার, এই স্থানে বিশ্রাম লাভ কর। তবু জানিব—আমরা তিনজনেই একত্রে আছি। পর মুহূর্ত্তে অপর সঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বেশ বুঝিতে পারিল—তাহারও জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ! ইহা দেখিয়া জন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, ভাই! তুমিও আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে! তবে আমি কি করিয়া এইরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে একাকী থাকিব। আমি কাহাকে লইয়া—কি লইয়া হেথায় জীবন ধারণ করিব। মনে করিয়াছিলাম—তোমরা সুস্থ হইলে তিনজনে আহারের অন্বেষণে যাইব।

বৃক্ষের ফল মূল যাহা পাইব, তিনজনে একত্রে আহার করিয়া বৃক্ষ শাখায় ঘর বাঁধিয়া, সংসারের চিন্তা দূরে রাখিয়া—সুদিনের প্রতীক্ষায় ভগবানের নিকট অহর্নিশি প্রার্থনা করিব, কিন্তু তাহা হইল কই। তাহা হইতে দিলে কই! দুজনেই ত একে একে আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছ! একজন গিয়াছে—তুমিও যাইতেছ! কেহই একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না! এই বলিয়া জন উচ্চৈঃস্বরে পাগলের মত মুমূর্ষু সঙ্গীকে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সমাগত! ক্রমে ধরাতল অন্ধকারে পূর্ণ হইল। সেই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জনের দ্বিতীয় সঙ্গীর ক্ষীণ জীবন-দীপশিখা দেখিতে দেখিতে চির অন্ধকারে মিশিয়া গেল। জন এখন একাকী কি করিবে কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার মনে করিল, সকলেই তো চলিয়া গেল, তবে আমিই বা কি হেতু জীবনের মমতা করি! এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আমিও আমার সকল ভাবনা হইতে অব্যাহতি লাভ করি। কে যেন পরক্ষণেই তাহাকে এ কার্য্যে বাধা দিল; আবার যেন তাহার মনের গাত ফিরিল। রাত্রি হইতেছে দেখিয়া জন নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করিল।

ক্ষুৎ-পিপাসায় ও দারুণ শীতে জন সমস্ত রাত্রিই একভাবে বসিয়া কাটা-ইল। আবার উষার আলোকরাশি অদূরে দেখিয়া, বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া মৃত সঙ্গীদ্বয়ের নিকট যাইয়া কহিল, ভাই! তোমরা ঘুমাও! আমি তোমাদের জন্য পানীয় ও আহার অন্বেষণে যাইতেছি, যাহা পাই লইয়া আসিয়া তিন জনে একত্রে আহার করিব। তোমাদের শরীর অসুস্থ, তোমরা বিশ্রাম কর, ঘুমাও! আমি একাকী যাই। এই বলিয়া জন নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে ইসাবেলা প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে সমুদ্রতীরে শিশুটীকে লইয়া আসিয়া একদৃষ্টে অনিমিষ-লোচনে দূর সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকে! আহা! এই সমুদ্রতীরেই পতিপ্রাণা সাধ্বী তাহার স্বামীকে বিদায় দিয়াছে। এই সমুদ্রতীরেই সে তাহার প্রাণপ্রিয়তমকে বিদায় দিবার সময় তাহার বক্ষে আপন মস্তক লুকাইয়া, চোখের জলে হৃদয়ের গভীরতম বেদনা জানাইয়াছে। প্রিয়-বিচ্ছেদ রূপ ভয়ঙ্কর যাতনা এই সমুদ্রতীরেই হতভাগিনী প্রথম অনুভব করিয়া, দুঃখের অকূল সাগরে আপনার ক্ষুদ্র জীবনতরীখানি ভাসাইয়াছে, সমুদ্রতীরে আসিয়াও যেদিকে জাহাজখানি তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্বকে লইয়া অদৃশ্য

হইয়াছে, সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ক্রমে সে এত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে যে, তাহার সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হয়। ক্রোড়স্থ চঞ্চলমতি শিশুর উত্তেজনায় তাহার সুখময় দুঃখের ভাবনায় বাধা পড়িলে, তাহার চমক ভঙ্গ হয়; তখনি সে নয়নানন্দ সন্তানের চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া সমস্তই ভুলিয়া যায়। অবশেষে কবে স্বামীর শুভ সংবাদ পাইবে, এই আশায় প্রতিদিন বন্দরের আফিসে তাহার খবর জিজ্ঞাসা করে, এবং প্রতিদিনই বিফলমনোরথ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

একদিন প্রাতঃকালে বন্দর আফিস জনতায় পূর্ণ, হেনরীও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইল; নির্ব্বাক্ জন-পুঞ্জের অসাধারণ ম্লানভাব নিরীক্ষণ করিয়াই চতুর হেনরী বুঝিতে পারিল যে, বন্দর আফিসে নিশ্চয় কোন অশুভ সংবাদ আসিয়াছে। যাহা হউক, অনতিবিলম্বেই সে জানিতে পারিল যে, সমুদ্রে প্রবল ঝড়ে "লিলি" নামক জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে, আরোহী ও নাবিকগণের এপর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হেনরী পূর্ব্বেই জানিত যে "লিলি" নামক জাহাজেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জন সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে, তাই এই হৃদয়বিদারক সংবাদেও হেনরীর মুখে আনন্দের রেখা দেখা দিল। সে মনে মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতে লাগিল,—যাক্, ভালই হইয়াছে, আমার চিরশত্রু, আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জনের নিপাত হইয়াছে, ইসাবেলাকে লাভ করিবার এই আমার উপযুক্ত অবসর, এই বলিয়া আপনার মনোভাব গোপন করতঃ কৌতূহল নিবারণের জন্য ও বিশেষরূপে সম্যক্ বিষয়টী অবগত হইবার মানসে হেনরী দারুণ আগ্রহে জনতা ভেদ করিয়া, বন্দর আফিসে প্রবেশ করিল ও তথায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বেশ বুঝিল,—আর সন্দেহের কোন কারণ নাই,—জনের নিপাত অবশ্যম্ভাবী; যাই, এই সময়ে একবার ইসাবেলাকে খবর দিয়া আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করি; এই বলিয়া হেনরী বন্দর আফিস হইতে ইসাবেলার গৃহাভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিল। ইসাবেলার গৃহের নিকট যাইয়া মনোভাব গোপন করিয়া, বিষণ্ণভাবে ইসাবেলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবলাকে তাহার স্বামীর নিদারুণ সংবাদ দিয়া তাহার শোকের কপট সঙ্গী হইল। ইসাবেলা হেনরীর মুখে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পুত্রটীকে ধাত্রীর হস্তে দিয়া পাগলিনীর মত বন্দর আফিসের দিকে দ্রুতপদে গমন করিল। হেনরীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পরে ইসাবেলা বন্দর আফিস হইতে যথাযথ যাবৎ সংবাদ শুনিয়া শোকে দুঃখে অভিভূতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কত কাঁদিল,—চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া দিল, কিন্তু হায়! তাহার হৃদয়ের আগুণ চক্ষের জল সিঞ্চনে আরও দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিল; হতভাগিনী শোকের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, শীঘ্রই হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইল। হেনরী এতক্ষণ পার্শ্বেই দণ্ডায়মান থাকিয়া শুধু তাহার এ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছিল; মনে করিতেছিল—ইসাবেলার শোকের বেগ এখন উথলিয়া উঠিয়াছে, এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতেই আবার উপশম হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে দু-চারিটী মিষ্ট সান্ত্বনা বাক্যে ভুলাইয়া, বন্দর আফিস হইতে কোন প্রকারে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃতের মত ভূমিতলে তাহাকে লুণ্ঠিত দেখিয়া বড়ই প্রমাদ গণিল, শীঘ্রই এক-খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া বহুকষ্টে ইসাবেলাকে তাহার বাটীতে আনিয়া ফেলিল, পরে ইসাবেলার চৈতন্যলাভ হইলে হেনরী নানা প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ইসাবেলার শোকাশ্রুতে ভাসিয়া গেল, সে কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। বাটীর সকলে আসিয়া ইসাবেলার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ইসাবেলার চৈতন্য লোপ হইবার উপক্রম হইল; হেনরী গতিক বড় সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া সে দিনের মত আপন গৃহে ফিরিয়া গেল। ভাবিল, আজ ইসাবেলা প্রাণভরিয়া কাঁদিয়া নিক্,—ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে কাল শোকের বেগ অনেকটা কমিবে।

জনমানবশূন্য নিবিড় জঙ্গলে জন একাকী কেবল সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া দিনাতিপাত করিতেছে; হতভাগ্য সারাদিন সমুদ্রতীরে আপনার উদ্ধারের জন্য অনিমেষ নয়নে আশাপ্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে! হায়! জাহাজের পরিবর্ত্তে কেবল দূরে সমুদ্রের তরঙ্গরাশি প্রতিদিন গণনা করিয়া সন্ধ্যার সময় ভগ্নমনে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রাত্রিযাপন করে! খাইবার মধ্যে বনের ফল, পিপাসা শান্তির জন্য সমুদ্রের লোণা জল; পরিধান বৃক্ষের পত্র বল্কল—শয়ন ভুলিয়া গিয়া বৃক্ষশাখায় উপবেশনে রাত্রিযাপন. প্রথম প্রথম সঙ্গীহারা হইয়া জন যে কষ্ট অনুভব করিয়াছিল, ভগবানের অনুগ্রহে এখন আর সেরূপ কষ্ট অনুভব করে না! এখন যেন ক্রমেই সব সহিয়া যাইতেছে, ক্ষৌরকার্য্য

অভাবে নখ ও চুলে জনকে এ জঙ্গলে এরূপ অবস্থায় সহসা আর মানুষ বলিয়া চিনিবার যো নাই; কখন কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে, কখন এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কখন বা স্থির হইয়া সমুদ্রতীরে বসিয়া অনিমেষ নয়নে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। জনের অদৃষ্টে বিধাতা কেন এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসরও কাটিয়া গেল, হতভাগ্য জনের উদ্ধার হইল না; জন যেথায় আসিয়া পড়িয়াছে, সে স্থান জাহাজ যাতায়াতের বড় সুগম পথ নয়, সেথা হইতে বহুদূর দিয়া জাহাজাদি যাতায়াত করে। সে স্থান লোকলোচনের বাহিরে, সুতরাং জনের দৃষ্টিপথে কি করিয়া তাহার আশার সামগ্রী মিলিবে! জন দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িতেছে—বাহ্যজ্ঞান লোপ হইবার উপক্রম হইতেছে; জনকে দারুণ অশান্তি হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য ক্রমে ক্রমে উন্মত্ততা আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করিল।

এদিকে হেনরী প্রতিদিনই আপনার অভিলাষ সিদ্ধির আশায় ইসাবেলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া যায়, শিশুটীর মনোরঞ্জনার্থে তাহাকে প্রতিদিন নূতন নূতন খেলনা, খাদ্যসামগ্রী ও মধ্যে মধ্যে নানারূপ পোষাকও আনিয়া দেয়; হেনরী এখন আপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ইসাবেলাকে সংসারে হেনরী ভিন্ন অপর আপনার জন কেহই নাই তাহাই দেখায়। দিনের পর দিন যাইতেছে—ইসাবেলার শোকাগ্নি ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে; এখন আর জনের জন্য ইসাবেলার তত উন্মত্ততা আসে না। এখন সে বুঝিতে পারিতেছে যে, মৃত জনের জন্য আকুল হইয়া বৃথা রোদন করিলে কি ফল; কে কোথায় রোদন করিয়া মৃতজনকে লাভ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং সে আপন মনকে অনেকটা প্রবোধ দিয়াছে—কি করিবে শোকের অগ্নি জগতে কে চিরকাল একভাবে অনুভব করিয়া থাকে; কখন জনকে মনে হইলে তাহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু সে কয়দণ্ডের জন্য! কেবল প্রিয়-বিরহে অশ্রুজল সার করিলেই তো দিন কাটে না, সুতরাং যতই শোক পুরাতন হইতে থাকে, ততই আপন ভবিষ্যৎ চিন্তা আসিয়া চিত্ত স্বভাবতঃই অধিকার করিতে থাকে। এই আপন চিন্তাই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব দারুণ শোক অশান্তিময় প্রাণেও সান্ত্বনা-শান্তিবারি সিঞ্চনে স্থিরভাবে আনয়ন করে! পতি-

বিচ্ছেদ-ব্যাকুলা ইসাবেলারও অবস্থা এখন এইরূপ,—ইসাবেলা ভাবে,—যে মরিয়া গিয়াছে, তাহার আর কোথায় সন্ধান পাইবে ; এখন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটীর চিন্তা ও আপন চিন্তা আসিয়া ইসাবেলার হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে জনের প্রদত্ত অর্থও ফুরাইল, ইসাবেলা বড়ই ভাবিতা হইল ; এদিকে হেনরী ইসাবেলার নিকট যাতায়াত ঠিক সমভাবেই বজায় রাখিয়াছে, বরং তাহার মৌখিক আত্মীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তত্রাচও ইসাবেলা হেনরীকে আপন অবস্থার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিল, কিন্তু হেনরী অতি চতুর, সেও তাহার সময় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে! ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ইসাবেলার অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইয়া আসিতে লাগিল—ইহা হেনরী বেশ বুঝিতে পারিল! সেও সেই জন্য মৌখিক বদান্যতা উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিল, সে আরও বুঝিল যে—এই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রশস্ত সময় ; আর জন যখন মরিয়া গিয়াছে, তখন আমাকে বিবাহ না করিলেই বা ইসাবেলার কি করিয়া চলিবে! তবে যখন আমি তাহাকে বরাবরই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—যাহার ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া আমি দারুণ ক্ষোভে ও সন্তাপে দিন কাটাইতেছিলাম ও তাহার সর্ব্বনাশ সাধন-সংকল্প করিতেছিলাম, ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া আমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী জনকে যখন আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তখন আর তাহাকে বৃথা কষ্টে পড়িতে দিব না! সময়ক্রমে তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়া তাহার মনোভাব বুঝিয়া লইব. আরও দুই একমাস যাক্, বিশেষ একটু কষ্ট অনুভব করিলেই, সে আমাকে বিবাহ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই, ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই আমার মতে সম্মতি প্রদান করিবে। যাহা হউক, হেনরীর বাহ্যিক আত্মীয়তায় ইসাবেলার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ইসাবেলারও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে বাকি রহিল না।

একদিন হেনরী ও ইসাবেলা উভয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ একটী পার্কের ভিতর বসিয়া, ইসাবেলা আপন দুঃখের কাহিনী হেনরীকে বলিতে আরম্ভ করিল। হেনরী আপনার অভীষ্ট পূরণের এই প্রকৃত সুযোগ বুঝিয়া, ইসাবেলার নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিল ও অচিরেই তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখিনী হউক, তাহাও খুলিয়া বলিল। হেনরীর প্রস্তাবে ইসাবেলা নীরব রহিল, সেদিন কোনরূপ সম্মতি না দিয়া বলিল, আমাকে

এক সপ্তাহ সময় দাও; তোমার এ প্রস্তাব আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে তোমায় আমার অভিমত জানাইব! এই বলিয়া সেসব কথা চাপা দিয়া ইসাবেলা আবার অন্য কথার উত্থাপন করিল; ইসাবেলার কথায় হেনরীর মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। সাত দিন পরে কি উত্তর দিবে, এই ভাবনায় তাহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল; এখন হেনরীর আহারে রুচি নাই—নিদ্রায় তৃপ্তি নাই—কার্য্যে মনোযোগ নাই। ইসাবেলা কি উত্তর দিবে, তাহার মনে কেবল এই ভাবনা।

ইসাবেলা গৃহে আসিয়া সেই রাত্রে তাহার বাটীস্থ অপরাপর স্ত্রীলোকের নিকট হেনরীর প্রস্তাব জানাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেনরী আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ মৌখিক আত্মীয়তারূপ কূট কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল;—অবশ্য হেনরী যে ইসাবেলাকে ভালবাসিত না অথবা তাহার পূর্ব্ব প্রণয় প্রত্যাখ্যানের প্রতিহিংসামানসেই ইসাবেলাকে কেবল শাস্তি দিবারই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে, ইহাও নহে; হেনরী ইসাবেলাকে বরাবরই ভালবাসে, তবে মধ্যে জনের সহিত তাহার বিবাহ হইলে সে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আপনার প্রণয়ীকে অপরের সহিত বিবাহিত তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র অনুরক্তও ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিলে জগতে কে না হেনরীর মত ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং হেনরী জনের সহিত ইসাবেলার মিলন বিধাতার অভিপ্রেত ভাবিয়া আপনার মনের আগুণ মনেই চাপিয়া দিন কাটাইতেছিল; এখন সে বুঝিয়াছে বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ! আমার জীবনাধিককে প্রলোভনে ভুলাইয়া, হতভাগ্য জন আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইয়া, বিধি-ইচ্ছার লঙ্ঘন করিয়াছিল; তাহার ফল সে হাতে হাতে পাইয়াছে; হেনরীর অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন,—তাহার পথ এখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন! হেনরীর আত্মীয়তায় ইসাবেলা ও তাহার বাটীস্থ অপর সকলেই হেনরীর উপর আকৃষ্ট; সুতরাং ইসাবেলা হেনরীর প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্রই তাহারা ইসাবেলাকে কালবিলম্ব না করিয়া তাহাতে সম্মত হইতে পরামর্শ দিল, ইসাবেলা সকলের মতে একমত হইয়া হেনরীকে বিবাহ-প্রস্তাব জ্ঞাপন করিল।

(বারান্তরে সমাপ্য!)

শ্রীননিলাল সুর।

বাসন্তী-উৎসব।

অম্বর-বারিধি মাঝে নব জলধর-পোত
মন্থর মরাল-গতি নীরবে ভাসিয়া যায় ;
সিন্দুর সর্ব্বাঙ্গে মাখি' বাল বিভাকর দেব,
সুশোভিত প্রাচীমূলে উঁকি ঝুঁকি মারি চায়।
রসাল-মঞ্জরি' পরে দ্রুতগতি রেণুবাস
সুগন্ধ-নন্দিত-মদে না চায় নয়ন মেলি',
কুন্দ-প্রসূন-রাজি মলয়-সমীর স্পর্শে
বিকসিত বিহসিত পড়িছে অপরে ঢলি।
বৃতি-বিশোভনা নীল শ্বেতাপরাজিতা
হৃদয় সোহাগটুকু অতীব যতন করে,
ধরিয়া রেখেছে তব সুন্দর চরণ দুটী
সাজাইতে মন মত সভক্তি সমাদরে।
বিহগ বিহগী গায় পরম পুলকে মাতি
অস্ফুট কাকলী গান, বিমোহিত চারিধার,
উৎফুল্ল আঁখি মেলি' পুলক হরষ-ভরে
কিশোরী প্রকৃতি রাণী তোষে হৃদি সবাকার।
অপরূপ সাজে সাজি লতা বৃক্ষ শাখা শাখী
প্রভাত-মলয়ানিল মাখিয়া সকল গায়,
নূতন উদ্যম ভরে নবীন আমোদে মাতি'
করিতেছে নতি স্তুতি, আবাহন-গীতি গায়।
শ্বেত-অরবিন্দ' পরে পুস্তক-বীণা-ধরা
অম্বর-আচলকির ছন্দ-গীতি চমকিত,
সুগন্ধ ললিত পদ কমল মধুপ ভ্রমে
ধরাতল সহ চুমে মধু-পান ঈপ্সিত।
এস গো, বাসন্তী দেবি, বিশোভিতা দশ দিশি
রাখিয়াছে হৃদি তন্ত্রে পুরিয়া মধুর তান ;—
স্ফীত উছলিত মম ক্ষুদ্র হৃদয়াধার
ছন্দ-হীন ভাষা-হীন বিনা তান লয় মান।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিদ্যার্ণব।

রঞ্জাবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাঘমাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ক্ষীণকায়া-অতলস্পর্শী বরুণার নির্ম্মল জল ঝুর ঝুর করিয়া তখনও ভাগীরথীতে আসিয়া মিশিতেছে; দু'দিন পরে হতভাগিনী, ভাগীরথীকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। সঙ্গমসুখ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, গঙ্গা ও বরুণার সন্ধিস্থলে ভাগীরথীতীরে আদি-কেদারের মন্দিরে নয়নাভিরাম চতুর্ভুজ নারায়ণ কেদারনাথ বারাণসীর এক প্রান্তে বসিয়া কাশীধাম রক্ষা করিতেছেন। বেলা প্রায় ডুবু ডুবু, অস্তগত মরীচি-মালীর দীপ্তিহীন রক্তিম আভা ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে শুভ্র বালুরাশির উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আদি কেদা-রের মন্দিরের পার্শ্বে প্রাচীন তিন্তিড়ী-বৃক্ষের তলে বসিয়া গঞ্জিকা টিপিতে টিপিতে কোন বাঙ্গালী পথিক গান ধরিয়াছে—

ও ঘাটে যাবনা সঁইয়া পাণি আভরণ
হেরিলে সে কালাচাঁদে মন উচাটন।

ভাগীরথীতীরে বালির উপরে জন দুই কাশীর গুণ্ডা লোটা হাতে আসিয়া লেঙটা খিচিয়া খুব ডনবৈঠক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, আর এক একবার রঙ্গীনবসনা অবগুণ্ঠনবতী রমণী যাত্রীদিগের মন্দ চরণের মঞ্জীর-ধ্বনি শ্রবণে সোৎসুক নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া আছে, তখন আর তাহাদের ডনবৈঠকের কথা মনে আসিতেছে না। কোথা বা দুটী সাধু ধুনি হইতে গাত্রোত্থান করতঃ চিমটা দ্বারা ধুনিতে কয়েকবার আঘাত করিয়া, লোটা হাতে মাঠের পানে চলিয়াছে। বরুণার উত্তর ধারে অড়হর বনের মধ্য দিয়া গ্রামান্তর হইতে গোয়ালিনীগণ দূরে হাড়ি মাথায় করিয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিতেছে, প্রত্যেকের হাতে এক গোছা করিয়া অড়হরের ডাল, তাহা হইতে দুই একটী করিয়া আহার চলিতেছে, আর সাঁঝ লাগিবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলাও হইতেছে। বরুণার মুখে একটী চিতা জ্বলিতেছে, চিতার পার্শ্বে দুটী হিন্দু-স্থানী রমণী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে, পার্শ্বে

মুদ্দফরাস দাঁড়াইয়া আছে; বোধ করি মৃত ব্যক্তির রমণীদ্বয় ব্যতীত আর কেহ আপনার লোক ছিল না। বারণসীতে তীর্থ করিতে আসিলে প্রত্যেক যাত্রীকে একবার ৺বারাণসী ধামের উত্তর প্রান্তস্থ—আদি-কেদারের রমণীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসিতে হয়। রঙ্গাবতীর আত্মীয় স্বজন সকলেই ৺বারাণসীধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। আজ মাঘী পূর্ণিমা, তাই সকাল করিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে গঙ্গা-স্নান করিয়া তাঁহারা সকলে রাজ-ঘাটে আদি-কেদার দেখিতে আসিয়াছেন; সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেহ কেহ পরিশ্রান্ত হইয়া কেদার ঘাটের তেতুল গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছেন, যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ বা তখনও রাজঘাটে প্রাচীন দুর্গ, সন্ন্যা-সীর যোগাশ্রম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহাগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। আর রঙ্গাবতী কি করিতেছে? রঙ্গাবতী বরুণার মনোহারিণী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তন্ময় হইয়া, পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণা, জননী, সঙ্গিনী, কাশীর দেবতা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া এক অনন্ত প্রকৃতির স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। এখানে যেন স্বর্গ হইতেও শান্তি পাওয়া যায়! সেখানকার সৌন্দর্য্য হইতে বুঝি পৃথিবীর আর কিছুই অধিক সুন্দর করিয়া ভগবান্ সৃষ্টি করেন নাই। রঙ্গাবতী এই স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু একটী ভাবনা তাহার অন্তর হইতে পুঁছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সে যতই বরুণার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া পড়িতেছে, ততই সেই অনন্ত সুন্দর অথচ যেন মলিনাভ উজ্জ্বল অথচ বিষাদ পবিত্র অথচ যেন পাপ-ছায়া-স্পর্শী ভাবনাটী তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিতেছে।

বরুণার এক তীর অত্যুচ্চ। বেল ও নিম্ব বৃক্ষসমূহ উচ্চ পাহাড় হইতে যেন বরুণার স্বচ্ছ সলিলে উঁকি মারিয়া মুখ দেখাদেখি করিতেছে। অপর তীর সমতল; হরিৎ গমগুলি শীষ মস্তকে করিয়া নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত চুম্বন করিতেছে। কে কোথায় পথিক আছ, কে কোথায় পাগল হইয়া ভাবনার রাজ্যে বিচরণ করিতেছ,—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া অমৌলিক বিলাস-সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইয়া আপনার মনে আপনি কাঁদিয়া বেড়াইতেছ, একবার আসিয়া এই বরুণা ও উত্তরবাহিনী গঙ্গার সন্ধিস্থলে দাঁড়াও! একবার বরুণার কূলবিচুম্বিত প্রাণারাম শ্যাম শস্যরাজির প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখ, তোমার হৃদয় অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। পৃথিবীর সুখ দুঃখ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কোন্ স্বরগের দেশে গিয়া পড়িবে, তাহা স্থির করিতে পারিবে না।

রঞ্জাবতী বাল-বিধবা, রঞ্জাবতী স্তিমিত যৌবনা, রঞ্জাবতী অভাগিনী! রঞ্জাবতী পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া, বরুণার সুনীল শস্পের সম্মুখে একটী প্রাচীন নিম্ব-বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে,—উঃ! সেও এই দিন এমনি সময়, সে দিন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ছিল, আর আজ নির্ম্মল আকাশ; এখনও সুদূর তালবৃক্ষের অন্তরাল হইতে সূর্য্যদেব উঁকি মারিতেছে। সে দিন বাটীতে অপর কেহ ছিল না, শিবনাথ আর আমি: শিবনাথ সেই শিবনাথ,—যাহাকে প্রাণ-শুদ্ধ ভালবাসি, সেই শিবনাথ—যাহাকে একদণ্ড চক্ষের আড়াল করিলে হৃদয় দুর্ব্বল হয়, সেই শিবনাথ। হায়! হায়! শিবনাথ কি করিল? পুত্র নাই, কন্যা নাই, স্বামী নাই, পৃথিবীতে আপনার বলিবার কেহ নাই, বুকভরা সমস্ত ভালবাসার অধিকারী শিবনাথ! এ নশ্বর সংসারে যদি সন্তান হইতেও কিছু থাকে ত সে শিবনাথ! স্বামী হইতেও বিধবার যদি কিছু থাকে ত সে শিবনাথ! বৃদ্ধা জননী আছেন, তাঁহাকে ফেলিয়াও শিবনাথের কথা লইয়া প্রাণ কত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কই শিবনাথ ত তাহা বুঝিল না। জানি সে আমাকে খুব ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসায় যেন কি একটা মিশান আছে বলিয়া অনুমান হয়। ছিঃ! শিবনাথ! তুমি পুরুষ মানুষ—ক্ষুদ্র হৃদয়কে উন্নত করিতে পার, লালসাকে পরাজয় করিতে পার,—তোমার কিসের ভয়, কিসের ভাবনা! শিবনাথ,—তুমি ত ইচ্ছা করিলে সমস্ত পৃথিবী আপনার করিতে পার; তবে তাহা কর না কেন? শিবনাথ, তোমাকে এত ভালবাসি,—তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না! এত বুঝাইলাম, তুমি পণ্ডিত হইয়া—শাস্ত্রবিশারদ হইয়া—গৃহী হইয়া অসহায়া, নিরাশ্রয়া, সম্পদহীনা হিন্দু-বিধবার ভালবাসা উপলব্ধি করিতে পারিলে না। তুমি ব্রাহ্ম, তুমি বিধর্ম্মী, কিন্তু আমার কাছে তুমি সন্তান। লোকে তোমাকে অশ্রদ্ধা করিলে, আমি তোমাকে বাহু প্রসারণ করিয়া প্রীতিভরে গ্রহণ করিব। তুমি বিধর্ম্মী বলিয়া সমাজের ঘৃণিত হইলেও তুমি আমার অন্তরে এক বিশুদ্ধ পুরুষ। তোমার সমস্ত দোষ ক্ষমার্হ। কিন্তু শিবনাথ ছিঃ! ছিঃ! তুমি একি করিতেছ! হায়! হায়! এত ভালবাসিলাম, শিবনাথ—আমাকে চিনিতে পারিলে না! না না, শিবনাথের কোন দোষ নাই। সে ত বোঝে আবার বোঝে না! ছিঃ! শিবনাথ, তুমি ব্রাহ্ম, আমি হিন্দু-বিধবা; আমি তোমার জননী হইতেও কোন স্বর্গীয় জিনিষ। তুমি আমার সন্তান! স্বামী হইতেও যদি কিছু উচ্চ আদরণীয়

থাকে ত তুমি তাই, শিবনাথ তুমি কবে বুঝিতে পারিবে—আমি তোমার কে ? কবে তোমার সে মহান্ জ্ঞানের উন্মেষ হইবে ! যে দিন বুঝিবে, হয় ত সে দিন আমি আর এ পৃথিবীতে থাকিব না।

বরুণার উচ্চকূলে নিম্ব-মূলে সৌন্দর্য্য-মুগ্ধা রঙ্গাবতী স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপ আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। সূর্য্যের রক্তিম-রশ্মি তাহার রক্তাভ গণ্ডস্থল চুম্বন করিতেছে। গৃহে প্রত্যাগত গাভীগণের কণ্ঠে দোদুল্যমান ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে ; এমন সময় রাজঘাট দুর্গ, ডফরিণ পুল প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া শিবনাথ রঙ্গাবতীর পদপ্রান্তে আসিয়া উপবেশন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যশোহর জেলার ইছামতী-তীরে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে রঙ্গাবতীর পিত্রালয়। শিবনাথ রঙ্গাবতীর স্বজাতি, পড়শী। রঙ্গা শিবনাথ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠা, শৈশবে উভয়ে এক সঙ্গে খেলা করিয়াছে, এক পাঠশালায় পড়িয়াছে। শিবনাথ পড়া বলিতে পারে নাই,—রঙ্গা পড়া বলিয়া দিয়াছে। শিবনাথ গুরুমহাশয়ের বেত খাইয়াছে, রঙ্গা ভয়ে কাঁদিয়াছে। শিবনাথ ছুটিতে পড়িয়া গিয়াছে, রঙ্গা তুলিয়া ধূলা ঝাড়িয়া দিয়াছে। রঙ্গা এত করিয়াছে, শিবনাথ কি কিছু করে নাই !—শিবনাথ পুকুরের পানাপচা জলে সাঁতরাইয়া রক্তকম্বলের ফুল আনিয়া দিয়াছে, রঙ্গা লালফুলের হার নিজে পরিয়াছে, শিবকে পরাইয়াছে। শিব পাখীর ছানা আনিয়াছে, রঙ্গাবতী খাঁচায় ভরিয়া পুষিয়াছে। শিব হাত কাটিয়াছে, রঙ্গা ঔষধ লেপিয়া দিয়াছে। শিব ইছামতীতে সাঁতার দিয়াছে, রঙ্গা কুমীরে ধরিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি শিবের মাকে ডাকিয়া দিয়াছে ; এইরূপে উভয়ের শৈশব নির্ম্মল আনন্দে কাটিয়া গিয়াছে। শিব বড় হইয়া বিদেশে পড়িতে গেল, আর রঙ্গা ! রঙ্গা তাহার সাধের বাপের বাড়ীর খেলা ধূলা ছাড়িয়া, রাঙা পালতোলাই ইছামতীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গীগুলির মমতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনতা হারাইয়া পরের ঘরে সংসার পাতিতে চলিল। রঙ্গার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; শিবের সঙ্গে

আর রঞ্জার সাক্ষাৎ হয় না ; যখন শিব আসে, রঞ্জা তখন শ্বশুরবাড়ী থাকে। শিব বাড়ী আসিলে প্রায়ই রঞ্জাদের বাড়ীতে থাকে, রঞ্জার জননী শিবকে আপনার ছেলের মতন দেখেন, কারণ রঞ্জার মায়ের রঞ্জা ব্যতীত আর কোন পুত্র কন্যা ছিল না, তাহার উপর শিব আবার রঞ্জার বাল্য-বন্ধু!

শিব যখন শুনিত, রঞ্জা শ্বশুর বাড়াতে বেশ সুখে আছে—তখন আপনা-আপনিই যেন একটা হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া শিবের কোন এক অতীতের সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। কিছুদিন পরে শিবের বিবাহ হইল—এ বিবাহ রঞ্জাবতী দেখিতে পাইল না, সে সময়ে তাহার শ্বশুরের অত্যন্ত ব্যারাম।

মানুষের চিরদিন সমান যায় না। সংসারের কত জ্বালা, কত ভালবাসা, কত পাপ, কত পুণ্য বহন করিয়া কাল অভ্রান্তগতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর গেল, একটী পুত্র রাখিয়া শিবনাথের স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলেন। এদিকে রঞ্জাবতীও বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

শ্বশুর বাড়ীতে আপনার বলিতে রঞ্জার আর কেহ ছিল না, কাযে কাযেই তাহাকে বারমাস বাপের বাড়ী থাকিতে হইত। শিবনাথ দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিল না, বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিত। শিবনাথের জননীই পুত্রটীকে প্রতিপালন করিতেন। রঞ্জাবতী শিবনাথের পুত্রটীকে আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহার প্রতি এরূপ মমতা পড়িয়া গেল, যে শিবনাথের পুত্রকে একতিল না দেখিতে পাইলে রঞ্জাবতী পাগলের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িত। শিবনাথের পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, বর্ত্তমানে জননীই তাহার বাটীর একমাত্র অভিভাবিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে,—শিবনাথ অত্যন্ত পীড়িত, জীবনের আশা নাই। শিবনাথের জননী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। রঞ্জাবতীও শিবের জন্য কাঁদিয়া ফেলিল। অতীতের স্মৃতি যুগপৎ তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল ; বিশেষতঃ শিবনাথের পুত্রের প্রতি অত্যধিক

মমতা শিবনাথকেও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। রমণীর প্রকৃত ভালবাসা শরতের শেফালিকার ন্যায় সুপবিত্র, নির্ম্মল শুভ্র; পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় পুণ্য-প্রবাহিণী; এ মমতার তরঙ্গ, এ ভালবাসা, এই স্বর্গীয় সুষমাভরা অনন্ত অমরপ্রেমের পুণ্য তুফান, কেবল সেই আরাধ্য বস্তুর উপর পতিত হইয়া সঙ্কীর্ণ থাকে না, প্রেমপাত্র-সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর উপরই বসন্তের স্নিগ্ধ কৌমুদীর ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে—তাই রঙ্গাবতীর প্রেম পাত্র হইতে পাত্রান্তরে গিয়া পড়িয়াছিল, শিবনাথের পুত্র হইতে অলক্ষ্যে শিবনাথের উপর পড়িয়াছিল, আর সেই অতীত শৈশবের স্মৃতি-বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় রঙ্গাবতীর ভালবাসার পুষ্টি সাধন করিতেছিল। রঙ্গাবতী শিবনাথের পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিল না, সেও শিবনাথের জননীর সঙ্গে শিবনাথকে দেখিতে চলিল।

শিবনাথ মুমূর্ষু অবস্থায় শায়িত। কয়েকজন মেসের বালক শিবনাথকে শুশ্রূষা করিতেছিল। শিবনাথ ঘুমঘোরে কি স্বপ্ন দেখিয়া কখন হর্ষে, কখনও ভয়ে ওষ্ঠাধর বিকৃত করিতেছিল, এমন সময় ললাটে কাহার কর-স্পর্শে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রোগী চাহিয়া দেখিল, রঙ্গাবতী শিয়রে বসিয়া;—অশ্রুজলে তাহার কমল গণ্ড দুটী প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। সেই জল ভরা ডাগর আঁখি দুটী তুলিয়া রঙ্গা অনিমিষে শিবনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। রঙ্গার কর-স্পর্শে শিবনাথের দুর্ব্বল ধমনী সবল হইয়া উঠিল, হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, শিবনাথের মৃতপ্রায় অবসন্ন দেহে নব-জীবন সঞ্চার হইল।

রঙ্গার সুশ্রূষায় শিবনাথ ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। রঙ্গা দিবা-রাত্রি রোগীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিত না, ছায়ার ন্যায় পিছু পিছু ঘুরিত। ক্ষণভঙ্গুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কালের আবর্ত্তে মানুষের মন যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আজ যাঁহাকে ঘোর সংসারী দেখিতেছি, ঘটনা-বৈচিত্র্যে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। আজ যিনি সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কাল দেখিতেছি,—কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে পাপ-পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ যিনি পণ্ডিত, কাল তিনি হিতাহিত জ্ঞান-বর্জ্জিত মূর্খ। আজ যিনি সংযমী, কাল তিনি দারুণ ভোগরত। রঙ্গার ভালবাসায় শিবনাথ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। একটী আদর্শ হিন্দু-বিধবার অপার্থিব ভালবাসা একজন বিধর্ম্মী শিক্ষিত যুবক উপলব্ধি করিতে পারিল না।

রঞ্জাবতী যুবতী, শিবনাথ যুবক, কিন্তু রঞ্জা বয়োজ্যেষ্ঠা। রঞ্জা গঠিত-চরিত্র, সংযমী, পৃথিবীর অনেক পাপ-চক্ষু, অনেক লালসা, অনেক প্রলোভনের ঝঞ্ঝাবাত রঞ্জার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তথাপি রঞ্জা তুঙ্গ-শৃঙ্গী হিমাদ্রি সদৃশ অচল অটল প্রশান্ত ধীর। শিবনাথ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, সে অনেক বিজ্ঞান, অনেক ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-চর্চ্চা করে নাই, সে প্রবৃত্তি মার্গের পথিক,—নিবৃত্তির কিছু নহে। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে শিখিয়াছে,—প্রকৃত বীরের ধর্ম্ম সংযম শিক্ষা করে নাই, তাই আজ শিক্ষিত শিবনাথ একজন দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণীর নিকট পরাজিত! সৎ-শিক্ষার অভ্যাসে যে রমণী-হৃদয়, পুরুষের অপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হয়, রঞ্জাবতীই তাহার আদর্শ। পুরুষ! তুমি সহস্র পাণ্ডিত্যের বুজরুকি দেখাওনা কেন, সংযম শিক্ষা না করিলে তোমার পাণ্ডিত্যের কিছুই মূল্য নাই! তুমি আর একটা হিংস্র জন্তু উভয়েই সমান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিবনাথ শিক্ষিত, কর্ত্তব্য-পরায়ণ কিন্তু ব্রাহ্ম, যাহারা পৃথিবীর সহস্র সহস্র শুভ কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কেবল বিধবার বিবাহ লইয়াই জীবনপাত করিতেছে, তাহাদের সংযম শিক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহারা আদর্শ হিন্দু-বিধবার প্রতি ভালবাসার মর্ম্ম কি বুঝিবে? সেই জন্য বুঝি আজ শিবনাথ, রঞ্জাবতীকে ভালবাসিতে গিয়া কেমন একপ্রকার আবিলতায় বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে। এক দিকে শিবনাথের কর্ত্তব্য, সংযম বল্গা ধারণ করিয়া প্রাণপণে আকর্ষণ করিতেছে, আর অন্য দিকে যৌবনের উদ্দাম লালসা ও সমাজ-গত সংস্কার শিবনাথকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে। এক দিন হয় ত অদম্য বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শিবনাথ কি এক আবিল প্রস্তাব করিতে রঞ্জাবতীর নিকট গিয়াছে, কিন্তু রঞ্জার বিশ্বব্যাপী স্বর্গীয় প্রেমের বন্যায় শিবনাথের সে আবিলতা ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; শিবনাথ ঔষধ-গন্ধে অভিভূত, বিষধরের ন্যায় গুড় গুড় করিয়া পালাইয়া আসিয়াছে!

শিবনাথের জননী পুত্রকে আর কলিকাতায় রাখিলেন না, তাঁহারা সকলে স্বগ্রামে চলিয়া আসিলেন। এখানে সেই এদোঁপুকুর, পাখীর বাসা-বাঁধা বড় বৃক্ষ আজও আছে, ইছামতীতে রাঙা পালতোলা ক্ষুদ্র তরণীও সেই ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে, ছেলেরা তীরে বাঁধা ডিঙ্গীতে উঠিয়া শীতকালের রৌদ্রে নাচিয়া নাচিয়া রোদ পোহায়। সে গ্রামের সমস্তই সেই ভাবে সেই সুরে সেই তালে চলিতেছে, ছিল না কেবল শৈশবের কোমল দুটী প্রাণ, আজ

আবার অনেক দিন পরে পুরাতন সেই দুইটী প্রাণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। সে দুটী প্রাণ আর কেহ নহে, রঞ্জাবতী ও তাহার বাল্য সহচর শিবনাথ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ মাঘ মাসের পূর্ণিমা, রঞ্জাবতীর বাটীর অপরাপর আত্মীয় স্বজন সকলেই গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটি গিয়াছেন, রঞ্জাবতী একাকিনী কি করিবে, তাই শিবনাথের পুত্রটী বুকে করিয়া শিবনাথের বাটীতে আসিয়াছে।

বিকাল বেলা, আকাশে মেঘ লাগিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শীতের শেষে মেঘ লাগিয়া হঠাৎ বর্ষণ আরম্ভ হইলে মনটা বড় উদাস হইয়া পড়ে। রঞ্জা জানালায় বসিয়া কত কি ভাবিতেছে, কোথায় তাহার সোণার সংসার, কোথায় তাহার শ্বশুর শাশুড়ী আর কোথায়ই বা তাহার দেবতুল্য স্বামী! স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর স্নেহ-মাখা আহ্বান, সমস্তই একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল; স্বামীর আর কোন চিহ্ন রঞ্জার কাছে নাই, তাঁহার মূর্ত্তিটা সামান্য স্বপ্নের ন্যায় একটু একটু মনে আসে; সর্ব্ব অবয়ব এক সঙ্গে ধরণায় আসে না! এক অঙ্গ ভাবিয়া স্মরণ করিতে গেলে অপর অঙ্গ ভুল হইয়া পড়ে। কালমেঘে অঙ্গ ঢাকিয়া প্রকৃতি দেবী যতই ঝুপ ঝুপ করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন, রঞ্জার হৃদয় ততই অতীতের স্মৃতি আসিয়া তোলপাড় করিয়া দিতেছে। শিবনাথের পুত্রটী রঞ্জার রুক্ষ কেশ ধরিয়া পিঠের উপর একবার উঠিতেছে, আবার নামিয়া ও মাসী মা, আমার দিকে চাও বলিয়া কচি হাতে চিবুক ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; এমন সময় শিবনাথ আসিয়া ডাকিল—রঞ্জা! রঞ্জা চমকাইয়া উত্তর দিল, এস শিবনাথ!

রঞ্জা বলিল, শিবনাথ আজ নির্জ্জনে পাইয়া আবার—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেদিন কি কথা বলিবে বলিয়া বলিতে পারিলে না? কি এত গোপনীয় কথা যে, আমাকে বলিতে লজ্জা লাগে! আমি ত বলিয়াছি তোমাকে বড় ভালবাসি, তোমাকে এক তিল না দেখিয়া থাকিতে পারি না! যাহা তোমার জননীকে বলিতে লজ্জা বোধ কর, তাহা আমার নিকট অকপটে বলিতে পার। শিবনাথ, পূর্ব্বের ন্যায় তোমার সে সাহস নাই কেন? তুমি

আমার কাছে অপরাধীর মতন আসিয়া দাঁড়াও কেন শিবনাথ? তুমি কি কোন পাপ করিয়াছ? আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না; যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক আমাকে বল, তোমার পাপের লাঘব হইবে। আমি যে তোমার অমন বিষাদ-ভারাক্রান্ত বদনখানি দেখিতে পারি না, শিবনাথ! তুমি যেন আমাকে কি বলিতে যাও সাহস হয় না, বলিতে পার না, অপরাধীর ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মুখের পানে চাহিয়া চলিয়া যাও। এমন কি কথা শিবনাথ, আমাকে বলিতে ভয় হয়? তবে কি খুব খারাপ কথা?—না,—তোমার কথা—না,—তোমার ছেলের কথা—না তাও না! আমার সম্বন্ধে কি কোন অপরাধের কথা বলিতে তোমার এত ভয় হইতেছে? না রঙ্গাবতী, তাহাও নহে। তবে কি তোমার পুনরায় বিবাহের কথা?—না আমার নয়। তবে কার শিবনাথ? রঙ্গাবতী আমাকে ক্ষমা করিও, তোমাকে বড় ভাল বাসি, আমার বিবাহ নয়—বিবাহ তোমার! কেন বিধবার ত বিবাহ হয়!

শিবনাথের প্রস্তাব শুনিয়া রঙ্গাবতী ক্ষোভে বিষাদে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, পর মুহূর্ত্তেই আবার ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল —শিবনাথ তুমি বলিলে কি! তোমাকে এত ভালবাসিয়া তাহার ফল কি এই হইল? নরাধম—নরকের কীট, আমার বিবাহ! বিধবার বিবাহ! তবে কি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও? শিবনাথ বলিল, না রঙ্গাবতী আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও, আমি ত ও কথা মুখে বলি নাই। রঙ্গাবতী বলিল, বুঝেছি শিবনাথ, আর বলিতে হইবে না—কেন তুমি অপরাধীর মত আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে! কি করিয়া বুঝিব যে, অবশেষে তোমার মনে এই ছিল। শিবনাথ, পৃথিবীর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে নির্ভর করিয়া ছিলাম, তোমার কাছে আমার কিছু লজ্জা ছিল না। পিতামাতা স্বামী সকলেই ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীর দেবতা,—স্বামী। স্ত্রীলোকের সতীত্বই সেই স্বামী-সন্নিধানে পৌঁছিবার একমাত্র পথ। ছিঃ ছিঃ! শিবনাথ, বলিতে গেলে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তুমিই আমাকে সেই পথ পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতেছ? পৃথিবীতে আর আমার স্থান নাই, বিধবার রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কেহ নাই। শিবনাথ, শেষে তোমার জ্ঞান হইল যে, বিধবাকে বিবাহ করা? যে ভালবাসায় তোমার জননী হইতেও উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সেই নিঃসহায়া বিধবাকে বিয়ে করা! তোমার এই শিশু পুত্রই আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

যাও শিবনাথ, পিশাচ হইতেও অধম তুমি, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; আর কিছু দিন আমার সম্মুখে আসিও না। শিবনাথ বলিল, বেশ রঙ্গাবতী, ভয় নাই আর আমি তোমার সম্মুখে আসিব না। রঙ্গা,—কেন আর আসিবে না? কেন,—আমি ত তোমাকে একেবারে আসিতে নিষেধ করি নাই। তুমি না আসিলে আমি কি করিয়া বাঁচিব? তোমাকে না দেখিলে যে এক দণ্ড থাকিতে পারি না শিবনাথ! পৃথিবীতে যে আমার আপনার বলিতে আর কেহ নাই শিবনাথ! শিবনাথ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব কেন? আমি ত ভুলিয়া যাইবার জন্য তোমাকে ভালবাসি নাই! আমার ভালবাসায়—সেই শৈশবের ভালবাসায় ত কোন লালসার স্বার্থ-সিদ্ধি নাই শিবনাথ! শিবনাথ, আজ অন্তরে বড় দাগা দিয়াছ, হু হু করিয়া বুক জ্বলিয়া যাইতেছে, তুমি আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াও।

শিবনাথ চলিয়া গেল, আর আসিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। রঙ্গাবতীর বুকভরা ভরসার মধ্যে যেন কোথা হইতে একটা হতাশ আসিয়া বাসা বাঁধিল. তাহার আজীবন-সঞ্চিত প্রণয়ের মধ্যে যেন হঠাৎ দহ পড়িয়া একটা খাদের সৃষ্টি হইয়া গেল। সেই খাদের এপারে দাঁড়াইয়া করুণ-নেত্রে চাহিয়া রঙ্গাবতী যেন বলিতে লাগিল, সমস্ত ঝাড়ি ঝুড়িয়া দিয়া ধরিতে পারিলাম না; এত বন্ধনের মধ্যে বুঝি ফাঁক পড়িয়া গেল! আজ আমি এ পারে দাঁড়াইয়া, আর শিবনাথ আমার জিনিষ চুরি করিয়া ওপারে গিয়া দাঁড়াইল, আর কাছে আসিতে পারিবে না। হায় হায়, শেষে শিবনাথ কি করিল! শিবনাথ বুঝি কোন পাপ করিয়াছে, তাই সে রঙ্গার কাছে আসে না, না আসিলেই সে ভাল থাকে। পুণ্যের কাছে পাপকে না আসিতে হইলেই পাপ ভাল থাকে। কিছুদিন অতিবাহিত হইল, রঙ্গা থাকিতে পারিল না; আবার শিবনাথকে ডাকিল, শিবনাথ আসিল। শিবনাথ মাঝে মাঝে আসে, রঙ্গা শিবনাথকে কত উপদেশ দেয়। শিবনাথের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে, সে রঙ্গার কথার অর্থ সকল সময় বুঝিতে পারে না। শিবনাথ বিমর্ষ—শিবনাথ অনুতপ্ত, শিবনাথের মনে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনিই আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গাবতী বলিত, শিবনাথ সংযম শিক্ষা কর। শিবনাথ বলিত, চিত্ত দমন করিবার ক্ষমতা না থাকিলে আর তোমার ও পুণ্য জ্যোতির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতাম না রঙ্গাবতী। শিবনাথ কিরূপ সংযম

শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। শিবনাথের যদি প্রকৃত চরিত্র দমন হইয়া থাকিবে ত সে মুখ তুলিয়া রঞ্জার সহিত সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিত না কেন? শিবনাথ যদি প্রকৃত সংযমী হইবে, তাহা হইলে রঞ্জা যখন অপর দিকে চাহিয়া থাকিত, তখন শিবনাথ গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে পুষিয়া অনিমিষে রঞ্জার রূপ-সুধা পান করিত কেন? যাই হউক, এ সমস্ত আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক, বুঝিত শিবনাথ—বুঝিত রঞ্জাবতী।

প্রায় বৎসর পুরিতে চলিল, কাহারো মনে সুখ নাই। শিবনাথের কর্ত্তব্য লালসাকে পরাজয় করিয়াছে বটে, কিন্তু শিবনাথের সম্পূর্ণ চিত্ত-সংযম ঘটে নাই। তাই মাঘ মাসে রঞ্জাবতীর আত্মীয় স্বজন ও হরিশচন্দ্র পুরের অনেকে কাশীধামে তীর্থপর্য্যটনে আসিয়াছেন, সেই সঙ্গে রঞ্জাবতীও আসিয়াছে এবং কৌশলে মতি-পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্ম শিবনাথকেও সঙ্গে আনিয়াছে। রঞ্জাবতী কাশীধামে বরুণার তীরে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় শিবনাথ আসিয়া তাহার পদ-প্রান্তে উপবেশন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রঞ্জা। মনে পড়ে শিবনাথ, সেও এই মাস এই দিন!

শিব। সব মনে আছে রঞ্জা।

রঞ্জা। তোমাকে কি জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ধামে আনিয়াছি, বলিতে পার শিবনাথ? আজ তোমার ও আমার শেষ পরীক্ষা।

শিব! অনেক দিন পূর্ব্বে ত আমার পরীক্ষা লইয়াছ, আজ আবার কিসের নূতন পরীক্ষা রঞ্জা?

রঞ্জা। তোমরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভিন্ন অন্য কিছুই মান না, কিন্তু আমাদের এই কেদারনাথই হিন্দু-ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব! দেবতা সকলেরই এক। ওই কেদারনাথের মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সত্য করিয়া বল দেখি শিবনাথ, আমি তোমার কে? আমি কি তোমার মাতৃস্থানীয়া নই?

শিব। না!

রঞ্জা। কেন শিবনাথ?

শিব। জননীর চরণ স্পর্শ করিলে জননীর আশীর্ব্বাদে যে ভাবের উদয় হয়, রঞ্জা তোমার পদধূলিতে তোমার আশীর্ব্বাদে তাহা পাই না!

রঞ্জা। বেশ, তবে কি আমি তোমার ভগিনী?

শিব। রঞ্জা আমার ভগ্নী নাই, ভগ্নীর প্রতি কিরূপ ভালবাসা পড়ে, তাহা ত আমি জানি না, আমি কি করিয়া বলিব—তোমাকে যেরূপ ভালবাসি, সেরূপ ভালবাসা ভগ্নীর সমকক্ষ কি তাহা হইতে উচ্চ:

রঞ্জা। তবে কি আমি তোমার পত্নীর সমতুল্যা!

শিব। আবার সেই কথা রঞ্জাবতী! ধর্ম্ম-সংস্কারে একবার ক্ষণিকের জন্য কি বাসনা মনে আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আমার ত পত্নী ছিল, পত্নীর প্রতি কিরূপ মমতা কিরূপ ভালবাসা জন্মায়, তাহা ত আমি জানি; কিন্তু কই এখন ত তোমাকে দেখিয়া সেরূপ ত কোন ভাবের কথা অন্তরে উদয় হয় না! তবে কি করিয়া মিথ্যা কথা বলিব যে তুমি আমার পত্নী।

রঞ্জা। তবে শিবনাথ, আমি তোমার কে?

শিব। রঞ্জাবতী! দর্শন, বিজ্ঞান, ন্যায়, ইতিহাস সমস্ত উল্টাইয়া দেখিলাম, তোমার ভালবাসার নামকরণ করিতে পারিলাম না, বুঝিতে পারিলাম না তুমি আমার কে! জন্মান্তরবাদিগণও বুঝাইতে পারিল না, তুমি আমার কে! ভূত-ভবিষ্যৎবাদী বলিয়া দিতে পারিল না, তুমি আমার কে! জ্যোতিষীও বলিয়া দিল না, তুমি আমার কে? যখন জননীর অগাধ প্রেম, অনন্ত ভালবাসার কথা ভাবিতে ভাবিতে তোমার ভালবাসা আসিয়া পড়ে, তখন দেখিতে পাই,—গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ন্যায় উভয়ের মধ্যে একটা ক্ষীণ রেখা পড়িয়া আছে, তাহা কিছুতেই মিশ খায় না, সহস্রবার ওলট পালট করিয়া তাহারা কিছুতেই মিশিবে না। আপনার সীমানা আপনিই দেখিয়া লইবে, জননীর প্রেমে গঙ্গাধারা ছুটে, আর তোমার প্রেমে যমুনা বহে। কিন্তু পুণ্যবতী গঙ্গার প্রবাহ ঘোলা আর কৃষ্ণপ্রেম-উন্মাদিনী কালিন্দী যমুনার জল নির্ম্মল। যখন প্রেমময়ী পত্নীর প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছায়ার ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হও, তখনও সেই ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গম-স্থলের ন্যায় উভয়ের মধ্যে একটা রেখাপাত হয়, সেখানেও তোমার পার্থক্য দেখিতে পাই, বলিতে পারি না তুমি রজনীগন্ধা কি শেফালী, পদ্ম কি গোলাপ, বেলা কি চামেলী, চন্দ্র কি সূর্য্য! যেখানে "তুমি আমার কে" এই 'কে' কথাটার প্রায় মীমাংসা

হইয়া আসে, অমনি আবার সেই 'কে'র পিছু পিছু এক 'কিন্তু' আসিয়া উপস্থিত হয়। এতদিন এই 'কে' ও 'কিন্তুর' সম্যক্ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে কি করিয়া বলিব রঞ্জাবতী, তুমি আমার কে ?

রঞ্জা। শিবনাথ, যাহা তুমি ধারণা করিতে পার না, ভাষায় আনিতে পার না, আমি তোমার তাই জানিও। আমি তোমার কে, যেমন তুমি বলিতে পার না ; তুমি আমার কে, তেমনি আমিও ঠিক বলিতে পারি না। যদি কুসুমের সুষমা হইতে কিছু প্রিয় থাকে ত বুঝি আমি তোমার তাই। দেবতার সুধা, স্বর্গের পারিজাত হইতে যদি কিছু প্রিয় থাকে ত বুঝি আমি তোমার তাই শিবনাথ! শিবনাথ বল, তুমি একটী শপথ করিবে ?

শিব। কি শপথ করিব রঞ্জাবতী ?—করিব।

রঞ্জা। তোমাকে এক বৎসর কাশীতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, আমাদের সঙ্গে তুমি ফিরিয়া বাটী যাইতে পারিবে না। তোমার মাতা ও পুত্রের সেবাশুশ্রূষার ভার আমার উপর রহিল। এক বৎসর যদি ব্রহ্মচারী-দিগের সহিত বাস করিতে পার, তাহা হইলে অচিরে তোমার 'কে' ও 'কিন্তু' কথাটীর মীমাংসা হইয়া যাইবে, আর মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। বল শিবনাথ, থাকিতে পারিবে কি ?

শিবনাথ। রঞ্জাবতী, নিশ্চয় পারিব! আমি আজ হইতে একবৎসরের জন্য কাশীবাসী হইলাম। তোমরা দেশে চলিয়া যাও, চিত্ত দমন ত অনেক দিন করিয়াছি, তবুও এ লঘু পাপে গুরুদণ্ড কেন রঞ্জাবতী!

রঞ্জা। আমি কাশী থাকিলাম ; তোমার উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই।

শিব। নিঃসন্দেহে দেশে ফিরিয়া যাও ; কিন্তু মনে মনে একবার ভাবিয়া দেখিও, তোমার কি চিত্ত সংযম করিবার ক্ষমতা আছে ? তুমি কি ভালবাসার কাঙ্গাল নও ? দেখ দেখি, ভালবাসিয়া কি যাতনা ভোগ করিতেছ, তবু ভালবাসা ফিরিয়া লইতে পারিলে কই! জানি না, এ যুদ্ধে জয় পরাজয় কাহার ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গাবতী বাটী আসিয়াছে। কয়েক মাস চলিয়া গেল, শিবনাথের আর কোন সংবাদ পাইল না। গ্রীষ্মকালে ইছামতী নদীর তীরে বড় কলেরা মারীভয় হইয়া থাকে। হঠাৎ হরিশচন্দ্রপুরে কলেরা বাড়িয়া উঠিল, অনেক লোক মারা গেল, শিবনাথের জননীও কলেরায় মারা পড়িলেন।

শিবনাথকে বারম্বার সংবাদ দেওয়া গেল, শিবনাথ দেশে ফিরিল না। রঙ্গাবতী বালবিধবা, সংসার সম্বন্ধে তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। সে শিবনাথের পুত্রটী উপলক্ষ্য করিয়া নিজের বাড়ী ও শিবনাথের বাড়ী সুব্যবস্থায় চালাইতে লাগিল। রঙ্গার গ্রাম্য সম্পর্কে দাদামহাশয় তাঁহার পুত্রের কন্যার সহিত শিবনাথের পুত্রের বিবাহ দিবেন বলিয়া, অনেক সময় আসিয়া রঙ্গার সহিত আবদালি করিয়া সৎপরামর্শ দিয়া যাইতেন। বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিল, শিবনাথের কোন খবর নাই, রঙ্গাবতী দিন দিন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আবার মাঘ পড়িয়াছে, মাঘ আসিলে রঙ্গার প্রাণটা যেন কোন এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে। এই মাঘ মাসেই যেন প্রতিবৎসর ভগবান রঙ্গার জন্য একটী একটী নূতন দুঃখের সম্ভার সৃষ্টি করিয়া রাখেন, তাই মাঘ মাস আসিলে রঙ্গার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে! এই মাঘ মাসের শেষেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, আবার মাঘ মাসেই রঙ্গা বিধবা হয়, মাঘী-পূর্ণিমার মেঘাবৃত ঝুপ ঝুপ বর্ষায় শিবনাথ রঙ্গার প্রাণে বিষাদের রেখাপাত করিয়াছিল, আবার এই মাঘীপূর্ণিমার মুক্ত আকাশে হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে বারাণসী ক্ষেত্রে বরুণার তীরে রঙ্গা শিবনাথকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনবাস দিয়া আসিয়াছিল! বৎসরের পর আবার সেই রঙ্গার কাল মাঘী-পূর্ণিমা আসিতেছে। ভগবান জানেন, রঙ্গার কপালে আবার কি আছে?

মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, একদিন রঙ্গার দাদামহাশয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম আসিল—"শিবধ্যান ব্রহ্মচারী সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, তিনি একবার স্বীয় পুত্র ও রঙ্গাবতীকে দেখিতে চাহেন, বিলম্বে প্রাণহানির সম্ভাবনা। শ্রীবিজ্ঞানন্দপুরী, কাশী অনন্তকুণ্ড যোগাশ্রম।" সেই দিনই রঙ্গা দাদামহাশয়ের সঙ্গে শিবনাথের পুত্রকে লইয়া কাশী-যাত্রা করিল।

মাঘ মাসের পূর্ণিমা। ব্যাসকাশীর তালগাছগুলির পার্শ্ব হইতে সোণার থালার মতন পূর্ণিমার চাঁদটী ডগমগ করিতে করিতে উঠিয়া আগেই গঙ্গার বুকে আসিয়া মুখ দেখিতেছে। গঙ্গার মৃদুল তরঙ্গ-হিল্লোলে রাঙা চাঁদখানি শতচন্দ্রে ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। দশাশ্বমেধের সুবিস্তৃত পাথরের রাস্তাটী যেন চাঁদের কিরণ বুকে ধরিবার জন্য নীরবে বক্ষ পাতিয়া শুইয়া আছে, আর তাহার উপর দিয়া ডাণ্ডা ঘাড়ে শিখাধারী হিন্দুস্থানীদিগের নাল-মারা নাগরা জুতা খড়াত্‌ খড়াত্‌ করিয়া অবিরাম চলিতেছে; কত শত শত বিধবা ঘটী ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া বাবার মাথায় দিবার জন্য ধুলাপায়ে দশাশ্বমেধের ঘাটের রাস্তা বাহিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে ছুটিতেছে। "হর হর বিশ্বেশ্বর" "বম বাবা বিশ্বনাথ"—রবে কাশী বিদীর্ণ হইতেছে। বাল বৃদ্ধ যুবা সকলেরই মুখে—সকলেরই প্রাণে বিশ্বনাথ ভিন্ন আর কিছু নাই, এমন সময় দারুণ নিরাশা বক্ষে লইয়া রঙ্গাবতী পুসপুস হইতে দশাশ্বমেধ ঘাটে নামিল। পাশেই অগস্ত্যকুণ্ড, সম্মুখে যোগাশ্রম। এইখানেই শিবনাথ আছেন, শিবনাথের নাম হইয়াছে—শিবধ্যান ব্রহ্মচারী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কা'ল রঙ্গার সেই কাল মাঘীপূর্ণিমার স্নান। কাশীতে অত্যন্ত যাত্রী-সমাগম হইয়াছে। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত। রঙ্গার মনে হইতেছে, তাহারা যেন সকলেই তাহার কথা আলোচনা করিতেছে, আর একবাক্যে বলিতেছে,—হায় হায়! রঙ্গা একি করিলে? আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে, রঙ্গার মনে হইতেছে—চাঁদ যেন ঘৃণার হাসি হাসিয়া বিষাদমুখে বলিতেছে, ছিঃ! রঙ্গা, করিলে কি? তোমারই ত দোষ! মাঘ মাসে হিমেল হাওয়া বহিতেছে, রঙ্গার মনে হইতেছে, বাতাস যেন শিহরিয়া বলিয়া গেল, হায়! হায়! রঙ্গা কি করিতে কি হইল!

তুমিই যে মারিয়া ফেলিলে?

শিবধ্যানের মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই রঙ্গার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, শিবধ্যান চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল, রঙ্গা আসিয়াছে। তখন

জড়িতকণ্ঠে বলিল, মা রঙ্গাবতী, বড় বিলম্বে আসিয়াছেন, -অনেক বলিবার ছিল, আর পারিলাম না, জিহ্বা অবশ হইয়া আসিতেছে! আপনি কে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতে আর 'কিন্তু' নাই -- জননী! অই দেখুন, আমার জননীর উপরে আপনার স্থান হইয়াছে, অই দেখুন মা, আপনি দেখিতে পাইতেছেন না, আমি আপনি কে,—বেশ দেখিতেছি! অই উর্দ্ধে, কত উর্দ্ধে, ক্ষীণশরীরী পুষ্পমালাসুশোভিতা, মা আমাকে ক্ষমা করুন, মস্তকে চরণ-ধূলি দিন; আর থাকিতে পারিতেছি না, -মরণের জ্বালা বড় জ্বালা!

রঙ্গাবতী শিবনাথের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়াছিল, যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর আদেশে শিবধ্যানের মস্তকে পদরজঃ স্পর্শ করাইল। শিবনাথ জল চাহিল, রঙ্গা তাহার মুখে জল দিল। জল পান করিয়া শিবনাথ পুনরায় বলিতে লাগিল,অই দেখুন,—আমার জননী আমাকে ডাকিতেছেন,আর আপনি তাঁহার উপরে বসিয়া আছেন। আপনার নিকট কতশত পুত্র ঘুরিয়া বেড়া-ইতেছে, আমার মার নিকট আমি একাই আছি! মা, আপনি একা আমার মা নহেন, অই দেখুন—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই আপনাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে! অই দেখুন, আমি মা বলিতেছি, আবার আমার পুত্রও মা বলিতেছে! আপনি বিশ্ব-জননী,—জগন্মাতা, প্রকৃতি দেবী বরাভয়-দায়িনী! মা আমাকে ক্ষমা করুন। রঙ্গাবতী বলিল—শিবনাথ কি বলিতেছ, পিপাসা পাইয়াছে এই জল খাও, এখনি সারিয়া যাইবে ভয় কি? শিবনাথ প্রলাপ ছাড়িল, চক্ষু মেলিল! রঙ্গার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, রঙ্গাবতী মা আমার, হিন্দু-বিধবা মা আমার, একবার তোমার ব্রাহ্ম সন্তানকে ক্ষমা কর। রঙ্গা বলিল, বৎস শিবনাথ, চিরদিনই তোমাকে ক্ষমা করিয়া আসি-য়াছি, এখনও তোমাকে এই বিশ্বনাথ সাক্ষী করিয়া ক্ষমা করিতেছি! তোমার কোন পাপ হয় নাই! শিবনাথ বলিল, রঙ্গাবতী, আমার হেমেন্দ্র থাকিল, আপনাকে দিয়া গেলাম, -ওঃ! আর পারিলাম না! আমার বুক যে থামিতেছে, জিহ্বা আর-উঃ—আমি চলিলাম। শিবনাথ চলিয়া গেল। রঙ্গাবতী বসিয়া রহিল—রঙ্গার ভালবাসার সামান্য একটু দহ পড়িয়াছিল বলিয়া সে যাতনায় অস্থির হইয়াছিল; এখন সেই দহ অকূল পাথার করিয়া তাহার শিবনাথ আমাদের শিবধ্যান ব্রহ্মচারী চলিয়া গেল। এখন প্রণয়ের অকূল পাথারে পড়িয়া রঙ্গাবতী কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা ভগবান জানেন। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।

আমরা আর রঙ্গাবতীকে লইয়া মাথা বকাইতে পারিব না। উপসংহারে এইটুকু বলিতে হইতেছে, ডিহি চন্দনপুরের অন্তর্গত মৌজা হরিশচন্দ্রপুরের প্রাচীন কাগজ পত্র জমীদারদিগের সেরেস্তায় যাহা আছে, তাহাতে রঙ্গা ঠাকুরাণীর বটগাছ, রঙ্গাদীঘির নাম পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে হেমেন্দ্রবাবুর পৌত্রাদি যে রাঙাঠাকরুণ চক ও রাঙাঠাকরুণ দীঘি ভোগ দখল করিতেছে, তাহাই যে আমাদের রঙ্গাবতীর সম্পত্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রঙ্গাবতী তাহার সমস্ত সম্পত্তি হেমেন্দ্রকে দিয়া গিয়াছিল। রঙ্গাঠাকুরাণী হইতে একালে রাঙা ঠাক্রুণ কথাটী দাঁড়াইয়াছে। রাঙা ঠাক্রুণের বটগাছটী আজো মাঠের মধ্যে বসিয়া অতীত কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গ্রীষ্মকালে রাখাল বালকগণ গরুর পাল আনিয়া সেই গাছতলায় বিশ্রাম করে।

একদিন বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে রাঙা বটতলায় বসিয়া একজন পথিক গান গাহিতেছিল—

"একদিন হায় এমন হবে এ-মুখে আর বলবে না,
এচরণে চল্‌বে নাক, এ-হাতে আর ধরবে না;
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ সঙ্গে কিছু যাবে না,
ও মন এই বেলা ডাক্ ডেকেনেরে ডাক্‌তে সময় আর পাবে না।

যে ভালবাসায়, যে মমতায় পড়িয়া সংসার-সমুদ্রে রঙ্গাবতী অবিরাম যুদ্ধ করিয়া গিয়াছে, তাহার কথা কেউ আর মুখে আনে না। সংসারে কিছুই থাকে না, থাকে কেবল সৎকীর্ত্তির নমুনাস্বরূপ অক্ষয় চিহ্ন, আর সেই চিহ্ন দেখিয়া পরবর্ত্তী সমাজে কর্ম্মকর্ত্তার গুণ-কীর্ত্তন।

রঙ্গাবতীর সঙ্গে তাহার সমস্তই চলিয়া গিয়াছে আছে কেবল রাঙা ঠাক্রুণের দীঘি আর সেই দীঘির ঘাটে গ্রাম্য-বধূগণের হাস্যরসমুখর অবগাহন! আর আছে রাঙা ঠাক্রুণের বটগাছ, সেই বটতলে রৌদ্রতপ্ত গোপ রাখালগণের কৃষ্ণ-গীতি, আর পথক্লান্ত পথিকের হৃদয়-স্পর্শী সকরুণ মর্ম্ম-গাঁথা! অনেক পথিক গাছতলা হইতে উঠিবার সময় আপনা আপনিই বলিয়া যায়, আহা! রাঙা ঠাকরুণ বুঝি জীবনে বড়ই অনুতাপ পাইয়াছিলেন, তাই বুঝি আতপতপ্ত জীবগণের সান্ত্বনার জন্য লোকালয়-বহির্ভূত নির্জ্জন, আশ্রয়হীন প্রান্তরে এই দীঘি ও বটবৃক্ষ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা একবার গ্রীষ্মকালে শীকারে বহির্গত হইয়া ঠাকরুণ-তলায় আশ্রয়

লইয়াছিলাম ; বৃক্ষতলে একটী প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, কবে কে এই পাথর আনিয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না ; গ্রামের যুবকবৃন্দ রথপর্ব্ব উপলক্ষ্যে পাথর টানাটানি করিয়া বল পরীক্ষা করিয়া থাকে। প্রবাদ,—রঙ্গা ঠাকরুণ নাকি কখন কখন বসন্তের ফুল্ল-সন্ধ্যায় আসিয়া তাহার আদরের বট-তলে এই উপল-খণ্ডের উপর অনেকক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। আমরা পাথরের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে দেখিয়াছিলাম, এক স্থানে লেখা আছে—

"আজো ভোরে কেঁদে উঠি ভাবি স্বপ্ন-ঘোরে,
সে কেমন ভালবাসা বেসেছিল মোরে।"

বলিতে পারি না এ হস্তলিপি কাহার। ইহা আধুনিক কি পুরাতন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রঙ্গাবতীরই অনুরূপ কেহ যাতনা ভোগ করিয়া ওই রঙ্গাবতীর স্মৃতির উপর তাহার হৃদয়ের ব্যথা ঢালিয়া রাখিয়া গিয়াছে কি না, তাহা ভগবান্ জানেন।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বাহার।

তুন-কি-অম্বর লহু মেহদল
সুরঙ্গ-সাজে সোহায়ল—রে,
উজোরি দশদিশ উয়ল সূরজ
বিলায়ত হেম করজাল—রে।

ইন্দিবর বা সুমন্দ কলয়িছে,
মাধব মহীপর আওল,
হরখিত হাসত বিকচ পুহপ
বিল্লি কেশর যুথী জাতকী—রে।

অমুয়া—মঞ্জরি বাস বিলায়ত
আন্ধিয়ার হোই সারঙ্গ বুলে
তুরন্ত ধায়ই মনা ন মানত
মিঠি পিবয়িতে ধাওয়ল—রে।

শাখ উপর বসি হরখে কোয়েলা
ফুকরত পঞ্চম তানে
থির থির দুলহ সুছন্দ লতাকুল
নিকুঞ্জ-বন-ভবন-ক—রে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিদ্যার্ণব।

অক্রূর সংবাদ।

(গল্প)

১

একটা কথা আছে "যাহারা কুণো লোক" অর্থাৎ যাহারা ঘরে বসিয়া ভাবের চর্চ্চা করে, তাহারা আর যাই হোক,সংসারের সহিত যে তাল বাঁচাইয়া চলিতে পারে না, একথাটা ঠিক ; এ বিষয়ে আমাদের হাল কবি কুঞ্জলাল তাহার পূরা প্রমাণ দিল।

নেহাইৎ আপনার লোক, কাকা অক্রুর-রমণ আসিয়া যখন কহিলেন, "ওরে কুঞ্জলাল, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যটা আর দিস্‌নে, যদি নিতান্তই দিতে হয়, তবে দুটো মিথ্যে কথা না হয় ব'ল্‌লি ক্ষতি কি ? আমি ত তোর কাকা বটে, আজ না হয় পৃথক্ হয়েছি।"

কুঞ্জলাল যোড় হাত করিয়া কহিল—মাপ কর্ব্বেন কাকা ! আদালত ধর্ম্ম স্থান, সেখানে দাঁড়িয়ে, হলপ ক'রে যে মিথ্যে কথা, তা কিছুতেই ব'লতে পারবো না, যা জানি তাই ব'লবো।

অক্রূর বাবু প্রমাদ গণিলেন। আপনার দীর্ঘটিকি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, যা জানিস্ তাই ব'ললেই যে গোল, হাঁরে—তার চেয়ে সাক্ষ্য দেব না বলাটাই ঠিক নয় কি ?

কোন উপায়েই কিন্তু কুঞ্জলালকে সত্য-পথ হইতে হঠানো দুঃসাধ্য হইল। একটু আত্মীয়তার খাতিরও সে রাখিল না।

এখন কথাটা হইতেছিল এই—অক্রূর বাবু সম্প্রতি নীলামে একটা পুকুর কিনিয়াছিলেন, পুকুরটী ছিল ছেঁচের অর্থাৎ তার জলে গরীব চাষীরা তরীটা তরকারীটা ফলটা মাকরটা করিয়া খাইত।

পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক পুকুর থাকে, পুকুরটীর স্বামী একজন, কিন্তু তার মাছ রাখা জল বাদ বাকি জলের স্বামী গ্রামের কৃষক-সাধারণ।

কিন্তু অক্রূর বাবুর ইচ্ছা, জোর করিয়া পুকুরটীর ছেঁচ বন্ধ করিয়া, তাহার জলে মৎস্যকুলের বৃদ্ধি করিয়া প্রতিদিনকার অন্নগুলি উদরস্থ করিয়া লইবার পক্ষে নিজের ও বংশাবলীর একটা সুযোগ রাখিয়া যান।

গ্রামের লোক তাহা শুনিবে কেন ? ইষ্টি অনুকূল যাহারা চাষী ছিল, তাহারা বাধা দিয়া মকর্দ্দমা বাধাইল। এবং অক্রুরেরই ভাইপো কুঞ্জলালকে

সাক্ষী মানিয়া আদালতে শমনজারীর প্রার্থনা করিল—কাজেই এহেন কুঞ্জলাল যখন বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াসী, তখন তাহাকে লইয়া কাকাকে অনেকখানি ভাবনায় পড়িতে হইল বৈ কি! কিন্তু কুঞ্জলাল—সে যে কি সত্যের আলোক পাইয়াছিল, কাকা অক্রূরের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে "সত্য বই মিথ্যা বলিব না" এটা বেশ ভাল করিরাই জানাইয়া দিল।

কাজেই মকর্দ্দমার রায়ের দিন যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। হাকিম কুঞ্জলাল ও আর পাঁচজনের কথাই সত্য মানিয়া গ্রামবাসীদের পক্ষেই ছেঁচ বাহাল রাখিয়া রায় দিলেন। আর রায়টা এমন ভাবে প্রকাশিত হইল—হাইকোর্টে মোশনের সে সুযোগটীও নষ্ট হইয়া গেল।

কাজেই অক্রূর বাবুর পক্ষে কুঞ্জলালের দুষমন চেহারাটি ছাড়া আর কিছুই রহিল না।

কিন্তু কুঞ্জলাল পথে একদিন মিনতি করিয়া কাকাকে কহিল—"দেখুন কাকা, যা সত্যি তাই বলেছি, আর গরীব চাষী, তাদের কথাটাও ত আপনার ভাবা উচিত ছিল! আপনি হ'লেন গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি, আপনি যদি ছেঁচ দেব না ব'লে কোমর বেঁধে দাঁড়ান, তা হ'লে তারাই বা দাঁড়ায় কোথা, আর আমরাই বা আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ পড়ে মিথ্যে বলি কোন্ মুখে?

অক্রূর বাবু মুখে একটা পরম নির্ব্বিকারত্বের চিহ্ন আঁকিয়া শিখাটা আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, বেশ ক'রেছো বাবা, উপযুক্ত ভাইপোরই কাজ ক'রেছো। আমার কিচ্ছু দুঃখ হয় নাই।

কুঞ্জলাল বুঝিল, মুখে তাঁহার এটা নির্ব্বিকারত্বের একটা ভূমিকা মাত্র—ভিতরে যে অনেক খানি সয়তানী মতলব উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্নেহহীন অকরুণ আঁখি দুটীই ধরাইয়া দেয়।

তবু সে দমিল না, কহিল—যা ন্যায়, যা সত্য—তারই পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। স্বার্থের দিকে চাহিয়া মিথ্যাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিভাষণ করি নাই। আপনার ভাবের রাজ্যেও এ সম্বন্ধে অনেকখানি কবিত্বও ছড়াইয়া গেল, লিখিল—

"প্রহ্লাদ সে সত্য শিশুটীরে ফেল্লে যখন জলে
ডুবলো না সে নাচলো কমল দলে"*
ইত্যাদি— ইত্যাদি—

* "কিন্তু কবিতায় প্রথম দুই ছত্র কবি কালিদাস রায় হইতে ধার করা—

২

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বাহির সংসারে যখন কুঞ্জলালের প্রভাব গজাইয়া উঠিয়াছে, এবং নিজেও কবিতা ও কাব্য লইয়া ভোর হইয়া আছে, তখন একদিন সয়তান সশরীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার চক্ষে দেখা দিল,—কাকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। মধ্যপ্রদেশে দাদা মুকুন্দলাল চাকরী করিতেন, সেখান হইতে পত্র আসিল। দাদা লিখিয়াছেন—

"শুনিলাম, তুমি গোপনে গোলা হইতে ধান বেচিতেছ, প্রজাদের খাজনা লুঠিতেছ; সংসারের কোন কর্ম্মই দেখ না। যাই হোক, শীঘ্রই ইহার বন্দোবস্ত হইবে।"

কুঞ্জলালের আর বুঝিতে বাকি রহিল না—যে, এ কীর্ত্তি তাহার অক্রুর কাকারই।

কিন্তু কাকার কাছে যাইয়া কি অনুযোগ করিবে? তিনিত আর কাঁচা খেলোয়ার নহেন, পাঁচ চাল ভাবিয়া তবে কিস্তী দিয়াছেন!

বড় বৌ মানদা সুন্দরীর কাছে আসিয়া কহিল,—(তিনি তখন ছেলেদের লইয়া দেশেই ছিলেন) "আচ্ছা বৌঠান, তুমি কি আমার নামে কখনও কিছু শুনেছ? আমি গোপনে গোলা হইতে ধান বেচি, খাজনার টাকা আদায় করি—নিজের খরচের জন্য?

মানদা সুন্দরীর কাণ আগে হইতেই ভার হইয়া ছিল—পুষ্করিণীর ঘাটে, অক্রুর কাকার বাড়ীতে যত শুনিতে হয়, শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা অকথ্য, যাহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য, চাষা-বাড়ীর মেয়েদের প্রতি খর নজর রাখা (যাহা-দের জন্যই সে কাকার বিরুদ্ধে লড়িয়াছে), এমন সকল অসম্ভব কথাও মানদা কাকীর কাছ হইতে শুনিয়া রাখিয়াছিলেন।

তবে খানিকটা চক্ষু-লজ্জা, খানিকটা মানুষকে চিনিবার যো নাই বলিয়া ঘৃণায় সবটা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ওঠা হয় নাই। কিন্তু আপনা হইতেই কুঞ্জলাল যখন কথাটা পাড়িল, তখন ছাড়িবেন কেন?

মুখটা বাঁকাইয়া কহিলেন,—লোকে কাণাকাণি ত অনেক দিন হ'তেই ক'চ্চে, ধান ত বেচো, গোমস্তার কাছ হ'তে খাজনার টাকাও নাও জানি, তা সংসার খরচের জন্য কি নিজের খরচের জন্য, তা আমি মেয়ে মানুষ কেমন ক'রে ব'লবো? কুঞ্জলালের হৃদয়টা মহাশূন্যের মত সম্পূর্ণ নিস্তাপ ও স্তব্ধ হইয়া আসিল।

খানিক সেই ভাবে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে কহিল—তারজন্য কি এসব বিষয় নিয়ে দাদাকে কখনও পত্র লেখা হয়েছিল? মানদা তখন কড়াইয়ে দুধ চাপাইয়া জ্বাল দিতেছিলেন, একটা তীব্র ঝাঁঝের সুরে কহিলেন, কি পত্র লেখা? পত্র লিখতে কি জন্য যাবো? আমি কি ঘর ভাঙতে ব'সেছি নাকি! তাই বিনিয়ে বিনিয়ে খুঁটি নাটীর খবর লিখে পাঠাবো? যার সংসার, যার ভাই, সেই এসে সব বুঝবে।

প্রেম, মৈত্রী, সখ্যের কবিতাগুলা আজ যেন তাহাকে চাবুক মারিতে লাগিল।

এই নারীকেই না সে একদিন কল্পনার সুমহান্ লক্ষ্যে রাখিয়া, মায়ের দিক হইতে,—ভগ্নীর দিক হইতে, ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি গাঁথিয়া উপহার দিয়াছিল।

বেচারা কুঞ্জলাল জানিত না যে, সংসারটী তাহারই মত কয়েকটী নিরীহ প্রাণীর দ্বারা চালিত নহে, তাহার মধ্যে কত প্রলুব্ধ সয়তান সৃষ্টির বিরাট সৌন্দর্য্য-খণ্ডগুলির পানে শ্যেন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

বেদনায় বুকটা বড় মর্ মর্ করিয়া উঠিল! কিন্তু কোন উপায় নাই, স্বয়ং ঈশ্বরই যখন হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন।

দাদা মুকুন্দলাল বাড়ী আসিয়াই কুঞ্জলালের কাছ হইতে সমস্ত হিসাব পত্রের তলব করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যদি চ কিছু গলদ বাহিরিল না, তথাপি মনের খট্‌কা কিছুতে গেল না। কাকা অক্রুর রমণ স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে, তিনি প্রমাণ দিতে পারেন। তবে দুই-ই ভাইপো, সেটী কর্ত্তব্য নহে বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছেন মাত্র। ইহার পরে কুঞ্জলালের সম্বন্ধে আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে?

তাহার উপর রাত্রিকালে স্ত্রীর অনুযোগও নিষ্ফল যাইল না! কুঞ্জলালের চরিত্রের কথা, ঘুমের কথা, কাকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা, অবশেষে একদিন কেমন করিয়া অতি তুচ্ছ কিছু মিষ্টান্নের জন্য পুত্র ভবানন্দকে কাঁদাইয়া সবটাই নিজের স্ত্রীর জন্য রাখিয়াছিল, তাহা শুদ্ধ বলিতে বাদ পড়িল না!

মুকুন্দলাল অন্তরে অন্তরে যদিও এই সমস্ত অল্পশিক্ষিত স্ত্রী-সমাজের উপর আদৌ আস্থাবান ছিলেন না, তথাপি উপস্থিত ব্যাপারে স্ত্রীর কথাগুলিকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইতেও পারিলেন না, ভাবিলেন সংসারে অসম্ভবই বা কি আছে!

তাঁহার হৃদয়ও গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পৃথক্ হওয়ার যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ রহিল না।

শীঘ্রই শুভ সংবাদ গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বড় বউয়ের পক্ষীয়েরা, যেমন ক্ষান্তর মা, নতুন বৌ, মেজো গিন্নী ইত্যাদি আসিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত কহিল, শুনে বড় সুখী হনু বড়বউ, তোমার আর গতর জাল করে পরের জন্য খেটে মরতে হবে না, কর্ত্তাকেও আর নিজের রোজগারের টাকাগুলির আর একজনাকে সমান অংশ ভাগ দিতে হবে না! তোমাদের এত রোজগার, ভাবনা কি?

কাকীমা আসিয়া কহিলেন, বল যে ওদের কাকা বেঁচে থাকুন, একা দিগ্বিজয়ী কাকা হতেই সব দিক জল জলাট হয়ে উঠবে।—বলিয়া একটা কটাক্ষের সহিত ছোট বউ প্রমোদার ঘরের দিকে তাকাইলেন।

মানদা সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিয়া অন্তরের সহিত কাকীমার কথায় সায় দিয়া গেল। অত্যন্ত বিনয় করিয়া কহিল, তোমরাই বলো বাছা আমাদের কি কোন দোষ আছে? মানুষে আর কত সইতে পারে? নইলে বলবে যে, তাঁর ভেয়ের উপরে কোন অটান আছে তাও নয়। ছেলে পিলে হয়েছে, লোকসানও ত আর সওয়া যায় না! আগে যা করেছ তা করেছ বাপু, বই লিখেছ আর ঘুমিয়েছ, তাতে কেউ কিছু বলেছে?

সকল কথাই কুঞ্জলালের কর্ণে প্রবেশ করে, শুধু দাহে কিছু বলে না, নীরবে একটা চরম পরিণামের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

প্রমোদা একদিন কাঁদিয়া কহিল, দেখ তুমি তোমার দাদার পায়ে ধরে বল যে, পৃথকে কাজ নাই! তুমি বই টই নিয়ে থাকো, কেমন করে সংসার চালাতে হয় জান না,—তা পার্ব্বেও না।

কুঞ্জলালের অন্তরেও দিবারাত্র এই কথারই প্রতিধ্বনি ছুটিতেছিল। সে যে সংসারের কিছুই জানে না, সে কথাটা সে নিজে এবং আশে পাশের পাঁচজন বেশ করিয়াই বুঝাইয়াছিল, কিন্তু হইলে কি হয়? সে যে পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছে, পুরুষের পুরুষত্ব ত 'না'র দিকে নয়, তার গতিই যে 'হাঁ'র দিকে! সে পৌরুষ-হীন হইয়া শুধু কবিত্ব পাইয়া থাকিবে, সেই বা কেমন কথা? গর্জ্জিয়া স্ত্রীকে কহিল, এতদূর অক্ষম বলে আমায় ভেবো না, ক্ষমা চাইতে হয় তুমি দাদার কাছে ক্ষমা চাও, আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই, দাদা ভাইকে

ত্যাগ করিতে পারে, আর অক্ষম ভাই বুঝি কিছু পারে না? না হয় তার দিন যাবে সুখে, তিনি রোজগার করিতে পারেন বলে, আর আমার দিন যাবে দুঃখে, তা আমি গ্রাহ্যই করি না; "সুখ আর দুঃখ ভগবানের একই নিয়মের দুই দিক মাত্র।"

মুকুন্দলালও প্রথমটা মনে করিয়াছিলেন, এই যে পৃথকের প্রস্তাব তুলিতেছি, ইহাতে কুঞ্জলাল নিশ্চয়ই আসিয়া দাদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া লইবে! অন্ততঃ একবারও আসিয়া বলিবে, "দাদা আমার অপরাধ কি?" কিন্তু দেখা যাইতে লাগিল, তাহারও এই পৃথক্ হওয়া ব্যাপারে যেন সম্পূর্ণ অভিমত রহিয়াছে, একটা কথার প্রতিবাদ করিতেছে না, অথচ গম্ভীর ভাবে সমস্ত আরোপিত অভিযোগ মাথায় করিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে, ব্যাপার খানা কি?

মানুষকে ত চিনিবার যো নাই। যে কুঞ্জলালকে এত ভাল বলা যাইত, ছেলে বেলা হইতে যাহার দাদার উপরে অসীম ভক্তি ছিল, জীবন মধ্যাহ্নে একটু সুযোগ পাইয়া সেই দাদার সহিত সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে? "দুত্তোরে" বলিয়া মুকুন্দলাল বন্ধু বান্ধবদের এই পৃথক্ হওয়া ব্যাপারে উপস্থিত হইতে পত্র লিখিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রামের ভদ্রবর্গ উকীল ও অক্রূরবাবু থাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি দুই ভা'য়ে বণ্টন করিয়া দিলেন।

অভিজ্ঞেরা কহিলেন, "চুল চেরা" ভাগ হইয়া গেল।

মুকুন্দলাল কহিলেন, কুঞ্জলাল দেখে নাও! বেশ তন্ন তন্ন করে বুঝে নাও, কোথাও তোমার কিছু আপত্তি আছে কি না?

কুঞ্জলাল অবিচলিত স্বরে কহিল, না দাদা কিছু না, আমার কিছু আপত্তি নাই।

অক্রুর হুকা টানিতে টানিতে পরম বিজ্ঞভাবে কহিল, হঁা বলা ভাল, দেখ কোথাও খুৎ টুৎ থাকে কি না। তখন শেষ কালে বলবে যে, আমি ছোট ছিলাম দশ জনে আমায় ঠকিয়েছে, সেটা বড় বদ্‌নামের কথা।

কুঞ্জলাল অক্রুর রমণের ভিতরে এক আর বাহিরে আর এক রকমের অভিসন্ধি বহুদিন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তবু সে নীরবে অনেক কথা সহিতেছিল, কিন্তু উপস্থিত একবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া উঠিল,—কাকা, আপনার আর কিছু না বল্লেই ভাল হয়। এযে পৃথক্ হওয়া গেল, সে ত



৮ ভুবনেশ্বরের মন্দির।

কেবল আপনা হতেই! আপনিই আর ভাইকে ভাই বলতে দিলেন না। আমি কি কিছু জানি নাই মনে করেছেন, সব জেনেছি সব বুঝেছি, কেবল বলতে বাধো ঠেকেছিল মাত্র; কিন্তু যতই করুন, হৃদয় ভাঙতে পার্ব্বেন না। বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় চোক দুটি জলে ভরিয়া আসিল।

অক্রূর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, এই ভাবে একটা পরম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া খানিক কুঞ্জলালের মুখের দিকে চাহিয়া তারপর জনান্তিকে কহিলেন, রাধে এ তোমার ইচ্ছা, নইলে যারই ভাল করতে যাই, সেই বলে কি না বদ! তা কথাতেই ত আছে—কলিকালে সব উল্টো! কুঞ্জলালের দিকে নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, হাঁ বাবা কুঞ্জলাল, এতদিন পরে এই ধারণাটাই তোমার হলো?

কুঞ্জলাল গম্ভীর স্বরে কহিল, হাঁ কাকা, সেই ধারণাই আমার খুব প্রবল! আমি স্পষ্টই যেন আপনার কাছ হতে শুনতে পাচ্ছি, আমায় শাসিয়ে বলছেন,—বেটা বড় স্পর্দ্ধায় উঠেছিলে,—আর আজ বড় স্পর্দ্ধায় নামিয়েছি।

ঠিক জায়গায় আঘাতটী পড়িয়া অক্রূর একবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে এমন কথা! যা বলিতে কেহই সাহস করে না, কুঞ্জলাল তাহাই বলিল! একটা দুঃসহ দাহে জ্বলিয়া উঠিয়া অক্রূর উঠিয়া পড়িলেন। পাঁচজনে অনেক করিয়া তাঁহাকে বসাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জেদাজেদিতে তাঁহার রোক যেন আরও বাড়িয়া গেল।

উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ বেটা কুঞ্জ, যদি এর কখনো শোধ নিতে পারি, তবেই আমি পুরুষ!

রাগের মোড়ায় হুকাটাকে খুব জোরে টানিতে টানিতে অঙ্গুলি-প্রবিষ্ট-মাত্র চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞেরা কুঞ্জলালকে বুঝাইল, কহিল, কাকার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও; নইলে তোমার জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ করার ফল ভোগ করতে হবে।

কুঞ্জলালের কি রকম রোক চাপিয়া গিয়াছিল, সে ঘাড় নাড়িয়া গম্ভী, স্বরে কহিল, উনি যা করতে পারেন তাই করবেন, তা'বলে কাক আর যিনিই হোন, সয়তানের পায়ে হাত বুলুতে পার্ব্বো না।

দাদা মুকুন্দলালও খানিক ভাবিয়া কহিলেন,—দেখ কুঞ্জ, করলে না, বুড় মানুষ ওঁকে চটানো ঠিক নয়।

কুঞ্জলাল কহিল, না দাদা, ঠিক কথাটাই বলা উচিত, মুখের উপরি জবাব না পেয়েই ত এত বেড়ে গেছে!

৩

পথে আসিতে আসিতে অক্রূর রমণ মতলবটা ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহারটা সমাপন করিয়া সেই দিনই তিন মাইলের পথ, রামচন্দ্রপুরের মধু মণ্ডলের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

অক্রূরের বিপদে তিনিই একমাত্র বিপত্তারণ মধুসূদন! মধু আগ্রহ ভরে সবটা শুনিয়া তারপর বিজ্ঞের মত ঘাড়টী নাড়িয়া কহিলেন, এতো তেমন বেশী কিছু না। আমায় একবার ক'লকাতা যেতে পারলেই হলো। তবে কুঞ্জের হাতের লেখাটী চাই।

অক্রূর চট্ করিয়া পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, আমাকেও তেমন কাঁচা লোক পাওনি, যখন নাচতে নেমেছি, তখন ঘোমটা দেওয়া অভ্যাস নয়, বলিয়া পত্রখানা সযত্নে মধুর হাতে দিয়া কহিলেন, এই নাও, এই কুঞ্জের হাতের লেখা! মধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার পত্রখানার উপরে চোক বুলাইয়া কহিলেন, এই এম্নিই ঠিক কুঞ্জলালের লেখা?

অক্রূর কহিলেন, হাঁ! তার ঘরের পেছনে ঢের অমন লেখা পাওয়া যায়, বাতাসে উড়তে থাকে, পাঁচালী টাচালী কি লেখে কিনা? সে যাই হোক ছাই ভস্ম, আমার তাতে কিছু যায় আসে না, আমার কাজটা হলেই হলো।

মধু কহিলেন, অবশ্যই হবে! এ'তো তেমন শক্ত কিছুই নয়। ভাগা-ভাগির কথাটীও সে সময় বাদ পড়িল না।

অক্রূর কহিলেন, বরাবর যা হয়ে থাকে, আধা-আধির বক্রা, জমী জায়-গার চৌহদ্দী টৌহদ্দীর ভার আমার রইল! আর বিষয় আশয় ক্রোক না করলেও চ'লবে। অস্থাবরেই টাকাটা আদায় হয়ে যাবে।

মধুও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, সমস্ত কাজ পাকা হইলে পত্র লিখিব।

বাড়ী আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরেক রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আকাশের চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলা রোজ যেমন জ্বলিতে থাকে, জ্বলিতেছিল। মানুষের সুখ দুঃখে, বেদনায়, চক্রান্তে কেহই কম্পিত হইও না।

ইমময়ী অক্রূরের কাছে জলের গাড়ুটী নামাইয়া দিয়া ভাল মানুষ-কহিলেন, তা হলে সুখবর বটে ত?

মহিমময়ী নিজে যদিও সুখবরের কোন ধারও ধারিতেন না, (কারণ অক্রুরের সমস্ত গুহ্য কথা স্ত্রীর কাছেও অপ্রকাশ রহিয়া যাইত), তথাপি স্বামীর মনটী লওয়াইবার জন্য কহিলেন, সুখবর বটে ত?

অক্রূর বিজয়ীর উদাত্ত সুরে কহিলেন, আমায় আবার কোন্ কাজে কবে বিফল হতে দেখ্‌লে? অক্রূর রমণ যার নাম, যার নামে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়! বলিতে বলিতে গায়ের জামাটী খুলিয়া ফেলিয়া মহিমময়ীর হাতে দিলেন। অতিরিক্ত ঘামে জামাটী একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল, মহিমময়ী সেটী উঠানের তারের উপর ঝুলাইয়া দিয়া আসিয়া কহিলেন, আমার বড্ড ত ভাবনা হচ্ছিল। বলি চারিদিকে শত্রু, গিয়েছ কখন একলাটী। ছোঁড়াটার খুদে বউটার আবার কথা কত? কখন বিকেল বেলায় ঘাটে বুঝি তোমার আর কুঞ্জের কথা উঠেছিল, তাতে কেমন হাত নাড়া দিয়ে বলা হয়েছে, আমার স্বামীর ত কোন দোষ ছিল না, কাকাই যত অনর্থের গোড়া! কাকা যেন তার বাপ ভাইয়ের গলায় ছুড়ি বসিয়েছে, পোড়ার মুখীদেরও জিব্বে এমনি?

অক্রূর পাকা গোঁপ জোড়াটী পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন, আমলো, তিনটে বৎসর সবুর করতে দাও, তারপর দেখে নেবে কার কদ্দূর ক্ষমতা! হেলে ধরতে পারেন না, কেউটের গর্ত্তে হাত দেবার সাধ! আচ্ছা।—

মহিমময়ীও সায়ে সায় দিয়া নিতান্ত পতিগত-প্রাণার মত হুকাটী কলিকাটী কাছে আনিয়া দিয়া কহিলেন, তাকি আমি বুঝি নাই? হ্যাঁগা? পরশের দশখানা গাঁয়ের লোক তোমার পরামর্শ নেয়, আর দস্যি ভাইপো কিনা হিংসেয় ফেটে মরে! তা যতই হিংসে কর অবাগীর ব্যাটারা, তোদের কাকার কাছে হার মানতেই হবে।

স্বামী স্ত্রী দুজনাকার মধ্যেই এমন একটা সংকল্প দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের জয়টা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে, তা সে যেমন করিয়া হউক। পাপ-চক্রান্ত অধর্ম্ম, কিছুতে পেছপাও নয়! লোকে যেন না বলে অক্রূরবাবু ভাইপোর কাছ হইতে মুখের উপর জবাব পাইয়া চুপ করিয়া আছে। জয় চাই, জয় চাই!

৪

অক্রূররমণ কখন যে কুঞ্জের সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিয়া আসিল, সে তাহার কোন খোঁজই লইল না, কি করিয়াই বা লইবে?

আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত যখন স্তব্ধ ছিল। সে যেমন কল্পনার ডানা দুটী মেলিয়া ভাবের রাজ্যে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের পর যে একটা ব্যথা তাহার প্রাণে জাগ্রত হইয়াছিল, সেটীও এই শূন্য মায়া লইয়া খেলা করিতে করিতে কখন যে কাটিয়া গেল, তাহা সে টেরই পাইল না। ভাবিয়া দেখিল, বুকের যেখানটী খালি হইয়া গিয়াছিল, আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের স্নেহধারা তাহার সে ক্ষত ভরাইয়া দিতেছে।

এতদিন যাহা পায় নাই, তাহাই পাইয়া ঈশ্বরের অপার মহিমার কাছে নত হইয়া গেল। দেখিল—প্রাণের সুরে ডাকিলে কেহ ত ইতস্ততঃ করে না। গ্রামের ইতর সাধারণ হইতে ভদ্র পর্য্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় তাহার বৈঠক খানায় আসিয়া আড্ডা লয়। কুণো ভাবটাও আর থাকিল না, দশজনাকার মধ্যে পড়িয়া তাহার হৃদয়টাও যেন দশের হইয়া গেল, দেখিল আর শুধু কবিতা দিয়া আপনাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। জীবনটার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে, ইহা যে দিন অনুভূত হইল, সেই দিনই সর্ব্বাগ্রে নিজের মজুত ধান্যের অর্দ্ধেক "ধর্ম্ম-গোলা" ভাণ্ডারে জমা দিল।

সকলেই কুঞ্জলালের ব্যবহারে খুসী, শুধু অক্রুরেরই হৃদয়ে শান্তি নাই। তাহার উপর সম্প্রতি ধর্ম্ম গোলাটী স্থাপিত হইয়া তাঁহার ব্যবসায়ে ঘোর মন্দা লাগিয়া গিয়াছিল, এটী কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না।

একদিন আত্মীয়তা করিয়া কোন লোকদ্বারা কুঞ্জলালকে বলিয়া পাঠা-লেন, এরকম ছোটলোকদের অত্যধিক "লাই" দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হচ্চে? অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে পাতের "কুকুর" যে মাথায় চড়ে বসবে, সেটা ভাবা ত উচিত!

কুঞ্জলালও অত্যন্ত বিনয় করিয়া উত্তর দিল। মানুষের কার্য্যই তাহাই,—মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা! স্বার্থের দিক চেয়ে হৃদয়টাকে খাটো করা ঠিক নয়।

অক্রুরবাবু আবার একদিন শুনিলেন, কুঞ্জলাল গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া মাঠের মধ্যে এক বড় পুকুর কাটাইবার প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার জলে অন্ততঃ হাজার বিঘা জমীর ধান্য বাঁচিয়া যাইবে।

অক্রুর হতাশ হইয়া কেবলই ঘন ঘন মধু মণ্ডলকে পত্র লিখিতে লাগি-লেন। মধুও যথাসময়ে পত্রের উত্তর দিতে লাগিল।

এক একদিন অক্রূরের এমনও ইচ্ছা হয়, যেন কুঞ্জলালকে ভস্মলোচন মন্ত্রে ভস্ম করিয়া দেন। কিন্তু দারুণ কলির বাজারে সে মন্ত্রও নাই, তেমন কামরূপ-ফেরৎ ওস্তাদও চক্ষে ঠেকে না! ভবিষ্যৎ সন্তানদের একটা কিছু করিয়া রাখিবার সে প্রয়াসটাতেও কুঞ্জ বাদ সাধিতেছে! এমন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদও সে জন্মিয়াছিল।

অবশেষে বৎসরের শেষে একদিন কাকী পুকুর ঘাটে হাত নাড়িয়া, পরম পুলকিত ভাবে, নবনির্ম্মিত নেকলেশটীকে যথাসম্ভব লোক-লোচন-বর্ত্তী করিয়া প্রকাশ করিলেন, কুঞ্জের আর বিলম্ব নাই, তার শেষ হয়ে এসেছে! মধু মণ্ডলের নামটাও বলিতে বাদ পড়িল না। কথাটা নানা আকারেই তারপর গ্রামের প্রবীণা নবীনাদের স্ত্রী-মুখ হইতে বিচিত্র ঘটায় উৎসারিত হইতে লাগিল।

কেহ বলিল, কুঞ্জলাল দশহাজার টাকা মধু মণ্ডলের কাছ হ'তে ধার নিয়েছে, কেহ কহিল পনের হাজার ইত্যাদি—। কুঞ্জলালের স্ত্রী প্রমোদার কর্ণেও কথাটা প্রবেশ করিল,—সে কিন্তু ভাল বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

স্বামীর কাছে কথাটার সত্যতা যাচাই করিবে মনে করিল! স্বামী কুঞ্জলাল তখন গ্রামের সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে কি রকম শিক্ষা প্রচলন করিলে ভাল হয়, সেই কথাটাই গাঢ় মনোনিবেশের সহিত চিন্তা করিতেছিল! এক-বার বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের বিবরণীটা পাঠ করিতেছিল, আবার জর্ম্ম-ণীর কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীটার কথাও ভাবিয়া দেখিতেছিল, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল "শোনো।"

কুঞ্জলাল বই হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল "বলো" বলিয়া বইএর পাত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

প্রমোদার বড় রাগ হইল! ভাবিল—এমন মানুষ! চারিদিকে নিজের এতবড় একটা বিপদের কথা রাষ্ট্র, ঘাড়ে সংক্রান্তি! তবু একটু চেতনা নাই! কেবল বই, আর বই লইয়াই আছে! কিছু না বলিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কুঞ্জলাল হাসিয়া প্রমোদার অঞ্চলটী চাপিয়া কহিল, চটে যাও কেন সুন্দরী—বইগুলি ত তোমার সতীন নয়!

প্রমোদা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না! ভাবিল, এমন সরল আপন-ভোলা লোকের সম্বন্ধেও কথা উত্থিত হয়?

স্নিগ্ধ পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, এ সব কি শুনছি! লোকে যে ব'লছে, দশহাজার টাকা তুমি কোথাকার মধু মণ্ডল না কার কাছে ধার ক'রেছো! কই, আমাকে ত একদিনও বল নাই!

কুঞ্জলাল একবারে আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—তুমি খেপ্‌লে নাকি? কি আবল তাবল বকছো, তার ঠিক নাই। কোথাকার কোন মধু মণ্ডল, কে বল্লে তোমায়?

প্রমোদা কহিল, কেন সবাই ত ব'লছে! ওই তোমার কাকীও বলে গেছে, লোকেও বলছে, তবে তুমি টাকা ধার করেছো এ নিশ্চয়! আমায় ব'লতে পার নাই তাই! টাকা না দিতে পার্লে সব নিলাম করে নেবে এমন পর্য্যন্ত যে শুনিলাম!

কুঞ্জলাল কহিল, আমার যা কিছু দেনা পাওনা, সে ত আর তোমার কাছে অবিদিত নাই। আমি সংসারের কিছু কি দেখি, সে তুমিই জানো; বলিয়া ভাবিতে লাগিল!—ভাবিতে ভাবিতে কহিল,—তুমি ত ভুল শুন নাই, আর কেউ কুঞ্জলাল হবে হয় ত!

প্রমোদা কহিল, না আমি বেশ শুনেছি, তোমারি নাম হচ্ছিল!

কুঞ্জলাল কহিল, তোমার কথা শুনে আমার যে মাথা ধরে গেল! দিনে ডাকাতি, এও কি সম্ভব হতে পারে? যতই কথাটাকে সে আমল দিতে চাহিতেছিল না, কথাটা কিন্তু ততই একটা সন্দেহের খুঁৎ লইয়া তাহাকে পাইয়া বসিতেছিল।

অবশেষে সজোরে কথাটার অমূলকত্ব প্রচার করিয়া স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিল, কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বন্ধু বিহারীকে খুব গোপনে সবটা খুলিয়া বলিয়া, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে বলিল।—বিহারী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাগল কিছুই না!—এটা রচা কথা মাত্র।

কুঞ্জলাল হাঁপ ছাড়িয়া কহিল, বাঁচা গেল! রচা কথা, তবুও আমার কত ভাবনা হচ্ছিল!—

৫

অনেক দিন পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ না পাইয়া কুঞ্জলাল নিশ্চিন্তে কবিতার পাতই ভরাইয়া যাইতেছিল—প্রেমের কবিতা লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে, কবিত্বের লক্ষ্য এখন ভাবের ইন্দ্রজালের দিকে ছিল না!—ভিতর

হইতে একটা উদ্দাম প্রেরণা তাহাকে আর এক জগতের বাণী প্রচার করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

কুঞ্জলাল সে রহস্য জগৎটাকে চিনিয়াছে, কিন্তু তাহার বার্ত্তা প্রকাশ করিবার সে সামর্থ্য তাহার সাধ্যে কুলাইয়া উঠিতেছিল না।

কি লিখিবে না লিখিবে ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় স্ত্রী প্রমোদা হঠাৎ একটা ঝড়ের মত, সেখানে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—ওগো কি সর্ব্বনাশ হলো গো! দেখে এসো, কারা এসেছে, সব নিলেম করবে! কার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলে? বলিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুঞ্জলালের এক মুহূর্ত্তে চিন্তার আবেগ কোথায় মিলাইয়া গেল!—তাড়াতাড়ি চটিটা পায়ে দিয়া বাহির হইবামাত্র দেখিল—সত্যই যে তাই! নাজির কনষ্টেবল ও পাইক গোমস্তায় বাড়ী ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।

কুঞ্জলালকে দেখিবামাত্র শীর্ণকায় মধু মণ্ডলের প্রৌঢ় গোমস্তাটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নাজিরকে বলিলেন,—ওই কুঞ্জবাবু, ওঁরই এই বাড়ী।

কুঞ্জলাল কাছে আসিয়া কহিল, ব্যাপার কি মশাই! গোমস্তাটী দাঁত খিচাইয়া কাংস্যকণ্ঠে কহিল!—ব্যাপার কি কিছু জানেন না?—উদোর? টাকা ধার করেছেন মনে নাই? এই পাঁচটী হাজার টাকা দিচ্চেন ত—দিচ্চেন, নইলে ঢোল বাজিয়ে বাড়ীর টিকটিকিটীও বাদ দেব না।

কুঞ্জলাল তাহার অসম্ভব রকম চাঞ্চল্য দেখিয়া ঘৃণাভরে নাজিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?

নাজির পরোয়ানা খুলিয়া দেখাইয়া কহিল, আপনার কুলুপ তালা বন্ধ করিলেও নিস্তার নাই। আমার কুলুপ ভেঙ্গে জিনিষ পত্র শীল কর্ব্বার হুকুম আছে।

কুঞ্জলাল পরোয়ানা পড়িয়া দেখিল—কলিকাতার আদালতেই নালিশটী রুজু হইয়াছিল, এবং গোপনেই কখন ডিক্রিজারি হইয়া একেবারে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা আসিয়াছে।

কুঞ্জলাল কহিল, কই মোকর্দ্দমা হ'য়েছিল—কখন্, তার শমন পর্য্যন্ত ত পাই নাই!

নাজির কহিল, শমন এসেছিল, অবশ্য ডিক্রিজারীর পরোয়ানা বেরিয়েছিল, আপনি গ্রাহ্য করে খোঁজ নেনিন। এখন টাকাটা দিয়ে দিন্!

কুঞ্জলাল কহিল—আমিই না হয় গ্রাহ্য ক'রলাম না। গ্রামের আর কেউ জানে?

গোমস্তা কহিল—জানে না? অক্রুর বাবুকে জিজ্ঞেসা করে আসুন দেখি?

কুঞ্জলাল বুঝিল—সয়তানের চক্রান্তেই এতটা হইয়াছে। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

গোমস্তাটী তীব্রস্বরে কহিল—কি ব'লছো মশাই, টাকা দেবে—না ঢোল বাজাতে বলবো? নাজিরের দিকে চাহিয়া কহিল, দেন মশাই, উনি আর কোন উত্তর দেবেন না। আপনি আপনার কাজ করুন। এই ঢুলে! বাজা না ঢোল,—লোকজন সব আসুক।

নাজির ভাল মানুষটীর মত তাহার মুসলমানসুলভ দীর্ঘ দাঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, মশাই কেলেঙ্কারীটাই কি ভাল? আপনারা মান্য গণ্য ব্যক্তি, এই সামান্য টাকাটা ফেলে দিন, উনি যখন নিশেনদারী করছেন, তখন আমাকে বাধ্য হয়েই সব শীল করতে হবে।

সকাল বেলায় কুঞ্জলালের হৃদয়ে যে শুভ্র সুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেটা অনেকক্ষণ হইল অন্তর্ধান হইয়াছিল। এখন শুধু এই ভীষণ মুহূর্ত্তে সৃষ্টির বিরাট ভণ্ডামিটার পানে চাহিয়া কেবল শিহরিয়া উঠিতেছিল। সংসার যে এতবড় সয়তানের লীলা-ভূমি হইতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই। উপস্থিত ব্যাপারে সে যে কি করিবে কি না করিবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এতদূর মিথ্যাকে সে কি করিয়া সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে? পায়ের নীচে হইতে পৃথিবী যেন ঘনতর বেগে সরিয়া যাইতে লাগিল।

কুঞ্জলাল দুইবার পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল। নাজির আবার জিজ্ঞাসিল—কি মশাই, তাহলে আপনি কিছু উত্তর দেবেন না? কেলেঙ্কারী-টাই আপনার ইচ্ছা?

কুঞ্জলালের যেমন মুখে আসিল—তেমনি কহিল,—টাকা ধার করি নাই যখন, তখন টাকা দেব কোত্থেকে? তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নাজির হাসিয়া কহিল, মশাই পাগল আপনি, টাকা ধার করেছেন না করে-ছেন, আদালত ত আর মিথ্যে ডিক্রি দেয় নাই! শুনলাম যে আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি, এসবের কিছুই বুঝেন না নাকি? ডিক্রি হয়েছে, অস্থাবর এসেছে,

এখন টাকাটা ত মিটিয়ে দেন, তারপর যা করতে হয় করবেন। আদালতও খোলা রয়েছে।

এমন সময় বিহারী ও গ্রামের আর কয়েকজন সেখানে প্রবেশ করিল।

তাহাদিগকে দেখিবামাত্র গোমস্তাটী তাড়াতাড়ি একবারে ঘাড় দোলাইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, শুনুন মশায়, আপনারাও ত ভদ্রলোক, এমন ছেলে মানুষী কোথাও দেখেছেন? বলেন আমি ত কিছু জানি না! বাবা, যাব না বল্লে কি যমে ছাড়ে? কলকাতায় বসে টাকা গুণে নিয়েছেন, আজ মনে নাই! কালের গতিকই এই যে, নেবার সময় নেব বেশ হাত পেতে, আর উপুড় হাত করতে হলেই যত গোল। ঢুলির দিকে চাহিয়া কহিল, নে ব্যাটা বাজা ঢোল! নাজিরকেও কহিল, আপনি আর বিলম্ব কচ্চেন কেন? শীল করুন, বুঝছেন ত উনি টাকা দেবেন না।

নাজির মহাশয় তখন 'আমার দোষ নাই' বলিয়া ঢোল বাজাইতে আদেশ দিলেন। এবং নিজের পকেট হইতে পরোয়ানা খানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঢোল বাজিতে লাগিল, আর সেটী বিনাশের উন্মাদ গর্জ্জনের মত গমকে গমকে, এক আকাশ হইতে আর এক আকাশে প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিতে লাগিল।

কুঞ্জলাল যুক্তি ও বিচার লইয়া যে একটা আপাতঃ আপোষ নিষ্পত্তির কল্পনাকে মনের মধ্যে অবলম্বন করিয়াছিল, এ রুদ্র নিনাদে আর তাহার তাল রাখিতে পারিল না। হৃদয়ে যাহা কিছু শান্ত সংযত ভাব ছিল, তাহাও নিবিড়তর হইয়া এই প্রলয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

বিহারী এ বিবাদে অক্রূরের কাছে পরামর্শ লইবার জন্য তাহার হাত ধরিল।

কুঞ্জলাল বিহারীর হাত ছিনাইয়া গুম হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ঢোলের শব্দে সে আর আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তাহার ভিতরটী যেন মরিয়া হইয়া বলিতেছিল, মরিতে হয় অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই মরিব। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীতে লোকে ভরিয়া গিয়াছে, গ্রামের প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কেহ মজা দেখিতে আসিয়াছে, কেহ বা একটু সহানুভূতি দেখাইতেও আসিয়াছে। সকলেই

আছে, নাই কেবল কাকা অক্রূর রমণ। কিন্তু কল্পনায় আজ তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি বেশ কল্পনা করিয়া লইতে পারা যায়। কাকীরও আজ কত আনন্দ! অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীগণও তাহাদের সে আনন্দে যোগ দিয়াছে। আজ তাহাদের শত্রু জালে পড়িয়াছে। কুঞ্জলালের চক্ষে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আলো নিবিয়া গিয়া প্রেত-লোকের ছায়ান্ধকার জাগিয়া উঠিল, কাণের কাছে শুনিতে লাগিল, তাহার ঘরের পাশ দিয়াই যেন প্রেতগুলা উন্মত্ত তাণ্ডবে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। এমন সময় প্রমোদা-কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ তাহাকে একেবারে পাগলের মত করিয়া তুলিল। নাজির ঘরের দ্রব্য শীল করিবার জন্য প্রবেশ করিতেছিল, প্রমোদা দোরবন্ধ করিতে গিয়া তাহাতে অক্ষম হইয়া কাঁদিয়া লুটাইতেছিল। কুঞ্জলাল পাগলের মত, নির্ব্বোধের মত তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, ঝাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, এ অন্যায়, এ অবিচার! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিহারীও অনেক বাধা দিয়া কুঞ্জলালকে আটকাইতে পারিল না। তখন একটা কোলাহলের মধ্য দিয়া সশস্ত্র পুলীশ ইনস্পেক্টার আসিয়া সব কোলাহলের অবসান করিয়া দিল।

দিব্য নিলাম হইতে লাগিল। কুঞ্জলালই শুধু নাজিরের উপর বল প্রয়োগের অপরাধে বাঁধা পড়িয়া থানার হাজত গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল।

* * * * * * *

সন্ধ্যা বেলায় অন্ধকার ঘরে যখন ভূমিশয্যা হইতে জাগিয়া উঠিল, তখন প্রথমটা ভাল করিয়া মনে করিতে পারিল না সে কোথায়! এমন সময় পাশের ঘরের কয়েদীদের শিকল ঝন্-ঝন্যায় প্রকৃত স্থানটা হৃদয়ঙ্গম হইল। মাথা ঘুরিয়া গেল, বুঝিল আজ সে জগতের দোষীর দলেই দাঁড়াইয়া।

সংসার আর প্রমোদার কথা চিন্তা করিতেও পারিল না। সে করুণ আর্ত্তনাদের মধ্যে ডুব দিতে তাহার মনটাও ভয়ে পিছাইয়া পড়িতেছিল। কুঞ্জলাল ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে খানিক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরের শীতল বাতাস আসিয়া তীরের মত তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। কুঞ্জলাল তাহা গ্রাহের মধ্যেই আনিল না, ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিতে চাহিল। কিন্তু অন্ধকার, সীমাহীন অন্ধকার তাহার দৃষ্টি রোধ করিয়া দাঁড়াইল! একটা নক্ষত্রের পর্য্যন্ত দীপ্তি চক্ষে ঠেকিল না। সারাদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পরও সে মেঘ কাটে নাই, অন্ধকারটা যেন জমাট হইয়া

ধরণী ও শূন্য এক করিয়া দিতেছিল, আর তাহারি মধ্য হইতে বিদ্যুতের এক একটা পাংশুল দীপ্তি আসন্ন-মৃত্যু জীবনের চপল হাসিটীর মত ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কুঞ্জলালের হৃদয়ের মধ্য হইতে আর একটী হৃদয় যেন বাহির হইয়া অনন্ত প্রসারিত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর সীমাহীন লোক-হীন পথ ধরিয়া অনন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়াই চলিতে লাগিল। যুগ-যুগান্ত ধরিয়াই যেন সে চলিতেছে। কোথায় তার ঠিকানা নাই, কি উদ্দেশ্যে তার জানা নাই, তবু চলিতেছে, এক জায়গায় না এক জায়গায় গিয়া তাহার "বুকের বোঝাটী" নামাইয়া রাখিতে পারিবে;—এই ভরসা।

সহসা সশব্দে গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল!—স্বপ্ন ভঙ্গে চাহিয়া দেখিল—হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোকে, ছায়ার মত দুটী প্রেতমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অতাল্প কালের মধ্যেই সে যেন মানুষের স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, ঘরের মধ্যে আসিল অক্রূর ও বিহারী!

কুঞ্জলাল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

অক্রূর কহিলেন,—বউমার কান্না সইতে না পেরে এলাম বাবা! সারা-দিন তিনি খান নাই! কেবলি কাঁদছেন।—উঠে এসো! দারোগাবাবুর কাছে জামিনে খালাস চেয়েছি।

কুঞ্জলাল বিহারীর মুখের দিকে চাহিল!—

বিহারী কহিল, বিস্মিত হবার কারণ নাই ভাই, এখন উঠে এসো?

অক্রূর কহিলেন,—জিনিষ পত্র যা নিলেম টিলেম হয়েছিল,—সে সব আমি ডেকে রেখেছি। টাকা দিলেই ফিরে পাবে!

কুঞ্জলাল আর কিছুই বলিল না, উঠিয়া বাহিরে আসিল। সে যে মনে করিয়াছিল—সরাসরি ঈশ্বরের আদালতে দাঁড়াইয়া, তাহার আর্জ্জি পেশ করিবে। অক্রূর তাহারও শেষ করিয়া আসিয়াছেন,—এখন শুধু টাকাটি দিলেই সব মিটিয়া যাইবে!—"হায়রে টাকা" তাহার বক্ষ-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহিরের হাহাকারের সঙ্গে মিশিয়া জগতজোড়া অনন্ত হাহাকারের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

বিয়োগ-বিধুর।

পরম সুহৃৎ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রের—

শোকোচ্ছ্বাস।

১

শারদীয় পূর্ণ শশধর-করজাল
উছলিয়া পড়িয়াছে গগন-মণ্ডলে ;
উদ্ভাসিত করিয়াছে শ্যাম ধরাতল,
বিটপ বিটপীদল হাসে কুতূহলে।

২

হাসিছে প্রকৃতি সতী, হাসে বিভাবরী
বিভূষিতা সিত-শুভ্র কৌমুদী-বসনে ;
শাখা'পরে মৃদু হাসে শেফালি সুন্দরী ;
আনন্দ-পূরিতা হেরি দিক্‌বালাগণে।

৩

পল্বল শোভিত হ'য়ে কুমুদিনী-হারে,
হর্ষ-মদ-স্ফীত-বক্ষে নাচিতে নাচিতে,—
উল্লসিত হইয়াছে মৃদুল সমীরে ;
নিশানাথ দেখে মুখ জল-মুকুরেতে।

৪

হর্ষিতা প্রকৃতি-রাণী পুলকিতা ধরা
বিকসিতা দিক-চয় আমোদে মাতিয়া ;
ঘোর-দর্শ-মসী-মেঘ কালকূট ভরা
মুহূর্ত্তে ফেলিল আসি সমস্ত ঘেরিয়া !

৫

গরজিল ঘন ঘন গম্ভীর-আরাবী,
চপলা চমকি উঠে নয়ন ধাঁধিয়া ;
নিমেষে মুছিয়া ফেলি মনোলোভা ছবি,
মহাশোক-সিন্ধুনীরে দিলগো ঠেলিয়া।

৬

নভস্থল বিষাদিত কালবেশ পরি,
টপ টপ ঢালে শোক-নয়ন-আসার ;
মেদিনী পরশে ব্যথা অনুভব করি
সকলে বিষম শোকে করে হাহাকার।

৭

অম্বর অসিত-বর্ণ বেশ-বিপর্য্যয়
হেরিয়া, কাতর ক্ষুদ্র বালক জনেক,
সে আসারে মিশাইল নিজ বারি-ধার
অগ্রজা তাহার হয় গত বরষেক।

৮

বাষ্পবারি-পূর্ণ-কণ্ঠে উদ্বেগে ফুকারি
কহিল কাতরে,—তার মধ্যমা ভগ্নীরে ;—
"ঝঞ্ঝাবাত বৃষ্টিপাত ধরি শির'পরি
অসহায় রহে কোথা উন্মুক্ত সমীরে

৯

চল, বোন্, চল দোঁহে যাই একবার
অন্বেষি ফিরায়ে আনি দিদিরে আবাসে ;"
নিরুত্তর, তেয়াগিল নয়ন-আসার
কাতর-বিহ্বল-বক্ষ স্ফীত-দীর্ঘ-শ্বাসে।

১০

"কৃপা-কণা দানে দিদি বল একবার ;
—স্নেহ তব চিরদিন ছিল এ অনুজে.—
তাই গো শুধাই তোমা বল আরবার
কোথা যাব, কোথা গেলে পাব তোমা খুঁজে !

১১

আর যে সহেনা বোন, কোমল অন্তর
বিষম ভাবনা-ভারে যায় গো ছিঁড়িয়া ;
বলিলে না কোথা আছ দূর দূরান্তর,—
কোন পুণ্যময়স্থানে বসতি করিয়া !

১২

তবে কি তোমারে পুনঃ না পাব দেখিতে ?
আর কি পাব না ফিরে স্নেহের সোহাগ ?
বসায়ে কোমল কোলে সান্ত্বনা করিতে
দেখাবে না পুনঃ সেই নব অনুরাগ ?"

১৩

বাছারে, কোথায় দেখা পাবিরে তাহার ?
স্বরগ-কুসুম সে যে অমর-বাঞ্ছিত ;
শোক দুঃখ জরা ব্যাধি পূর্ণ কারাগার ;
পলায়েছে সব ত্যজি হ'য়ে সন্ত্রাসিত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিদ্যার্ণব ।

প্রিয়।

তুমি, জীবনের প্রিয় মম
স্বরগ অমিয়া সম
যাহা কিছু নিরুপম
করি দরশন।

ওগো! অমনি তোমার স্মৃতি
পুলকিত করে মতি
যেন সে তোমার জ্যোতি
নেহারে নয়ন॥

তুমি, নিশীথে পাপীয়া তান
তুলিয়া মাতাও প্রাণ
ভুলে যাই শুনে গান
মরম বেদন।

তুমি, বসন্তের ফুল বনে
মাধবী জ্যোৎস্না-সনে
ধীরে বহ নিজ মনে
মলয় পবন॥

তুমি, নিশার শিশির-দল
কুসুমের পরিমল
নিদাঘে শীতল জল
কর বরিষণ।

তুমি, সাধুর নির্ম্মল-প্রীতি
নারীর সতীত্ব-জ্যোতি
অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তি
জগত-জীবন॥

তুমি, শরতের শশধরে
নীলাকাশে, তারা-হারে
উজ্জ্বল রজতাধারে
জ্যোৎস্না-কিরণ।

তুমি, শিশুর সরল হাসি
তপনের কর-রাশি
স্বপনে দেখাও আসি
মানস-মোহন ॥

আমি, কিছুই চাহি না আর
ওহে জীবনের সার!
(শুধু) মরমেতে একবার
দিও দরশন।

ওগো! তাতেই মিটিবে আশা
ঘুচে যাবে প্রেম-তৃষা
ও অনন্ত ভালবাসা
লভিব যখন ॥

শ্রীস্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

মেটেকুম্ভ ও কুম্ভকার।

মেটেকুম্ভ কেঁদে বলে কুম্ভকারে ডেকে,
"মমতা কি নাই তব হৃদে?
সতত প্রহারি মোরে রাখ বহ্নি'পরে
পুড়ে দেহ দেখিতে দেখিতে।"
ক্রোধভরে কুম্ভকার কহিছে কুম্ভকে,
"আমারে নিন্দিলে অকারণ,
তোমার গঠন-তরে বিধির বিধানে
এ ধরায় আমার জনম।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন।



বড় আশা করিয়া, গত দুই মাসের কাগজ নিয়মিত সময়ে বাহির করিয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম, এখন হইতে প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে অবসর প্রকাশ করতঃ গ্রাহক মহোদয়গণের সন্তুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইব। কিন্তু ললাট-লিপি অন্যরূপ! গতপূর্ব্ব মুদ্রাকর ও কার্য্যাধ্যক্ষদ্বয়ের অদুরদর্শিতায় ও অমনোযোগিতায় নববর্ষের অবসরের প্রিভিলেজ পোষ্টটি (অর্থাৎ পোষ্টাফিস হইতে এক পয়সায় যাইবার যে অধিকার পাওয়া গিয়াছিল, তাহা) হইতে বঞ্চিত হওয়া গিয়াছে, এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, গ্রাহক মহোদয়গণ পত্র লিখিয়া পত্রের উত্তর পান না—নিয়মিত ভাবে কাগজ পান না, আরও নানাবিধ কারণে ঐ প্রধান কর্ম্মচারীদ্বয়কে কর্ম্মচ্যুত করিয়া, পুনরায় উপযুক্ত লোক নিযুক্ত ও কার্য্য-শৃঙ্খলা করিতে হইয়াছে। তদুপরি এক পয়সায় কাগজ পাঠাইবার অধিকার এখনও পোষ্টাফিস হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং দুই মাসের কাগজ একবারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কাজেই মাঘ মাসের কাগজ প্রস্তুত হওয়া সত্বেও স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে ফাল্গুন মাসের কাগজের সহিত এক সঙ্গে বাহির করিলাম। আরও বিশেষ কথা—মুদ্রাকর-পরিবর্ত্তন;—বর্ত্তমানে একটু সময়-সাপেক্ষ।

যাহা হউক, ফাল্গুন মাসের মধ্যে আমরা "মাঘ ও ফাল্গুন" মাসের কাগজ পরিশোধ করিলাম। আগামী চৈত্র মাস হইতে নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে কাগজ পাঠাইয়া আমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিব। তবে সঙ্কল্প মানুষের, সিদ্ধিপ্রদাতা শ্রীভগবান,—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।





অভিজ্ঞান

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

ভারতে বাল্য-বিবাহ।

ভারতক্ষেত্র পুণ্যভূমি। এখানে ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের পাদস্পর্শে ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া গিয়াছে। এর প্রত্যেক অণুপরমাণুতে জগন্নিয়ন্তা বিধাতার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। এই পুণ্যশ্লোক ভারতে সর্ব্বকালে, সর্ব্ববিষয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের মত-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নবধর্ম্ম, নব-আচার, নবশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সেই পূর্ব্বপ্রচলিত ঋষিবাক্যসমূহের প্রতিও লোকের অনাস্থা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাচীনকালে ভারতে বাল্য-বিবাহ, শৈশব-বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সকল প্রাচীন রীতি-নীতি, কালের করাল-কবলে নিপতিত হইয়া যেন অতল সলিল-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। আজকাল হিন্দুসমাজে পূর্ব্বের সেই প্রাচীন রীতি নিতান্ত ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সাধারণতঃই বর্ত্তমানে কন্যা বয়স্কা না হইলে, তাহার বিবাহের সম্বন্ধে কন্যাকর্ত্তার যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা তাঁহার স্মরণপথেই উদিত হয় না। ইহা হয় কেন? এ কালেরই মহিমা! বর্ত্তমানে এদেশে এমনই একটা স্রোত আসিয়াছে, যেন ঐ টাই—ভালো, ঐ টাই উত্তম। কিন্তু তাঁরা একবার ভাবেন না যে আমাদের দেশটা কেমন, লোকের স্বাস্থ্যটী কিরূপ! যদি একবার দেশের জল বায়ুর দিক দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও বেশ স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এ দেশের মেয়েদের বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ হওয়া ন্যায়সঙ্গত। কেননা, এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান, বালিকারা অল্পবয়সেই ঋতুমতী হয়। সুতরাং ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বালিকাকে সম্প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে আছে ঃ—

“অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা।”

প্রাচীনকাল হইতে এই ঋষিবাক্য হিন্দু-সমাজে মূলমন্ত্রের ন্যায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালের কুটিলগতি-প্রভাবে সেই পুণ্যবাক্যেও লোকের বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋষিরা যে শুধু মত প্রচলিত করিতে হইবে, এই ভাবিয়াই আপন আপন মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহারা তপঃপ্রভাবে

দেশ, কাল ও পাত্রাপাত্র-ভেদ বিচার করিয়াই ঐ সকল মতের প্রচার করিয়াছিলেন।

জগতের প্রত্যেকই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ মানবের উৎপত্তিও প্রকৃতি এবং পুরুষের সংমিলনেই হইয়া থাকে। এ মিলন যে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই করিতে হইবে তা' নয়, ইহাতে একটা পবিত্রতা, একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা; একটা উচ্চ ভাবও রাখা চাই। আর এ যে সে মিলন নয়—এর বিরহে হ্রাস নাই, দুঃখে ক্লান্তি নাই, এমন কি মৃত্যুতেও ক্ষয় নাই। এ মিলন কি যেমন তেমন হইলে চলে? তাই বলিতেছিলাম, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে সম্প্রদান করা উচিত। ঋতুমতী হইলে তাহার রিপুর প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সাধারণতঃই হইয়া থাকে। সেই প্রবল আক্রমণে কয়জন স্ত্রীলোক আপন শক্তি-প্রভাবে তাহার সেই রিপুর দমন করিতে সমর্থ হয়। তখন যদি তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর পুরুষ পতিত হয়, তাহার মনে কি একবার এভাবও হয় না যে, 'সে আমার হোক্'! যদি তাই হয়, তবে আর সে কন্যার সতীত্ব কোথায় রহিল? যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী প্রভৃতি রমণীরা সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের রমণীকুলের পক্ষে ইহা অতি নিন্দনীয়, অতি ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুরুষ হইতে স্ত্রীর পবিত্রতা রক্ষা করা অধিক পরিমাণে কর্ত্তব্য। যে হেতু প্রকৃতিই উৎপত্তির মূল কারণ। সেই প্রকৃতি যদি কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই দোষের ভাগ পরবর্ত্তী সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু পুরুষ যদি আচারহীন ও ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে যতটা অনিষ্ট হইবে, একটি স্ত্রীলোক সেই দোষে দোষী হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিন্দার, ঘৃণার ও লজ্জার কারণ হইবে। পুরুষের যে তাহাতে দোষ হয় না তাহা নয়—তাতে শুধু তা'র নিজেরই ক্ষতি ও অনিষ্ট হইয়া থাকে।

বাল্যকালে বালিকারা পবিত্র থাকে, সংসারের আবর্ত্তনে পড়িয়া সেই বিমল চরিত্র চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় না। সেই সরল হৃদয়ের সরল বিশ্বাস যখন একীভূত থাকে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত না হয়, সেই সময় যদি সে একজনকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই যে তাহার আপনার জন, কখনও কি সে পর হইতে পারে? কন্যাটি বর্ষীয়সী না হইলেই শাশুড়ীও আপন অভিপ্রায়ানুসারে পুত্রবধূকে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন;

কিন্তু বর্ষীয়সী হইলে সর্ব্বথা তাহার বিপরীত ফলই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন আর শ্বাশুড়ী বৌয়ের উপর কোন কথাই বলিতে পারেন না। অনেক সময় পুত্রের ভয়েও শ্বাশুড়ী বৌকে কিছু বলিতে সাহসী হন না।

বিপক্ষবাদীরা বলিবেন, বয়সের অপরিপক্কতা হেতু বালিকারা আপন আপন স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে পারে না। কথাটা সত্য, কিন্তু আপন আপন ব্যক্তি বাছিয়া লইলেই যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পূর্ণ সুখী হইবেন, তাহা নয়। যদি তাহাই হইত, তবে আর ইউরোপীয় আদালতে বিবাহ-বন্ধন ছেদনের (Divorce) এত অসংখ্য মোকদ্দমার সৃষ্টি হয় কেন? স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্যই স্বামী-সেবা। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গতি। তিনি যা'ই হোন্ না কেন, প্রত্যেক স্ত্রীই আপন স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবে। ইহাই হিন্দুদিগের প্রধান বিশেষত্ব। তাহাতে যদি তাহাকে নরকেও যেতে হয়, সাধ্বী স্ত্রী তাহাওেত কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হন না।

এই যে শিক্ষা, ইহা বাল্যকালেই কোমল হৃদয়ে বিকশিত হইয়া থাকে। যে হেতু বাল্যের সেই নির্ম্মল নিষ্পাপ হৃদয় স্বতঃই বিশ্ব-প্রেমের দিকে ধাবিত হয়। তখন তাহাদের হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ কিছুই থাকে না; ক্রমে যতই বয়োবৃদ্ধি হয় ও সঙ্গদোষ আসিয়া পড়ে, তখন হইতেই ঐ সকল কোমল প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে মহৎ দোষসকল তাহাদের হৃদয়-মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। সুতরাং কোমল হৃদয়েই সদ্‌গুণরূপ বীজসকল রোপণ করা কর্ত্তব্য।

বাল্য-বিবাহ হইলে, তাহার উপযুক্তমত শিক্ষা লাভ হয় না, কথাটা একেবারে অমূলক নহে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, স্ত্রীলোকের প্রধান শিক্ষা কি? শুধুই কি পাশ করা? শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ—স্ত্রীজনসুলভ গুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া একটী লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী হওয়া। এই হইল স্ত্রীলোকের প্রধান এবং মুখ্য শিক্ষা। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম, রন্ধন, অতিথি-সৎকার, গুরুজনে ভক্তি, আর্ত্তের সান্ত্বনা, দুঃখীজনে দয়া এই সকলই তাহাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। আনুষঙ্গিক লেখাপড়া শিক্ষাও কতক পরিমাণে প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। তাহাও স্বামী অথবা অন্য আত্মীয়ের নিকট হইতে পারে। প্রাচীন ভারতেও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ সমাদর ছিল। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের রমণীদের ন্যায় লেখাপড়াকেই জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লইতেন না। তাঁহাদের সংসার ছিল, কর্ম্ম ছিল, স্বামী-সেবা ও অতিথি-সৎকার প্রভৃতি গুণ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে

স্বামীকে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর ন্যায় থাকিতে হইতেছে; ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা! শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কোথায় তাঁহারা সৎস্বভাব-সম্পন্ন হইবেন, তাহা না হইয়া তাহার বিপরীতই হইয়া পড়েন। এ শিক্ষায় তাঁহাদের আত্ম-সংযমের স্থলে, আত্ম—অসংযমই শিক্ষা হইয়া থাকে।

প্রাপ্তবয়সে প্রণয়ী প্রণয়িনীদিগের চক্ষু প্রায়ই অন্ধ হয়। কারণ, প্রাপ্ত-বয়সের প্রণয়-প্রবাহ যখন উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া, ফেনিল উচ্ছ্বাসে বহিতে থাকে, তখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হইতে দেখা যায়। যে হেতু, ভোগেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই এই মিলন-কামনায় প্রধাবিত হইয়া থাকে। তখন সৎ ও অসৎ বিচার করিবার ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাপ্ত-বয়সে যখন প্রণয়ী প্রণয়িনীর মিলন হয়—সেই মিলনে অনেককেই আপন আত্মীয়-গণকে, এমন কি স্ব স্ব সমাজ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে দেখা যায়। সেই প্রণয়াবেগ আপন শক্তি-প্রভাবে সহ্য করিতে পারেন, এমন ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না; কাজেই পিতা-প্রপিতামহের সেই চিরপূজ্য পন্থাও তাঁহারা ত্যাগ করেন। এই তো হইল প্রাপ্তবয়সের প্রণয়প্রবাহ!

শাস্ত্রে আছে ঃ—

"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্।"

যে কন্যা বার বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা 'ব্রহ্মহত্যা' রূপ পাপের ভাগী হন। এরূপস্থলে সেই কন্যার স্বয়ং বর খুঁজিয়া বিবাহ করা আবশ্যক। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, বার বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে শৈশব বিবাহ উঠিয়াই গিয়াছে, কারণ আধুনিক সমাজ ইহাকে অতি বিগর্হিত বলিয়া বিবেচনা করেন। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে, ১২।১৩ বৎসরের বালিকার বিবাহ দেওয়া, ভবিষ্যতে যেন তাহাই প্রচলিত থাকে, কন্যাকর্ত্তারা যেন তদূর্দ্ধে গমন না করেন।

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে, তাহাদের সন্তানও অপ্রাপ্ত-বয়সে হইবে, তাহাতে কুফল হয় সত্য, কিন্তু তাহার প্রধান কারণ কি বাল্য-বিবাহ? না বালক-বালিকার অসংযত চিত্তের সংযমাভাব? আজকাল স্ত্রী-পুরুষ কেহই আত্ম-সংযমন বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহাই জানে না। তথাপি

শিক্ষারই গৌরব করিতে হইবে। যদিও কথাটা অভ্যস্ত করিয়া থাকুক, তথাপি কার্য্যে পরিণত করিতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। সংযত-চিত্ত হইলে পতি-পত্নী এক শয্যায় শয়ন করিয়াও নির্ব্বিকারচিত্ত থাকিতে পারে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা রামায়ণে পাইতে পারি। যখন শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করিলেন, তখন ভরতও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রামচন্দ্রের বনবাস কাল তিনিও 'অসিধারা' ব্রত প্রতিপালন করিবেন। তিনি তাঁহার এই অটল, অচল প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

চিত্তসংযম না থাকিলে, মানুষের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। মানবের রূপ আছে, রূপে মোহ আছে, মোহে আত্মবিস্মৃতি হইতে পারে। তবেই দেখা গেল, এইস্থানে চিত্ত-সংযম থাকিলে আশঙ্কাই রহিল না। রিপুগণই মানবের সকল অনর্থের মূল! যখন শিক্ষা দ্বারা এই রিপুসকলকে আপন বশীভূত করিতে পারা যায়, তখনই মানব সম্পূর্ণ সুখী; এতদ্ভিন্ন সর্ব্বসময়ে সর্ব্ববিষয়েই অসুখী। এই শিক্ষা শুধু বই পড়িলে ও লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিতে পারিলেই হয় না। এই শিক্ষা সমাজের, উপদেশের, আদর্শের।

বাল্য-বিবাহে স্বামী, স্ত্রীর যেরূপ বিমল ভালবাসার অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ ভালবাসা বোধ হয়, আর কাহারও নিকট হইতে পাইবার আশা করা যায় না। সেই কোমল বালিকা-কলিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কোনও সাংসারিক পঙ্কিল ছায়ার আবির্ভাব হয় না; হৃদয়টী জুড়িয়া স্বামী-ভালবাসারূপ সেই এক বস্তুই সংস্থাপিত থাকে। বাল্যের সেই কোমল হৃদয়ে যে বীজ রোপণ করা যায়, তাহাই চির জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ হয়। সেই নির্ম্মল হৃদয়ের নির্ম্মল ভালবাসা কত সুন্দর, কত উদার! কিন্তু এই যুবতী-বিবাহে যে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, প্রায়ই তাহা যুবকের প্রেমালিঙ্গনের মধ্য হইতে উৎপন্ন। সেই যুবতী স্ত্রীর হৃদয়-মন্দিরে কত শত পঙ্কিল ভালবাসার চিত্র বিরাজ করে, ক'জন তাহার খোঁজ রাখিয়াছেন? সেই হৃদয়খানিতে কার প্রতিচ্ছবি একদিন উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? বিবাহের পরও সেই পূর্ব্ব ভালবাসার মসীময় পাপ-স্মৃতি জাগরিত থাকে কি না, তাহা কে খবর রাখেন!

হিন্দুশাস্ত্রে আছে, স্ত্রীলোক যদি ভুলেও স্বামী ভিন্ন অপরের রূপ ধ্যান করে, তাহা হইলেও সে পাপী। এই যে যুবক-যুবতী-সম্মিলন, যুবতী কখনও

কাহারও রূপ ধ্যান করে নাই, এ কথা কি কেউ বলিতে পারিবেন? তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাল্যের সেই পবিত্র কালেই বালিকাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

ভিক্ষা।

আজি, ভিক্ষা মাগি আমি হে জগৎস্বামী
তোমার যুগল চরণে।
মম, হৃদয়-নিকুঞ্জ কর আলোকিত
পবিত্র জ্যোৎস্না-কিরণে॥
সেই, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকে তোমার
দেখাও মূরতি মোহন।
হেরি, ভুলে যাব সব কামনা-বিভব
অশান্তি মরম-দাহন॥
পরে, মার্জ্জিত করি হৃদয়-মন্দির
তোমার আসন পাতিব।
দিয়া, ভক্তি-গঙ্গাজল প্রেম-পুষ্পদল
ও চরণ দুটী পুজিব॥
যবে, সুখের সংসার হেরিবে নয়ন
তোমারি সে দয়া জানিব।
পুনঃ, নিরাশার দুঃখে গুমরিলে বুক
তোমাকেই শুধু ডাকিব॥
তাই, ডাকিগো তোমায় ওহে দয়াময়!
বারেক করুণা করিয়া।
মম, হৃদি-কুঞ্জবন কর আলোকিত
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

বিধি-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হেনরীর মনে আনন্দ ধরে না, শুভদিনে শুভক্ষণে হেনরীর সহিত ইসাবেলার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর হইতেই ইসাবেলার মন যেন ক্রমেই স্ফূর্ত্তিহীন হইতে লাগিল। ইসাবেলা নিশিদিন যেন কি গভীর চিন্তায় চিন্তিতা, দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মনভঙ্গে ইসাবেলার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, ইহা দেখিয়া হেনরী প্রমাদ গণিল। ইসাবেলার নিশ্চয় কোন মারাত্মক ব্যাধি জন্মিয়াছে, এই ভাবিয়া হেনরী সহরের এক বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইল। চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া, চিকিৎসকের সুপরামর্শে হেনরী কালবিলম্ব না করিয়া ইসাবেলাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করিবার মনস্থ করিল।

পাঁচবৎসর অতীত হইয়া গেল; জন কোনমতেই উদ্ধারের কোন আশা দেখিল না। এখন তাহার আকৃতি দেখিলে বোধ হইবে—যেন মানুষ আকারে কোন বন্য জন্তু, তাহার হাবভাব ঠিক সেইরূপ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় এখনও তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতি একেবারে লোপ পায় নাই, না জানি আরও কিছুকাল এরূপভাবে থাকিলে, এইগুলিও যে ক্রমে লোপ পাইবে, ইহার বিচিত্রতা কি!

জন একদিন হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, দূরে একখানি তরণী পাল-ভরে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে; জন আর স্থির থাকিতে পারিল না, আহ্লাদে তাহার হৃদয়ে যেন নব বলের সঞ্চার হইল। জন—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, এই কথা স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিল ও নির্দ্দিষ্ট তরণীর পালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তরণ দিতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়াই অনভ্যাস বশতঃ তাহার শরীর যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল, হস্ত-পদ সঞ্চালন করিবার যেন ক্ষমতা লোপ পাইল। হতভাগ্য গা-ভাসান দিয়া স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তরঙ্গাঘাতে একবার ডুবিয়া যায়, একবার ভাসিয়া উঠে, এইরূপ করিতে করিতে তাহার জ্ঞান লোপের উপক্রম হইল। যাহা হউক, ভাসিতে ভাসিতে জন অনেক দূর চলিয়া গেল। পালবাহী তরণীখানি সে অনতিদূরেই ভাসমান দেখিয়া, ইঙ্গিতে আপনার

উদ্ধারের প্রার্থনা জানাইল। তরণীস্থিত নাবিকগণ অদুরে জনকে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারের জন্য একখানি ছোট নৌকা খুলিয়া অবিলম্বেই জনের নিকট পৌঁছিল ও তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল। জন নৌকায় উঠিয়াই চৈতন্য হারাইল, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থিরভাব ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া জনের উদ্ধারকারিগণ যত শীঘ্র পারিল, জনকে তরণীতে লইয়া গিয়া বিশেষ ভাবে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সহৃদয় নাবিকগণের তৎপরতায় ও সেবায় ক্রমে ক্রমে জনের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। কেবল নাবিকগণের সাহায্যেই যে তাহার জীবন রক্ষা হইল জানিয়া, জন কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার উদ্ধারকারী বন্ধুদিগের নিকট তাহার বিপদের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। জনের দুঃখের কথা শুনিয়া সকলের মনে কষ্ট হইল ও জনের প্রতি সকলেই দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিল। অল্পদিনের মধ্যে তরণীখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া জনকে আবশ্যকীয় পরিচ্ছদাদি ও পাথেয় দিয়া স্বদেশ পৌঁছিবার জন্য অন্য জাহাজে উঠাইয়া দিয়া গেল। জন তাহাদের এরূপ ব্যবহারে কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, বহুদিন পরে স্বদেশ যাত্রার জন্য উদ্বিগ্ন হইল। আবার তাহার প্রাণের ইসাবেলাকে ও লুইসকে মনে পড়িল, আবার তাহাদের দেখিতে পাইবে এই আশা মনে জাগিল। কিন্তু এখনও সে যে অকূল সমুদ্রের উপর, তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইল না।

যথাসময়ে জাহাজখানি বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বন্দরে জন প্রিয়তমা পত্নী ইসাবেলা ও প্রাণাধিক লুইসের নিকট হইতে যাইবার কালীন শেষ বিদায় লইয়াছিল। আজ বহুদিন পরে আবার সেই বন্দরে পদার্পণ করিয়া, পরমপিতা পরমেশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল; বহুদিন পরে আবার আপনার স্বদেশের মুখ দেখিয়া প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল ও মনের দারুণ আগ্রহে অতি অল্পসময়ের মধ্যে ইসাবেলার বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়া যাহা দেখিল—যাহা শুনিল, তাহা অতীব হৃদয়বিদারক ও সহ্য করা জনের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল! জন উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ভগবান! এই জন্যই—ইহা দেখাইবার জন্যই কি আমায় স্বদেশে আনয়ন করিলে! ইহা অপেক্ষা সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল নির্জ্জন বনভূমি যে আমার সুখকর ছিল! ইহা অপেক্ষা সমুদ্রের অতল জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল! ইহা অপেক্ষা যে অসময়ের কাণ্ডারী সহৃদয় নাবিকগণের সঙ্গই আমার সহস্রগুণে উচিত ছিল!

হায়! আমি কি এই দেখিবার জন্য—এই শুনিবার জন্য এই স্থানে আসিলাম! ইসাবেলা! ইসাবেলা! এই তোমার মনে ছিল? এই জন্যই কি আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া, জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া তোমায় দেখিতে আসিলাম? ভগবান! ভগবান! আমার কি করিলে! আমার কি করিলে! এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় বাটী হইতে বহির্গত হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। জন নিকটস্থ একটী হোটেলে গিয়া কিছু আহার করিল। হোটেলের কর্ত্রীঠাকুরাণী জনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, বড়ই পরিচিত মুখ, কিন্তু ঠিক করিতে পারিতেছি না, কোথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? জন কর্ত্রীঠাকুরাণীর কথায় বলিয়া উঠিল, আজ ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এইখানেই দেখিয়াছেন, আপনি ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চী তো? কর্ত্রীঠাকুরারাণী বলিলেন, হাঁ আমিই ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চী, আপনি এখানে থাকেন কোথায়, এ সহরের ইতর ভদ্র সকলেই আমার পরিচিত, আপনি কি এতদিন অন্য কোথাও কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন? জন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, তখনই আপনার বিপদের কথা ও বিষাদকাহিনী সমুদয় ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চীর নিকট সবিশেষ বর্ণনা করিয়া রোদন করিতে লাগিল। এখন ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চী তাহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—জন! তোমার অদৃষ্টবশে এইরূপ ঘটিয়াছে, আমি তোমার দুঃখে যারপরনাই দুঃখিত, কি করিবে? যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর ভাবিও না। আপাততঃ তুমি আমার এই হোটেলেই বাস কর, তোমার কোন কষ্ট হইবে না, আমাকে তোমার আত্মীয় মনে করিবে, কিম্বা যদি বিবেচনা-সঙ্গত বোধ কর, তুমি আমার এই হোটেলের ম্যানেজার হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ কর, কিছুদিন পর ইসাবেলা অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী কত রমণী আবার তোমার পাণিগ্রহণাভিলাষিণী হইবে; এই বলিয়া তাহাকে নানারূপ প্রবোধ বচনে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চীর সহৃদয়তায় ও সুমিষ্ট কথায় জন আপনার দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া কাঁদিয়াই আকুল! ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চী পরিশেষে তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, জন! এখন বিশ্রাম কর; নিদ্রা যাইবার আবশ্যক হয়, ঐ ঘরে নিদ্রা যাইয়ো, এখন আমি চলিলাম, কল্য প্রাতে আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

জন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চীর নির্দ্দেশ মত শয়ন-

কক্ষে যাইয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। হতভাগ্য মনে করিল, এখান হইতে তিন মাইল বইতো নয়—আমি একবার যাইয়া ইসাবেলাকে দেখিয়া আসি, যে কোন উপায়ে পারি, একবার তাহাকে জন্মের মত দেখিব; প্রাণের লুইসকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব; আর একবার হেনরীকেও দেখিব, সে ইসাবেলাকে লইয়া কেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, তাহা হইলেই আমার কার্য্যশেষ। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে; এইরূপ ভাবিয়া জন তৎক্ষণাৎ হোটেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

জন বাহির হইয়া দেখিল, রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে! যদিও রাত্রি অধিক হয় নাই বটে, কিন্তু কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া পথে কদাচিৎ কখন দু একটী পথিককেই দেখা যাইতেছে। দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এমন সময় জন ম্যাডাম ব্ল্যাঙ্কীর কথিত বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। কি করিয়া বাটীর মধ্যে যাইবে—কি করিয়া ইসাবেলার সুখশান্তিপূর্ণ নূতন সংসার দেখিবে, ইহার নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। জন শুনিতে পাইল—উপরের কক্ষে হাসি আমোদ হইতেছে, পিয়ানোর সহিত তাহার প্রাণাধিক ইসাবেলা সুমধুর সঙ্গীত-লহরীতে শ্রোতার হৃদয় ভাসাইতেছে। প্রণয়িনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই যেন হতভাগ্য জনের সংজ্ঞা হারাইবার উপক্রম হইল, অতিকষ্টে আপনার চিত্ত স্থির করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল, ইসাবেলার জানালার সম্মুখে একটী বৃহৎ পাইন গাছ রহিয়াছে; জন ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া সবেগ-আনন্দ কম্পিত হৃদয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিল ও অতি সঙ্গোপনে ইসাবেলার জানালার সমীপবর্ত্তী হইল। কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন রজনী বলিয়া জনের অনেকটা সুবিধা হইল, কক্ষমধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপালোকে জন সমস্তই দেখিল ও বুঝিল, ইসাবেলা ও হেনরী যথার্থই সুখের সংসার পাতিয়াছে, সম্মুখে লুইস বসিয়া রহিয়াছে। জনের চক্ষে জল আসিল, একবার মনে করিল—ডাকিয়া কথা কহিয়া যাই, আবার পরক্ষণেই মনে ভাবিল—না, ইহাদের আমার উপস্থিতি জানাইয়া ইহাদের সুখ ভঙ্গ করা আমার কোন মতেই উচিত নয়; ইহারা জানে আমি মরিয়াছি—ইহাদের জ্ঞানে আমার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া, ইহাদের সুখের সংসার মরুভূমিতে পরিণত করিব না। ইসাবেলা হেনরীকে লইয়া সুখিনী হইয়াছে—সুখে থাকুক, ভগবান তাহাকে সুখিনী করুন, লুইস সুখে থাকুক; হেনরীও সুখে থাকুক। আমি অভাগা, আমার অদৃষ্টে সুখ নাই বলিয়া আমি অপরের সুখের পথে হন্তারক হইব

কেন ? দেখিলাম, সকলকেই সুখী দেখিলাম—প্রাণে শান্তি আসিল, এইবার আস্তে আস্তে অবতরণ করিয়া চোরের মত চলিয়া যাই! এই বলিয়া জন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। একে চারিদিক কোয়াসাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময়, তাহাতে তাহার মনের গতি অন্যরূপ!—জন অবতরণ করিতে করিতে পদস্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল; তাহার পতনে নিম্নস্থ শুষ্ক পত্রের উপর একটা শব্দ হইল—সেই শব্দে হেনরী ও ইসাবেলার চমক ভাঙ্গিল। তাহারা আলোকসাহায্যে জানালা হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, একটা লোক ভূমি হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা উভয়েই চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, জন আশু বিপদে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

ম্যাডাম ব্ল্যাঙ্কী জনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আর একবার জনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে জনের কক্ষে আসিলেন; জন কামরায় নাই দেখিয়া ম্যাডাম বিশেষ ভাবিতা হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই জন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনের এরূপ অবস্থা দেখিয়া ম্যাডাম ব্ল্যাঙ্কী জনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন! জন সমুদয় ঘটনা গোপন রাখিয়া ম্যাডামকে অন্য কথায় বুঝাইয়া দিল, কিন্তু ম্যাডাম তাহার মুখের ভাব ও কথার সূত্রে সন্দেহ করিয়া বলিলেন,—রাত্রিও অনেক হইয়াছে—কল্য প্রাতে সমুদয় শুনিব; আমার বিশ্বাস, এখন তুমি আমার কাছে আসল কথা গোপন করিলে! যাহা হউক, কল্য প্রাতে সমুদয় বৃত্তান্ত আমি তোমার মুখ হইতে শুনিতে আশা করি; বৃথা চিন্তায় রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত করিও না। কাল সকালে আবার সাক্ষাৎ করিব বলিয়া ম্যাডাম প্রস্থান করিলেন।

জন শয়ন করিল, উপকারিণী মিষ্টভাষিণী ম্যাডামের সহৃদয়তায় বড়ই সন্তুষ্ট হইল ও তাহার নিকট মিথ্যাকথা বলায় মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইল। যাহা হউক, মনে ভাবিল কল্য প্রাতেই সমুদয় বৃত্তান্ত বলিব। জন—বুকে ও পিঠে ভয়ঙ্কর বেদনা অনুভব করিল; সে বেদনার প্রকৃত কারণ বিশেষ বুঝিল; বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার সময় যখন পড়িয়া গিয়াছিল, তখন বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আঘাত যে এত গুরুতর হইবে তাহা ভাবে নাই; অল্পক্ষণের মধ্যে বেদনা এত বৃদ্ধি

হইল যে, জনের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; প্রবলবেগে জ্বর হইল; জন অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিল।

প্রাতে ম্যাডাম ব্ল্যাঙ্কী আসিয়া প্রথমেই জনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—জন অঘোর অচৈতন্য! ম্যাডাম মনে করিলেন, জন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; সুতরাং তখন তাহাকে না জাগাইয়া তিনি অন্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন। ক্রমে বেলা ১২টা বাজিল—তখনও জন উঠিল না, দেখিয়া ম্যাডাম পুনরায় জনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও জনের গাত্রে হাত দিয়া সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, জনের জ্বরের প্রকোপ এত বেশী যে, তাহাতেই হতভাগ্য অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জনের আকস্মিক এরূপ অবস্থা দেখিয়া, করুণাময়ী কালবিলম্ব না করিয়া তখনই ডাক্তার ডাকাইলেন; ডাক্তার আসিয়া জনের অবস্থা বড় ভাল বোধ করিলেন না; তবুও তিনি চেষ্টার ত্রুটী না করিয়া একটী ঔষধ দিয়া বলিলেন যে, জ্ঞান হইলেই ঔষধটী খাওয়াইতে হইবে—আমি পুনরায় বৈকালে আসিব। ডাক্তার চলিয়া যাইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে জন চক্ষু চাহিয়া একবার চারিধার জন্মের মত ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান আসিল; হতভাগ্য সম্মুখে আপনার মাতৃস্বরূপিণী করুণাময়ী ম্যাডাম ব্ল্যাঙ্কীকে বিষণ্ণমনে দণ্ডায়মান দেখিয়া সরোদনে বলিয়া উঠিল, মা! আমি চলিলাম, আর আমার বেশী দেরী নাই; আজ এই দুইদিনে তুমি আমার যাহা করিয়াছ, তাহা আমি আপন গর্ভধারিণী মা অপেক্ষাও অধিক বিবেচনা করি! করুণাময়ি? তোমার করুণার ধার শুধিতে পারিলাম না—এই বড় দুঃখ রহিয়া গেল! জনের মুখে এইরূপ সম্বোধন শুনিয়া ম্যাডাম ব্ল্যাঙ্কীর করুণ প্রস্রবণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। সন্তানস্নেহে তিনি জনের সেবায় সদাই নিরত রহিলেন। জনের অবস্থার বৈলক্ষণ্য না বুঝিতে পারিয়া তিনি আবার ডাক্তার ডাকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জন তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, মা! আর ডাক্তার ডাকিও না! ডাক্তারে আমার আর কিছুই করিতে পারিবে না। আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। জননি! আমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ কর! আর ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন নাই; কাল রাত্রে আমি তোমারও নিকট মিথ্যা বলিয়াছি—আমায় মার্জ্জনা কর! এই বলিয়া জন গত রজনীর ইসাবেলার সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা তাহাকে প্রকাশ করিল; আরও বলিল, মা! ইসাবেলাকে আমার সম্বন্ধে কোন কথা জানাইও না; সে যেমন ভাবিয়াছে, জাহাজ জলমগ্নের

সঙ্গে সঙ্গে আমিও জলমগ্ন হইয়াছি, তাহার এ ভুল বিশ্বাস যেন কখন সত্যে আনীত না হয়। তাহার এ বিশ্বাস যেন চিরকাল সমভাবে থাকে। আহা! সে আবার সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছে—আমার এ অদ্ভুত অস্তিত্ব কখন সে যেন না জানিতে পারে—তাহার শান্তির পথে, তাহার সুখের পথে আমার অস্তিত্ব আর তাহার কণ্টক হইবে না, আমার স্মৃতি আর তাহাকে দগ্ধ করিবে না; তাহাকে দেখা দিয়া—হেনরীকে দেখা দিয়া আমি আর তাহাদের হৃদয়ে নবজাত সুখশান্তি নাশ করিতে চাহি না; তবে মৃত্যুকালে প্রাণের লুইসকে একবার বুকে ধরিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারিলাম না, এই এক মহাদুঃখ রহিয়া গেল; তা যাক্, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি অশান্তি লইয়া মরি, তাহাতেও আমার সুখ! তথাপি অপরের শান্তিপূর্ণ হৃদয় আমি অশান্তিময় করিতে চাহি না। মা! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আমি দুঃখ লইয়া আসিয়াছিলাম—দুঃখ লইয়া গেলাম—আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবার কেহই রহিল না! আজ আমার দুঃখের অবসান হইল, আমি চলিলাম—আমায় বিদায় দাও! এই বলিয়া হতভাগ্য জন পৃথিবীর অশান্তি বুকে ধরিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিল—সব ফুরাইল—দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জনেরও জীবন-প্রদীপ চির-নির্ব্বাপিত হইল! দীন জন পৃথিবীর কার্য্য সমাধান করিয়া চির বিশ্রাম লাভ করিল।

জনের মৃত্যুতে ম্যাডাম ব্ল্যাঞ্চীর দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি একবার মনে ভাবিলেন, ইসাবেলাকে সংবাদ পাঠাই—তাহার পূর্ব্ব-স্বামীর মৃতদেহ একবার দেখিয়া যাউক, কিন্তু পরক্ষণেই জনের সনির্ব্বন্ধ অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িল; আর ইসাবেলার কথা মনে আনিলেন না; জনের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তিনি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন।

শ্রীননিলাল সুর।

ষট্‌কর্ম্ম।

ষট্‌কর্ম্ম কি ? ইহা ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য। ভগবান মনু ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। (১ম-৮৮) ব্রাহ্মণকে অধ্যয়নের সহিত স্বীয় শিষ্যকে অধ্যাপন করিতে হইবে; যজন বা হোম-কার্য্যের সহিত পরের হোম-কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে। তিনি শিষ্যকে বিদ্যা ও অন্নদান করিবেন। সমাবর্ত্তন কি গুরুগৃহ পরিত্যাগ বা বিদ্যাসমাপন করিবার পর শিষ্য গুরুকে গুরু-দক্ষিণা দিবেন. তাহা গুরুকে গ্রহণ করিতে হইবে,—ইহাই হইল প্রতিগ্রহ। এরূপ না করিলে ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, এই কারণে ভগবান মনু আট ঘাট বাঁধিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা, বিক্রমপুর, ফরিদপুর, নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে, উত্তর পশ্চিম ও মহারাষ্ট্রদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই সমস্বরে বলিবেন যে, ষট্‌কর্ম্মের ঐ অর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন অর্থ নাই ও হইতে পারে না। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের ইহাই হইল সাত্ত্বিক কর্ম্ম। তবে কালের কুটিলগতি প্রযুক্ত ব্রাহ্মণগণ দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ায়, তাঁহাদের রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহাদের রাজসিক কর্ম্ম—স্বার্থপরতার মোহে শিষ্য-যজমানকে আর্থিক প্রবঞ্চনা করা। তাঁহাদের তামসিক কর্ম্ম হইল—ইষ্টসাধনার্থে শিষ্য-যজমানের অনিষ্ট করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালাপ্রদেশ-বিশেষে অধুনা ষট্ কর্ম্মের অর্থ বিকৃতি করিয়া, তাহা অন্য কর্ম্মবোধক বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। ষট্‌কর্ম্মান্বিত বলিলে অধুনা শাস্ত্র-লিখিত ষট্‌কর্ম্মা বলিয়া তদঞ্চলের লোকে বোঝে না; তাহা দ্বারা সেই তমঃপ্রকৃতি লোককে বুঝায়; যে মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, আকর্ষণ ও শান্তি এই ষট্‌কার্য্যে পটু। ঢাকার ব্রাহ্মণকে এ বিষয়ে গৌরব করিতে শুনিয়াছি। ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের গৌরবের কার্য্য নহে।

ঋক্ যজুঃ সাম বেদত্রয়ে এই ষট্‌কর্ম্ম নাই। ঋষিগণ প্রাতঃপ্রদোষ হোম করিয়া দেবতা ও উপদেবতার তুষ্ট্যর্থে বলি প্রদান করিতেন। তাহাতেই তাঁহারা গৃহশান্তির অনুষ্ঠান হইল বলিয়া মনে করিতেন। অভিচার

কর্ম্মে তাঁহারা কখন মনোনিবেশ করেন নাই। সে কার্য্য, যজ্ঞের ক্রিয়া-কলাপে আড়ম্বর প্রকাশ করিলে ব্রহ্মা-নামক পুরোহিতগণের স্কন্ধে পড়িয়াছিল। ঋষি-যজ্ঞে সম্ভবতঃ ব্রহ্মার আবশ্যক হইত না। রাজযজ্ঞেই তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন—পুরোহিত শব্দের গাত্রে তাহার ছাপ রহিয়াছে। এই ব্রহ্মা পুরোহিতগণ অথর্ব্ববেদ-সংহিতা সঙ্কলিত করেন; তাহাতে অভিচারের নানা প্রকার লিখিত আছে। অভিচারমূলক বলিয়া অথর্ব্ববেদ ত্রয়ীতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ভগবান্ মনুর প্রাচীন স্মৃতিতে অভিচারমূলক অথর্ব্ববেদের উল্লেখ ছিল কি না তাহা জানি না, তবে তাঁহার স্মৃতির বর্ত্তমান সংস্করণ—যাহা ভৃগুকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ও পুর্ব্ব দশ অধ্যায়ে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। ভূমি অপহারক শত্রুকে দমন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ রাজবল অপেক্ষা স্বীয় বলকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া, অথর্ব্বাঙ্গিরস শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুনিধন করিবে; এই কথা একাদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। ইহাও চরম অনুকল্প অর্থাৎ সকল কার্য্যেই অভিচার আশ্রয়ের কঠিন নিষেধ রহিয়াছে। রাজা অনিষ্টকারীর দণ্ডবিধান করিলে অভিচার কর্ম্মের কখন অনুষ্ঠান করিবে না।

আমাদের দেশের কোন কোন ব্রাহ্মণ মারণ উচ্চাটনাদি ষট্ কর্ম্মের গৌরব করিয়া থাকেন এবং তাহার সাধনকল্পে বৃথা সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলে এই কর্ম্ম নীচ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহাদিগকে তথায় শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলে। ইঁহারা অভিচার কর্ম্মে খুব দক্ষ। শাকল দ্বীপ ত নহে, মহাভারত কর্ণ-পর্ব্বমতে ইহা মদ্রদেশের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। এস্থানে ম্লেচ্ছাচার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মদ্রদেশাধিপতি শল্য নিহত হইলে, ভারতযুদ্ধের পরে তদ্দেশীয় হিন্দুরাজগণ দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ মাদ্রাজ তাঁহাদের হইতে নামকরণ গ্রহণ করিয়াছে। এবং শাকল-দেশবাসী দ্বিজগণ ভারতের সর্ব্বস্থলে ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহাদের প্রধান আবাসস্থল মগধ ছিল; কারণ তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণের অভ্যাস শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মগধে গোবধ করিতেন, ইহা অথর্ব্ববেদে লিখিত হইয়াছে। "কীকটেষু কৃন্ততি গাবঃ" মগধে গোরু কাটা হয়। যাহা হউক, অধুনা তাঁহাদের মধ্যে মাংসাহার আছে কি না জানি না; উত্তর পশ্চিমের অন্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ত তাহা প্রায় নাই।

এক্ষণে নিশ্চিত হইল যে অভিচার কর্ম্ম অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য, ইহা সৎ-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কখন অনুষ্ঠিত হয় না। মনুতে এক স্থলে ছয়টী আততায়ী বা শত্রুর কথা লিখিত আছে। ইহার সহিত পরবর্ত্তী স্মৃতিতে অভিচার দ্বারা হননোদ্যত ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া আততায়ীর সংখ্যা সাত হইয়াছে। ইহা বিষ্ণু-স্মৃতির ৫ম অধ্যায়ের ১৯১ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে। মেধাতিথি ৮ম অধ্যায়ের ৩৫০ শ্লোকে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিষ্ণু-স্মৃতির বচনের অনুরূপ; ইহাতেও আটটী আততায়ীর কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, ইহাদের সময়ে এই অভিচার দ্বারা হননকারীর সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাই রাজদণ্ডের বিধান দ্বারা তাহাদের দমন করিবার বিধি নিবদ্ধ হয়।

ভারতে কিরূপে এই গর্হিত ষট্‌কর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হইল, ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে আমি তাহার উত্তরে বলিব—ইহার প্রচারক হীনযান বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ও জৈনগণ। তাহাদের রাজা নাগার্জ্জুন তাহাদের প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ ম্লেচ্ছদেশীয় লোক ছিলেন। ইহারা মহাযান বৌদ্ধগণের ঠিক বিপরীত দল। তাহারা বিলাসিতা স্ত্রীসঙ্গ আদি চিত্তের বিকার উৎপাদক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহারা সেই সকল সেবন করিত, সুতরাং উত্তরোত্তর ইহাদের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ইহারা নানাপ্রকার ঘৃণ্য ন্যক্কারজনক দ্রব্য দ্বারা তাহাদের গর্হিত কার্য্যের সিদ্ধির চেষ্টা করিত। আধুনিক ইন্দ্রজাল ভূতডামর নাগার্জ্জুন সিদ্ধিপুট আদি পুস্তকে এই-গুলির বিস্তারিত বর্ণন আছে। ছাত্রগণকে এই কদর্য্য পুস্তকগুলি পাঠ করিতে নিষেধ করি। চিকিৎসাগ্রন্থ পাঠ করা উচিত, কিন্তু এগুলিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কুশিক্ষা ছাড়া আর কিছুই লাভ হইবে না।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এই হীনযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধ ও জৈনগণই কলুষিত করিয়া দিয়াছে। মনুশাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও বিলাসিতা ও কুক্রিয়া যে দেশে বলবতী হইয়া গেল, ইহার মূলে তাহারাই। নাগার্জ্জুনের সময়েই তাহারা এই অবসর প্রচুররূপে পাইয়াছিল; তখনি তাহারা দুইটী দর্শন শাস্ত্র জাল করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে চালাইয়াছিল;—সে দুইটী ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন ও মীমাংসা দর্শন। এই দুইটীই শারীরক মীমাংসা নামে কথিত হইয়া থাকে। একটী পূর্ব্ব আর একটী উত্তর। পূর্ব্বটীতে শারীরক বা জীবাত্মার কথা দূরে থাকুক,

ঈশ্বরের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই, সুতরাং উহার পূর্ব্বশারীরক-মীমাংসা নামকরণ ভ্রমসঙ্কুল। উত্তরশারীরক-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শনটীও একটী প্রবঞ্চনা। যাহা মীমাংসিত ছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়েই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির অনাদিত্ব নিরপেক্ষ ভাবে সৃষ্টির ভাবটী নিরাকৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম, জগতের বিবর্ত্ত এই ভাবটী স্থাপিত হইয়াছে। তারপর অবতার-বাদ ভাগবত মত বৈশেষিকের অণু হইতে জগৎ সৃষ্টিরূপ মত ইত্যাদি খণ্ডিত হইয়াছে। ব্রহ্মের যখন পরিণতিই নাই, তখন বিবর্ত্তভাব কিরূপে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে? সুতরাং যাহা লইয়া এত নাড়া চাড়া, তাহাই হ য ব র ল'য়ে পরিণত হইল। এই কারণে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করও বলিতে বাধ্য হন যে, যাহাকে তোমরা মূল প্রকৃতি বলিতেছ, তাহাই আমাদের ব্রহ্ম; সুতরাং আমাদের মধ্যে আর কোন বিরোধ রহিল না। (দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৯ সূত্রভাষ্য দেখ)। প্রতিজ্ঞাতে সাংখ্যদর্শনের মত অবৈদিক বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছে, অথচ মায়াবাদ স্থাপনের সময়ে চাতুরী খেলা হইয়াছে। প্রথমে বলা হইল, মায়াবাদ বেদে নাই, সেই কারণে জৈমিনি ধর্ম্মের উপদেশ করেন। আবার পরক্ষণেই বলা হইল, মায়াবাদ বেদে আছে, জৈমিনি তাহার প্রমাণ। বাদরায়ণের মতে মায়াবাদ যুক্তি দ্বারা স্থাপিত করিতে পারা যায়, সুতরাং জগতকে মায়া বলিলে কোন বৈষম্য হয় না। (তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ৩৮ হইতে ৪৩ সূত্র দ্রষ্টব্য) ইহা কি শাস্ত্র? না ঋষির রচনা?

যাহার কথার ঠিক নাই—প্রতিজ্ঞার স্থিরতা নাই, সে শাস্ত্র লিখিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে কেন যায়? ইহার প্রধান কারণ আর কিছুই নহে—পবিত্র আর্য্য শাস্ত্রকে কলুষিত করা।—তাহা হইয়াছে। ইহার সংশোধন হওয়া সুদূরপরাহত। মনুতে লিখিত আছে যে, বেদের অবিরোধী আর্য্য ন্যায়-শাস্ত্রের সহায়তায় ধর্ম্মের সংশয়িত বিষয় মীমাংসিত করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম নির্ণীত করিবে (১২ শ ১০৬); এ স্থানে গৌতমের ন্যায়-শাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, মীমাংসা দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিতে বলা হয় নাই। সুতরাং এ গ্রন্থটী অপ্রামাণিক; বেদান্ত দর্শন ও মীমাংসা দর্শনের নিষ্পত্তিগুলি পরস্পরবিরোধী, অথচ বাদরায়ণ ও জৈমিনি উভয়ে উভয়ের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহারা উভয়ে যে এক কার্য্যের ব্রতী ছিলেন, তাহা বেশ বোধ হইতেছে, এই ব্রতটি ঋষির ছদ্মে অর্থাৎ জনসমাজে আপনাকে ঋষি নামে

পরিচিত করিয়া আর্য্য ধর্ম্মকে কলুষিত করা.—তাঁহাদের অভীপ্সিত কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছে। এখন ইহাদের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে গেলে তাহা ঋষিনিন্দা বলিয়া তিরস্কৃত হইবে এবং নিন্দাকারী পামর পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত ও নিন্দিত হইবে।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

ভ্রান্ত।

যে জন গিয়াছে চলি,'
আসিবে না ফিরিবে না
কভু সে আবার ;
যার তরে দুঃখ ছানি'
সুখের ভরেছ ডালা
সে নহে তোমার !

তবে ওরে ভ্রান্ত মন,
আবেগে কেনরে শুধু
বল বার বার,
মায়ার কুহকে মজি,'
অধিকার নাহি যা'তে—
"আমার আমার !"

শ্রীকেদারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

তারকেশ্বরের ইতিবৃত্ত।

"ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥"

হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস, তারকেশ্বরের ন্যায় জাগ্রত দেবতা কুত্রাপি নাই। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি-মুক্তির জন্য একাগ্রতা সহকারে ইঁহার আশ্রয় লইয়া প্রায় কেহই বিফলমনোরথ হন নাই। এজন্য নিত্য শত শত ব্যক্তি তারকনাথ দেবের পূজা দিতে আগমন করিয়া থাকেন। এই তীর্থের খ্যাতি ভারতব্যাপী। হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানের তীর্থদর্শনার্থী এই তীর্থে সমাগত হইয়া থাকেন। লোকের উৎকট পীড়াদি আরোগ্য হইলে পূজাদি দিতে থাকায় ক্রমে ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তারকেশ্বরের মন্দির যে স্থানে, ঐ স্থানকে পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপ বলিত। ইনি সেই স্থানের জঙ্গল মধ্যে প্রস্তর আকারে পতিত ছিলেন। রাজা রাও ভারমল্ল রাঁইয়ের রাখাল বালকগণ ঐ প্রস্তরকে সামান্য শিলাখণ্ডবোধে তদুপরি ফলমূলাদি ছেঁচিয়া খাইত। এই কারণে তারকেশ্বর দেবের মস্তকে অদ্যাপি একটি গহ্বর আছে। মন্দিরের মধ্যে একটি গহ্বর আছে, তাহারই মধ্যে তারকেশ্বর দেব অবস্থিত। গহ্বরটী রৌপ্য-নির্ম্মিত আবরণে ঢাকা থাকে। মহান্তের পূজার সময় অন্য ব্যক্তিকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মহান্তদিগের গিরি, পর্ব্বত, বন, জ্যোতীঃ, পুরী, ভারতী, সাগর, সরস্বতী ইত্যাদি দশটী উপাধি আছে; তন্মধ্যে তারকেশ্বরের মহান্তের উপাধি "গিরি" এবং বৈদ্যবাটীর কালী মহান্তের উপাধি "ভারতী"। কোন মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান "চেলা" গদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে কয়েকটী সমাজ আছে, উহাতে অনেকগুলি মহান্তকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। গোপবংশসম্ভূত তারকেশ্বরের প্রকাশক মুকুন্দ ঘোষের মৃত্যু হইলে, তাঁহার শবমূর্ত্তি মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে সমাহিত হইয়া, তদুপরি একখণ্ড প্রচণ্ড শিলা সংস্থাপিত হয়। অদ্যাপি তীর্থযাত্রী মাত্রেই তাঁহার উপর দুগ্ধাদি অর্পণ করিয়া থাকেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার অধীন দ্বারহাট্টার দক্ষিণ বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ৺সহদেব চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ১৭৩৪ খৃঃ রচিত তাঁহার "ধর্ম্ম মঙ্গল" নামক

গ্রন্থে যে "তারকেশ্বর বন্দনা" নামে একটি কবিতা আছে; ঐ কবিতাটী অদ্যাপি প্রতিদিন মন্দিরের সমীপে গায়কগণ সমাগত ব্যক্তিগণকে শুনাইয়া থাকে। মহান্ত কর্ত্তৃক দেশের যাহাতে উপকার হয়, এমন কোন রূপ কার্য্য হয় নাই। তারকেশ্বরে শিবরাত্রি এবং চৈত্রসংক্রান্তির সময় একটি করিয়া মেলা হইয়া থাকে এবং বহুযাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক; কিন্তু কুলকামিনী অপেক্ষা কুলটা ও বারাঙ্গনার সংখ্যাই অধিক হয়। ১৮৮৫ খৃঃ ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী সেওড়াফুলী ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর তীর্থ পর্য্যন্ত বাইশ মাইলব্যাপী একটি শাখা রেলপথ বিস্তার করিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃঃ তারকেশ্বর হইতে মগরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বত্রিশ মাইল একটি ক্ষুদ্র রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে তারকেশ্বরে ব্যবসায়ীদিগের এবং সমাগত যাত্রীদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

তারকেশ্বরের কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করিলে, এই স্থানের প্রাচীন কাহিনী জানিবার জন্য মনে স্বতঃই বাসনা জন্মে। এই বাসনার কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা-সাধন মানসে এই স্থানের পুরাতন কথাও কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমান-চাকলার অন্তর্গত বালিগড় ও মহেনাবাঘ নামক দুইটী পরগণার অধিকার লইয়া, তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের অধীন একজন মালাকার জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে কেশব মল্ল নামে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজপুত অযোধ্যা প্রদেশান্তর্গত জোনপুর জেলার কালিঞ্জর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। মোগল-কুল-তিলক দিল্লীশ্বর সম্রাট্ আকবর শাহের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া, নানাস্থানীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়লাভ করায়, বাদশাহ আকবর শাহ কেশবের কার্য্যকলাপে ও বাহু-বীর্য্য-বলে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে হাজারী অর্থাৎ এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক করেন। বঙ্গদেশে পাঠান নরপতিগণের অত্যাচার প্রশমিত করিবার জন্য ১৫৬০ খৃঃ মহামতি আকবর শাহ রাজপুত-গৌরব রাজা তোডর মল্লকে সসৈন্যে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন; এবং তাঁহার সহিত কেশব হাজারীকেও আপন অধীনস্থ হাজার সৈন্য সহিত তোডর মল্লের সহকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে নানা স্থানীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে পাঠানগণকে দমন করেন। অতঃপর কেশব হাজারী রাজা তোডর মল্লের সঙ্গচ্যুত হইয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত দ্বারহাট্টা গ্রামের অদূরবর্ত্তী বালিগড় নামক স্থানে বাস করেন। এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত মালাকার-রাজ বাস করিতেন। কেশব হাজারী ঘটনাক্রমে

তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। ফলে মালাকার-রাজ পরাজিত হইয়া কেশবের অধীন হন, সুতরাং তদীয় বিষয় সম্পত্তিও কেশবের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর কেশব হাজারী পুত্র-পরিবার লইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশব হাজারীর তিন পুত্র—বিষ্ণুদাস, ভারমল্ল ও বরদাপ্রসাদ সিংহ। এই স্থানে অদ্যাপি বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। কেশব হাজারীর অন্তিম সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুদাস তারকেশ্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রামনগর নামে একটি পৃথক্ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন।

কেশব হাজারীর মৃত্যুর পর হৃতরাজ্য মালাকার-রাজ তৎকালীন নবাব দরবারে আবেদন করেন। তাহাতে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক বিষ্ণুদাসকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। বিষ্ণুদাস একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। তিনি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন। নবাব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজোপাধির সহিত পাঁচশত বিঘা ভূমি জায়গীর প্রদান করেন, অধিকন্তু তাঁহার গৃহীত পূর্ব্বোক্ত বালিগড় ও মহেনাবাঘ পরগণার রাজ্যাধিকার প্রদান করেন। অতঃপর বিষ্ণুদাস রামনগরের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির ভার মধ্যম ভ্রাতা ভারমল্লকে দিয়া, রামনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃদেবের অধিকৃত ভূমি বর্ত্তমান বাহিরগড়ে গিয়া বসতি করেন। রাজোপাধি প্রাপ্তির পর রাজা বিষ্ণুদাস সিংহ দেশীয় সকল রাজপুতকে একান্নবর্ত্তী করিতে প্রয়াস করিলে, মধ্যম ভ্রাতা ভারমল্ল অভিমত প্রদান করেন; কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরদাপ্রসাদ মত দেন নাই, সুতরাং তিনি ইঁহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার নিকট গড়মন্দারণ (বরদাগড়) গিয়া বাস করেন। বিষ্ণুদাসের পর তাঁহার পুত্র যশোবন্তনারায়ণ সিংহ রাজা হন। তৎপুত্র রাজা জগৎনারায়ণ সিংহ, এবং তাঁহার পুত্র কুমার রঘুনাথ নারায়ণ সিংহ পর্য্যায়ক্রমে তথায় রাজত্ব করেন। এই রঘুনাথের বাল্যাবস্থায় তাঁহার হস্ত হইতে বালিগড় পরগণার রাজ্য লোপ হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া, বালিগড় পরগণার রাজপুত রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। কুমার রঘুনাথ নারায়ণের দুই পুত্র—বীর সিংহ ও শোভা সিংহ। শোভা সিংহের পুত্র গোপাল সিংহ, তৎপুত্র স্বরূপ সিংহ, তৎপুত্র পীতাম্বর সিংহ, তৎপুত্র ক্ষেত্রমোহন সিংহ। হুগলী জেলার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া—কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী বাহিরগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয় রাজা বিষ্ণুদাসের

বংশধর। এই বংশের কোন ব্যক্তি তারকেশ্বরে পূজা দিতে আসিলে অদ্যাপি বহু সমাদর পাইয়া থাকেন।

রাজা বিষ্ণুদাস সিংহ রামনগর পরিত্যাগ করিলে, তদীয় মধ্যম ভ্রাতা রাও ভারমল্ল সিংহ তথায় একাধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি পরম শৈব ছিলেন; চিরকাল শিব-সেবায় দিনাতিপাত করিতেন। তিনি আজীবন বিবাহ করেন নাই বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম—ভৈরবমল্ল। বঙ্গদেশে আসিয়া ঘটনাক্রমে ভারমল্ল নামে পরিচিত হন এবং নবাব সরকার হইতে "রাও রাঁইয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার দ্বারা রামনগর রাজ্যে বহুবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি যে সকল দীঘী, সরোবর, উদ্যান, দেবালয়, পান্থ-শালা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। রাও ভারমল্লই তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কারক এবং তারকেশ্বর শিলার সংস্থাপক। তৎকালে ইহা তারপুর নামে অভিহিত হইত এবং একটি নিবিড় অরণ্যে পর্য্যবসিত ছিল। তাঁহার সময়েই জোৎশম্ভু নামক স্থানে তারকেশ্বর প্রকটিত হন। ভারমল্লের অনেকগুলি পয়স্বিনী গাভী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে "ভারতী"নাম্নী একটি গাভী অপরিমিত দুগ্ধ প্রদান করিত। সেই সকল গাভী ও অন্যান্য পশু পালনের ভার, তারকেশ্বরের পশ্চিম প্রান্তে সাহপুর নিবাসী মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপের উপর ন্যস্ত ছিল। মুকুন্দের অধীনে অনেকগুলি রাখাল বালক থাকে। ক্রমে ভারতী গাভীর দুগ্ধ-পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় রাজা ভারমল্লের কর্ণগোচর হয়। তিনি মুকুন্দ ঘোষের উপর অসন্তুষ্ট হন। তখন মুকুন্দ স্থির করিল, রাখাল বালকগণই চুরি করিয়া ভারতীর দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে রামনগরের উত্তরে একটি প্রকাণ্ড ময়দান ছিল, তাহাতে প্রায়ই জল থাকিত; মধ্যস্থলে দ্বীপের আকারে কয়েক বিঘা ভূমিতে উলু-খাগড়ার বন ছিল। সেই স্থানকে তৎকালে সিংহল দ্বীপ বলিত। রাখালগণ তথায় গোচারণ করিত। এক দিবস প্রাতঃকালে মুকুন্দ ঘোষ প্রচ্ছন্নভাবে রাখালগণের অনুগমন করেন। তিনি তথায় অবলোকন করেন, ভারতী গাভী রাখাল বালকগণের গোপনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর প্রচুর দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে। মুকুন্দ ঘোষ সেই শিলাখণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখেন,—তাহা মৃত্তিকাপ্রোথিত; কিন্তু সেই শিলাখণ্ডে এক অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব বলেন—"আমি তারকেশ্বর শিব; পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইলে! তুমি আমার প্রকাশকর্ত্তা,

অতএব আমার পূজার পর সকলে তোমার পূজা করিবে। অদ্য হইতে তুমি ভৈরবত্ব প্রাপ্ত হইলে"। দেখিতে দেখিতে সেই শিবমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। মুকুন্দ ঘোষ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা ভারমল্লকে তদ্বিষয় অবগত করান। তিনি শিবলিঙ্গ রাজধানীতে তুলিয়া আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অসমর্থ হন। তৎপরে স্বপ্নাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা ভারমল্ল তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ এবং মন্দিরের পশ্চিমে একটি পুষ্করিণী খনন ও সম্মুখে একটি নাট-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ১৬৩০ খৃঃ তারকেশ্বরদেব বর্দ্ধমানাধি-পতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। তিনি স্বপ্নদৃষ্টে ইঁহার মন্দির ও ৫৫০ বিঘা ভূমি দান করেন। রাজা বিষ্ণুদাস সিংহ নবাব সরকার হইতে যে ৫০০ শত বিঘা ভূমি জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহা তিনিও পূর্ব্বে দান করিয়া যান। রাজা ভারমল্ল রাও তারকেশ্বর দেবের সেবার্থে পূর্ব্বোক্ত ১০৫০ বিঘা ভূমি অর্পণ করেন। ইহাই তারকেশ্বর দেবের আদি সম্পত্তি। ভারমল্ল-প্রদত্ত ঐ ভূমি-সম্পত্তির দলিল বহু দিবস যাবৎ মহান্তদিগের নিকট ছিল। কিন্তু ইঁহার জায়গীর-প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির কোনরূপ দলিল না থাকায়, দশশালার বন্দোবস্তের সময় উহা ইংরাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া কেবল ৫৫০ বিঘা ভূসম্পত্তি থাকে। শিংটি—শিবপুর নিবাসী ৺চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। এক দিবস তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে তারকেশ্বর দেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তিনি তারকেশ্বর তীর্থে আগমন পূর্ব্বক পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। রাজা ভারমল্ল নিকটবর্ত্তী ভঞ্জপুর গ্রামে তাঁহার বাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। অতঃপর চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় সপরিবারে তথায় বসবাস করিতে থাকেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিয়া তারকেশ্বর দেবের পৌরোহিত্য করিতেছেন। তারকেশ্বর প্রকটিত হইবার কিছুদিন পরে, ৺জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিয়া শিবাবির্ভাব-বার্ত্তা শ্রবণে, তারকেশ্বর তীর্থে উপনীত হন এবং যথারীতি তাঁহার পূজা বন্দনাদি সমাপন করিয়া উদ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলে, বালিগড়ের মাঠে তারকেশ্বর দেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তথায় অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সুতরাং তিনি তারকেশ্বর দেবের আদেশে ছাঁইর পূজারী হন এবং তদবধি তারকেশ্বরের মহান্তের অস্তিত্ব হইয়াছে।

ভারমল্ল অতিশয় বিবেকী ছিলেন। তিনি স্বীয় চরমকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া তারকেশ্বরের সমুদয় সুবন্দোবস্ত করেন এবং যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ও কর্ত্তৃত্বের ভার মহান্ত জগন্নাথ গিরির উপর নির্ভর করেন।—এই মর্ম্মে রাজা ভারমল্ল রাও একখানি উইল পত্রও স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সমুদয় ভূসম্পত্তি দেবত্র সম্পত্তিরূপে দান করিয়া যান। অতঃপর কয়েক দিবস মাত্র পীড়া ভোগ করিয়া তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কর্ত্তা রাজা ভারমল্ল রাও মানব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবলোকে গমন করেন।

বর্দ্ধমান-রাজের নির্ম্মিত মন্দিরের উপর ১৭০৯খৃঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অর্জ্জনা গ্রামের স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিত বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ১৭৪৪খৃঃ বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক তাহার সংস্কার হয়। ১৮৩০খৃঃ ভূমিকম্পে তাহার বিশেষ ক্ষতি হওয়ায়, বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র রায় বাহাদুর তাহার পুনঃ সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। হাওড়া জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দে মহাশয়ের সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি তারকনাথ দেবের অনুগ্রহে দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। অতঃপর তিনি ১৮৯১খৃঃ মহান্ত মহারাজের প্রাসাদ হইতে শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটী প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন এবং মার্ব্বেল প্রস্তরের নাটমন্দিরটীও তিনি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৮৯৮খৃঃ কলিকাতা বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকের ঘাটের উপর একটি সুন্দর "চাঁদনী" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘী গ্রামের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর মহোদয় মন্দিরের কপাট দুইখানি রৌপ্যমণ্ডিত করাইয়া দিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে গোপবংশসম্ভূত মুকুন্দ ঘোষই তারকেশ্বর দেবের প্রকাশক। মুকুন্দ "গিরি" উপাধিধারী সন্ন্যাসী হন। মুকুন্দ ঘোষকে ছাড়িয়া তারকেশ্বরের মহান্তের সংখ্যা বার জন :—

(১) জগন্নাথ গিরি—তিনি বারবৎসর কাল মহান্ত ছিলেন। তাঁহার দুইজন শিষ্য ছিল—কমললোচন গিরি এবং ফতে গিরি। (২) কমললোচন গিরি। (৩) শম্ভুচন্দ্র গিরি। (৪) গোপালচন্দ্র গিরি। (৫) রাধাকান্ত গিরি। (৬) গঙ্গাধর গিরি—তাঁহার কোন চেলা না থাকায় মৃত্যুর পর প্রসাদ গিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী গদি প্রাপ্ত হন। (৭) প্রসাদ গিরি।

(৮) পরশুরাম গিরি। (৯) মোহনচন্দ্র গিরি—তিনি বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। (১০) রঘুচন্দ্র গিরি—ভারমল্লখাত সিদ্ধি পুষ্করিণী বা দুগ্ধ পুষ্করিণীকে তিনি বৃহৎ করিয়া খনন করাইয়াছিলেন। (১১) মাধবচন্দ্র গিরি—তাঁহার শ্যামচাঁদ গিরি, কেশবচন্দ্র গিরি, উমেশচন্দ্র গিরি, সুরেশচন্দ্র গিরি, শ্রীশচন্দ্র গিরি এবং সতীশচন্দ্র গিরি প্রভৃতি শিষ্য থাকেন। মহান্ত মাধবচন্দ্র গিরি অল্প বয়সে অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া চরিত্রদোষে লিপ্ত হন। মহান্ত ও এলোকেশীর যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এই এলোকেশীর হত্যাভিনয়ে রাজ-বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। মহান্তের কারাবাস কালে ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ শ্যামচাঁদ গিরি তিন বৎসর তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করেন। মহান্ত মাধবচন্দ্র গিরি কারামুক্ত হইয়া আসিলে, শ্যামচাঁদ গিরি সহজে তাঁহাকে তারকেশ্বরের গদি প্রত্যর্পণ করেন নাই। পরে যখন শ্যামচাঁদ গিরি তারকেশ্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন, সেই সময়ে বহু অর্থসহ অনেক প্রাচীন দলিল হস্তগত করিয়াছিলেন। ভারমল্ল প্রদত্ত দলিলখানিও বোধহয় তৎসহ স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। মাধবচন্দ্র গিরির কারাবাস কালে ঢাকার কালীগিরি মহান্ত যখন হুগলীর জজ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন ঐ দলিলখানি দাখিল করা হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার দেহান্তর হয়। (১২) অতঃপর মহান্ত মাধবচন্দ্র গিরি মানবলীলা সম্বরণ করিলে, বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি এবং শ্রীশচন্দ্র গিরি উভয়ের তারকেশ্বরের গদি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ফলে হুগলীর জজ আদালত পর্য্যন্ত মোকদ্দমাটী গড়াইয়াছিল। পরিশেষে রাজবিচারে মহান্ত সতীশচন্দ্র গিরি গদি প্রাপ্ত হন এবং ইঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীশচন্দ্র গিরি তারকেশ্বরের গদি প্রাপ্ত হইবেন—এইরূপ স্থির হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি স্বীয়গুণে গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইয়া, তারকেশ্বরের মহান্তপদে অভিষিক্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহান্ত হইবার কয়েক বৎসর পরে ইঁহাকে গদি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য কলিকাতা খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দে ও অপর কতিপয় ব্যক্তি হুগলীর জজ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। অভিযোগকারীদিগের উক্তি যে, মহান্ত মহারাজ দেবত্র সম্পত্তির অপব্যয় করিতেছেন। কিন্তু তৎকালীন জজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত

কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব সে অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে পুনরায় মহান্ত মহারাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য হুগলীর জজ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতে মহান্ত মহারাজেরই জয়লাভ হইয়াছিল।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের লর্ড বিশপ—পাদরী লাট—তারকেশ্বরের মহান্ত মহারাজের অতিথি হইয়াছিলেন; তাঁহার সেক্রেটারী চিদানন্দ স্বামী লাট পাদরীকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

"বন্দি নে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি,
চারিদিকে জলা জঙ্গল খাগড়ার বসতি!
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর,
তার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেশ্বর!!

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

চন্দ্রমা ও নীহারিকা।

মৃদুভাষে চন্দ্র প্রতি নীহারিকা বলে,
"জ্যোতিষ্ক মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ তুমি,
সান্ধ্য গগনে উঠি খুঁজি সারা নিশি
না পাই তোমার সম আমি।"
চন্দ্র বলে, "নীহারিকা! চেন না আমায়
(তাই) শ্রেষ্ঠ বলি' সম্ভাষিছ মোরে,
দয়া করে সূর্য্য মোরে দিয়েছে কিরণ
(তাই) আলো দানি এ বিশ্ব মাঝারে।"

শ্রীহেমনলিনী দেবী

আমার সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনম্" পিতার এই বাক্য সার্থক হইয়াছে। তিনি আমাকে সংসার-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ চিরদিনের মত ঘুচিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি যে বাড়ীতে বাস করি, যে উপায়ে অন্ন সংস্থান করি, যাহা পরিধান করি, যে তৈজস পত্র ব্যবহার করি, সে সকলই তাঁহার দত্ত। তিনি আমাকে সংসারে আনিয়াছেন, আমায় লালন পালন করিয়া পুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহে আমি লেখাপড়া শিখিয়াছি, মানুষ হইয়াছি, লোক-সমাজে পরিচিত হইয়াছি।

বংশবৃদ্ধিই বাঙ্গালীর প্রধান কার্য্য, পুত্র কথঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া দু' দশ টাকা উপার্জ্জনের অধিকারী হইতে না হইতে, পিতামাতা তাহাকে সংসারী করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যতক্ষণ না তাঁহাদের সে মনসাধ পূরণ হয়, কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, প্রকৃতই একটা গুরুতর অভাব জানিয়া কতক্ষণে এই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত হয়, সে জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন। বলা বাহুল্য, পিতামাতার জীবদ্দশায় আমার বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারা আমার স্ত্রীকে লইয়া কত সাধ আহ্লাদ মিটাইয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন এখন কোথায়? যাঁহাদের আদর-যত্নে, স্নেহ-সোহাগে ভাসিয়া আমার সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইয়াছিল, সে দুইজনেই একে একে আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চির-বিদায় লইয়াছেন। সে স্নেহ, সে মমতা, সে ভালবাসা ইহজীবনে আমাদিগকে আর ভোগ করিতে হইবে না। এক সময়ে তাঁহারা আমাদের পিতামাতা ছিলেন, এখন আমরা আমাদের পুত্র-কন্যার জনক-জননী হইয়াছি; তাঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণে সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসিতে ভার লইয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন, আমরা যথাশক্তি তাঁহাদের পদচিহ্নাবলম্বনে অগ্রসর হইয়াও সুচারুরূপে কোন কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেছি না, পদে পদে ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে।

এক দলের বিকাশে অন্য দলের অন্তরায়। বাপ মা গিয়াছেন, এখন

আমাদের পালা, পুরুষানুক্রমিক এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। খেলার ঘরে পুতুল সাজাইয়া বালকবালিকা খেলে, সংসারেও আমাদের খেলা। পুত্র শশধর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী সওদাগরী অফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত, মাসিক পঞ্চবিংশতি মুদ্রা তাহার আয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পঠদ্দশায় আমি শশধরের বিবাহ দেই, বধূমাতা আমার সংসারের একজন পোষ্য হইয়াছে। কন্যা ইন্দুমতীর যথাসময়ে বিবাহ দিয়াছিলাম, সে এখন পরের ঘরে, বৎসরে দুই তিন ক্ষেপ এ বাটীতে আসিয়া থাকে, কিন্তু সংসারের ঝঞ্চাটে প্রতি ক্ষেপে তিন চারি দিনের অধিক থাকিতে পায় না, আমার বধূমাতাই এখন ইন্দুস্থানীয়া হইয়াছে। গৃহস্থালীর সকল কাজ গৃহিণীকে করিতে হয়, বধূমাতার সহায়তায় এখন তাহার সে কাজের কতক লাঘব হইয়াছে।

পৈত্রিক ভদ্রাসন ভিন্ন আমার আর কিছু ছিল না, সংসারে পুত্র কন্যা ও গৃহিণীকে লইয়া দিনপাত করিতে অর্থের প্রয়োজন, তাহার উপর আচার ব্যবহার, লোক লৌকিকতা ; এ অবস্থায় পদে পদে খরচ না হইবে কেন ? সংস্থান না থাকিলে খরচ পত্রের জন্য বিব্রত হইতে হয়। গ্রাসাচ্ছাদন জন্য পরমুখাপেক্ষী, সারাদিন অন্যের আনুগত্যে থাকিয়া, চাকুরী করিয়া যাহা উপায় করি, দুঃখে কষ্টে তাহাতেই দিনপাত হয়। শশধর এখন আয়ের পক্ষে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে, কিন্তু ইন্দুমতীর বিবাহে ও শশধরের লেখাপড়ার জন্য আমার যে খরচ হইয়া গিয়াছে, তাহা ত সমস্ত আমার আয় হইতে নির্ব্বাহ হয় নাই, সে খরচ সঙ্কুলান করিতে আমাকে পরের নিকট হাত পাতিতে হইয়াছিল, সে ঋণদায় হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারি নাই।

যে সংসারে পাঁচজনের একত্র বসতি, সেখানে অনেকটা পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ নির্ভর করে। সে নির্ভরে একের সুখ-দুঃখে অন্যে ভাগীদার, সে ভার গ্রহণে পরস্পর সহানুভূতি লাভ করে। এ কারণ এক সময়ে একে অন্য দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে সংসারে একক সকল দিক দেখিয়া চলিতে হয়, তাঁহার সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হওয়া প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। আমার অদৃষ্টে ভাই ভগ্নী বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন জীবিত না থাকায়, একমাত্র গৃহিণীকে অবলম্বন করিয়া সাধের সংসার পাতিতে হইয়াছে, শশধর ও ইন্দুমতী সেই সংসার-বৃক্ষের ফলরত্ন। পুত্রকন্যার পালনে যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সংসারী মাত্রেই তাহা সবিশেষ অবগত।

কালস্রোতে সামাজিক রীতিনীতির ঘোর পরিবর্ত্তন, সে অদল বদলে আসল নকল বুঝা যায় না, বড় ছোট ভেদ থাকে না, লঘু গুরুর বিচার হয় না। শশধর আমার সুবোধ পুত্র, আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কখন কোন কাজ করে না, কোথাও যায় না, তাহার খাওয়া পরার কোন বাদবিচার নাই, সংসারে যাহা জুটিয়া উঠে, তাহা পাইয়াই সে সন্তুষ্ট! গুরুজনের প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি, কর্ম্মস্থলে যাহাদের সহিত একত্র কাজ করে, সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, কাহারও সহিত শশধরের অপ্রণয় নাই। বয়সে প্রবীণ না হইলেও দীন দুঃখী গরিবের প্রতি যথেষ্ট দয়া, দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের অভাব মোচনে সর্ব্বদাই অগ্রসর। সকল সময়ে প্রার্থীর অভাব মোচন করিতে না পারিলে শশধর মনে ক্ষুণ্ণ হয় এবং যে কোন প্রকারে তাহাদের অভাব মোচনে চেষ্টা করে, অধিক কি পরের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়াও পরের উপকারে যুবক কদাচ পশ্চাৎপদ হয় না। প্রকৃত পক্ষে পুত্রস্থানীয় শশধর আমার প্রধান সহায়; সাংসারিক খরচপত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার অভাব দাঁড়াইবার পূর্ব্বক্ষণেই সে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এরূপ পুত্রের সহায়তায় আমার সংসারে অভাবজনিত কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু যে পরের মেয়েকে বধূমাতারূপে গৃহে আনিয়াছি, আমার সংসারের চাল চলনে তাহার সকল সময়ে মনস্তুষ্টি হয় না। বধূমাতা আমার স্বেচ্ছায় এমন দুই একটা কাজ করিয়া ফেলেন যে, উহার জন্য আমাদিগকে সময়ে সময়ে বিব্রত হইতে হয়। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে সে বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, অবশ্য আমরা সদ্‌যুক্তি দিতে পারি, কিন্তু তাহার সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ থাকে না। পুত্রকন্যার এরূপ অবৈধ আচরণে জনক জননীর প্রাণে ব্যথা লাগে, যাহাতে এরূপ কার্য্য পুনরায় না হয়, সে বিষয়ে সাবধান করিবার জন্য আমরা কোন প্রকার তিরস্কার করিলেও বধূমাতা সে দিকে লক্ষ্যপাত করে না, তাহার এই অগ্রাহ্য কারণে আমার সাধের সংসারে আর সে সুখ-শান্তি নাই। অবশ্য আমরা স্ত্রী পুরুষে বধূমাতাকে কোন কথা বলিলে শশধর সে কথা কর্ণগোচরে প্রবেশ হইতে দেয় না, অধিকন্তু তাহার স্ত্রীকেই বিলক্ষণ ভৎর্সনা করিয়া থাকে, কিন্তু যে সংসারে পুত্র সহায়স্থানীয়, বধূমাতা শাশুড়ীর সংসারসঙ্গিনী, সে সংসারে এরূপ কোন বিশৃঙ্খলভাব উপস্থিত হইলে কেমন একটা অভাব ঘটিয়া যায়। দুঃখে কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দৈনিক যাহা প্রয়োজন, তাহা কোনরূপে নির্ব্বা-

হিত হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক শান্তির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে সহজে সে চিত্ততৃপ্তি লাভ হইয়া উঠে না, অধিকন্তু সেই বিষয় লইয়া মনোমধ্যে যত তোলা-পাড়া করা যায়, উত্তরোত্তর নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে সমধিক বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"তেলে জলে মিশ খায় না "একটা চলিত কথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, বাস্তবিকই এ উভয়ের পার্থক্য চিরকালই রহিয়াছে। কিন্তু একের সহিত অন্যের মিলনে উভয়ে যদি এক-মন এক-প্রকৃতি না হয়, তাহা হইলে দুইজনকে চিরদিন মনঃকষ্টে অশান্তিতে যাপন করিতে হয়, এরূপ অবস্থায় পরিণয় বিষময় হইয়া উঠে। সহধর্ম্মিণী বলিলেই বুঝিতে হইবে, স্বামীর সকল বিষয়েই স্ত্রী অনুগামিনী; পতি যে আচার ধর্ম্ম রীতিনীতির অনুমোদন করিবে, পত্নীকে সেই পথেই আজীবন চলিতে হইবে, কোন প্রকারে তাহার অন্যথা করিলে তাহাকে ধর্ম্মতঃ ভ্রষ্টা হইতে হয়।

দেশ কাল পাত্র ভেদে এখন পূর্ব্বপ্রচলিত রীতিনীতির ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—একারণ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সমভাবে গৃহীত হয়। পিতা প্রপিতামহের সময়ে যেরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছি, আত্মীয় স্বজনের যে চাল চলন দেখিয়া আসিয়াছি, সে নিয়মের কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিলে প্রাণে কেমন একটা ব্যথা লাগে; সাংসারিক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায়, সে কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইলেও পরক্ষণে তাহার জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়, সেই অনুতাপের কারণ সংসারে অনাস্থা জন্মে, সেই বীতানুরাগ প্রযুক্ত শরীর ভঙ্গ হইয়া যায়, শরীর খারাপ হইলে জীবনধারণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অল্পতা হইয়া আসে! আজীবন যাহাদের সংস্পর্শে দিনপাত হইল, এরূপ মনঃকষ্টের তাহারা কোন কারণ হইল না, অথচ যে সংসারকে অধিকতর প্রফুল্ল থাকিবার কথা, সেই সংসারে এই চিত্ত-বিকারের সঞ্চার।

মানুষ জন্মিলেই মরিতে হইবে, অক্ষয় পরমায়ু লইয়া কেহ এ জগতে আসে নাই, আসিবেও না। ক্ষয় না হইলে লয় হয় না, সুস্থ শরীরে সবল

দেহে এখানে সেখানে যাতায়াত করিতেছি, প্রয়োজন মত খাদ্য-পানীয়ে দেহের পুষ্টি সাধিত হইতেছে, সুস্থাবস্থায় সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। আপনার কার্য্য আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়, সে জন্য কখন কাহারও পক্ষপাতী হইতে হয় না, সুস্থ শরীর ও সবল দেহ থাকায় আমার এ ভাল করিতেছে, কিন্তু সময়ে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও আপনার অধীন জানিয়া ইচ্ছামত তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছি,—এদিক ওদিক চালাইতেছি, ফিরাইতেছি, ঘুরাইতেছি, এক দিন তাহাদের উপর আমার এ শক্তি এ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না; তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিতে সাধ্য সাধনা করিয়াও কোন ফলোদয় হইবে না। সংসারে দৈনন্দিন জীবন যাপনে একের প্রতি অন্যের অবৈধ আচরণের ঘাত-প্রতিঘাতে যে অপ্রীতির সূত্রপাত হয়, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে মন ভাঙ্গিতে থাকে, সেই মনভঙ্গের সহিত শরীরও ভাঙ্গিয়া যায়।

সহধর্ম্মিণীকে লইয়া সংসার, পৈত্রিক ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলে, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ কারণ অহরহঃ আমাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়; পরের দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহাতেই দুঃখে কষ্টে স্বীয় পরিজনবর্গের দিনপাত হয়। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সমস্তই গৃহিণীর প্রতি ন্যস্ত; সে বিষয়ে কি হইল না হইল, আমাকে দেখিতে হয় না; আমি বাহির হইতে আনিয়া যোগাই, আমার গৃহিণী সেই সকলের দেওয়া নেওয়ার সুব্যবস্থা করে। গৃহিণী নিয়মমত সাংসারিক সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছে বলিয়াই আমাকে সে সকল বিষয়ে ভাবিতে চিন্তিতে হয় না। সুখে স্বচ্ছন্দে এতাবৎকাল কাটিয়া আসিয়াছিল, কোন বিষয়ের জন্য একদিনও উদ্বেলিত হইতে হয় নাই। ভগবানের কৃপায় পুত্র বা কন্যা এতাবৎকাল আনুগত্যে থাকিয়া, আমাদের চিত্তবিনোদনই করিয়াছে; ইন্দুমতী আমার এক্ষণে গলগ্রহ নহে, মা আমার সুযোগ্য পাত্রে অর্পিতা, বিধির প্রসাদে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি, আমার ইন্দুমতী এক্ষণে পরের ঘরণী, বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাহাকে স্বামী-গৃহে থাকিতে হয়। হিন্দুরমণী স্বামীর গৃহিণী হইয়া আজীবন অতিবাহিত করিবে, ইহাই কামনা, ভগবৎ-প্রসাদে আমার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে। সুখ দুঃখময় সংসারে কিন্তু কেহ বহুদিন একভাবে কাটাইতে পারে না; আমি ইন্দুমতীর জন্য এক্ষণে আর উদ্বিগ্ন নহি, মা আমার নিজের সংসার নিজে বুঝিয়া গৃহস্থালীর কাজ

কর্ম্ম করিতেছে! অন্যপক্ষে বধূমাতাকে লইয়া আমায় বড়ই বিচলিত হইতে হইয়াছে। সংসার-পথের পথিক করিতে গৃহিণী ও আমি তাহার জন্য প্রতিদিন যে কষ্ট সহ্য করি, তাহা কথায় ব্যক্ত হয় না। আমরা বুড়া বুড়ী এত যে পরিশ্রম করি, সেটা বধূমাতার ধর্ত্তব্য নহে। আমাদের উপদেশ বাক্যগুলি মনোযোগের সহিত বৌমা শ্রবণ করিলে এবং সেই অনুসারে চলিলে এ বৃদ্ধ বয়সে আমাদিগকে এরূপ মনস্তাপ সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু আমরা যাহা যেমন বলিয়া দিই,—যাহা করিতে বারণ করি, স্বভাব-চাঞ্চল্যে বধুমাতা সে সব এককালে ভুলিয়া যান্, আমাদের কথায় এইরূপ অনাস্থার কারণ আমরা মনে কষ্ট পাই, অথচ বধূমাতার সুচারুরূপে কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। আজ কাল পরামর্শ করিয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে কেহ ইচ্ছা করে না, স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠানে অনেক সময়ে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সে দিকে আর লক্ষ্য হয় না, সেই দৃষ্টি না থাকায় সংসারের এই অবনতি। সামান্য কারণে সাজান সংসার ছারখার হইয়া যায়, ইহাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে?

আমার বধূমাতা সুধাংশুবালা বড়মানুষের মেয়ে, তাহার পিতা একজন নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী,—জন-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি! কোম্পানীর বড় চাকুরে হইলে লোকজন যথেষ্ট পরিমাণে রাখিতে হয়; বৈবাহিক রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সে অংশে ক্রটী ছিল না, একারণ বধূমাতা আমার বাল্যকালাবধি বিলাসভোগে লালিতা-পালিতা, সংসারের কাজকর্ম্মে সুধাংশু তাদৃশ অনুরাগিণী নহে, সে আপনার বেশ-ভূষা ও অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া ব্যস্ত; একারণ শাশুড়ীর আদেশমত সংসারের কাজকর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগিনী হইতে পারে না। বধূমাতাকে মনের মত সংসারী করিতে গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু সুধাংশুর চালচলনে তাহা হইয়া উঠে না বলিয়া তিনি তাহার উপর বিরক্তা হন, সময়ে সময়ে তিরস্কার করেন; কিন্তু শুধাংশুবালা শাশুড়ীর সে ভৎর্সনায় আত্মসংশোধনের কোন উপায় করে না, এজন্য আমাকে সময়ে সময়ে বধূমাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইতে হয়। সংসারে পুত্র ও বধূমাতাই আমার সর্ব্বস্ব, কোন কারণে তাহাদের কোন প্রকার অবৈধ ব্যবহার দেখিলেই অনুতাপিত হইতে হয়! শশধর আমার সকল বিষয়েই আজ্ঞাবহ, আমার বা তাহার প্রসূতির অনভিমতে সে আজ পর্য্যন্ত কোন কাজই করে নাই, তাহার জন্য

অবসর—



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

"যোগরাণী" নামক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটী দৃশ্য।

আমাকে বা গৃহিণীকে একদিনের জন্যও মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয় নাই, পুত্র সম্বন্ধে উভয়ে আমরা মনের সুখে কাল কাটাইতেছি, কিন্তু বধূমাতাকে লইয়া বড়ই গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে, তাহাকে যাহা করিতে বলা হয়, অনেক সময়ে তাহা সমাধা হয় না, অথচ এমন কতকগুলি অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে যে, তাহাতে মনে মনে বিরক্ত হইতে হয়। এই জন্যই সাধের সংসারে সুখ পাই না, আপনার লোকে কোন একটা অন্যায় করিলে তাহার প্রতী-কারের চেষ্টা হয়, কিন্তু সে যতক্ষণ না সেই দোষের সংশোধন জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, ততক্ষণ কোন ফল দর্শে না, মনের অশান্তি ভিন্ন ইহাতে আর কিছু লাভ হয় না।

যাহাদের লইয়া সংসার, তাহাদের সংশ্রবে যদি এইরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে সংসারের প্রতি বীতানুরাগের সঞ্চার হইতে থাকে। আমার সংসারে বাহ্যাড়ম্বর কিছুই নাই. পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি না থাকায় পরের দাসত্বব্রতে জীবন যাপন করিতে হয়, পুত্রও পিতার অনুগামী, উভয়ে মাসিক যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতেই দৈনিক অভাব ঘুচিয়া যায়, যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত হয়, পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধেই ব্যয় হইতে থাকে, তাহাতে বধূমাতাকে লইয়া বড়ই অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। সুধাংশুবালার এখনও সম্যক্‌ জ্ঞান বিকাশ হয় নাই, পিতার আদরের কন্যা, শ্বশুরগৃহে কি ভাবে কাটাইতে হয়, এখনও তাহার সে শিক্ষা হয় নাই। বধূমাতা আমার কোন্‌ কার্য্য ন্যায়—কোন্‌টা অন্যায়—ভাবিয়া দেখে না, স্বেচ্ছামত যখন যেটা মনে আসে, তাহাই করিয়া ফেলে। গৃহস্থের সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্যের যথাযথ বন্দোবস্ত না থাকিলেই বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, গৃহিণীর সঙ্গিনী বধূমাতা আমার সংসারের কাজকর্ম্মে অনুরাগী না হইয়া শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সততই যত্নশীল, একারণ ঘর-সংসারের কাজ কর্ম্মে তাহার অবসর হইয়া উঠে না, অথচ গৃহিণীকে একাকিনী সংসারের সকল দিক দেখিতে হয়, তিনি বধূমাতার প্রতি বিরক্তা হইয়া উঠেন! যাহাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইবে, গৃহস্থালী সম্বন্ধে তাহার কোন ক্রটি দেখিলে মন বিচলিত হইয়া উঠে; বধূমাতার সহিত গৃহিণীর এইরূপ অনৈক্য হইলে সংসারের শ্রী-বৃদ্ধির হ্রাস হইয়া পড়ে; শাশুড়ী বধূর প্রতি যে কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্তা, বধূমাতা কর্ত্রীঠাকুরাণীর সে আদেশ প্রতিপালনে উপেক্ষা করিলে সে কার্য্যই সমাধা হয় না, অগত্যা তৎপক্ষে ক্রটি থাকিয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে সময়-সাপেক্ষ, ইচ্ছামত উহা সাধিত হয় না; কিন্তু অবনতির দিকে ধাবিত হইলে, অনতিবিলম্বে অধঃপতন অনিবার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের বিলিবন্দোবস্ত লইয়া শাশুড়ী-বধূতে সময়ে সময়ে মনান্তর হয়, গৃহিণীর ইচ্ছা—বধূমাতাকে মনের মত করিয়া লয়েন, তাহার কাজকর্ম্মে কেহ কোনপ্রকার ত্রুটি ধরিতে না পারে। কিন্তু বধূমাতার সে দিকে তাদৃশ লক্ষ্য না থাকায়, সংসার সম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, সে কারণ গৃহিণী বধূর প্রতি অসন্তোষভাব দেখাইয়া থাকেন, এইরূপ পুনঃপুনঃ সংঘটনে শাশুড়ী-বধূতে মনান্তর দাঁড়াইয়াছে, গৃহিণী বধূমাতার প্রতি বিরক্ত হইলেও স্নেহবশে কোন কথাই ধর্ত্তব্যজ্ঞান করেন না ও স্মরণে রাখেন না, তিনি তাহাকে কন্যার মত আদর যত্নই করেন; কিন্তু সুধাংশুবালা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সদুপদেশে আপনার দোষগুলি সংশোধনের পরিবর্ত্তে বিরক্তিভাব দেখাইয়া থাকে, একারণ গৃহিণী মনঃক্ষুণ্ণা হন; যাহাদের লইয়া সংসার, তাহাদের যদি এইরূপ ভাব দেখা যায়, তাহাতে শান্তির বিনিময়ে যে অশান্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বধূমাতা আমার বড় মানুষের মেয়ে, পিতৃগৃহে যে ভাবে লালিত পালিত হইয়াছে, পতিঘরে সেইরূপ ভাবেই থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে গৃহিণীর কিরূপে মনঃপূত হইতে পারে? এতাবৎকাল শশধর বধূমাতার কোন কথাই গ্রাহ্য করিত না, ভক্তিপরায়ণ পুত্র পিতা-মাতাকে এযাবৎকাল যেভাবে দেখিয়া আসিয়াছে—সেই ভাবেই চলিয়াছে। কিন্তু পুনঃপুনঃ স্ত্রীর প্ররোচনায় শশধরের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মুখে কোন কথা উচ্চারিত না হইলেও তাহার বাহ্যদৃশ্যে আভ্যন্তরিক ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আমি বুঝিলাম – সংসারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছে, এভাবে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইবে না। একমাত্র বধূমাতার বিবেচনার ত্রুটি হওয়াতে সংসারের শান্তি যে চিরদিনের মত চলিয়া যাইতেছে, এ কথা স্বয়ং আমি ভিন্ন কে আর হৃদয়ঙ্গম করিবে?

বহুকষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া,

লোকের সহিত কত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া, সারাদিন পরিশ্রমান্তে পরের টাকা ঘরে আসে, সংসারে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিয়া সেই অবসাদের অবসান হয়! যে সংসারে শান্তির অভাব, সেখানে আর সুখ কোথায়? আমার অদৃষ্টে জীবন ধারণ ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংসারে এতাবৎকাল মনের সুখেই কাটিয়াছিল, বধূমাতার সংস্রবে এখন আমার সে দিন নাই! একদিনের জন্যও শশধরের উপর বিরক্ত হইবার আমার কোন কারণ হয় নাই, সে এতাবৎকাল আজ্ঞাধীন ভাবেই কালাতিপাত করিয়াছে, কিন্তু বধূমাতার পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় তাহারও ভাবান্তর হইয়াছে! যদিও আমাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলায় না, আমাদের অনভিপ্রায়ে সে কোন কাযেই কদাচ হস্তক্ষেপ করে নাই, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পুত্রের কথা-বার্ত্তায় পূর্ব্বে যত আনন্দ অনুভব করিতাম, এখন আর সে স্ফূর্ত্তি পাই না। দিনে দিনে বধূমাতা আমার শশধরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, সেই বিস্তারে সংসার হতশ্রী হইতেছে, গৃহিণী বধূমাতার ভাবগতিক দেখিয়া এখন আর কোন দ্বিরুক্তি করেন না। প্রথম প্রথম তাহাকে সুপথগামিনী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সুধাংশুবালার চরিত্র সংশোধনের তাহাতে কোন উপকার দর্শিল না, অথচ বধূমাতা আপনার ইচ্ছামত কার্য্যেরই প্রশ্রয় দিতেছে। যে ভাবে সংসার চলিয়া আসিতেছিল, তৎপক্ষে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল, অগত্যা শাশুড়ী-বধূতে মনান্তর জন্মিল, বধূমাতার প্রতি শাশুড়ী রুষ্টা হইলে, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কমিয়া যায়। সারাদিন পরিশ্রমান্তে বাটীতে আসিয়া স্ত্রী-পুত্র সম্মিলনে কোথায় মনের সুখে কতকক্ষণ কাটাইব, না—তাহার বিনিময়ে সংসারের কথা লইয়া তোলা-পাড়া করিতে যাইয়া মন বিরক্ত হইতে থাকে। আর এইরূপ মনোমালিন্য প্রযুক্ত শশধর এখন আমায় পূর্ব্বের মত দেখে না, উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাভক্তিতে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। সময়ে বধূমাতা ও শশধরই সংসারের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিবে, গৃহিণী ও আমাকে তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে! যে সংসারে এরূপ ভাবগতিক দাঁড়াইয়াছে, সে সংসার হইতে যত শীঘ্র মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ততই মঙ্গল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কোন কার্য্য হয় না, ভগবানের যতক্ষণ না কৃপাদৃষ্টি হইবে, কোন কাজ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সংসারের প্রতি আমার ধিক্কার জন্মিয়াছে, যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে টানিয়াছি,

যাহাদের মঙ্গল চিন্তায় শরীর পাত করিয়াছি, তাহারাই যদি আমার অশান্তির কারণ হয়, তাহাদের সংশ্রবে যদি আমাকে কষ্টে দিনপাত করিতে হয়, তাহা হইলে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? যাহাদের অবলম্বনে আমি সংসারী হইয়াছিলাম, তাহাদের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া জীবন ধারণে লাভ কি? সংসারে যখন সুখ শান্তি নাই, তখন আর আমার অস্তিত্বের প্রয়োজন কি?

আমার কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে! পুত্র উপায়দার হইয়াছে, বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে সংসারী করিয়াছি, উপযুক্ত পুত্র আপনার মঙ্গলা-মঙ্গল নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। বধূমাতা অন্তঃসত্ত্বা, সময়ে সুসন্তান প্রসব করিয়া আমার বংশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। এক যায়,—আর আসে, এই ধারাবাহিক নিয়মে সংসার চলিয়া আসিতেছে, পিতা-মাতা চলিয়া গিয়াছেন, আমার ও গৃহিণীর দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন শশধর ও সুধাংশুবালা পুত্র-পৌত্র লইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে পারে, ইহাই আমার একান্ত কামনা। এখন যোগেযাগে গৃহিণী ও আমার সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ অচিরাৎ শেষ হইলেই, আমাদিগের কার্য্য পূর্ণ হইল জ্ঞান করিব, ভগবান্ কতদিনে সেই দিন দিবেন?

শ্রী——

দিবা ও নিশা।

দিবা কহে, "নিশীথিনী! ভগিনী আমার,
ঘৃণা হয় দেখে তোর কুৎসিত আচার;
ধনরত্ন চুরি করি' গৃহস্থ পীড়ন,
করে খল পেয়ে তোর তামিস্র ভীষণ।"
নিশা বলে, "দিবা, তোর দগধ শরীর,
কথাগুলি করে মোর শ্রবণ বধির;
শান্তি-সুধা লভে নর আমার আশ্রয়ে,
নতুবা তোমার তাপে যেত যমালয়ে।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

হরিদ্বারে।

৺বিশ্বনাথের প্রিয়ভূমি বারাণসীর কথা সেবার স্বদেশী মাসিক পত্রে বিস্তারিত লিখিয়াছি, অতএব পুনরায় চর্ব্বিত-চর্ব্বণের কোন আবশ্যক দেখি না। যে বরুণা ও অসি নদীদ্বয় হইতে বারাণসী নামকরণ হইয়াছে, বর্ত্তমানে সেই নদী দুটীর অস্তিত্ব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইতেছে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে নর-পুরীষ-পূর্ণ বরুণার পুতিগন্ধ বক্ষ অবলোকন করিলে, কাশী-বাসীর উপর বিরক্ত হইয়া পড়িতে হয়। আদি কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখস্থ এই বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলটী বারাণসীর মধ্যে আমার অতি মনোরম বলিয়া মনে হয়। সেবার কংগ্রেসের সময় যখন রাজঘাটে ছিলাম, তখন অনেক সময় আমি এই স্থানেই অতিবাহিত করিতাম। তখন বরুণায় এত ময়লা দৃষ্টিগোচর হইত না। কাশী সহরের প্রায় সমস্ত ময়লাই এক্ষণে বরুণা বহন করিয়া গঙ্গায় আনিয়া দিতেছে। শীতকালে এই সঙ্গমস্থলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মধুর লাগে। অবসরে প্রেরিত মৎ-লিখিত রঞ্জাবতী গল্পে এই স্থানের কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

কাশী হইতে হরিদ্বারে যাওয়ার কথা বলিবার আগে, মুর্শিদাবাদ হইতে কাশী আশার কথা একটু বলিতে হইবে। আমাকে অনেক সময় মুর্শিদা-বাদের কান্দী মহকুমায় থাকিতে হয়। আমার বাসার দরোয়ানটী বেশ সৌখীন ও পলোয়ান গোছের। কুস্তি ইত্যাদি ধূমধামেই দিন কাটায়। কান্দী থানার ও ট্রেজারির অধিকাংশ কনষ্টেবলই তাহার বন্ধু। তাহারা প্রায় অনেক সময় আমার বাসায় আসিয়া, গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিত এবং আমার নিকট হইতে ৺পূজার—৺হোলির সেলাম দিয়া পার্ব্বণীও রীতিমত আদায় করিত, কাজেই তাহাদের নিকট আমিও একজন বড় গোছের বাঙ্গালীবাবু হইয়া পড়িয়াছিলাম। পুলিশের সিপাহিগণ প্রায় সকলেই আমাকে চিনিত।

বাঙ্গালার জল বাতাস—বাঙ্গালার মাটির—বাঙ্গালীর সহবাসের এমন গুণ এমন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা যে, যে কোন বিদেশী, সে হাজার মূর্খ হউক,—হাজার স্থূলবুদ্ধি হউক না কেন, যে বাঙ্গালার এই সব সঙ্গলাভ করিবে, সে-ই মানুষ হইয়া যাইবে—সে-ই চালাক—সে-ই বুদ্ধিমান হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপ অনেক বিদেশী বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আসিয়া—বাঙ্গালীর রীতি-নীতি শিক্ষা করিয়া, বাঙ্গালী অপেক্ষাও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলের বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের পরিচয় দিবার জন্যই আমাকে এত কথা বলিতে হইল।

আমি কান্দী মহকুমা হইতে ৺কাশীধাম রওনা হইবার জন্য বাণ্ডেল-কাটোয়া—বারহারোয়া রেলের খাগড়াঘাট রোড ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। সাহেবগঞ্জে দিনমানে Coresponding trainর সুবিধা নাই বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের পরামর্শ মতন রাত্রের ট্রেণের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইল।

বারাণসীতে আমার ভগ্নীপতি শ্রীমান রামারঞ্জন মিশ্র (জমীদার) ও কনিষ্ঠ শ্রীমান বিজয়গোপাল রায় A. S. C. মহাশয়ের চাকর, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র মায় Photo camera পর্য্যন্ত লইয়া হরিদ্বার যাইবার অভিপ্রায়ে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া, আমি সঙ্গে কোন লোকজন না লইয়া, সঙ্গের সাথী এক ব্যাগ লইয়াই একাকী কাশী যাইতেছিলাম। ট্রেণ আসিবার কিছু পূর্ব্বেই এক পুলিশের সিপাহি আসিয়া আমাকে হুজুর সম্বোধনে লম্বা চওড়া সেলাম দিল। আমি ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট বসিয়াছিলাম, ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারই ত এক নম্বর হুজুর, তাহার উপর আবার পুলিশের খাকি-জামা খাকি ব্যাগ ঝুলান বুট পরা Constable নিকট আমি হঠাৎ আর এক নম্বর হুজুর হইয়া পড়ায়, আফিসের ভিতর আমার বেশ পসার জমিয়া গেল। Constableটি অনেক দিন বাঙ্গালা পুলিশে কাজ করিতেছে, সে আমার সহিত বাঙ্গালা—হিন্দুস্থানী ভাষাতেই আলাপ পরিচয় করিল, সে ভাষা আমার ঠিক স্মরণ না থাকায়, আমার ভাষাতেই তাহার কথাবার্ত্তা গুলি লিখিতে হইল। আমি সিপাহিকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই; পরে জানিলাম, কান্দী থানায় থাকিবার সময় আমার দরোয়ান রামবিলাস সিংহের সহিত তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে আমার বাসায় কত দিন গিয়াছে, পার্ব্বণীও আদায় করিয়াছে, সম্প্রতি সে বহরমপুর সদরে বদলী হইয়া বেমার অবস্থায় হাঁসপাতালে ছিল, পুলিশ সাহেব ৩ মাসের ছুটী মঞ্জুর করিয়াছেন, তাই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে শরীর সারাইতে দেশে যাইতেছে। তাহাকে মোগলসরাই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে; তাই সে বলিল,—আপনি একা আছেন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যান ত পথে কোন তকলিব পাইতে দিব না। এই কনষ্টেবলের ছোট ভাই সম্বন্ধে ২।৪ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তার নামটী

ঠিক মনে আসিতেছে না, সে তখন লালগোলাঘাট ষ্টেশনে Loc. goods clerk. বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইলেও দেখিতে নিতান্ত ছেলে মানুষ বলিয়া অনুমান হয়। সেরূপ বালক আমাদের বাপ মার নিকট নাবালক মাত্র। অমন বয়সের ছেলেপিলেকে আমাদের পিতা-মাতা বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইতে গেলে আগেই ভাবিয়া খুন হইয়া যান। আমি যতক্ষণ ট্রেণে ছিলাম, তাহার আলাপে বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম, ছেলেটী ভারি চালাক, প্রতি Stationএ চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে, গার্ডের সহিত বেশ জলদ ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহে, কখন কখন এক আধ Stationএ গার্ডের গাড়ীতেও থাকিয়া যায়। তাহার ইংরাজীতে অনেক ভুল থাকিলেও চলতি কথায় বেশ টক্ টক্ করে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহার মনের ভাব প্রকাশের কোন অসুবিধা হইতেছে না। অনুসন্ধানে জানিলাম, খড়গপুরে কোন মিশনারি স্কুলে 5th Class পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল এবং এক গার্ডের নিকট ইংরাজীতে কথা কহিতে শিখিয়াছিল। আরও শুনিলাম, আমার পরিচিত সিপাহি প্রথমে সাহেবের নিকটে ছুটী পায় নাই, এই বালকই কথাবার্ত্তায় পুলিশ সাহেবকে খুসী করিয়া দাদার ছুটী মঞ্জুর করাইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অনেক Graduate (গ্রাজুয়েট) সাহেবদিগের সহিত কথা কহিতে গিয়া Grammerর চিন্তা করিতে করিতে যেরূপ খাপ ছাড়া English বলিয়া ফেলেন ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন, তার চাইতে এই হিন্দুস্থানী বালক কথাবার্ত্তায় অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ! কনষ্টেবল বলিল, হুজুরের ইন্‌টারের টিকিটে দরকার কি? আপনি আমাদের গাড়ীতে চলুন, আপনার সমস্ত অসুবিধা আমরাই দুর করিব। আমি অনেক সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে সেই সিপাহি ভ্রাতাদ্বয়ের সঙ্গ লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। আমার খরচেরও সাশ্রয় হইল এবং বিদেশের সঙ্গীও জুটিয়া গেল। ট্রেণে উঠিবার সময় কনষ্টেবল বলিল, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, আমি Police Sub Inspector Baneras transfer হইয়াছি। আমি বেমালুম মিথ্যা কথা ধরা পড়িবার ভয়ে ইহাতে আপত্তি করিলাম, কনষ্টেবল বলিল, আপনার কোন ভয় নাই, যাহা করিতে হয় আমরাই করিব; আপনি কেবল Sub Inspector এই কথাটী মুখে বলিবেন। আমাদের বাড়ী চন্দনপুর গ্রাম খুলনা ও যশোহর জেলার মধ্যস্থলে অবস্থিত, আমাদের বাড়ীতে টুর উপলক্ষে সাতক্ষীর ও নব গ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্টর ও

দারোগাগণ প্রায়ই আগমন করিয়া থাকেন, দারোগা বাবুদিগের সংস্পর্শে আমি কতকটা তাঁহাদের রীতিনীতি চাল-চলনের বিষয় অবগত ছিলাম। কাজেই কনষ্টেবলের এই প্রস্তাবে তাহার মনিব সাজিতে আমার বিশেষ আপত্তি রহিল না। আমরা থার্ডক্লাশে উঠিয়াই দেখি, ট্রেণে বেজায় ভিড়, ২।১ জন দাঁড়াইয়া আছে, কেবল পশ্চিম দেশীয় একজন মুসলমান এক অর্দ্ধবেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা বিস্তার করিয়া দিব্বি নিদ্রা যাইতেছে, গাড়ীশুদ্ধ সমস্ত যাত্রীই হিন্দু, তাহাতে আবার স্থানাভাবে কেহ কেহ দণ্ডায়মান, কেবল এক জন মাত্র সাদা পায়জামা পরা মুসলমান মিথ্যা নিদ্রার ভাণে শায়িত, কিন্তু কেহই তাহাকে তুলাইতে সাহস করিতেছে না। আমরা তিনজন ঠেলাঠেলি করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। সিপাহি মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ীর অবস্থা দেখিয়াই একটু গরম হইয়া হিন্দী ভাষায় মুসলমানকে ঠেলিয়া দিয়া, তাহার কথার প্রতীক্ষা না রাখিয়া—'বঠিয়ে মহারাজ' বলিয়া আমাকে বসাইয়া দিল। মুসলমানটীও বেশ গরম হইয়া উঠিল। শেষে আইনের তর্ক বিতর্কে মুসলমান শয্যাত্যাগ করিয়া যেমন উঠিয়া বসিল, সিপাহিও অমনি গরম মেজাজে আমার ব্যাগটি বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিল। আমি দারোগাবাবু, কনষ্টেবল আমার সিপাহি, তাহার ছোট ভাই আমার খানসামা, এটা সত্বরেই আমার গাড়ীতে প্রচার হইয়া পড়িল। কনষ্টেবলের সহিত মুসলমানের বাক্‌যুদ্ধের সময় পার্শ্বের বেঞ্চ হইতে দুইজন সাঁওতাল যাত্রী স্থান ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সিপাহি দুইজনও তখন সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। পরের ষ্টেশনে দুইজন যাত্রী নামিতে না নামিতেই সেই ঝাঁকড়া চুল চাপকান পরা মিঞা সাহেবও খাবার বাক্সটী লইয়া সেই বেঞ্চে উঠিয়া গেল। ২।৩টা ষ্টেশন যাইতে না যাইতেই অত ভিড়ের মধ্যে আমার শুইবার পর্য্যন্ত স্থান হইয়া গেল। অনেক হিন্দুস্থানী যাত্রী আমার সিপাহির কাণে কাণে—আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং ট্রেণ হইতে নামিবার সময় আমাকে সেলাম দিয়া গেল। বারহারোয়া ষ্টেশনে সেই মিঞাসাহেবও আমাকে আদাপ দিয়া নামিয়া পড়িল। এইরূপ একজন প্রবাসী হিন্দুস্থানীয় কনষ্টেবলের বুদ্ধি-বলে আমি দিব্বি রাম-রাজত্ব ভোগ করিয়া, নির্ব্বিবাদে নিদ্রা দিয়া প্রাতে কিউলে জংসনে আসিয়া নামিলাম। কিউলে পাঞ্জাব মেলের পরই হাওড়া-দিল্লির এক্সপ্রেশ আসে; ঠিক এই সময় জংসনে আরও দুই একখানি ট্রেণ পর পর আসিয়া থাকে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী থার্ডক্লাসের

প্যাসেঞ্জারদিগকে এই ট্রেণের সময় মোশাপিরখানা হইতে ষ্টেসনে আসিতে দেওয়া হয় না। পশ্চিমে থার্ডক্লাসের যাত্রীদিগের বিশ্রাম-আগারের নামই মোশাপিরখানা, মোশাপিরখানাগুলি ষ্টেসনের প্লাটফরম্ হইতে একটু দূরে থাকে। ইহাকে আমাদের দেশের গোয়ালার চাতাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাই হউক, কিউলে নামিলেই থার্ডক্লাসের যাত্রীদিগকে ভেড়া তাড়ান করিয়া মোশাপিরখানায় তাড়াইতে লাগিল। আমিও প্রমাদ গণিলাম। কনষ্টেবল বলিল—হুজুর থোড়ি পিছাড়ি আইয়ে, হাম্ আগাড়ি যাঁতেহে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের পিছু পিছু আমি ও আমার সেই ইংরেজী বলা হিন্দুস্থানী বালক, দুইজন চলিতে লাগিলাম। গেটের নিকট গিয়া দেখি, কনষ্টেবল দণ্ডায়মান আছে। পাঞ্জাবী টিকিট-কলেক্টর আমাকে দেখিয়া সেলাম দিয়া গেট ছাড়িয়া দিল, আমরা তিন জনে প্লাটফরমের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। শুধু তাহাই নহে, আমি প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া পড়িলাম, সিপাহি দুইজন দরজায় উপবেশন করিল। আমরা কিছুক্ষণ পরে হাওড়া-দিল্লি এক্সপ্রেশে উঠিয়া পড়িলাম, এইরূপে আমার সেইরূপ সম্মান বাড়িয়া গেল। বাস্তবিকই আমার জন্য পৃথক্ একখানি বেঞ্চ পড়িয়া থাকিল। তখন বেলা উঠিয়াছিল, কনষ্টেবল আমার মুখ ধুইবার জল মায় দাঁতন পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া দিল, আমি তাহার ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম. পথি মধ্যে সুযোগ মত কিছু জলযোগ করিলাম, এবং আমার সঙ্গী দুইজনকে পেট ভরিয়া খাওয়াইলাম। আমি একজন Non Smoker, কিন্তু তবুও খাইবার ভাণ করিয়া, এক কৌটা সিগারেট পর্য্যন্তও খরিদ করিয়া কনষ্টেবলকে দিলাম; সে আমার উপর যৎপরোনাস্তি খুসি হইয়া পড়িল। সে অবশেষে তাহার পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং পুলিশ লাইনে ঢুকিয়া এযাবৎ কি ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, সমস্তই আমাকে বলিল। কনষ্টেবল বলিল—তাহার ঠাকুরদাদা হাবিলদার ছিল, পিতাও বর্ত্তমানে পল্টনের পেন্‌শান্ প্রাপ্ত সিপাহি, তাহার একটী চাচাতো ভাই দশাশ্বমেধ ঘাটের পুলিশ চৌকির জমাদার। কনষ্টেবল নাছোড় বান্দা হইয়া আমার নিকট তাহার পরিচয়-পত্র দিল, শুধু তাহাই নহে, হরিদ্বারের সন্নিকট নাজিমাবাদ ষ্টেশনে তাহার এক জ্ঞাতি ভাই টিকিট-কলেক্টর ছিল, তাহার নামেও এক পত্র পাইলাম। আমরা বেলা ১২টার সময় মোগল-সরা'য়ে নামিলাম, মোগল-সরাই হইতে ৪৷৷০ টার সময় কাশীর

ট্রেণ ছাড়ে। এত দীর্ঘকাল কোন যাত্রীকে ষ্টেশনে থাকিতে দেয় না, কাজে-কাজেই সকলকেই মোশাপিরখানায় আশ্রয় লইতে হয়, আমরা বাঙ্গলা দেশের, হিন্দুস্থানীর পরস্পরের একতা দেখিয়া বিস্মিত হই। ভাগলপুরের লোকে হয় ত সাহারাণপুরবাসীকে দেশভাই বলিয়া এক হইয়া দাঁড়ায়। এ রীতি কেবল হিন্দুস্থানীদিগের এক চেটিয়া নহে। প্রবাসে থাকিলে বাঙ্গালীরও সে ভাবটী আপনাআপনি আসিয়া দাঁড়ায়! কেবল বাঙ্গালী কেন, পরদেশে সব জাতিরই এইরূপ অবস্থা হয়। মোগল-সরাইয়ে নামিয়া কলিকাতার এক জেলেটোলার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কখনও বেনারস আইসেন নাই, চেঞ্জের জন্য গণেশ মহল্লা অন্নপূর্ণা-ঠাকুরাণীর বাসায় যাইতেছেন। তিনি একা, কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন, আমাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; কারণ আমার গন্তব্যস্থান গণেশ-মহল্লার সন্নিকটেই ছিল। তিনিও মোশাপির খানায় চলিতেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গে অতদূর যাইব শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম,—মহাশয়! আমি যে সবইনস্পেক্টর, আমার সঙ্গে থাকুন, দেখুন শেষ পর্য্যন্ত কতদূর গড়ায়, না হয় অবশেষে দুজনেই মোশাপিরখানায় আশ্রয় গ্রহণ করিব। বাহাদুর আমার সেই বাঙ্গালার পাণি খাওয়া আগ্রা জেলার সিপাহি! তাহারই যোগাড়ে এবারও পূর্ব্বের মত গেট খুলিয়া গেল, আমরা নির্ব্বিঘ্নে কাশী ট্রেণের প্লাটফরমের প্রথম 'শ্রেণীর বেঞ্চে স্থান লাভ করিলাম, সেইখানে বসিয়াই রাবড়ি পুরি ও বাঙ্গালী বাবুটীর ঘরের তৈয়ারী নানাবিধ খাবারে উদর পূরণ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলের চেষ্টায় বিনা আয়াসে এতদূর আসিয়া পড়িলাম, পথে কোথাও দারোগাবাবুর আত্ম-পরিচয় দিতে হয় নাই বলিয়া, বুক হইতে যেন সাতমণ একটা পাষাণ নামিয়া গেল! দুঃখ রহিল আমার সেই সিপাহির ভ্রাতার! পরে—মহারাজ মেহেরবান্ করকে মাত্ ভুলিয়ে, হাম জরুর খুমেগা ফিন্ বহরমপুর্মে ভেট হোগা, সেলাম—বলিয়া তাহারা আমার সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আগ্রা ট্রেণে চলিয়া গেল। সেপাইয়ের কথা অনেক সময় মনে পড়ে, প্রবাসীদিগকে ভগবানই এইরূপ বন্ধু অনেক সময় মিলাইয়া দিয়া থাকেন, আমি এরূপ বন্ধু বিদেশে আরও দুই এক স্থানে পাইয়াছি। আমরা কাশীতে কিছুদিন থাকিয়া, আমাদের কোন বন্ধুর নিকট হইতে জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব প্রাইমিনিষ্টার ৺কান্তিবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একখানি পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া, অডিদ রোহিলা খণ্ডর

পাঞ্জাব মেলে হরিদ্বার রওনা হইলাম। ফাল্গুনের ফুল্লরজনীতে সবুজ গম-খেতের ভিতর দিয়া, সাদা আফিং ফুলের বাতাস খাইতে খাইতে আমাদের রেল, বন্ধুর কঙ্করাবৃত পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূ ধূ ধূ ধূ বালিভরা নদীভাঙ্গার উপর দিয়া—মেঘের দেশে—দেবের দেশে—হরিদ্বারে—আকাশের দিকে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

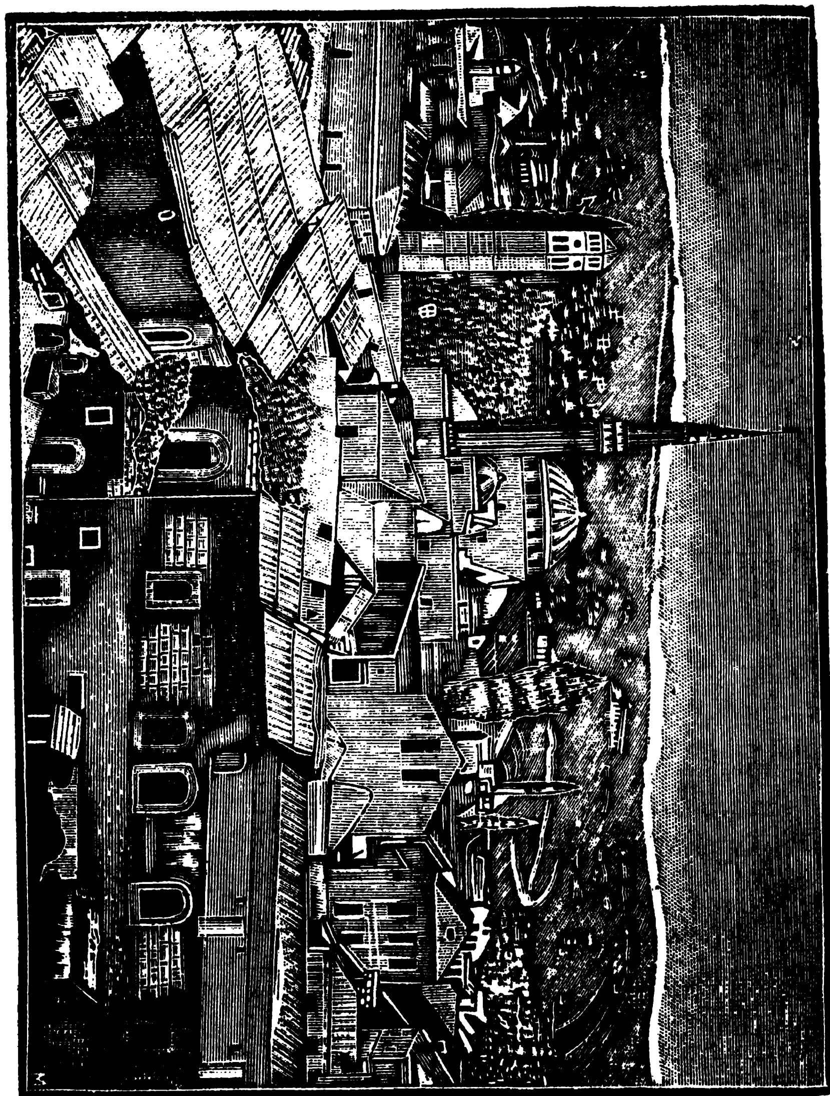
ধ্যান।

দুঃখ-দৈন্য-লাঞ্ছনা-মাঝে
দেবতার ধ্যান—
সেত সকলেই করে!
বিষয়-বাসনা-লালসে
দেবতার ধ্যান
ধ্যায়ানে বলিগো তারে।

অশ্রু।

হৃদ্য সুন্দর মনোরম তবে,
আত্মীয়-স্বজন-বিরহে—
অশ্রুপাত—সে অশ্রু-পাত নয়,
ভেসে যাওয়া স্বার্থ-প্রবাহে।
বিশ্বের অণু-কীট-কণা-তরে,
যদি বিন্দু অশ্রুও ঝরে,
সিন্ধুসম সে দেবতার কাছে
কুন্দ-কুসুম-মালারে!

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।



পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের উন্মেষ ক্ষেত্র।

সিরাজিভো সহর।

এই সহরে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌-দম্পতী নিহত হন

শিক্ষার দোষ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ননির মাতা দেবর-সন্নিকট হইতে বুঝিয়া গেলেন, তাঁহার দ্বারা কিছুমাত্র কার্য্য হইবার প্রত্যাশা নাই।

বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা রাধাচূড়া ফুলের গাছের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ননির মাতা বড় ব্যথিত-হৃদয়ে চিন্তা করিলেন—এখন কি করা যায়! যাঁহাকে নিতান্ত আপনার লোক বলিয়া জানিতাম,—যিনি আমাদেরই যজমানগুলি লইয়া নিজ উদর পূর্ণ করিতেছেন—যিনি এক মুঠা চাউল আর চারি আনা পয়সার জন্য ননির পিতার সঙ্গে পাঁচক্রোশ রাস্তা চলিয়া গিয়াছেন—যাঁহার অভাবে ননির পিতা ডাকিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তিনিই যদি এরূপভাবে জবাব দিলেন, তবে অপরে সাহায্য করিবে কেন? অপরের কাছে গিয়া আর কি করিব? কিন্তু এ অপমান—এত পদদলন সহ্য করিয়া এ গ্রামে থাকিব কেমন করিয়া? হীরু যদি আরও অপমান করে—তাহা হইলেও রক্ষা করিবার ত কেহ নাই? তখন কি করিব? গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব কি? না গেলে ত উপায় নাই,—শেষে কি সর্ব্বনাশ হইবে! কিন্তু হঠাৎ যাইবার সাধ্যই বা কোথায়? আমার যে চারিদিকে জিনিষ-পত্র পয়সাটা কড়িটা ছড়ান। এ সকল জাল কুড়ান কি—দু'দশ দিনের কায! তবে না হয়, ননিকে খবর দেই—সে আসিয়া বাড়ী পঁহুছিলে, আর কার সাধ্য যে অত্যাচার করে!

কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, সে আসিয়া যদি এই সকল কথা শোনে—তবে একটা লাঠালাঠি—মারামারি উপস্থিত হইতে পারে। এমনই কি হবে,—দেশে কি মানুষ নাই, মাথার উপর কি ভগবান নাই!

কিন্তু কে মানুষ,—কাহার শরণ লই? কে স্ত্রী জাতির লজ্জা-নিবারক—কে দুর্ব্বলের সহায়—অরক্ষিতের রক্ষক? হঠাৎ মনে পড়িল, শ্যামাচরণ স্মৃতি-ভূষণের কথা। তিনি বড় পণ্ডিত—অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী—ব্রাহ্মণের পুরোহিত, ব্রাহ্মণের গুরু। দেশের লোকের ব্যবস্থাদাতা—মানে-সম্ভ্রমে

তিনিই এ দেশের শীর্ষস্থানীয়; এ বিপদে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাঁহার বাড়ী নাদকুঞ্জ—আধক্রোশ তফাতে। ভাল, গ্রামের ভজহরি ভট্টাচার্য্য, মদন মুখুয্যে, চারু বাড়ুয্যে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, দামোদর দত্ত, বামাচরণ বোস, শশী সেন—এ সকলকে এক এক বলিয়া দেখা যাউক;—সকলেই ত আর উমেশ চক্রবর্ত্তী নহে!

ননির মাতা তখন স্খলিত পদে, ব্যথিত অন্তরে, কম্পিত হৃদয়ে গ্রামের সকলের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিলেন। কিন্তু কোথাও প্রাণভরা সমবেদনার শান্তনার একটু স্নিগ্ধ বাক্যও শুনিতে পাইলেন না। সর্ব্বত্রই—"দেখা যাবে। আচ্ছা ভাল, কতদুর কি হয় দেখ,"—কোথাও বা—"সীতানাথকে একবার বলিয়া দেখি। সে আমার বিশেষ খাতির করে"। কোথাও বা—"তাই ত, এ বড় অত্যাচারের কথা, কিন্তু উপায় কি! ওদের অবস্থা এখন ভাল।" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া আসিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর;—দ্বিপ্রহরের খরদিবাকর-করে পৃথিবী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। ব্যর্থ চেষ্টার পূর্ণ মনোবেদনা বুকে করিয়া সেই রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণীবক্ষে যখন একটি রমণী অত্যাচারের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তখন গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকেই স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া গৃহমধ্যে ছায়াতলে বহুরস-সমন্বিত আহার্য্য ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন।

সেই সকাল বেলা শ্বাশুড়ী বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফিরিলেন না, এজন্য বধূ নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। শ্বাশুড়ী যখন সীতানাথকে তাহার পুত্রের কথা বলিতে গিয়াছিলেন, ননির স্ত্রী চপলা তখনই স্নান করিয়া আসিয়া রন্ধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। তারপরে শ্বাশুড়ী 'এই আসেন এই আসেন' করিয়া এতক্ষণ কাটাইল। এখন মধ্যাহ্নকাল অতীত হইতে যায়, তথাপি শ্বাশুড়ী ঘরে ফিরিলেন না, ইহাতে সে অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত হইল, কিন্তু কি করে—সে বউ মানুষ কোথায় যায়? বাড়ীতে আর একটি লোকও নাই যে, তাহাকে শ্বাশুড়ীর অনুসন্ধানে পাঠায়। অন্য দিন হইলে প্রতিবাসী কাহাকেও ডাকিয়া পাঠাইতে পারিত। আজ সে বাটীর বাহির হইতে ভয় পাইতেছে। হীরু পশুর ন্যায় তাহাদিগকে যেরূপ ভয় দেখাইয়া গিয়াছে—তাহার বাটীর বাহির হওয়া সে নিরাপদ বলিয়া মনে করে নাই।

যখন সে চিন্তার দারুণ উদ্বেগ বুকে করিয়া প্রতি পত্র-কম্পনে বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল,—সেই সময় শুষ্কমুখে তাহার শ্বাশুড়ী আসিয়া

দরোজা খুলিয়া দিতে ডাকিলেন। শ্বাশুড়ীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চপলা ছুটিয়া গিয়া দরোজা খুলিয়া দিল এবং শ্বাশুড়ী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পুনরায় দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়া শ্বাশুড়ী বউয়ে রন্ধন গৃহের দাবায় উঠিল।

শ্বাশুড়ীর মুখ চিন্তা-বিশুষ্ক দেখিয়া বধূ বলিল—"মা, মুখ যে শুকিয়ে গেছে? বেলা কত হ'য়েছে,—ঘরে ফিরতে এত বেলা কেন ক'ল্লে মা?"

শুষ্ক অথচ বিস্ফারিত, উজ্জ্বল অথচ করুণার্ত্ত নয়নে বধূর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া শ্বাশুড়ী বলিলেন,—এই সীতে বোস আর তার ছেলের পিণ্ডি দিবার জন্মে অনেক চেষ্টা ক'রে ফিরিতেছিলাম; আমরা তাদের কুল-পুরোহিত কি না!"

বধূ। কি হ'ল? পশুর কথা শুনে তার বাপ কি বলিল?

শ্বাশুড়ী। সে কি তেমনি বাপ? গরিবের টাকা হ'য়েছে—ধরা সরার মত দেখছে,—অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না। মানীর মান—দেবতা—ব্রাহ্মণের খাতির তাদের কাছে কি আর আছে মা?

বধূ। শুনে কি বলিল?

শ্বাশুড়ী। "ছেলে আমার তেমন নয়—তাই ত-বিশ্বাস ত হয় না"—এমনি ভাবে কতকগুলা বাজে কথা।

বধূ। উচ্ছন্নে যাবেন? তবে এত বেলা হ'ল কেন মা?

শ্বাশুড়ী। গ্রামের মধ্যে—দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি।

বধূ। কেন?

শ্বাশুড়ী। কেউ যদি আমাদের সহায় হয়—কিন্তু সারা-গ্রাম ঘুরে দেখলেম—কেউ নাই। অসহায়ের সহায় নাই। রুক্ষ মাথায় তেল দিবার মানুষ মিলে না—তেলা মাথায় তেল ঢালিতে সবাই যায়। আ'জ কা'ল সীতে বোসের অবস্থা ভাল—বিশেষ সে জমীদারের কাজ করে—ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা কইতে চায় না। আমাদের কথা কেউ কাণেই তোলে না।

বধূ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা ভয় কি মা? এটা ইংরেজের রাজত্ব—ইংরেজ-রাজত্বে পশু-বল খাটে না।"

তারপরে বাটি পূরিয়া তেল আনিয়া শ্বাশুড়ীকে মাখাইয়া দিল। শ্বাশুড়ী পুকুরে যাইবার জন্য উঠিতেছিলেন, বধূ বলিল,—"বড় বেলা হ'য়েছে মা,—রোদে মাটি তেতে তাঁহা তাঁহা কোর্‌ছে—আস্‌তে পা পুড়ে গেছে—তেষ্টায়

কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে,—বেলা অনেক হ'য়েছে—বাড়ী স্নান কর—এখন পুকুরে যাওয়া সহজ নয়।"

শ্বাশুড়ী। জল ?

বধূ। যা আছে—তাতেই তোমার স্নান হবে এখন। বিকালে নয় একবারের স্থলে দু'বার যাব এখন।

শ্বাশুড়ী। তবে তাই আন মা—আর পাচ্ছি না।

(ক্রমশঃ)

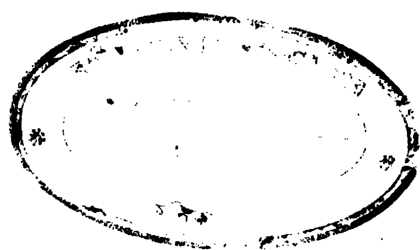
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সাময়িক সংবাদ।

মৌলবি দীন মহম্মদ কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাহাদুর ও বাবু হিমাংশুভূষণ রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক ক্ষতিপূরণের নালিশ করিয়াছেন। অভিযোগের কারণ এই যে, মৌলবি সাহেবের "ক্রুসেড ও জেহাদ" নামক পুস্তক গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ না করিলেও পুলিশ ঐ পুস্তক লইয়া গিয়াছেন। মৌলবি সাহেব পুস্তকের মূল্য, মোকদ্দামার খরচ ও সুদ প্রভৃতি ধরিয়া ১,৫১৮৲ টাকার দাবী করিয়াছেন। মোকদ্দামা এখনও বিচারাধীন।

বঙ্গে যেমন আর পাঁচ সম্মিলনী আছে, তেমনি ব্রাহ্মণসম্মিলনীও হইল। এবৎসর ইহার কার্য্য হইয়াছে, বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া ষ্টেসনের নিকট নন্দেশ্বরী-পীঠসমীপে। আগামী বৎসর আর একস্থানে হইবে। এইরূপে বৎসর বৎসর—ব্রাহ্মণগণ কনফারেন্স করিয়া ঘুরিবেন। বেশ !

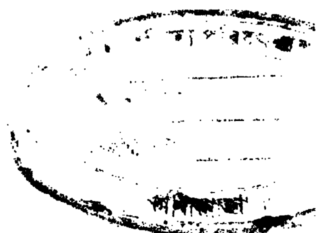
পি, এম্ বাগচী এণ্ড কোম্পানীর নূতন পঞ্জিকা এবার কলিকাতার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রীত হইতেছে বলিয়া রাষ্ট্র। কয় বৎসর ধরিয়াই এরূপ শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে গণাপড়াও এই পঞ্জিকার ভাল !



অবসর—



পল্লী-উদ্যান-বাটীকার দৃশ্য।



নব বর্ষে—আবাহন।

এসগো নূতন বর্ষ! করি আবাহন
তেয়াগিয়া জরা-জীর্ণ বিগত জীবন ॥
নির্ম্মল সরসী-জলে
ফুল্ল শত-শতদলে
ভ্রমর মধুর স্বরে করিয়া গুঞ্জন
জানাইছে জগজনে তব আগমন ॥

হাসিছে নবীন চাঁদ নবীন আকাশে,
গাহিছে বিহগকুল নবীন হরষে ॥
নবীন আনন্দে ধরা
সাজিয়াছে মনোহরা
হেরি তব আগমন প্রকৃতি উল্লাসে
সেজেছে জোছনা-সিক্ত চারু ফুলবাসে ॥

সারাটি বরষ ধরি কেঁদেছ আপনি,
কাঁদায়েছ জগতের কত শত প্রাণী ॥
কত দীর্ঘ হা-হুতাশ
সহিয়াছ বার মাস
অনাহারে অনিদ্রায় কত আত্মগ্লানি
সহিয়াছ মানবের দিবস-যামিনী ॥

তাই আজি সুশীতল মলয় পবন
এসেছে মুছাতে তব মরম-বেদন ॥
নবীন বিটপি-রাজি
নব ফুল-ফলে সাজি
মরি কি সুন্দর শোভা করেছে ধারণ
পূজিবারে নব বর্ষ! তোমার চরণ ॥

অনন্ত করুণাময় জগৎ-ঈশ্বরে
প্রণমি আইস বর্ষ! নব হর্ষভরে ॥

বিনাশি আঁধার ভ্রান্তি
লয়ে এস সুখ শান্তি
বরিষ পীযুষধারা অবনী-ভিতরে,
ভাসুক এ মহাবিশ্ব নব সুখ-সরে ॥

দরিদ্র উদর ভরি করুক ভোজন,
দারুণ বিদ্রোহে হ'ক শান্তি সংস্থাপন ॥
সাধুর নির্ম্মল প্রাণ
'সততা' করিয়া দান
বিমল 'প্রতিভা' রাশি করুক অর্জ্জন,
অভাগার অশ্রুবারি হউক মোচন ॥

নীচমতি মূর্খ যারা স্বার্থ-পরতায়
পর-হিংসা পর-চর্চ্চা করিয়া বেড়ায় ॥
সাধুরে করিয়া চোর
দেখায়ে ধর্ম্মের জোর
বৃথা আস্ফালন করি কুকর্ম্ম বাড়ায়,
অনুতাপে দগ্ধ হ'ক তাদের হৃদয় ॥

শ্রীস্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

দেহ-পরিণাম।

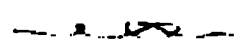
শিথিল হইবে তনু দৃষ্টি হবে ক্ষীণ,
পরিপাটী দন্তগুলি হবে গো বিলীন ;
দেহের লাবণ্যধারা, আর নাহি রবে।
তরঙ্গ-শোভিত কৃষ্ণ কেশরাশি সবে,
হবে জানি একদিন তুষার বরণ ॥
নাহি রবে নয়নের উজল কিরণ,
সুমিষ্ট সঙ্গীত আর শুনিতে না পাবে ;
কণ্ঠে আসিবে না গান, স্পর্শসুখ যাবে।
অসীম দেহের শক্তি আর নাহি রবে ;
নরগণ কেন করে সদা গর্ব্ব তবে ?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

শুভদৃষ্টি।



প্রথম পরিচ্ছেদ।



অল্প বয়সে ম্যালথসের থিয়রীটা মাথায় ঢুকিয়া প্রভাতকে বাতিকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর সম্প্রতি সে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েক খণ্ড গ্রন্থ ও জীবনীও পড়িয়াছিল। এই সব নানা কারণে বাঙ্গালাদেশের বর-কন্যার বাজারে যখন তার খুব চড়া দামে বিক্রীত হইবার কথা, তখন সে এমন বাঁকিয়া বসিল যে, কেহই তাহাকে বিবাহে লওয়াইতে পারিল না!

তাহার যে এক উত্তর ছিল, সেই উত্তরের বলে সে সকলকেই হঠাইয়া দিত। বলিত,—বিবাহ না করিয়াও যখন ঠিক মানুষটী থাকা যায়, তখন বিবাহ করিয়া কয়েকটা অযোগ্য মানুষের পিতা হওয়া অপেক্ষা, নিজেকেই-সংসার-সুখে বঞ্চিত রাখা ভাল।

এই লেকচারে দাদা রজনীকান্ত অনেক আগেই হঠিয়া গিয়াছিলেন, শুদ্ধ এক বিধবা পুত্রহীনা পিসিমাতাই, এই মাতৃহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের পশ্চাতে একক দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনিই তাহার সমস্ত খেয়ালকে আপনার সুগভীর স্নেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া সন্তানের প্রবর্দ্ধমান স্বাধীনতাকে নিঃসঙ্কোচে বাড়িয়া যাইতে দিলেন। এত লেখা-পড়া শিখিয়া ছেলে যে কখনও বেঠিক হইতে পারে না, এই একমতে মত লইয়া সকলকে প্রভাতের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না—তাঁহার চিরকালের ইচ্ছা ছিল, অল্প বয়সে প্রভাতের বিবাহ দিয়া, একটি টুক্‌টুকে ছেলেকে প্রভাতের কোলে দেখিয়া সুখে শেষের নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন,—কিন্তু ভগবান এমন করিয়া যে তাঁহার সব সাধগুলি ভাঙিয়া লয় করিয়া দিবেন, তাহা কে জানিত?

একদিন গোপনে রজনীকান্তের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখ দেখি বউমা, যদি তার বিবাহে মত করাতে পার—আর ক'দিনই বা বাঁচবো আমি, প্রভাতকে সংসারী দেখে মরতে পা'রলে সুখী হতুম; তাকে আমি এতটুকু বেলা হ'তে মানুষ ক'রে এসেছি।

বিন্দুবাসিনী ফিরিয়া আসিয়া হতাশ সংবাদ দিয়া কহিল;—ঠাকুরপো তাঁহাকেও—সেই এক উত্তর দিয়া দিয়াছে, আরও আজ নূতন করিয়া এমন গোটাকয়েক কথা বলিয়াছে, যাহার ষোল আনা মনে করিয়া আনাই কাহারও পক্ষে অসম্ভব!

তখন গোপনে গোপনে পিসিমা ভগ্নী গিরিবালার বাড়ীতে খবর দিয়া দিলেন,—মনের ভাবটা, যদি দশজায়গায় দশজনার দেখিয়াও সংসারের দিকে মন যায়।

গিরিবালা পূজার সময় তাহাদের দেশের বাড়ীতে ভাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল!—প্রভাত যাইতে স্বীকৃত হইল!—

কিন্তু পূজার সময়টা স্নেহময়ী পিসিমাতা, প্রভাতকে কাছ ছাড়া করিয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিলেন না;—কহিলেন,—পূজার সময় কত দেশ-বিদেশের লোক ঘরে আসচে, আর ঘরের ছেলে যে বিদেশে যাবে, সে কিছুতে হ'তে পার্ব্বে না। অগত্যা পূজার পরেই যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে প্রভাত তাহার দিদি গিরিবালার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ইহার আগে সে কখনও গিরিবালার বাড়ী যায় নাই—যতবার যাইতে আসিতে হইয়াছিল—দাদা রজনীকান্তই গিয়াছিলেন।

নূতন স্থানের নূতন দৃশ্যে—তাহার চিত্ত কেমন এক অজানা পুলকে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। এখানকার আকাশ বাতাস শুদ্ধ তাহার চোকে কেমন মনোহর ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য করিবার তখন তাহার তত অবসর ছিল না। কারণ, বাড়ীর দারোয়ান রামরূপ মিশির তখন তাহার মস্ত গালপাট্টা দুটা ফুলাইয়া প্রভাতের আর দুই দিন আগে না আসার দরুণ আক্ষেপ করিতেছিল। সে বলিতেছিল—আর দুই দিন আগে আসিলেই তাহাদের দাদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিত। প্রভাত বুঝিল যে, মন্মথবাবুর আর দুইদিনও অপেক্ষা সহে নাই—ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে মাথায় রাখিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। চাকরীটুকু বজায় রাখিতে বাঙ্গালীর এমনি ঐকান্তিক চেষ্টাই বটে।

দিনমানটা একরকম কাটিয়া গেল মন্দ নয়—তবু তাহার বড় ফাঁকা বোধ হইতেছিল—ভগ্নীপতি মন্মথবাবুর সহিত একবার দেখা হইল না!—

আহারের সময় মন্মথবাবুর দুই ভগ্নী আসিয়া তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছিল, তাহার বিবাহ না করার কারণ এবং তাহার

সংসারে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার হেতু কি? আরও কত কি বৃত্তান্ত, কিন্তু সে তাহাদের কোন কথার একটা সদুত্তর দেয় নাই।

সন্ধ্যার সময় পূজার দালানের রোয়াকে দাঁড়াইয়া প্রভাত এই কথাগুলা চিন্তা করিতেছিল—আর অস্তাচলাবলম্বী দিনকরের শেষ রশ্মিটী কেমন নারিকেল গাছের উপরে লাল হইতে ফিকা লালে, ফিকা লাল হইতে কেমন একটা সোণালী আভায় ক্রমেই মিশিয়া যাইতেছিল, তাহাই দেখিতেছিল।

এমন সময় সহসা কে ডাকিল—প্রভাতবাবু! প্রভাত চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল—লতিকা!—মন্মথবাবুর পিস্‌তুতো ভগ্নী। তাহার দৃষ্টি যেন সহসা একটা তীব্র বিদ্যুদ্দাম বিকাশে দমিয়া গেল।

লতিকা কহিল,—জল খাবেন না প্রভাতবাবু? না ওই মেঘের পানে চেয়ে থাকলেই পেট ভ'রে যাবে? একটা রহস্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া, লতিকা প্রথম আলাপেই এতটা বলিতে সাহস করিয়াছিল। প্রভাতও বলিতে যাইতেছিল—রহস্য ভাষাতেই—ভরে নাকি সুন্দরী? ঐ রূপ সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার লহরীগুলি গণিতে গণিতে মানুষ তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা জন্ম-মৃত্যু সব ভুলিয়া যায়?—

কিন্তু কথাটা নিতান্ত কবিত্বময় বলিয়া অন্যভাবে একটু হাসিয়া ও কাশিয়া কহিল,—আমাদের ত ঐ আকাশের পানে চেয়েই দিন কেটে যায়। জল না খেলেও চলে!—

লতিকা স্মিত দৃষ্টিতে প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—এ জ্ঞান তা হ'লে আপনারও আছে। তবু ভালো!—লতিকা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভাতও তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ চলিয়া গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে সন্ধ্যাটা প্রভাতের বড় সুখে কাটিয়া গেল। এমন রহস্যালাপসূচিত আরামদায়িনী সন্ধ্যা, সে বুঝি তাহার বিশ বৎসরকার সারাজীবনে কখনও পায় নাই।

আহারান্তে লতিকা স্বহস্তে পান সাজিয়া আনিয়া দিল। তাহার পর

শালালোকের যাহা কখনই প্রাপ্য নয়, লতিকা একটা কলিকায় আগুন চড়াইয়া গাল ফুলাইয়া ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাত ব্যস্ত হইয়া কলিকাটী লতিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া হুকায় চড়াইয়া দিল।

যদিও ইতিপূর্ব্বে সে কখনও তামাক খায় নাই—তথাপি আজ ধরিল!—নবীনার তামাক সাজা ব্যর্থ করিতে পারিল না!—

আস্তে আস্তে তামাক টানে আর—এক একবার খুব নীচু দৃষ্টিতে অতি সন্তর্পণে নবীনার যৌবনোচ্ছলিত মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া লয়। দৃষ্টিটা যেন তাহার নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই বাধাইয়া দিল।

প্রভাতও অনেক করিয়া ভাবে যথেষ্ট স্বাভাবিকতা রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু কিছুতে জড়িমার হাত এড়াইতে পারিল না। হঠাৎ এ তাহার কি হইল? প্রতিবার চাহনিতেই হৃদয়ে যেন কেমন একটা সৌন্দর্য্য-স্রোত বহিয়া যায়, কোথা হইতে একটা উচ্ছলিত পুলক-স্রোত নামিয়া আইসে। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সুপ্ত কামনাগুলি জাগ্রত হইয়া এই সৌন্দর্য্যের পদতলে তাহার অহৈতুকী স্তব নিবেদন করিতে চাহে!

কিন্তু মূঢ় ভক্তের জড়িমায় দেবতার সামান্য কৌতূহল বৃদ্ধি হয় মাত্র। ইঙ্গিতে আভাসেও জানায় না যে "আমি তোমায় অনুগ্রহ করি।"

প্রভাত আর একবার লতিকার পানে চাহিতে লতিকা ঈষদ্ধাস্যে কহিল,—আগুন ধরলো আপনার, না ভাল ক'রে ফুঁ দিয়ে দেব।

প্রভাত হাসিয়া কহিল—তুমি যাতে আগুন ধরিয়েছ লতিকা, সে কি কখনও নিবতে পারে?

লতিকা কহিল,—না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন না।

প্রভাত জোরে একটা টান দিয়া তাহার কুণ্ডলায়িত ধূম বাহির করিয়া কহিল,—দেখ সে কেমন অন্তরে বাহিরেই জ্ব'লে উঠেছে।

লতিকা চিবুকে করাঙ্গুলি দিয়া হাসিতে লাগিল, এমন সময় বিধবা নিরাভরণা মলিনা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

রমণীর নামটী যদিও মলিনা, কিন্তু তাহাতে হাসিমাখা এমন এক ভাব ছিল, যাহা বসন্তের নিরালসা শুভ্র তটিনীর উপর অজস্র চন্দ্রকিরণ-রেখাপাতের মত সবটা দেবত্বে ও কবিত্বে মণ্ডিত।

মলিনা প্রথমতঃ আসিয়া লতিকার দিকে এমন এক রহস্য-বিজড়িত

কটাক্ষপাত করিল, যাহাতে লতিকা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, দিদি আমাদের সর্ব্বদা লাল হয়েই আছে,—বুঝি কারু কোপ কারু উপরে ঝাড়বে বলে এসেছ, কি বলো দিদি ?

মলিনা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, কারু কোপ কি ? তোরই উপরে আমার যত আক্রোশ ! যদি দেবতাটি ভাগ্যক্রমে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তবু তার ধ্যান ভঙ্গ না করলেই নয়। আহা, দেখ-দেখি—এমন ভাবভোলা সদাশিব ! তাপস।

লতিকা হাসিয়া কহিল, মরণ ! ঢং দেখে বাঁচি না, বুড়ো বয়সে সক্ যেন উথলে উথলে উঠছে।

মলিনা কৃত্রিম কোপে চক্ষু পাকাইয়া কহিল, কি এত বড় কথা ! আমি বুড়ো ! আচ্ছা জিজ্ঞেস দেখি এই মশায়কে ? মশাই ! সত্যি বলবেন, এই যে ছাই ঢাকা আগুণ, একি একদিন জগৎ গ্রাস করতে পারতো না ! আজ যদিও এ সজ্জা, তবু বলুন দেখি পুরুষের দৃষ্টি কাকে আগে পছন্দ করে ? উত্তর দিন মশায় !

প্রভাত হাসিয়া কহিল, আমি আর কি বলবো বলুন ! আমার দুইই সমান—গঙ্গা আর যমুনা—কাকে থুয়ে কার কথা বলবো, যখন দুইএরই উদ্যত তরঙ্গ এসে আমার পাষাণ প্রাচীর টলিয়ে দিয়ে যাচ্চে !

'উহুঁ হ'লোনা' বলিয়া মলিনা একখানা চেয়ার সরাইয়া লইয়া প্রভাতের কাছে আসিয়া বসিল। তারপর লতিকার দিকে আর একটা কটাক্ষ হানিয়া কহিল, বেচারা স্বামীটির দিকে যদি এমনি আগ্রহভরে চাইতিস লতি ! এমনি, আজ যেমন একজনার পানে চাইছিস। এমনি এত কাছে !

"তা হলে সে শিকল ছিঁড়ে পালাতো না বোধ হয়" বলিয়া প্রভাত কথাটা শেষ করিয়া দিল।

লতিকা দুই জনেরই দিকে একটা কোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "ওই ছাড়া তোমাদের আর কি অন্য কথা নাই ? আমার স্বামী আমায় যদি নাই-ই নেয়," বলিয়া চলিয়া গেল।

'খুব তাড়িয়েছি', বলিয়া মলিনা চেয়ারে বসিয়া হাসিতে লাগিল। প্রভাতের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমারও মনটা এতে একটু দুঃখিত হ'লো, কেমন না প্রভাত ? আচ্ছা ভাই, তুমিও একটা বিয়ে ক'রে ওমনি একটা সঙ্গী জুটিয়ে নাও না !

প্রভাত মুখটা ফিরাইয়া কহিল, নাঃ—ওসব বিষয়ের আমি কোন দরকার দেখি না।

মলিনা কহিল, দরকার দেখ না ত চিরকাল এমনি কার্ত্তিকটী হয়ে থাকবে ?

"এর মধ্যে ঢের কথা আছে" বলিয়া প্রভাত কথাটা পাল্টাইয়া কহিল, আচ্ছা দিদি ! ওইযে লতিকার স্বামী, তিনি কেন অমন বলুন ত ? আমরা ত বিবাহ করিই নাই. কিন্তু তিনি কেন বিবাহ করে নিজ পত্নী না গ্রহণ কচ্চেন।

"তিনিও যে তোমার মত বিএ পাশকরা শিক্ষিত হে", বলিয়া মুখটা ভার করিয়া কহিল, মানুষ হ'য়ে মানুষকে এত দুঃখ বোধ হয় কোথাও কেউ দেয় নি।

প্রভাত একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কেন ?

"কেন তবে শোন,"বলিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিনোদের সব অবস্থার কথাই বলিয়া গেল। তাহার বাপ যে তাহায় আইন পড়িবার খরচ দেয় নাই, তাহারাই তাহার পড়িবার সব খরচ চালাইয়া আসিয়াছে, মায় জল খাবার পর্য্যন্ত, সেটুকুও জাঁক করিয়া বলিতে বাদ পড়িল না। তারপর, বিবাহের পর কবে কোন দিন কলেজ কামাই করিয়া বিনোদ তাহার বালিকা বধূটীকে দেখিতে আসিয়াছিল, সেটুকু শুদ্ধ পরম আগ্রহে বলিয়া গেল।

প্রভাত বলিল, এত যখন ভালবাসা ছিল, তা এখন আসেন না কেন ?

"কে জানে" বলিয়া আবার বিনোদের ওকালতী ব্যবসায়ে হতোদ্যমের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। এই ওকালতী ব্যবসায়ই যে তাহার সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব-লোপের কারণ, একথাটা প্রভাতেরও হৃদয়ে গাঢ়তর মুদ্রিত হইয়া গেল। তাহার অন্তরটা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য ভারি বেদনাগ্রস্ত হইয়া উঠিল।

হায়, লেখা-পড়া শেখার পরিণাম যদি এই মনুষ্যত্ব-লোপই হয়, তবে তাহার শিক্ষার কি প্রয়োজন ? প্রভাত একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মলিনার বেদনাতুর হৃদয়খানিকে আরও ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিল।

মলিনা গাঢ়স্বরে কহিল, দেখ ভাই, লতি আমাদের বড় অভাগিনী, ছেলে-বেলায় মা-বাপ হারা, এখন এ বয়সকালে যদি স্বামীর সোহাগ হতে বঞ্চিত হ'লো, তবে তার মত হতভাগিনী কে আছে ?

প্রভাত আশ্বাস দিয়া কহিল, চিরকাল এদিন থাকবে না দিদি, পকেটে কিছু জমলেই আবার যে বিনোদবাবু,—সেই বিনোদবাবুই হবেন।

মলিনা কহিল, সে তোমরাই ব'লতে পার ভাই। নইলে দিতে থুতে বলো, তা আমরা যেমন দিয়েছি, একটা ঘর-কন্নার সামগ্রী অন্যে তেমন দেয় না। তবু এই যদি তার নিয়তি হয়, কি কর্ব্বো?

ইতিমধ্যে কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল।

পার্শ্বের এক ঘরে গিরিবালা ও লতিকা তাস খেলিতেছিল, প্রত্যেকবারের খেলায় হারিয়া লতিকা তাহার যত আক্রোশ, বৌদির ভাইয়ের উপর ঝাড়িবে বলিয়া অকালে খেলা ভাঙ্গিয়া দিল। কারণ গিরির যখন ভাই, তখন গিরির সম্বন্ধে ভাইএর কাছে ঠাট্টাটা নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে পরম তৃপ্তিকর হইবে না। তখন মস্ত একটা রাগ ভাঙ্গা-ভাঙ্গির ব্যাপারে অনেকেরই টান পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহার চিত্তে প্রভাতের কৌতুক-হাস্যটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাজিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া ঘর হইতেই উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, প্রভাতবাবু! আপনার দিদি কতদুর খেলোয়াড়, তা জান্তে পেরেছেন, কতবার গোলাম হারিয়েছেন, বলিতে বলিতে প্রভাতের ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, এখন আমার কাছে খাট স্বীকার না করলে ত আর গোলাম ফিরিয়ে দিচ্চিনে।

গিরি হাসিয়া তাসগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিতে লাগিল, তা বল না কেন, আমি হা'রলে ত? তুমি হেরেছ, তুমিই চেঁচাও বেশী!

লতিকা প্রভাতকেই মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, আচ্ছা আপনারাই মীমাংসা করুন এর, কার কি শাস্তি পাওয়া দরকার। প্রভাত চুপ করিয়া রহিল।

মলিনা হাসিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, আচ্ছা আমি এর মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি; গিরি হেরেছে, আজকের মত ও সারারাত বিরহ-শয্যায় শয়ন করে থাকুক। আর তুই গোলাম জিতেছিস্, ওর ভাইটীকে নিয়ে দীর্ঘ দিবসের বিরহ ভুলে যা!

লতিকা লজ্জায় লাল হইয়া মলিনাকে একটা ক্ষুদ্র রকমের আঘাত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিতে লাগিল, হাঁ,তাই বৈ কি,আমিই ত খেলাতে হেরেছি!

মলিনা, প্রভাত ও লতিকা দুজনেরই দিকে একটা স্নিগ্ধ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তাতে দোষই কি লতিকা, মনে করনা ঐ যদি আজ তোর স্বামী হ'তো, কেমন হে প্রভাতবাবু? হ'তে কি ইচ্ছাটাও করে না?

প্রভাতেরও তখন কিরূপ লজ্জায় কর্ণমূল লাল হইয়া গিয়াছিল, কোন

একটা লাগসই উত্তর তাহার মুখে যোগাইল না। শুদ্ধ নীরবে হাসিতে ও কাশিতে লাগিল। মলিনা আবার জিজ্ঞাসিল, তোর কি মত লতি?

জড়িমার আবরণী হইতে নবোদ্ভিন্ন উষাকর-রেখাটার মত ঈষৎ-রক্তিম মুখে তরুণী লতিকা তাহার দিদির গলা টিপিয়া কহিল, তোমার মুণ্ডে বাজ আর কি?

মলিনা হাসিয়া কহিল, তবে যেখানে না, সেই খানেই ত হাঁ, কি বল হে প্রভাতবাবু? তোমার পক্ষে এতটা বলছি—আর তুমি চুপ করে আছো! ততক্ষণে লতিকা তাহার দিদির কণ্ঠ চাপিয়া কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

মলিনা তবু লতিকাকে প্রভাতের ঘরের দিকেই ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল! লতিকাও ছুটিয়া বাহিরে যাইয়া কহিল—দাঁড়াও, আবার তোমার সঙ্গে একহাত লড়ছি! বলিয়া ছুটিল—

হায়! এসময় প্রভাত একবার লতিকার লজ্জাকাতর কি আনন্দকাতর মুখখানির দিকে চাহিতেও পারিল না। প্রবল একটা বিদ্যুৎ রঙ্গে-ই সে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অপরূপ স্বপ্নময়ী হইয়া কাটিয়া গেল। সেই যে "ইচ্ছা করে না কি তার স্বামী হ'তে" এই কথাটা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাকে কখনও ঊর্দ্ধে কখনও নিম্নে টানিয়া তোলপাড় করিয়া দিয়াছিল। সকাল বেলাতে তখনও তাহার সে নেশা কাটিয়া যায় নাই। তাই সে যখন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল—তখন সে জগতের উপরে আজ একটা অপরূপ দীপ্তরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল—সে যেন শুনিল, পাখীর স্বর আজ ভিন্ন! স্বপ্নে যে ঝঙ্কারটা শুনিয়াছিল, সেই ঝঙ্কারেই আকাশ ভরিয়া রহিয়াছে, বাতাসের মৃদু উচ্ছ্বাসের মধ্যেও কি একটা গোপন রহস্যের আভাস অনুভব করিল। চাহিয়া দেখিল—লতিকার শাখে আজ অপর্য্যাপ্ত প্রস্ফুটিত কুসুমসম্ভার।

প্রভাতের চিত্ত যেন কোন্ অজানা দেশের বারতা পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল! উধাও হইয়া ছুটিবার জন্য সে তাহার কল্পলোকের ডানা দুটী মেলিয়া উড়িবে কি একবারেই মরিবে ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে, এমন সময় একদল

বালক আসিয়া, তাহাকে পাইয়া বসিল!—কাল কখন কথার ছলে তাহা-দিগকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলিবে বলিয়াছিল, তাহাই তাহারা স্মরণ করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

তাহারা যখন আসিয়াছে, তখন তাহাদিগকে ফিরান অনুচিত ভাবিয়া প্রভাত পূজার দালানে বসিয়া অনেকখানি লেকচারই দিয়া গেল। কহিল—ধর্ম্ম, আমাদের যা ধরে রাখে, পূজা অর্চ্চনা বিধি-নিষেধের মধ্যেই আমাদের ধর্ম্ম নাই। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই আমাদের তা পেতে হবে, সে কর্ম্ম আবার বিশ্বহিত! লোকহিত!—সেখানে "আমি" নাই! আমি সেখানে ম'রেছে, শুদ্ধ এইটুকুর জন্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যে, অসত্য হ'তে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হ'তে আলোকে নিয়ে যাও। ভূমার সঙ্গে আত্মার যোগ ঘটিয়ে দাও। সেখানে ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশঃ দেহি নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি—

লেকচারটার যে একটা খুব জমাট ভাব আসিয়া জমিতেছিল না, তাহা প্রভাতও বুঝিতেছিল—শ্রোতৃবর্গও যে না বুঝিতেছিল তাহা নহে, তবু আজকের ছন্দকে স্বচ্ছন্দগতিতে টানিয়া আনা তাহার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য।

তবু মোটামুটি একরকম বলিয়া গেল—ও শ্রোতৃবর্গও করতালী দিল, এবং সে ধ্বনি যে অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহাও বেশ বোঝা গেল!

অবশেষে রবিবাবুর কয়েকটা ধর্ম্মপুস্তকের কথা বেমালুম নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনার বক্তব্য শেষ করিয়া দিল।

পাড়ার জনকতক পল্লীবৃদ্ধও আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, বাঃ! চমৎকার ত!—এতো সব নতুন কথা! তাহারা অভ্যর্থনা করিবার কিছুই না পাইয়া দুইহাত তুলিয়া প্রভাতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল!—অন্তঃপুরের আয়োজন কিন্তু অন্যরূপ হইয়াছিল। সে বাড়ীর দ্বারে প্রবেশিতেই একটী ছোট সুন্দরী বালিকা, তাহার গলায় একটি বিনি সূতার মোটা মালা পড়াইয়া দিয়া গেল। আর পার্শ্ব হইতে, দুই ভগ্নী উচ্চকণ্ঠে হুলুধ্বনি দিল। উপরে শঙ্খও কে বাজাইল যেন! প্রভাত বুঝিল যে, এই দুই নহলা দহলা ভগ্নীর ষড়যন্ত্রেই এ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে।

না খুসি হইয়া পারিল না!—কহিল—মশায়দের এ সামান্য সন্ন্যাসীটার গ্রেপ্তারের জন্য এত আয়োজন কেন; যখন বেচারা কটাক্ষেই মরিয়া আছে?

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উঁহু,—ঠিক মত জালে ফেলতে আরও অনেক খানির প্রয়োজন—কারণ ওলটা নেহাৎ বুনো কি না?

প্রভাত হাসিয়া কহিল, এর বাড়া আর কি ক'রবেন দিদি?

লতিকা চোক টিপিয়া কহিল, ফলেই যখন জান্তে পার্ব্বেন, তখন এত তাড়াতাড়ি কেন?

প্রভাত "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

বাস্তবিক সেই দিন হইতে বেচারা এমন ভাবে ভিতরে বাহিরে আনন্দে ও কৌতুকে জড়িত হইয়া যাইতে লাগিল—যাহা ছাড়াইয়া যাইতে তাহার পক্ষে পরে অনেকখানি কষ্টকর হইয়াছিল। আহারে জলের গেলাসের ঢাকনি খুলিতে দেখে জল নাই! অন্ন এমনভাবে কৃত্রিম শোলাকুচিতে নির্ম্মিত, যাহা পাখার বাতাসে ঘরময় হইয়া যায়! পানের ডিবায় পানের পরিবর্ত্তে আরশুলার বাচ্ছা! প্রভাত যেন একটা রহস্যের সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গেল। এ আলো অন্ধকারের উদ্বেল নর্ত্তন-লীলা হইতে জাগিয়া উঠা তাহার পক্ষে যেন এখন একান্ত দুঃসাধ্য! পড়িয়া পড়িয়া কি মধুর অধঃপতন অনুভব হয়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া ছিল! শয্যায় শুইয়া প্রভাত জানালা-পথে, আকাশের নিবিড় নীলিমায় আপনার নয়ন-দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল!—একখণ্ড উদাস জলভরা মেঘ আকাশের সেই স্থানটা ভরিয়া দিতেছিল,—আবার তখনি সরিয়া যাইতেছিল, এইটে বেশ গাঢ়ভাবেই তাহার চোকে আসিয়া পড়িতেছিল,—মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধ আকাশের—চিলের ডাকও কর্ণে প্রবেশিতেছিল; আর হৃদয়ের মধ্যে তাহার একটা অব্যক্ত ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছিল। এমন সময় শুনিল, যেন মৃদু বলয়ের শব্দ,—

চোখে আলোর উপরে যেন আলোর একটা তরঙ্গ খেলিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল লতিকা!—এসময়ে কিন্তু সে লতিকার আদৌ আগমন সম্ভাবনা করে নাই। সহসা এই অসম্ভাবিত সুহৃৎ-সমাগমে, তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ছাপাইয়া যেন একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়া গেল!—সে উচ্ছ্বাস-প্রেমে কূল প্লাবিত, নয়—বেদনায় উন্মথিত। আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া প্রভাত উচ্ছ্বাসভরেই বলিয়া উঠিল—এই সেই রূপের সুরা! যা—নন্দন হ'তে নেমে এসে মানুষকে তার জীবনের যথার্থতা জানিয়ে দিচ্চে,—যা একদিকে সুরার মত প্রবল, অন্য দিকে সুধার মত কল্যাণদায়িনী।

লতিকা একটা বাক্স খুলিতে খুলিতে, সেখান হইতে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, ও কি ব'লছেন প্রভাতবাবু ?

প্রভাত বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া একেবারে খাড়া দাঁড়াইয়া কহিল, ব'লছিলাম সেই কথা ; যা দুজনের মধ্যে কখনও হয় নাই, যা জীবনের মধ্যে অপ্রকাশ ছিল, এ এক নতুন রহস্য-বার্ত্তা—যে তুমি উজ্জ্বল দীপশিখা, আমি উন্মত্ত পতঙ্গ, আমি মৃত্যু, তুমি তাতে জীবন-লহরী—নইলে !—

"চুপ" বলিয়া লতিকা ঈষদ্ধাস্যে, প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—আসুন দেখি, কথাটা না হয় পরেই কইবেন এখন। এখন আমার এই বাসের শিশিটার শিপি খুলতে পারেন যদি, পারেন ত আপনিও কতকটা ভাগ পাবেন অবিশ্যি—

না বলাটা কিছুতে প্রভাতের ঘটিয়া উঠিল না। এই সখের খাটুনীটুকু খাটিতে তাহার কি আগ্রহই জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু দৈবের কি নির্ব্বন্ধ, উভয়ের হস্ত সংস্পর্শে শিশিটা এমন বেমালুম ভাঙিয়া গেল, তাহার এক বিন্দু সুবাস শিশির গায়ে থাকিল না—সবটা মেঝের উপর পড়িয়া তাহার অনাস্বাদিত গন্ধে ঘর ভরাইতে লাগিল। সহস্র বকুল বেলার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত সুবাস-উদ্গার।

দোষী দুইজন নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে পরস্পরকে দোষী ঠাওড়াইতেছে, এমন সময় বাহিরে কাহার দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

প্রভাত কহিল, কে বল দেখি ?—

লতিকা কহিল,—দিদি, কিন্তু কি ব'লবে,—এই ভাঙা শিশি দেখে ?—

দুই জনেই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় মলিনা সশব্দে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া শিকল তুলিয়া দিল—দুই জনেই থ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল !—বার বার তাহাদের সহস্র মিনতিতেও দ্বার খুলিয়া দিল না—উপরন্তু মালিনী মাসীর দোহাই দিয়া, এমন এক ছড়া কাটিয়া গেল যে, দুই জনেরই তাহাতে লজ্জায় কর্ণমূল লাল হইয়া গেল।

প্রভাত কহিল, এসো লতিকা, যখন বিপাকে পড়া গিয়েছে, তখন এম্নি অবস্থাতেই কিছুক্ষণ থাকা যাক্।

লতিকা কহিল, দাঁড়ান আগে দিদির গঙ্গা-যাত্রাটার ব্যবস্থা করে তবে আমি বার হ'চ্চি - বলিয়া দেরাজের কাছে গিয়া, দেরাজ হইতে উলের

বাণ্ডিল,—কাঁটা,—অৰ্দ্ধপ্রস্তুত মোজার বাক্স বাহির করিয়া কহিতে লাগিল, এইগুলো সব জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দেব, তবে নিশ্চিন্ত হবো—

এই বলিয়া ক্রমাগতই সেগুলা বাহির করিয়া স্তূপীকৃত করিতে লাগিল !—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে লতিকার এ অভিমানের আয়োজন, তাহা তাহার ব্যর্থ হইয়াছিল ; কারণ মলিনা জানিত, এই দ্রব্যগুলিতে তাহারও যে পরিমাণ টান আছে, লতিকারও তাহার কম নাই। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হইয়াই বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল, আর শুধু ব্যাকুল প্রভাত একটি চকিত করুণ দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখনই লতিকা সেগুলা রাগ করিয়া ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইবে, তখনই বাধা দিয়া বলিবে, "আহা, কাজ নাই।"

অভিমান যখন একান্ত রূঢ়, প্রেম তখন এম্নি সজাগ যে আপনার বক্ষ দিয়া প্রিয়তমার যত্ন-লালিত দ্রব্যগুলি রক্ষা করিতে উদ্যত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

গুণের আদর।

কাকের বাসায় জনমে কোকিল
বর্ণ বটে তার কাল,
কুরূপ হ'লেও গুণের প্রভায়
জগৎ ক'রেছে আলো।
হে শিশু, করিও জ্ঞান অর্জ্জন
হেরিবে নির্ম্মল আলো,
রূপের প্রভায় হ'য়োনা মুগ্ধ
সকলে বাসিবে ভাল।

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

কথাটী নূতন না হইলেও নূতন করিয়া বলিতে দোষ কি? কথাতেই আছে "দশ মুখে ধর্ম্ম," নয়জনে নয় রূপ বলিয়াছেন, আমি না হয় দশম স্থান অধিকার করিয়া প্রচলিত বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলাম। অপর নয় জনেই যে একমত হইয়াছেন, তাহা নহে এবং আমিও যে তাঁহাদের কাহারও না কাহারও সহিত এক মতাবলম্বী হইব তাহারও স্থিরতা নাই, তবুও এ সম্বন্ধে দুটো কথা বলিবার সুযোগ ত্যাগ করিব কেন? আবার আমার কথাও যে কিয়দংশে ফলবতী হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ও জনৈক বন্ধুকর্ত্তৃক (অবশ্য নববিবাহিত) বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া আজ এই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। সাহস খুবই আছে যে দুটো নূতন কিছু বলিয়া ফেলিব, আর হয় ত সঙ্গে সঙ্গে খুব বাহবাও পাইব, কিন্তু যদি নাই পারি তাতেই বা লজ্জা কি? বলেঃ—

"দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।"

এরূপ অবস্থায় আমার পশ্চাৎপদ হইবার ত কোন কারণ দেখি না, বরং যাহা বলিতে যাইতেছি বলিয়া যাই। বিচারের ভার পাঠক মহাশয়গণের উপর। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মদ্‌বর্ণিত উপদেশ অনুসারে নিজ নিজ পুত্র-কন্যাগণকে শিক্ষা দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে নাও পারেন। তবে বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোত যেরূপ ভাবে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা হইলেও উহা যে পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ইহা অন্য কেহ না বলিলেও আমি বলিতে ছাড়িব না; এবং বন্ধুবরের চারিটী প্রশ্ন চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ধারাবাহিক উত্তর দিয়া যাইব। আধুনিক রুচিসম্পন্ন কোন ভদ্র-মহোদয় যদি ইহাতে অসন্তুষ্ট হন, দয়া করিয়া অধীন লেখককে ক্ষমা করিবেন। আর যদি কেহ বর্ত্তমান আলোচনা অনুসারে পুত্র-কন্যাগণকে শিক্ষা দান করিলে উপকার দর্শিতে পারে বিবেচনা করেন, তবে বড়ই বাধিত হইব ও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। প্রশ্ন চারিটি পরে সন্নিবিষ্ট হইবে, কিন্তু একটি কথা বলিয়া যাই।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন প্রথাগুলি প্রায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রী-সমাজ যে বিশেষ রূপে কলুষিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ভোগেচ্ছু হইয়া, সংসারে অশান্তির বীজ রোপণ করতঃ গৃহস্থের ও তৎসহ নিজেদেরও সারাজীবন দুঃখাবহ করিয়া তুলিতে-ছেন। ইহা যে তাহাদিগকে সুশিক্ষা না দিবারই বিষময় ফল, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? স্ত্রীলোক-দিগকে দায়ী করা যাইতে পারে না। ফলতঃ তাঁহাদের অবিভাবকগণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমধিক প্রচলনই এই সমস্ত দোষের আকর বলিয়া অনুমিত হ

এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের কয়েকটী বিভিন্ন অবস্থার কথা বলিতেছি। তাহাদিগকে সাধারণতঃ চারিটি অবস্থায় বিভিন্ন করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। যথাঃ—

১। কুমারী বা বাল্যাবস্থা (পিতামাতার অধীন)।

২। কৈশোর ও যৌবনাবস্থা (বিবাহের পর স্বামীর অধীন)।

৩। প্রৌঢ়াবস্থা (স্বামী বর্ত্তমানে স্বামীর নতুবা পুত্রাদির অধীন)।

৪। বৃদ্ধাবস্থা (পুত্রাদির অধীন)।

আবার এই চারিটি প্রধান অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং আমার বর্ত্তমান আলোচনায় বর্ণনার সৌকর্য্যার্থে সেইরূপ ভাবে বিভক্ত করিব। নচেৎ নারী-জীবনের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে না। সংসারী পুরুষের জীবন যেমন নানারূপ কর্ত্তব্যজালে জড়িত, স্ত্রীলোকদিগের জীবনও তদপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং কতকাংশে তাহাদিগকে অধিক কর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। শিশুদিগের শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয় থাকিলেও বাটীই তাহাদের প্রথম ও প্রধান শিক্ষার স্থল এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নিকট বা জনক অপেক্ষা জননীর নিকট তাহাদের সমধিক শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং জননীরা যদি উপযুক্ত শিক্ষিতা না হন, তাহা হইলে সন্তানগণেরও বাল্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে না। তাহার ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত সন্তানগণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফুরণ না হওয়ায় অনেক দোষের

আকর হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় বালিকাদিগকে বালকদিগের ন্যায় অতি বাল্য কাল হইতেই সুশিক্ষিত করা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমি স্ত্রীজাতির বাল্যাবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বালিকা-দিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিরূপ শিক্ষা দিলে তাহারা কালে উপযুক্ত গৃহিণী হইয়া সুখের সংসার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাই দেখা যাউক। স্ত্রীলোক লইয়াই সংসার,—একথা বলা বোধ হয় অযুক্ত হইবে না, এবং সেই স্ত্রীলোকগণই যে চেষ্টা করিলে সংসারে স্বর্গসুখের অবতারণা বা নারকীয় অভিনয় করিতে পারে, তাহাতে কোন ভুল নাই। যাহাদের লইয়া সংসার, যাহাদের অস্তিত্বে সংসারের অস্তিত্ব, তাহারা যদি সুশিক্ষিতা, সদা প্রফুল্লচিত্তা, মিষ্টভাষিণী, দয়া, মমতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিতা হইয়া সংসার পরিচালন করে, তাহা হইলেই লোকে সংসারে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার অভাবে নারকীয় অভিনয় অভিনীত হয়। পুরুষ-জীবন কর্ম্মময়। পুরুষ কর্ম্মস্রোতের অধীন হইয়া নানাদিকে প্রধাবিত হয়, এক স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পায় না। কিন্তু পরিশ্রান্ত হইলে কর্ম্ম-জগতের কেন্দ্র স্থান মমতাময়ী নারী-হৃদয়-চালিত সংসারক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। নারী, তাহার সেই কর্ম্মজড়িত তপ্তক্লিষ্ট প্রাণে মমতারূপ শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া অবসাদ দূর করে। সুতরাং শান্তির কেন্দ্রস্থল-রূপ রমণী-হৃদয় যদি নিজেই শান্ত না হয়, তবে তাহার নিকট শান্তি পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু নারী-হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ কিছু আপনা হইতেই সৃষ্ট হয় না। ফসল ক্ষেত্রে যেমন সুবীজ বপন করতঃ আবশ্যকমত বারি সেচনে অঙ্কুর উৎপাদন করাইয়া, পরে সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা সেই অঙ্কুরকে ফল-পুষ্পে সুশোভিত বৃহদাকার বৃক্ষে পরিণত করিতে হয়, নতুবা ভূমি পতিত থাকিয়া তাহাতে নানারূপ আগাছা উৎপন্ন করে ও কালে সেই সকল আগাছা এক প্রকার শিকর লইয়া বসিলে, তাহাদিগকে আর সহজে উত্তোলন করিতে পারা যায় না ও ভূমি চাষের অযোগ্য হইয়া পড়ে; সেইরূপ মানব-হৃদয়-ক্ষেত্রেও প্রথম হইতেই সৎশিক্ষার বীজ বপন করিয়া উপদেশরূপ বারি সেচনে প্রথমে অঙ্কুর ও ক্রমান্বয়ে ফল-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, নচেৎ সেই হৃদয়-ক্ষেত্র অশেষ দোষের আকর হইয়া জীবনকে বড়ই অসন্তোষজনক করিয়া ফেলে। কিন্তু শিশু-হৃদয়-ক্ষেত্রে এই সৎশিক্ষা বীজ রোপণ করিবে কে? শিশু মাতাপিতার নিকটেই লালিত পালিত হয়,

সুতরাং এ কার্য্য মাতাপিতার এবং পিতা অপেক্ষা মাতারই করা বিশেষ কর্ত্তব্য। তাহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, পিতাকে সংসার প্রতিপালনেচ্ছায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাহিরেই অধিক সময় থাকিতে হয়, মাতা সর্ব্বদা গৃহেই থাকেন। সুতরাং মাতা তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিবেন, সে সেইরূপই শিক্ষা লাভ করিবে, মাতার দৃষ্টান্তে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতৃচরিত্র আদর্শ হইলে সন্তানও আদর্শ হইয়া থাকে। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানকেও সুশিক্ষিত হইতে দেখা যায়। কদাচিৎ—অন্যথা হইলেও ইহা সমীচীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই—প্রাতঃস্মরণীয় বীরকেশরী মহারাণী হামিরের মাতা প্রভৃত ক্ষমতাশালিনী ও সাহসী নারী ছিলেন। হামিরকেও মাতৃদুগ্ধের অবমাননা করিতে দেখা যায় নাই। মাতা যেরূপ বীরাঙ্গনা ছিলেন, তিনি তদনুরূপ বীর পুত্রই হইয়াছিলেন। এত গেল একটি মাত্র উদাহরণ, এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের ইতিহাস বা পুরাণাদিতে বিরল নহে।

বালিকাবস্থায় কিরূপ শিক্ষা দিলে কালে তাহাতে সুফল প্রদান করিয়া স্ত্রীলোকে শান্তির ভবন নির্ম্মাণ করিতে পারে, এক্ষণে সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের ভিত্তি-স্বরূপ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজীবন গঠিত হইলে অন্যান্য সদ্গুণগুলি আপনা হইতেই আশ্রয় গ্রহণ করে—তবে সম্যক্ বিকাশ হইবার জন্য উপদেশ রূপ জল সেচনের আবশ্যক হয়। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত পুরাকালীন শিক্ষানীতির তুলনা করিলে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে কন্যাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। কিন্তু এ সমস্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর অনুকরণ মাত্র। প্রাচ্য-শিক্ষা-চর্চ্চা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"পূর্ব্বে কি বর্ত্তমান কালের ন্যায় শিক্ষা দিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় ছিল?" তাহা নহে, সেরূপ কিছু ছিল না সত্য, কিন্তু প্রত্যেক পিতামাতা শিশু সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভার গ্রহণ করিতেন। মাতা কন্যাকে গৃহিণীপণা, ব্রতানুষ্ঠান ও প্রতিবেশিনী বা প্রতিযোগিনীগণের সহিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, আর পিতা দিতেন ধর্ম্মোপদেশ। অল্পদিন পূর্ব্বেও—আমাদের দেশের বালিকাদিগকে বালিকা-

কালের কয়েকটি ব্রত করিতে দেখা গিয়াছে, যথাঃ—কুলকুলুতি, সুবচুন্নিব্রত, পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি ইত্যাদি। ধরিতে গেলে ব্রতগুলির মূলে কিছুই নাই; কিন্তু মন্ত্রগুলি সৎ উপদেশে পরিপূর্ণ। আমার বর্ত্তমান পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ এই ব্রতগুলির মন্ত্র জানেন কি না জানি না, কিন্তু অতি বাল্যাবস্থায় কুমারীদিগের মুখে আবৃত্তি শুনিয়া আমি তাহা অভ্যাস করিয়াছিলাম এবং হৃদি-পটে এখনও জাগ্রত আছে। কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্রতানুষ্ঠান কোথায়? আধুনিক সভ্যতার আলোকে পড়িয়া সেকেলের সেই কুসংস্কারান্ধকার ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রমাণের অভাব নাই; যে কার্য্য বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমারই বাটীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখন তাহার আর কোন আলোচনাই নাই। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, বর্ত্তমান গৃহিণীদিগের শিক্ষার অভাব। তাহারা নিজেরা জানে না, অন্যকে শিখাইবে কিরূপে? যে স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর যত্নে মদীয় ভবনে এই সমস্ত সৎকার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইত, এখন আমার সেই স্নেহময়ী মাও নাই, আর সে অনুষ্ঠানও নাই। তাঁহার সহিত সেগুলিও সেই পরম দয়াময়ের শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতেছে। পরিবর্ত্তে পাইয়াছি কি? স্বার্থের স্তূপীকৃত উদাহরণ, আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীর নিদর্শন স্বরূপ নানা ধাঁজের, নানারূপ রচনা কৌশলের রাশি রাশি গ্রন্থনিচয়, তাও ধর্ম্ম-পুস্তক নয়; উপন্যাস, নবন্যাস, গোয়েন্দা-কাহিনী বা নাটক। কথার ছলে আমার বাড়ী বলিয়াই বলিতেছি, কিন্তু শুধু যে আমার বাড়ীতেই এই ব্যাপার তাহা নহে, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই এরূপ ঘটনা দেখিতে পাইবেন। তাহা না হইলে এত সাধারণ পুস্তকালয় চলিতেছে কিরূপে, পুস্তকালয় গুলিতে ধর্ম্মপুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি গ্রন্থের আধিক্য কেন, বা এত রকমের উপন্যাস বাহির হইয়া বিপুল বিস্তার লাভ করিতেছে কি প্রকারে? বলিতে পারেন কি "শকুন্তলা, সাবিত্রী বা শৈব্যা-চরিত কয়জন গৃহস্থ ক্রয় করিতেছেন, যে পরিমাণে তাঁহারা নব প্রকাশিত উপন্যাসগুলি খরিদ করিয়া আলমারীর শোভা বর্দ্ধিত করিতেছেন? কোন যুবককে জিজ্ঞাসা করুন "সাবিত্রী-চরিত পাঠ করিয়াছ কি না?" তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইবেন—উহাতে আছে কি? একটা নীরস জীবনের বনবাস-কাহিনী বই ত নয়! ও আর পড়িব কি? কিন্তু আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন "বিষবৃক্ষের কোন্ অংশটা তোমার ভাল লাগিল?" তখনই উত্তর পাইবেন

"যেখানে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতেছেন, বা যেখানে হীরার ঘরে বসিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রেম ভিক্ষা করিতেছে, সেই স্থান-গুলি বড় মিষ্ট বোধ হইল।" তাহা হইলেই দেখুন, শিক্ষা হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার স্রোত কোন দিকে প্রধাবিত? শিক্ষা শব্দের তাৎপর্য্য কি? সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করাকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। উপন্যাস প্রভৃতিতেও শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের বালক-বালিকাগণ পুস্তকের সারাংশ গ্রহণ না করিয়া, অসার গল্পাংশ পাঠ করিয়াই পরম সুখ উপলব্ধি করে। বিষবৃক্ষ পাঠ করিয়া কয়জন বালিকাকে সূর্য্যমুখীর ন্যায় নিপুণা গৃহিণী হইতে বা হইবার চেষ্টা করিতে দেখা গিয়াছে? কয়জন যুবতী কুন্দ-নন্দিনীর ন্যায় সরল ও নিস্বার্থ-ভাবে স্বামী-সেবায় তৎপর হইয়াছে বা স্বামীর সুখবর্দ্ধনের জন্য আত্ম বলি-দানেও কুণ্ঠিতা হয় না?

বিষবৃক্ষের চরিত্র আলোচনায় অনেক যুবক-যুবতীকে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে দোষারোপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারা বোঝে না যে, সে প্রেম কতই নিস্বার্থ; কতই গভীর ও মহান্।

এস্থলে আমার এ আলোচনায় আর অধিক প্রয়োজন নাই, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। কেবল উপমার জন্য দুই একটি কথা না বলিলে নয় তাই বলিলাম, এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলিয়া যাই। বলিয়াছি—ধর্ম্মই মানব-জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, এবং জীবন একবার ধর্ম্মভাবে গঠিত করিতে পারিলে তারপর যত কিছু বিপত্তিই উপস্থিত হউক না কেন, সহজে মনুষ্যকে বিচলিত করিতে পারে না। কোমলমতি বালিকারা অবশ্য পাপ পুণ্যের কোন ধারই ধারে না; তাহাদের সুকোমল প্রাণে এরূপ বিচার-শক্তি নাই, যাহাতে তাহারা ভাল মন্দ বাছিয়া লইয়া কার্য্য করিতে পারে। জীবহত্যা পাপ—তুমি আমি বুঝি, কিন্তু তাহারা উহার কি জানে? সে অবাধে একটি পতঙ্গ ধরিয়া ক্রীড়াচ্ছলে তাহাকে হনন করিবে। কিন্তু যখনই তাহাকে এরূপ কার্য্য করিতে উদ্যত দেখা যায়, তখনই পিতামাতার কর্ত্তব্য—তাহাকে নিষেধ করা ও ভবিষ্যতের জন্য বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দেওয়া। এইরূপে প্রত্যেক ঘটনাতেই তাহাকে কুকার্য্যগুলি হইতে নিরস্ত করা পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্য এবং সেই সঙ্গে তাহাকে স্বকীয় কার্য্য, ব্যবহার ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া উচিত। বালিকাদের জন্য যে

সকল ব্রতানুষ্ঠান এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে, তাহার অনুশীলন করাও; নিজেরা এরূপ কর্ম্মকর, যাহার অনুকরণে তাহারাও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে রত থাকে ও বুঝিতে পারে যে, পিতামাতার ন্যায় সদনুষ্ঠান করাই জীবনের মুখ্য-কর্ম্ম; এরূপ গ্রন্থ ও জীবনচরিত পাঠ করাও বা গল্পচ্ছলে উপদেশ দাও, যাহা ধারণা করিলে তাহারাও সেইরূপ আদর্শ-চরিত্রা হইবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের সাংসারিক জীবন গঠিত করিবার জন্য—সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য-গুলি তাহাদের দ্বারা করাইয়া লও, এবং অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যে তাহাদিগকে সহকারী রাখিয়া দাও, তাহারা দেখিয়া শিক্ষা করুক যে, কিরূপে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। ভুলেও নিজেরা কখন তাহাদের সম্মুখে মিথ্যা কথা কহিও না বা এমন কোন কুকার্য্য করিবে না, যাহার ছবি তাহারা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারে। ফলতঃ তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিতে হইলে পিতামাতাকে তদনুরূপ শিক্ষিত ও আদর্শ-চরিত্র হইতে হয়। বাল্যাবস্থার শিক্ষা নিজেদের চেষ্টায় হয় না, পিতামাতাকে সে জন্য পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয় এবং তাহার জন্য তাঁহারাই দায়ী। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না, সুতরাং এখন অন্য অবস্থা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নৈবেদ্য।

ফুলের মত স্বার্থ-বিহীন
প্রেম হৃদয়ে
যার—
দেবের জন্য নৈবেদ্য সে যে
নিখিল জগৎ-
সার!

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

স্তোত্র।

(গীত)

দেবে পাশরিয়ে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়ে যোগনিদ্রা-ঘোরে
র'য়েছ ডুবিয়ে।
কমলের দলে জলধির জলে শ্যাম-কলেবর
গিয়াছে মিশিয়ে॥

নাভিপদ্মে পদ্মযোনি পিতামহ,
ধ্যানে মগ্ন ওই লভিয়াছে মোহ,
পাদপদ্মে তব রাজিছে হে ভব-বিভব-রূপিণী
দিক্ আলোকিয়ে।

কি খেলায় হরি বুঝিতে না পারি,
সিন্ধুকোলে শুয়ে মায়া-নিদ্রা ধরি,
খেলিছ শ্রীহরি গোলোকবিহারী বিষম চাতুরী
আশ্রিতে ভুলিয়ে॥

জাগ জগন্নাথ কর পরিত্রাণ,
যাতনা সহে না দহিতেছে প্রাণ,
কাঁদে বসুন্ধরা তাপিতা কাতরা কলুষে চেতনা
যেতেছে চলিয়ে।

উঠ হৃষীকেশ নিদ্রা পরিহরি,
অবতীর্ণ হও দিব্য বেশ ধরি,
মোহন-মাধুরী, পাপ-তাপহারি, হেরি হরি রূপ
নয়ন ভরিয়ে॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হস্ত।

প্রাচীন ভারতের যে বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই পূজ্যপাদ ঋষিগণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা কোন বিষয়ের চরমোৎকর্ষ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। ঈশ্বর ও পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে চরম জ্ঞান তাঁহারা সাংখ্য দর্শন ও উপনিষদে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ঊর্দ্ধে কাহারও যাইবার শক্তি নাই—সে সীমা যিনি উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়াছেন, তিনিই নাস্তিক হইয়া বসিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন জগৎকে ছাঁটিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার রচয়িতা বাদরায়ণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ঋষিগণের দৃষ্টিতে নাস্তিক। চার্ব্বাক ও লোকায়তগণ প্রকৃতি-পূজার সমর্থক বেদের ক্রিয়া-কলাপের প্রতিকূলতা করায় নাস্তিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছেন।

অবয়বের সূক্ষ্ম পরিমাণ পরমাণু—ইহা সহজ দৃষ্টিতে চক্ষুগোচর হয় না, জালান্তরগত সূর্য্যরশ্মিতে উহা দৃষ্ট হয়। ইহার আটটীর সমষ্টিতে যে অপেক্ষাকৃত স্থূল অবয়ব হয়, তাহা বালাগ্র অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগের তুল্য। ইহার আটটী পাশাপাশি রাখিলে তাহা লিক বা উৎকুনের ডিম্বের তুল্য। ইহার আটটী সারি সারি রাখিলে যবোদরের তুল্য হয়। যব-শস্যের এই মধ্যস্থলই ভারতীয় দৈর্ঘ্য পরিমাণের আদি। সুতরাং দেখুন, এস্থলে ঋষিগণ এক যবকে কত নিম্নতম সূক্ষ্মে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। আট যবোদরে এক আঙ্গুল। ২৪ আঙ্গুলে এক হাত।

অঙ্গুলির পরিমাণ চরক-সংহিতাতে আছে। বৈদিক পরিমাণ—প্রাদেশ কিষ্কু ইত্যাদি হোম-বেদীর রচনায় ব্যবহৃত হইত; উহা যজমান বা পুরোহিতের হস্তদ্বারা নিরূপিত হইত। সুতরাং হস্ত-দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা প্রযুক্ত এরূপ পরিমাণের সমতা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অভাব দূর করিবার জন্য বহুদর্শী ঋষিগণ সাম্যবিধায়িনী প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। উদ্ভিদ-জগতে যত বস্তু আছে, তাহাতে একটি সাম্যভাব যেন সুষ্ঠু বর্ত্তমান। বস্তু যত ক্ষুদ্র হয়, ততই তাহার বৈষম্য চক্ষু-গোচর হয় না। তাই দুই যবের পার্থক্য শীঘ্র লক্ষিত হয় না।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি আটটী যব পাশাপাশি রাখিয়া মাপিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে, উহা এক ইঞ্চের কিছু বেশী হয়;

সুতরাং প্রাচীন ভারতের হস্তের যথার্থ মাপ ২৪ ইঞ্চেরও কিছু বেশী হয়। আমরা সুবিধার জন্য এক অঙ্গুলির মাপ এক ইঞ্চ ও হস্তের মাপ ২৪ ইঞ্চ ধরিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের লোককে হস্তের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অম্লানবদনে তাহা ১৮ ইঞ্চ বলিয়া বসিবেন। ইহা ঠিক কি না, তাহা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টাও করিবেন না ; বরং যে তাঁহাকে ধারণার বিরুদ্ধ মত বলিতে যাইবে, তাহাকে অসম্বদ্ধপ্রলাপী বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী তিন যব সারি সারি রাখিলে তাহা এক ইঞ্চ লম্বা হয় অর্থাৎ যব ইঞ্চের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ; কিন্তু ছুতার মিস্ত্রী ও সাধারণ কারিকরশ্রেণীকে প্রশ্ন করিলে তাহারা চারি যবে এক ইঞ্চি বলে। এরূপ ভ্রমপূর্ণ ধারণা তাহারা কোথায় শিখিল? কে ইহা প্রবর্ত্তন করিল? ১৮ ইঞ্চের হাত ঠিক কি না? ইহা সত্যমূলক না প্রবঞ্চনা? এই সকল প্রশ্নের উত্তর ও বিচার এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়।

আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, হস্তকে ১৮ ইঞ্চের চীনে কাষ্ঠ-পাদুকা পরাইয়া তাহার বৃদ্ধি রুদ্ধ করা মহানৃশংসতা। ভারতে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, লোকের হস্তপরিমাণ প্রচলিত ১৮ ইঞ্চ হইতে বৃহৎ, সুতরাং ১৮ ইঞ্চের হস্ত প্রচলিত করা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মহা-গর্হিত কার্য্য। অতএব এই মাপটী সত্যমূলক নহে—ইহা প্রবঞ্চনা।

এই প্রবঞ্চনা প্রথমে আকবর বাদশাহের সময় ভারতে আসে। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতীয় মুসলমান বাদশাহগণ ভূমির রাজস্ব শস্যে গ্রহণ করিতেন অথবা ভূমির পরিমাণ-নির্ব্বিশেষে একটা মোট কর গ্রহণ করিতেন। শস্য বিক্রয় করিয়া যাহা হইত, তাহাই রাজস্ব জ্ঞান করিতেন। ক্রমে ভুঁইয়া, ভূঁইহার বা জমীদার প্রথার প্রচলন হয়। তখন বাদশাহ তাঁহার নিকট হইতেই একটা নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করিতেন। তিনি প্রজার নিকট হইতে শস্যে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করিয়া বাদশার মালগুজারী দিতেন, উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত—তাহা জমীদারের লাভ। জমীদার প্রজারঞ্জক হইলে তাহারা সুখে কালযাপন করিত, প্রজাপীড়ক হইলে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না। আকবরের সময় তাঁহার অধীন রাজ্যগুলি জরীপ হয় এবং তাহার রাজস্ব টাকায় নির্দ্ধারিত হয়। তিনি রীতিমত জমীদারী প্রথার প্রচলন করেন। পূর্ব্বে প্রজারাই আপনার আপনার "জোতের" মালগুজারী স্বয়ং রাজসরকারে প্রদান করিত—জমীদার রাজা-প্রজার মধ্যস্থ স্বরূপ হইতেন।

রাজস্ব অনেক প্রকারের ছিল। কোন ভূমির অর্দ্ধ, কোন ভূমির তৃতীয়াংশ, কোনটীর চতুর্থাংশ, কোনটীর ষষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ করা হইত; আবার কোন ভূমির মোটেই কোন কর গ্রহণ করা হইত না। শেষোক্ত ভূমিটি হয় অন-আবাদী বন জঙ্গল,—অথবা পতিত উষর,—যাহাতে শস্য উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহাকে চলিত কথায় "খিল" ভূমি বলিত। আবাদী জমীকে "মাল" বলিত। জরীপেরও অনেক প্রকার ছিল। আকবরের রাজস্বসচিব হিন্দু টোডরমল্ল ছিলেন; সুতরাং তিনি কতক ধর্ম্মঘেঁসা কাজ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বতন রাজার ব্রাহ্মণ দেবতা ও পীরের জন্য প্রদত্ত ভূমি এবং বন জঙ্গল কান্তার ভূমি ২৪ ইঞ্চ পরিমিত হস্ত বা ৪৮ ইঞ্চের গজে পরিমাপিত হইত। প্রজার "খেতী খোলার" ভূমি ২১ ইঞ্চ পরিমিত হস্ত বা ৪২ ইঞ্চ পরিমিত গজ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। প্রজার কর্ষিত ভূমি হইতে রাজস্ব আদায় হইত—তাহার ভদ্রাসন হইতে কাফির কর গ্রহণ করা হইত। আকবর ইহা রহিত করেন, ঔরঙ্গজেব পুনঃ ইহা "জিজিয়া" রূপে প্রচলন করিয়া যান।

আকবরের ৪২ ইঞ্চ পরিমিত গজকে লোকে "ইলাহী গজ" বা বাদশাহী গজ বলিত। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ইলাহী নামক তাঁহার কোন রাজকর্ম্মচারীর হস্ত-দৈর্ঘ্য ধরিয়াই এই গজ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। যদি এ প্রবাদে সত্য থাকে, তাহা হইলে আকবরের ঐ মাপ ধরিয়া ভূমি জরীপ করায় তাঁহার মতে একটা বলবৎ নজীর থাকিতেছে; কিন্তু ১৮ ইঞ্চের হস্ত প্রচলনে কোন নজীর নাই, কারণ ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণের হাত ১৮ ইঞ্চ অপেক্ষা বড়,—শিখ জাতির ভিতর তো এখনও ২০ ইঞ্চ বা ২০॥০ ইঞ্চ দীর্ঘ হস্ত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং ১৮ ইঞ্চের হস্ত প্রচার করা ঠিক নহে।

আকবর নিজ কার্য্য সমসাময়িক দৃষ্টান্তের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেও, তাঁহার প্রজার "খেতী খোলার" উপর তাহা প্রয়োগ করিতে যাওয়া উচিত হয় নাই। ইহা তিনি দুরভিসন্ধি বশতঃ বা কোন স্বার্থপর রাজকর্ম্মচারীর প্ররোচনায় করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ জানিবার যো নাই। সে যাহাই হউক, তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, প্রজার ভূমি মাপে বাড়িয়া গেল; সুতরাং পূর্ব্বে যে কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও বাড়িয়া গেল। আইন আকবরীতে ২৪ ইঞ্চের হাতের মাপ থাকিতে, আকবরের ছোট ২১ ইঞ্চের মাপ চালাইয়া প্রজার নিকট অধিক রাজস্ব আদায় করা উচিত হয় নাই। তিনি অত্যাচারী সম্রাট্ হইলে আমাদের কোন দুঃখের কথা ছিল না, কিন্তু যিনি

হিন্দু জাতিকে সুদৃষ্টিতে দেখিতেন, যাঁহাকে হিন্দুগণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া সম্মান করিতেন, তাঁহার হিন্দুপ্রজা সাধারণের সহিত অল্প রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এরূপ করা ভাল দেখায় না। না হয় তাহাও অনুমোদন করিলাম, কিন্তু ছোট মাপের তাড়নায় যে প্রজা ত্রস্ত ভীত উৎপীড়িত ও অবশেষে বাসত্যাগী হইয়াছিল, ইহা বড় কষ্টকর—আকবরের রাজ্যের ইহাই দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা। অন্য লোকে যথা বা অযথা যশোগীতি গাইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয়গণ তাহা কখন পারে নাই। আমাদের প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণও প্রজার পাপের ফল বলিয়া এই অত্যাচার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যে বা ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সেই মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
হলো রাজা মামুদ শরীফ।

*　　　　*　　　　*　　　　*

মাপের কোণে দিয়া দড়া, পনের কাঠায় কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারী।

কবিকঙ্কণের এই বচন দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, তাঁহার সময় কোন বৃহৎকাঠা প্রচলিত ছিল। সেই মাপের ১৫ কাঠায় এক বিঘা ধরা হইত। মাপের প্রচারও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। চতুরস্র ভূমিযুক্ত ক্ষেত্রের কোণাকোণি (diagonally) মাপ ১৫ কাঠা হইলে তাহা এক কুড়া বা কুড়ি কাঠা ধরা হইত, সুতরাং এই শেষ বিঘাটীর মাপদণ্ড কাঠাও অনুপাতানুসারে কমিয়া যাইত। যদিও অঙ্কপাত দ্বারা এই কাঠার হস্ত ২১ ইঞ্চ পূরা হয় না, তথাপি তখনকার মোটামুটী হিসাবের পক্ষে তাহাই ধরা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ কাব্য ১৪৬৬ শকে রচিত হয় "শকে রসরসবেদ-শশাঙ্কগণিতা। কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা"। অথচ গ্রন্থারম্ভে মানসিংহের কথা আছে। ইহাতে কালবিপর্য্যয় (anachronism) ঘটিতেছে, সুতরাং বোধ হয় গ্রন্থ লিখনের পরে এই ভূমিকাটী কবিকঙ্কণ কর্ত্তৃক স্বয়ং নিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ, গীতটী কবি বাঁকুড় রায়কে শ্রবণ করান। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুত্র রাজা রঘুনাথের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। স্থানে স্থানে রচনার ভণিতায় রাজা

রঘুনাথের অনুমতি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। খুব সম্ভব, বাঁকুড় রায়ের রাজ্য-কালে কাব্যটী আরম্ভ হইয়া, রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকালে শেষ হয়।

কবিকঙ্কণের কথার সত্যতা পরে প্রদর্শন করিব, এক্ষণে দেখাইতেছি—প্রাচীন ভারতে ২৪ ইঞ্চের হাতই প্রচলিত ছিল।

উপরি-উক্ত অঙ্গুলিপরিমাণ যাহা যবোদরের অনুপাতে প্রদত্ত হইয়াছে, উহা বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতার বচন হইতে গৃহীত। ভাস্করাচার্য্য লীলা-বতীর পরিভাষাতেও "যবোদরৈরষ্টকমঙ্গুলং স্যাৎ" আট যবোদরে এক আঙ্গুল লিখিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের সময়ের ব্যবধান প্রায় ৬০০ ছয়শত বৎসর; সুতরাং এই কয় শতাব্দী যাবৎ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্রই এই গণনাই প্রচলিত ছিল। ভারত যেরূপ পূর্ব্ব প্রথার স্থিতি-অনুমোদক (conservative) দেশ এবং ইহার অধিবাসিগণ যেরূপ স্থিতিশীল (conservative) জাতি, তাহাতে বোধ হয় এই গণনা প্রাচীন সময় হইতে আবহ-মান ভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

প্রাদেশ, কিষ্কু, মুষ্টি, হস্ত প্রভৃতি মাপ যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে দূষ্য না হইলেও রাজ্যের সাধারণ কার্য্যে তত্তৎ মাপের অনুপ-যোগিতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল; তাই ভূয়োদর্শী ঋষিগণ অক্ষয় অমর পরিমাণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া, দেশশাসকগণকে তাহা প্রচলন করিতে অনুরোধ করিয়া যান। প্রকৃতি অক্ষয় অমর, প্রাকৃতিক বস্তুও সুতরাং তাই। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম বলে তাহার কস্মিন্‌কালে ক্ষয় নাই। মানুষ মরে, তাহার স্থল তাহার প্রতীক সন্তান অধিকার করে। ওষধি মৃত হয়—তাহার ফল শস্য তাহার স্থান পূর্ণ করে। মনুষ্যে যেমন বৈষম্য অত্যধিক, অন্য জীব-জগতে তাদৃশ নাই—নির্জ্জীব জগতে ত বৈষম্য প্রায় লক্ষিত হয় না, তাই ঋষিগণ শস্য-জগৎ হইতে দৈর্ঘ্য ও ভার পরিমাণের মূল গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। যব ধান সাধারণ শস্য, তাই এই দুইটী দৈর্ঘ্য ভার-জ্ঞাপক পরিমাণের আদিরূপে গৃহীত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ধরিলে ছোট বড় হইতে পারে, তাই যবের মধ্যস্থল বা উদর নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিষমতা প্রায় তিরোহিত করা হইয়াছে। ইহার দ্বারাও ঋষিগণের নির্ব্বাচন-শক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বৃহৎ সংহিতায় প্রদেশ-বিশেষের রাজগণের গুণবর্ণন উপলক্ষে তত্তৎ প্রদেশের মনুষ্যের উচ্চতাও লিখিত হইয়াছে। কোন প্রদেশের লোকের

উচ্চতা ৮৪ অঙ্গুলি, কোন প্রদেশের ৯০, আবার কোন প্রদেশের ৯৬ অঙ্গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে যে অঙ্গুলির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। অঙ্গুলি এক ইঞ্চ স্বীকার করিলে জানা যাইতেছে যে, বরাহ মিহিরের সময় মনুষ্যের উচ্চতা প্রদেশভেদে ৭ফুট হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত হইত। চরক সংহিতা বিমান স্থানেও মনুষ্যের উচ্চতা প্রদত্ত হইয়াছে। তথায় লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির উচ্চতা ৮৪ অঙ্গুলি এবং যাহার অঙ্গুলাগ্র হইতে অন্য অঙ্গুলাগ্রের আয়াম ও দেহ-বিস্তার সমান অর্থাৎ ৮৪ অঙ্গুলি; তাহার আয়ু, বল, তেজ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন ও অন্যান্য বাঞ্ছার পূর্ণ বিকাশ হয়। ইহার অধিক বা হীন হইলে বিপরীত ফল হয়। * এস্থলটী আত্রেয় পুনর্ব্বসু কথিত ও অগ্নিবেশ লিখিত বচনের গন্ধ অথবা বৃদ্ধ চরকের বচন কি বৌদ্ধচরকের বচন, তাহা ঠিক নিশ্চিত করিবার যো নাই। চরকের একস্থলে প্রত্যক্ষ অনুমান শাব্দ তিন প্রমাণের উল্লেখ আছে; এ অধ্যায়ে উপমান ঐতিহ্যেরও প্রমাণের মধ্যে গণনা আছে, সুতরাং বোধ হইতেছে—ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা। আবার শব্দ ও ঐতিহ্যে তুল্যার্থতাও রক্ষিত হইয়াছে। তবে শব্দকে দৃষ্টার্থ অদৃষ্টার্থ সত্য অনৃত উভয়ই বলা হইয়াছে। ঐতিহ্যকে আপ্তোপদেশ-বেদাদি বলা হইয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধগন্ধ বাহির হইতেছে। পূর্ব্ব কথার দ্বারা গৌতমের একটী ন্যায় সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। শেষটীর দ্বারা কেবলমাত্র অথর্ব্ববেদের প্রতি সঙ্কেত প্রকাশিত হইতেছে। অথর্ব্ববেদ বৌদ্ধ জৈনগণের পূজ্য প্রামাণিক শাস্ত্র। তাহার পর ঋতু সম্বন্ধেও সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত লিপিবদ্ধ দেখা যায়।—প্রাবৃট্‌কে প্রথম ঋতু স্বীকার করা হইয়াছে—ঋষিগণের আদি ঋতু শিশির। পারসীকগণ বর্ষা বা দক্ষিণায়ন হইতে বর্ষ-গণনা করেন। যাহা হউক, এইগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যাইতেছে যে, এ স্থলটী নাগার্জ্জুনের সময়ে লিখিত হয়—তিনি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কারেও এইরূপ ঋতুর নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৫০ বা ৪৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। আলসিকন্দরের ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুর দেহোচ্চতা ৭ফুট লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং চরক ও আলসিকন্দরের সময় ভারতীয় মনুষ্যের উচ্চতা

* কেবলং পুনঃ শরীরং অঙ্গুলিপর্ব্বাণি চতুরশীতিস্তদায়ামবিস্তারসমং সমমুচ্যতে। (১৩২) তত্রায়ুর্বলমোজঃ সুখমৈশ্বর্য্যং চিত্তমিষ্টাশ্চাপরে ভাবা ভবন্ত্যায়ত্তাঃ। প্রমাণবতি শরীরে বিপর্য্যয়স্তু হীনেঽধিকে।

যে ৭ফুট বা তদপেক্ষা অধিক হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা আভাসে আরও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সিকন্দরের স্বদেশীয় মনুষ্যগণ ভারতীয়-গণের ন্যায় উচ্চ হইতেন না।

পূর্ব্বে ভারতীয়গণ সকল দেশের লোক অপেক্ষা স্বাধীনতায় কাল হরণ করিতে পাইতেন, তাহাতেই তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইত। এই কারণে ও স্বভাব-সুন্দরীর বাৎসল্য-স্নেহে লালিত হইয়া তাঁহাদের দেহ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ হইত। মুসলমান বাদশার রাজত্ব সময়েও মনুষ্যের যে উচ্চতা ছিল, ইংরাজের সময় তাহা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়, কারণ ইংরাজের সময়েই মনুষ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিহত হইয়াছে; সুতরাং এখন যে "—লোক নয় স্বাধীন" কবির এই উক্তি তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কাজেই মনুষ্যের পরিমাণ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে।

আর্য্যভটও তাঁহার দশগীতিকায় "সচাঙ্গুলোঘহস্তোনা" অর্থাৎ ৯৬ অঙ্গুলি ও ৪ হস্ত মনুষ্যের উচ্চতা দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময়েও মনুষ্য ৮ ফুট লম্বা হইত। বরাহ মিহির বৃহৎসংহিতায় কূপতড়াগাদি মাপে পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছেন—পুরুষ অর্থে যে ৪ হস্ত পরিমিত দণ্ড, তাহার ভুল নাই। অধুনাতনকালেও পশ্চিমাঞ্চলে কূপ পুষ্করিণীর গভীরতা প্রকাশ করিতে হইলে "পুর্সা" শব্দ ব্যবহৃত হয়—ইহা যে পুরুষ শব্দের অপভ্রংশ, তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের খর্ব্বতা প্রযুক্ত বর্ত্তমান সময়ে "পুর্সা" দ্বারা উচ্ছ্রিতবাহু মনুষ্য বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং ইহা দ্বারা মোটামুটী ৫ হস্ত পরিমিত গভীরতা প্রকাশিত হইতে পারে। যেহেতু বাহুর উচ্চ অংশ কফোণি হইতে মধ্যম অঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত মস্তকোপরি জাগিয়া থাকে ইহার দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বের মনুষ্য-শরীর বর্ত্তমান সময়ের শরীর অপেক্ষা বৃহৎ ছিল।

ভাস্করাচার্য্য তাঁহার লীলাবতীর প্রারম্ভে ক্ষেত্র বা নিবর্ত্তনের যে পরিমাণ দিয়াছেন, ২৪ ইঞ্চের হাত ধরিলেই বর্ত্তমান কালের বিঘার সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারা যায়; নতুবা নহে। যে ক্ষেত্রের প্রতি ভুজ ২০ বংশ দীর্ঘ, তাহাকে নিবর্ত্তন বলে। এক বংশ দশহস্ত দীর্ঘ, সুতরাং নিবর্ত্তনের প্রতি ভুজ ২০০ হাত লম্বা। এই বংশই উত্তরাখণ্ডে "কাঠা" বা কাঠা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে উত্তরাখণ্ডে কাঠা বিসওয়া বিঘাই অধিক প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে কিরূপ মাপ প্রচলিত আছে, তাহা জানি না। বিঘা

শব্দটী যে বিঘত শব্দের অপভ্রংশ, তাহার সন্দেহ নাই। বিঘত হস্তের অর্দ্ধাংশকে বলে। এখন এই বিঘতটী ভাস্করের লিখিত বংশে ও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে জানা যায় যে, দশ বিঘত দীর্ঘ ২০ বংশ পরিমিত ভুজযুক্ত ক্ষেত্র বিঘত ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত। কালসহকারে ইহার ক্ষেত্র শব্দটী উড়িয়া গেল এবং বিঘত বিঘা আকার ধারণ করিল। দশবিঘতে ৫ হাত হয় এবং এইরূপ ২০ বংশে ১০০ হাত হয়। বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সর্ব্বত্রই ১০০ হাত বর্গরূপ ক্ষেত্র এবং ৫ হাতের কাঠা প্রচলিত দেখা যায়, সুতরাং এ সকল অঞ্চলে লীলাবতী লিখিত ক্ষেত্রকালির গণনা অনুসৃত দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে ক্ষেত্র বড় হইত, আধুনিক ক্ষেত্র তাহারই চতুর্থাংশে দাঁড়াইয়াছে। খাস বাঙ্গালায় এই গণনাই কিছু বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় কেন ও কবে এ বিভিন্ন মাপ প্রচলিত হইল, জানি না—সম্ভবতঃ ইহাও পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারের ফলেই হইয়া থাকিবে।

নিম্ন তালিকায় প্রাচীন ও আধুনিক বিঘা ইংরাজী বর্গগজে প্রদত্ত হইল।

হস্ত	পরিমাণ	কালি	বর্গগজ
২৪ ইঞ্চ—	১০০ × ১০০	$\frac{১০০ \times ২ \times ১০০ \times ২}{৩ \times ৩} = \frac{৪০০০০}{}$	$= ৪৪৪৪\frac{৪}{৯}$
২১ ইঞ্চ	১০০ × ১০০	$\frac{১০০ \times ৭}{১২} \times \frac{১০০ \times ৭}{১২}$	$= ৩৩০২\frac{৭}{৯}$
৫॥০ ইংরাজীগজ	১১০ × ১১০ =	৫৫ × ৫৫গজ =	৩০২৫
২৪ ইঞ্চ	৮০ × ৮০	$\frac{৮০ \times ২ \times ৮০ \times ২}{৩ \times ৩}$	$= ২৮৪৪\frac{৪}{৯}$
১১ ঐ	৮০ × ৮০	$\frac{৮০ \times ৭ \times ৮০ \times ৭}{১২ \times ১২}$	$= ২১৭৭\frac{৭}{৯}$
১৮ ঐ	৮০ × ৮০	$\frac{৮০ \times ৮০}{৪}$	$= ১৬০০$

উপরের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে, কি পশ্চিমাঞ্চল কি বাঙ্গালাদেশ প্রচলিত ২৪ ইঞ্চ পরিমিত হাতের বিঘার ১৫ কাঠা—২১ ইঞ্চ পরিমিত হাতের এক বিঘার প্রায় সমান হইতেছে; সুতরাং কবিকঙ্কণের কথায় সত্য বর্ত্তমান। বাদশাহী আমলের ৫ হাতের কাঠাটী বর্ত্তমান সময়ে ১৮ ইঞ্চ হাতের $৫\frac{৫}{৬}$ হাত হয়। তাহা ৫॥০ সাড়ে পাঁচ হাত ধরিলে কৌশল আছে—অজ্ঞকে ৫হাতের স্থলে ৫॥০হাত দেখাইলে সে পরিতুষ্ট হইবে। কিন্তু ইহাতে প্রতি কাঠায় $\frac{২}{৫}$ হাতের ঘাটতী থাকিয়া বিঘায় ২৭৫

বর্গগজের অন্তর দাঁড়াইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ ইংরাজী বিঘা বাদশাহী বিঘা হইতে ২৭৫ বর্গগজ ছোট—ইহা বড় কম অন্তর নহে।

ঘাটওয়ালী প্রদেশে এখনও ২৪ ইঞ্চ হাতের কাঠার মাপ প্রচলিত। উহা বন জঙ্গল ও অনূর্ব্বর বিষম স্থানে পূর্ণ। তাহা আবাদ হইলে তাহার ভাগ্যেও কি হয়, বলা যায় না।

বঙ্গের সুসন্তান বঙ্গবাসীর হিতৈষী ও বঙ্গভাষার সংস্কারক ও কৃতী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রেও এই ছোট মাপের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট "সূত্রে" নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই বিস্তৃত "ভাষ্য" দ্বারা এই প্রবন্ধে বিশদীকৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

সাহিত্য-সম্মিলন।

এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন হইয়া গেল। তিন দিন ধরিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যিক মহলে যেন দুর্গোৎসব আসিয়াছিল। ধনী নির্ধন রাজা মহারাজা ভেদ ছিল না, সকলেই পূজার আনন্দে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। এবং যাহার যেমন সাধ্য অর্ঘ্য লইয়া মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এবারকার সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন—রাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বাহাদুর। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ বক্তৃতায় এবং কার্য্যে পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়াছিল।

* * * * *

এবার কার্য্য অপেক্ষা যে ভোজন ও নাচ তামাসার বাহুল্য অধিক হইয়াছিল, তাহা লইয়া অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু একথা যখন অনেকবারই উক্ত হইয়াছে, সাহিত্য জাতির গতির নিয়ামক তখন ইহা লইয়া ভাল মন্দ যাই হোক একটা আলোচনাও যে হইয়া গেল,—প্রথমতঃ তাহাই সাহিত্যসেবীর পরম লাভ ধরিতে হইবে। আর পূজার আনন্দে নৃত্য গীত এবং ভূরি ভোজনের ব্যবস্থাটা যদি বেশীই হইয়া থাকে, তবে সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কারণ, আমরাও দুর্গোৎসবের সময় শুধু মা মা করিয়া দিন কাটাইয়া দিই না—এই আনন্দই আবার জীবনকে নব ভাবে অনুপ্রাণিত করে।

তবে একটা কথা বলিবার এই যে, সাহিত্যসেবীদের পরস্পর মেশামেশি বরাবর যেমন হইয়া আসিতেছে—তেমনি হইয়াছিল, সে বিষয়ে বাঙ্গালীর পটুত্ব চিরদিনই বিশ্ব-বিদিত, তাহাতে আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই।

* * * * *

এখন শেষ কথা, এবার আমরা বর্দ্ধমানে যাইয়া কি পাইলাম? কি পাইলাম,—যদিও তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যাহা পাইয়াছি,—তাহা পাইবার আশা কখনও করি নাই। দেখিলাম জাতি নাই—আভিজাত্য নাই, হিন্দু নাই—মুসলমান নাই—সবাই এক প্রেমের ডোরে আসিয়া বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে! আমাদের অলক্ষ্যে অগোচরে ধীরে ধীরে একটা বিরাট জাতীয়তা আমাদিগকে পরম শ্রেয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে; রাজাধিরাজের কথায় জগন্নাথ-ক্ষেত্রের আনন্দ বাজারে আসিয়া দাঁড়াইতেছি।—তবে তাহাই কি কম লাভ? এ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত কোথা হইতে আসিল—এ সীমার মধ্যে অসীমের আহ্বান কে জাগ্রত করিল? ভিন্ন মত ভিন্ন রুচি, প্রয়াগ-সঙ্গমে এক ভক্তির তীর্থে আসিয়া সম্মিলিত হইয়া যাইতেছে।

আমরা শতকণ্ঠে বলিব—ইহা মিথ্যা নহে সত্যই—যাহা পাইয়াছি, তাহা আশার অতীত। পাইয়াছি আনন্দ—পাইয়াছি প্রেম—আর কি চাই? এবং ইহা হুজুগও নহে।

আরও একটা কথা—দেশের আপামর সাধারণ জানিয়াছে, অন্ততঃ বর্দ্ধমানবাসীরাও ইহা জানিয়াছে,—যে, সাহিত্য বলিয়া একটা জিনিষ আছে, এবং সেই সাহিত্যের যাঁহারা সেবা করেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও ভোজনের ত্রুটী করেন না—এবং তাঁহারা দেশের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি।

কে বলিতে পারে, দেশের নিম্নস্তরেও একদিন সাহিত্য আরাধনার এই প্রবল আগ্রহ জাগ্রত হইতে না পারিবে? কারণ দেশের সর্ব্ব নিম্নস্তরেও এই রকম করিয়া জাগ্রত হয়। স্বদেশী আন্দোলনে এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সাহিত্য-সম্মিলনে আমাদের লাভ যাহা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট, এবং এই লাভের লোভ প্রত্যেক সম্মিলনী হইতে পাইবার প্রত্যাশা করি।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।



অস্ট্রিয়ার নিহত যুবরাজ ফার্দ্দিন্যাণ্ড।





যুবরাজ ফার্দ্দিন্যাণ্ডের সহধর্ম্মিণী।

হরিদ্বারে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

হরিদ্বারের অনেক নাম, আমি সম্প্রতি 'আর্য্যাবর্ত্ত' মাসিকে 'হরিদ্বার' শীর্ষক কবিতায় 'হরিদ্বার' 'হরদ্বার' 'মায়াপুর'—'দেবদ্বার' 'গঙ্গাদ্বার' প্রভৃতি হরিদ্বারের সব নামগুলিই উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধগণ বলেন, বুদ্ধ-জননী মায়াদেবী হইতে মায়াপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু চতুর্ভুজা, ত্রিমস্তা – ত্রিশূল,—চক্রধারিণী মায়াদেবীকে দর্শন করিলে আমাদের ৺জগদম্বার প্রতি-মূর্ত্তি ভিন্ন কখনও বুদ্ধজননী বলিয়া অনুমান করা সহজ নহে। যাহা হউক, মায়াদেবীর মন্দিরটী সমস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত, ইহা দশম শতাব্দীর পুরাতন কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। হরিদ্বারের সমস্ত মন্দিরগুলিই পাথরে গাঁথা। হরিদ্বারের যত প্রকার নামই থাকুক, আমাকে 'হরদ্বার' নামটী বেশ ভাল লাগে। কারণ লোক-লোচনের অন্তরালে, নির্জ্জন পাহাড় জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথ ভেদ করিয়া রজত-শুভ্র এই বরফের দেশে উঠিতে থাকিলে, সর্ব্বদাই সেই শ্মশানবাসী বিভূতি-ভূষণ ভগবান ভোলানাথের শুভ্র, শান্ত মূর্ত্তিই অন্তরে নৃত্য করিতে থাকে—আর মুহুর্ম্মুহুঃ গিরি-গাত্র হইতে পিকরবের প্রতিধ্বনি সেই সংহারকর্ত্তা নীলকণ্ঠের বিষাণ-বাদন বলিয়া অনুমিত হইতে থাকে, তখন যাত্রিগণের মনে হয়, এই দেবদ্বার আর অন্য কোন দেবতার দ্বার নহে—ইহাই সেই কৈলাস শিখরের স্বয়ং শম্ভুনাথের কৈলাসপুরে যথার্থই উঠিবার ফটক। হরিদ্বারই যেন প্রকৃত সেই স্বর্গের দ্বার। এই ফটকই যেন স্বর্গ নরক ভাগ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, এই ফটকই যেন স্বর্গরূপ—Glacier এর Snowline, এই মায়াপুরের ফটক পার হইতে পারিলেই বুঝি মানুষ দেব-দেশে গিয়া দেবত্ব পাইয়া থাকে, দেবতা হইয়া যায়, আহার তৃষ্ণা থাকে না; আর ফটক দিয়া পুনরায় নীচেয় নামিতে প্রাণ চাহে না, তাই বুঝি কেদারনাথ, বদরিনারায়ণের সিদ্ধ পুরুষগণ দারুণ শীতে বরফ সমাধি থাকিতে ভালবাসে; তথাপি ফটকের এপারে আসে না। দুই তিন দিন অন্তর বেল খাইয়া কন্দ খাইয়া জীবন ধারণ করে; তথাপি হরিদ্বার পথে ফিরিয়া সহরে নামিতে চাহে না। এমন যে পবিত্র তীর্থ 'হরদ্বার' ইহাকে ভূতত্ত্ববিৎ-গণ গঙ্গাদ্বার ভিন্ন আর অন্য কিছু বলিতে চাহিবেন না, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের

যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাহাদের চক্ষে 'হরিদ্বার'—গঙ্গাদ্বার হওয়াই উচিত, কারণ উত্তর হিমালয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া কত অসংখ্য ঝরণা বহুদেশ ঘুরিয়া সমুদ্রে মিশিবার জন্য বাহির হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমরা তিহরি রাজ্যে গুচ্ছপানি যাইবার পথে প্রত্যেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করিবার সময়, বহুসংখ্যক ঝরণা গঙ্গায় মিশিবার জন্য ছুটিতেছে দেখিয়াছিলাম। ভৌগোলিকগণ হরিদ্বারকে আর কোন দেবতার দ্বার না বলিয়া প্রকৃত গঙ্গাদ্বার বলিয়া আখ্যা দিয়া আসিতেছেন।

আমরা যখন অভ্রভেদী তুঙ্গতুষার-মস্তিষ্ক হিমালয়ের পাদদেশে পর্ব্বত-উপত্যকা তীর্থরাজ হরিদ্বারের চরণ-প্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, তখন নাতিশীতোষ্ণ। সে সময় লছমন ঝোলা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগত সাধু সন্ন্যাসীদিগের জন্য কুঠীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইতেছে, মুসুরি শৈলাবাসে সাহেবদিগের যাইবার জন্য রাস্তা ঘাট পরিষ্কার হইয়াছে, কেবল সাহেব লোকের Especial train দিল্লী-অভিমুখে বাসিন্দা আনিতে চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন আমাদের বাঙ্গালীর গায়ে বেশি শীত লাগে না বটে, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে গঙ্গার বরফ গোলা জলে পাঞ্জাবীদিগের মতন বাঙ্গালী অধিকক্ষণ থাকিলে heart fail করিয়া বসে।

সে সময় হরিদ্বার হইতে কনখল পর্য্যন্ত উপত্যকাভূমির বিস্তৃত গঙ্গাবক্ষ সঙ্কীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, সে শোভা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—সে দৃশ্য আঁকাইবার তুলি নাই! তুমি হরিদ্বারে পাথর বাঁধা গঙ্গাতীর হইতে অথবা কনখলের উপলখণ্ড-পূর্ণ নগ্ন কিনারা হইতে পূর্ব্ব তীরে চণ্ডী পাহাড়ের শ্যামল পাদদেশে দৃষ্টিপাত কর, তোমার প্রাণ কেমন এক প্রেম-রসে আপ্লুত হইয়া উঠিবে, শরীর কণ্টকিত হইবে—চক্ষু দিয়া জলধারা বহিবে। প্রাতঃকালে দেখিবে—চণ্ডী পাহাড়ের পশ্চাৎ ভাগে যতদুর নজর যায়, (Sister Hills) পর্ব্বত মালার শিরোদেশ রূপার মতন ঝক্‌মক্ করিতেছে, কেহ কেহ বা রামধনুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। চণ্ডী পাহাড়ের চরণতল শ্যামল বনলতা মণ্ডিত, তন্নিম্নে নদীকূলের সিকতা-স্তর, তাহার পরই নদীবক্ষে নরমুণ্ডের ন্যায় গোলাকার অসংখ্য লাল নীল সাদা জরদা রঙের প্রস্তরখণ্ড একটার উপর আর একটা যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

প্রাতঃকালে পশ্চিমতীরে হরিদ্বার সহরপানে চাও, তাহা হইলে দেখিতে

পাইবে, ভীম ঘোড়া হইতে কনখল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সহরটী গঙ্গার কূলে কূলে একে বেঁকে একটা চিত্রিত চাঁদোয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, মনে হইবে কৈলাসপুরী বুঝি ঠিক এইরূপই দেখিতে হয় ? প্রিয়দর্শন যাত্রিগণ দেবলোক —আর শঙ্খঘণ্টামুখর বেদগান দেবতাদিগের ভাষা। তুমি যেন অবিকল ত্রিদিব স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ। বরফ-মস্তিষ্ক বিশাল পর্ব্বত, ময়ুর, হরিণ, ভিন্ন হরিদ্বারে আরো দুটী জিনিষ বাঙ্গালীর চক্ষে নূতন লাগে। একটী মহাশের মাছের হাতে হাতে আহার দেওয়া, দ্বিতীয়টী পাঞ্জাবী রমণীগণের ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে অবগাহন।

হরিদ্বারের ঘাটে ঘাটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাশের মাছ (মহাশ'ল) যাত্রীদিগের গায়ের উপর অনবরত আসিয়া ঢু মারিতেছে, একটী একটী মাছ একমণ দেড় মণেরও উপর দেখিতে পাওয়া যায়। মাছগুলি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশে মৃগাল মাছের ন্যায়। যাত্রীদিগের যেমন দেবতা দর্শন ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সম্পাদন করা একটী কর্ত্তব্য কার্য্য, সেইরূপ এই সমস্ত মৎস্যকুলকে আহার করানও আর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রত্যেক যাত্রীই ছাতু অথবা ময়দার দলা পাকাইয়া হাতে করিয়া মৎস্যদিগকে ডাকিবে, আর কাল মেঘের মতন জল আঁধার করা মৎস্যকুল গঙ্গার কূলে আসিয়া যাত্রীদিগের হাত শুদ্ধ গিলিয়া ধরিতেছে। আবার মাঝে মাঝে ২।১টী বাঁদর ঝপ করিয়া পড়িয়া মাছের মুখ হইতে থাবা দিয়া খাবার কাড়িয়া লইতেছে, এই যে সহস্র সহস্র মাছ নির্ব্বিবাদে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া স্বচ্ছন্দে রাজভোগে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মৎস্যজীবনও যখন নিজের সুখে সন্তুষ্ট নহে, তখন মনুষ্য-জীবন কি করিয়া কেবল নিজস্বটুকু লইয়া তৃপ্ত হইতে পারিবে ? আমরা পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এই সমস্ত মাছ যখন কেহ মারিতে বা ধরিতে পারে না, তখন ইহারা আরো বড় হইতে পারে না কেন, আর সংখ্যায়ও বা বৃদ্ধি হয় না কেন ? পাণ্ডা উত্তর করিল—ভগবানের অভিপ্রেত নহে যে, ইহারা দীর্ঘকাল সুখভোগ করে। হৃষীকেশের Up হইতে কনখলের Down পর্য্যন্ত কেহ মাছ ধরিতে পারিবে না আইন আছে বটে, কিন্তু যখন গরমে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, রাঙা জলে গঙ্গা-বক্ষ ভরিয়া যায়, সেই ঘোলা রাঙা জলের আস্বাদ পাইয়া মৎস্যগণ এত আদর যত্ন ভুলিয়া কতক হৃষীকেশ পার হইয়া উপরের দিকে উজান উঠে, কতকগুলি কনখল পার হইয়া Down এর দিকে চলিয়া

যায়, আর সেই সময় ধৃত হইয়া সাহেব লোক ও অন্যান্য আমিষভক্ষকদিগের রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে ; কাজেই বড় বড় মাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা ১০।১২ দিন হরিদ্বারে ছিলাম, আমাদের গোয়েন্দা যাত্রী ব্যতীত আর ৫।৬ জন মাত্র বাঙ্গালী যাত্রী এই দীর্ঘ দিনে আমাদের পরে পড়িয়াছিল। হরিদ্বার রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের তীর্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেখানে হিন্দুস্থানী অপেক্ষাও পাঞ্জাবী যাত্রীর বেশী ভিড় দেখিলাম, শত শত পাঞ্জাবী-রমণী আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতেছে। যেমন তাহাদের নীরোগ নিটোল অবয়ব—তেমনি টক্‌টকে রঙ। সবুজ কিংখাপের পায়জামা ভেদ করিয়া যেন স্বর্ণ বর্ণ উছলাইয়া উঠিতেছে। পাপ যেন স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা কখনও উলঙ্গ, কখনও অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছে, কাহাকেও সঙ্কোচ নাই--কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, বদনে কেবল দেবতার নাম, নয়নে দেবতার জ্যোতিঃ! তাহাদের দিকে পাপ মনে চাহিতে গেলে নয়ন আপনিই যেন অন্ধ হইয়া আসে। এই দৃশ্যটী প্রথম প্রথম আমাদের মনে অন্য ভাব আনিয়াছিল, আমরা প্রায়ই এই সব বিষয় আলোচনা করিতাম ; কিন্তু ২।৪ দিনেই আমাদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, সে সব কথা মনেও স্থান পাইত না! বাস্তবিকই সুন্দরী দেখিতে হইলে এই খানেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটা খাঁটি সত্য কিছু না দেখিলে তাঁহার অনুকরণ করা যায় না, আমাদের চিত্রকর যে ভ্রূ আঁকে, তাহা বোধ করি এই হিমের দেশের সুন্দরী রমণীর ভ্রূ দেখিয়াই প্রথমে অনুকরণ করিয়াছিল। রমণীর রূপলাবণ্যের কথা উঠিলে অনেকে কাশ্মীরের কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার বোধ হয় হরিদ্বারে আসিয়া এই সমস্ত পাঞ্জাবী রমণী-দিগের অনিন্দ্য সুন্দর ভ্রূযুগল, বিস্তৃত নয়নের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, উন্নত নাসিকা ও নীরোগ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মাধুর্য্য দেখিলে বোধ করি কাহারও সৌন্দর্য্য-লালসা অতৃপ্ত থাকিতে পারে না। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের অস্বাভাবিক স্নানের জন্যই সম্ভবতঃ ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের ফটো তোলা সরকার হইতে নিষেধ আছে, পৃথক্ অনুমতি না লইলে ফটো তোলা যায় না।

ক্রমশঃ—

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বন্ধুর প্রতি।



হাতে ধ'রে বন্ধুবরে
বন্ধু কহে সকাতরে,—
ছেলেটীরে 'চড়া' দরে
বেচ না হে বেচ না,

তোমার অখ্যাতি হ'বে
কেমনে পরাণে স'বে
টাকার 'ঠনাৎ' রবে
ওহে ভায়া নেচ না।

প্রতিবাসী—ভাঙ্গা বুক
দেখে কেন হাসি-মুখ ?
সুখের পরে যে দুখ
জেনে কি তা' জান না !

জল ঢেলে' মনাগুণে
ভাল ঘর দেখে' শুনে'
সুশীলা—ভূষিতা গুণে
'বউমায়' আন না।

উপযুক্ত পুত্র যা'র
কিসের অভাব তা'র ?
তোমার এ ব্যবহার
সাজে না হে সাজে না,

সমাজ থাকে না আর
ছেড়ে' দাও অত্যাচার,
বলি কত শত বার
প্রাণে কি তা' বাজে না !

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষার দোষ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রি এক প্রহরের পরে যখন স্তব্ধপল্লী সুপ্ত সুখ অনুভব করিতেছিল, এবং একটা পেচক বাঁশঝাড়ের মাথায় বসিয়া অতি কু—'কু-উ' স্বরে অশুভ ঘোষণা করিতেছিল, সেই সময় মুখে 'গালপাট্টা' আঁটা, 'মাল কোচ্চা' পরা, দীর্ঘ যষ্টিহস্ত সাত আট জন যোয়ান পুরুষ ননি চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর প্রাচীরে মৈ লাগাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তন্মধ্য হইতে এক জন ধাঁ করিয়া ঘুরিয়া গিয়া সদর দরোজা খুলিয়া দিল। আর একজন পশ্চাদ্দ্বার খুলিল।

তারপরে চারিজন দুই দরোজার নিকট সাবধানে পাহারায় দাঁড়াইল—বাকি কয়জনে যে গৃহে পুরুষপরিশূন্য অসহায় শ্বাশুড়ী যুবতী-পুত্রবধূ লইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই গৃহের দাবায় ভীষণ পদাঘাত করিল। একবার দুইবার তিনবার—আঘাতে দরোজা কাঁপিল, গৃহমধ্যস্থ ঘড়া, গাড়ু, ঘটি, থালা কাঁপিয়া 'ঝুন্ ঝুন্ ঝনাৎ' প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিল। আবার লাথি—আবার শব্দ!

নিদ্রিতরমণীদ্বয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিল,—জাগিয়া উঠিয়া বসিল। ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল। শ্বাশুড়ী বধূ বুঝিলেন, 'ডাকাত পড়িয়াছে—আর এই ডাকাতের দল হীরালালের প্রেরিত। কিন্তু এখন তাহাদিগকে কে রক্ষা করিবে? "ভগবান্,—তুমি কোথায়? অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল—রমণীর লজ্জানিবারক, রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

বাহির হইতে পুনঃপুনঃ পদাঘাত হইতে লাগিল। এক এক লাথিতে সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িতে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব নাই।

বধূ শ্বাশুড়ীর বুকে মাথা লুকাইল; শ্বাশুড়ী চীৎকার করিতে গেলেন। গলা উঠিল না—স্বর বাহির হইল না,—ভয়ে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি চীৎকার করিতে লাগিলেন—কিন্তু ভীতার্ত্ত কণ্ঠের সে স্বর গৃহের বাহির হইল না।

আবার লাথি—লাথির উপরে লাথির আঘাতে দরোজা দেওয়াল হইতে

সরিতে লাগিল—গাঁথুনির চূণ-বালি খসিতে লাগিল,—বাহিরের আলোক ঘরে প্রবেশ করিল। আর রক্ষা নাই—শ্বাশুড়ী-বধূ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। চীৎকার করিবার—কথা কহিবার শক্তি তাহাদের অনেকক্ষণ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণের পুনঃপুনঃ আঘাতে দেওয়াল হইতে দরোজা ছিন্ন হইয়া ঘরের মধ্যে বিশাল শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। যাহারা আঘাত করিতেছিল, তাহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন শ্বাশুড়া-বৌ উভয়েই মূর্চ্ছিত। দস্যুগণ গৃহমধ্যস্থ দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। তারপরে বধূকে ধরিয়া পাথরকোলা করিয়া দুইজনে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া বাহির হইল।

সুপ্তপল্লী-পথে—জনহীন পল্লী-পথে দস্যুগণ বধূকে লইয়া কিয়দ্দূর যাইয়া, এক অশ্বথ বৃক্ষের অদূরে দাঁড়াইয়া বোধ হইল, কাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কেহ সেখানে আসিল না।

তখন একজন বলিল—"কৈ রে ভাগা, মালিক কৈ ? এ বমাল নিয়ে এখন কোথায় যাব ? এ সামাল দেওয়া মোদের কাজ নয়।"

ভাগা বলিল,—"তাই ত রে। ব্যাটার কথা শুনে কাজে হাত দিয়ে শেষে কি জেল খেটে মরবো নাকি ?"

সেই দলের সোণা বলিল—"মুই কিন্তু তখনি বোলেছিলাম, সীতে বসি ছেলে, ও বেটা 'মারে মাছ, নাছোঁয় পানি'—কদিনের পয়সা। মোদের কাজ বুঝ্তি বনেদি ঘরের লোক চাই।"

ভাগা। এখন যদি শালা না আসে ত কি কোর্ব্ব ?

প্রথমে যে বলিয়াছিল, তাহার নাম মাধা। মাধা বলিল,—"নাই যদি আসে, বৌটাকে এই মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমরা যা ঘটিটা বাটিটা পেয়েছি, নিয়ে চলে যাব।"

সোণা। তবেই ত, এত খাটুনীর কি এই মজুরী বাবা ? বেচে-কিনে দু'দিনের গাঁজা হবে না।

মাধা। আচ্ছা, শালা গেল কোথায় ? সে যে পাল্কী নিয়ে ঐ পুকুরের ওধারে দাঁড়িয়ে থাকবে,—এল না কেন ? কোন বিপদ হয়নি ত ?

ভাগা। মোরও কিন্তু তাই মনে হ'চ্চে—গাটা যেন কেমন ভারি ভারি বোধ হ'চ্চে।

সোণা। তবে চল, বৌটাকে ফেলে দিয়ে মোরা পালাই!

মাধা। বৌটা যদি বলে দেয়।

সোণা। ও ত অজ্ঞান—মোদের কি আর চিন্তে পেরেচে। জ্ঞান থাকলিও চিন্তে পারবে কোথা থেকে।

মাধা। আর যদি ভয়ে মরে গিয়ে থাকে?

সোণা। বালাই গিয়েছে।

মাধা। আর যদি মোরা ধরা পড়ি?

সোণা। যত কু-ভাবনা তুই যুটিয়ে আনিস্।

মাধা। ভেবে-চিন্তে কাজ করাই ভাল। ঐ বিলের মধ্যে খুসে রেখে যাই চল্—লাস না পেলে আর কি কোরবে?

ভাগা! সেই পরামর্শই ভালরে সেই পরামর্শই ভাল।

তাহারা তখন এদিক—ওদিক চারিদিক চাহিয়া অদূরস্থিত বিলের দিকে ফিরিতেছিল। সেই সময় একজন বলিল,—ঐ বুঝি আস্‌ছে রে।"

সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া মাধা বলিল,—উ, হাঁরে, ক'জন লোক হন হন কোরে এই দিকেই আসছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে জন পনর লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলের হাতে বড় বড় লাঠি। একজন হাকিয়া বলিল,—"পাকড়া শালাদের।"

দস্যুদল বিপদ গণিল। অচৈতন্য রমণীর দেহ মাটিতে নামাইয়া সকলে লাঠি ধরিল;—কিন্তু লাঠি চালাইতে সক্ষম হইল না। বিপক্ষ-পক্ষ হইতে পিস্তল গর্জ্জিল,—একজন দস্যুর বামহস্তে পিস্তলের গুলি প্রবেশ করিল। আর এক জনের লাঠি আসিয়া একজন দস্যুর মস্তকে পড়িল এবং মাথা ফাটাইয়া রক্ত বাহির করিল।

দস্যুগণ বুঝিল, তাহারা পুলিসকর্ত্তৃক ঘেরাও হইয়াছে। অতএব বৃথা প্রাণহানি না করিয়া হাতের লাঠি ফেলিয়া ধরা দিল। কেন না, বন্দুকের গুলির কাছে লাঠি কি করিবে। তাহারা গুণ্ডা—প্রকৃত ডাকাত নহে।

পুলিসের লোক তাহাদিগকে বাঁধিয়া—অচৈতন্য রমণীকে তুলিয়া লইয়া থানা অভিমুখে চলিয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বধূকে লইয়া দস্যুগণ চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই শ্বাশুড়ীর চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন, দীপালোকবিহীন গৃহ—বাহিরের আলো আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে—জানেলা দরোজা খোলা—হুহু করিয়া বাহিরের বাতাস ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

শ্বাশুড়ী কাঁদিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনার অবস্থা, বধূমাতার অবস্থা ও ডাকাত দলের কথা মনে করিলেন। পাগলিনীর মত চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—চারিদিকে হাত বুলাইয়া বধূকে খুঁজিলেন,—কোথাও সন্ধান নাই। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—কোথাও সন্ধান নাই। বুঝিলেন—দস্যুগণ বধূকে লইয়া গিয়াছে। আরও তাঁহার মনে হইল, এই দস্যুগণ হীরালালেরই প্রেরিত—হীরালাল—নরপশু—পিশাচ হীরালাল [illegible]ণের কুলবধূ, তাঁহার মানসম্ভ্রম ও জাতির কাঁটা এবং নয়নের মণি স্নেহের [illegible] বধূকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া [illegible] হইলেন। কিন্তু যাইবেন কোথায়? তখন গভীর নিশীথ কাল—[illegible] জন-মানব শূন্য। পাড়ার পোষা কুকুরগুলা তখনও ঘেউ ঘেউ করিয়া [illegible] দস্যুসমাগম ও বহির্গমন সংবাদ প্রচার করিয়া সুপ্ত পল্লীবাসীর [illegible] ভাঙ্গিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

[illegible] যাইবেন কি করিবেন—কোথায় গেলে স্নেহের বধূমাতাকে [illegible] তাহাই ভাবিয়া আকুল ক্রন্দনে নীরব পল্লী জাগাইতে চেষ্টা ক[illegible] [illegible]টি প্রাণীও তাহার বাড়ী আগমন করিল না। সুপ্ত প্রতিবাসীর [illegible] ভাঙ্গিল না। আসল কথা,—জাগিয়াছিল অনেকে, সংবাদ পা[illegible]—কিন্তু অসহায়া রমণীদ্বয়ের সাহায্য করিতে গিয়া কি পরের [illegible] টানিয়া আনিবে? হীরা বোস যে এরূপ একটা অত্যাচার [illegible]রবে, তাহা সে দিন [illegible] পল্লীর প্রায় সমস্ত লোকই জানিতে পারিয়াছিল। একদিকে [illegible] মাতা অত্যাচার অবমানের মর্ম্মান্তিক কাহিনী বুকে করিয়া দু[illegible] [illegible]—অপর দিকে তেমনি ননির মাতা ও ননির স্ত্রীর এই [illegible] [illegible]ইয়া বেড়ানর প্রতিশোধ লইবার দানবীয় তাণ্ডব হুহুঙ্কা[illegible]রালাল [illegible]মে শাসাইয়া ফিরিয়াছে,—

সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টই বলিয়াছে,—গোণ্ডা লইয়া আ'জ নিশীথকালে পুরুষ-শূন্য রমণীদ্বয়ের বাড়ী প্রবেশ করিবে—অত্যাচার করিবে—কাহার সাধ্য যে তাহার গতি রোধ করে!

প্রায় গ্রাম শুদ্ধ উভয় পক্ষের কথা শুনিয়াছে,—কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত বিবেচনা করে নাই। যখন চীৎকারে ক্রন্দনে তাহারা সুপ্তপল্লী মুখরিত করিয়াছে—তখনও কেহ অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই।

তবে দুইটি লোক কেবল সন্ধ্যার সময় এ অত্যাচার অসহ্য মনে করিয়া পতঙ্গ হইয়া জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এক নেপাল মণ্ডল, আর দরাপ খাঁ।

নেপাল মণ্ডল ননিদের অনেক দিনকার প্রজা। সে যখন ঐ সকল ষড়-যন্ত্রের কথা পরম্পর শুনিতে পাইল, তখন কি করিবে, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। গ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক সকল যাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিল না—গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রজাগণ জমীদারের কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে কথা কহিতে যখন সাহস করিল না, তখন সে ক্ষুদ্র—অসহায়—একা কি করিতে পারে! কিন্তু জড়ের মত এ অত্যাচার দেখিয়া নীরব থাকাও নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। নীরব সন্ধ্যার ধূসর ছায়াতলে 'এদ্‌গা' বাড়ীর বেদীর উপরে বসিয়া যখন নেপাল মণ্ডলের অশিক্ষান্ধকার-মগ্ন চিত্ত এই বিষয় লইয়া তপোমগ্ন ঋষি-চিত্তের ন্যায় আন্দোলন করিতেছিল, সেই সময় সেখানে দরাপ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হয়। দরাপ খাঁ ত্রিংশৎ বর্ষীয় যুবক—এবং কিনু খাঁ নামক সামান্য এক কৃষিব্যবসায়ী দরিদ্র মুসলমানের পুত্র।

দরাপ গরুর ঘাস কাটিয়া লইয়া মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। এদ্‌গার বাঁধা বেদীতে চিন্তামগ্ন চিত্তে নেপাল মণ্ডলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মাথা হইতে ঘাসের বোঝা মাটিতে ফেলিয়া কাঁধের গামোছায় মুখ মুছিতে মুছিতে নেপালের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"নানা, কি ভাব্‌চো?"

এই নানার সঙ্গে দরাপের একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। নানা ভাবের গান জানিত, এবং বেহেস্তা দোজক পরী জীন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখিত বলিয়া দরাপ তাহাকে ভক্তি করিত ও সময় পাইলে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় নানার নিকটে আসিয়া বসিত। এদ্‌গাটী সাধারণের হইলেও দরাপের বাড়ীর নিকটে।

দরাপ জিজ্ঞাসা করিল,—"নানা, ভাব্‌চো কি ?"

নেপাল। ভাব্‌চি কি জানিস্‌,—এদেশে আর থাকা হয় না।

দরাপ। কেন নানা,—হ'য়েছে কি ?

নেপাল। ননি ঠাকুরকে জানিস্‌ ?

দরাপ। জানি বৈ কি।

নেপাল। সে বিদেশে থাকে,—ঘরে তার হুরীর মত বৌ আছে।

দরাপ। আছে ত আছে ;—তাই কি ?

নেপাল। বলি শোন,—হীরে বোস জমীদারের লোক হ'য়েছে, টাকা হয়েছে। বৌটীকে চায়,—কোন্‌ মাগীকে দিয়ে তাদের সম্মতি চায়,—তারা ঝাঁটাপিটে করিবার ভয় দেখায়।

দরাপ। বেশ ত—ভদ্রলোকের বৌঝীর মতই কাজ কোরেছে।

নেপাল। কোরেছে, কিন্তু এখন যে বাঁচে না।

দরাপ। কেন, কি হ'য়েছে ?

নেপাল। হীরালাল গোণ্ডা দিয়ে বৌটিকে আ'জ রাত্রে তুলে নিয়ে যাবে।

দরাপ। হুস্‌—এ মগের মুল্লুক কি না ! গাঁয়ে ত লোক নেই !

নেপাল। বাস্তবিক লোক নেইরে—সারা গাঁয়ে একজনও পুরুষ মানুষ নেই। পুরুষ মানুষ থাক্‌লে মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার সহ্য করতে পারে না।

দরাপ। মেয়ে দুটীকে সংবাদ দাও—তারা প্রতিবাসীদিগকে জানাক।

নেপাল। জানিয়াছে,—গ্রামের সবাই শুনেছে, কিন্তু কেহ কথা কহে নাই।

দরাপ। সত্য না কি ?

নেপাল। হাঁ।

দরাপ। তবে আমাদের পাড়ার যোয়ান গোছাও—আমরাও রক্ষা করবো।

নেপাল। তার চেষ্টাও কোরেছিলাম, কিন্তু কেউ স্বীকার হয় না। সবাই জমীদারের ভয় করে।

দরাপ। বল কি নানা ? মুসলমানের রক্ত কি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

নেপাল। তারা বলে হিঁদু হিঁদুতে হচ্ছে, আমরা মাঝে পড়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হব কেন ?

দরাপ। সে ভুল,—কিন্তু আর ত তাদের ভুল ভেঙে কাজ কর্‌বার সময় নেই,—এখন তুমি আমি কি করতে পারি। তাই ঠাওরাও।

নেপাল। তুই আমার সাহায্য করবি?

দরাপ। তোমার সাহায্য কি নানা;—বল মানুষ হ'য়ে মানুষের যা' কাজ, তাই করবি? বল না—কি কর্‌তে হবে?

নেপাল। থানায় যেতে পারিস্?

দরাপ। কেন পারবো না?

নেপাল। এখনি যেতে হয়।

দরাপ। বাড়ী ঘাসের বোঝাটা ফেলেই যাই। গিয়ে কি কর্‌তে হবে, ব'লে দাও।

নেপাল। দারোগাবাবুকে সব কথা বল্‌বি—সুইতলার মাঠে গোণ্ডাগণ বৌটাকে নিয়ে যাবে—হীরুও সেখানে পাল্কী নিয়ে উপস্থিত থাকবে—সেই খানে সব গ্রেপ্তার করা যাবে।

দরাপ। এ গোপন খবর তুমি জান্‌লে কি রকমে নানা?

নেপাল। ঝড়ো বাগ্দীকে উদলে দিয়েছি—সে সব খবর এনে দেবে।

দরাপ। সেলাম নানা;—এখন তবে যাই।

নেপাল। হ্যাঁ, বিলম্ব করলে কিন্তু ঠিক সময়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছিতে পারবে না।

দরাপ। না না,—বিলম্ব করবো কেন?

দরাপ চলিয়া গেল। নেপাল আরও কিয়ৎক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া চিন্তা করিয়া উঠিয়া গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং উজ্জ্বল সান্ধ্যতারা গগনপ্রান্তে বসিয়া কিরণ দানে জগতের অন্ধকার ঘুচাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা।

অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরাণী।

এই সংখ্যার অবসরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরাণীর প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারাই সিরাজিভো সহরে নিহত হন; ইঁহাদের হত্যার ফলেই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। নিহত যুবরাজ ফার্দ্দিন্যাণ্ড জর্ম্মন-সম্রাট কৈশার উইলিয়মের পরম বন্ধু ছিলেন। কৈশারের ন্যায় ইঁহারও দুরাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল ছিল। অস্ট্রিয়ার বিজয়কেতন ইয়োরোপের বহু স্থানে স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ইঁহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল। যুবরাজ ফার্দ্দিন্যাণ্ড অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন; তিনি স্বয়ং যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন, বিশেষজ্ঞের সহস্র প্রতিবাদেও তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। ইঁহার সহধর্ম্মিণী কোন রাজবংশের কন্যা ছিলেন না,—কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা মাত্র; যুবরাজ ফার্দ্দিন্যাণ্ড এই রূপবতী যুবতীর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করিতে বদ্ধপরিকর হন;—এ ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার মন্ত্রিসমাজ, এমন কি স্বয়ং সম্রাট পর্য্যন্ত বিস্তর আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু যুবরাজ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। সম্রাট যুবরাজকে এ কথাও বলিয়াছিলেন,—"যদি তুমি এই মহিলাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উপর তোমার কোনও অধিকার থাকিবে না।" যুবরাজও উত্তর দিয়াছিলেন,—"এই যুবতীকে বিবাহ করিতে আমি যখন প্রতিশ্রুত হইয়াছি—তখন পৃথিবীর সিংহাসনের বিনিময়েও আমি আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।"—বিবাহের পর কিন্তু ইঁহাদের এই মনোমালিন্য অপসৃত হইয়াছিল। সম্রাটের আদেশে যুবরাজ বোসেনিয়া ও হারজেলোভিনিয়ার অসন্তুষ্ট প্রজাদের সায়েস্তা করিবার জন্য অকুস্থলে গমন করিয়াছিলেন; যুবরাণীও তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। যুবরাজ যাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—"আমি এই অসন্তুষ্ট প্রজাদের প্রতি প্রথমতঃ যতদূর সম্ভব সদয় ব্যবহার করিব, কিন্তু যদি তাহারা তাহাতে সায়েস্তা না হয়—তখন তাহাদের প্রতি সয়তানের যোগ্য ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইব না!"—এই যাত্রাই তাঁহার কাল হইল; পথিমধ্যে বোসেনিয়ার রাজধানী—সিরাজিভো সহরে পিস্তলের গুলিতে তাহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

লুক্সেমবার্গের কুমারী রাণী।

জর্ম্মন সাম্রাজ্যের সান্নিধ্যে লুক্সেমবার্গ নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। রাজ্যটি স্বাধীন; রাজ্যের নায়ক—পুরুষ নহেন, রমণী। ইনি "লুক্সেমবার্গের ডচেস" নামে ইয়োরোপে প্রসিদ্ধা; ইঁহার প্রসিদ্ধিলাভের কারণ এই,—ইনি অসামান্য সুন্দরী, যুবতী এবং কুমারী। বর্ত্তমান যুদ্ধের সংস্রবে—জর্ম্মণীর যুবক যুবরাজ একদল সৈন্য লইয়া সহসা এই রূপসী রাণীর রাজধানীতে প্রবেশ করেন; তাহার ফলে ক্ষুদ্র রাজ্য, রাজপ্রাসাদ ও রাজপ্রাসাদের অধীশ্বরী যুবরাজের হস্তগত হয়। যুবরাজ সুন্দরী রাণীকে বন্দিনী করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান,—এই ব্যাপার লইয়া ইয়োরোপে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়; কিন্তু কিছুদিন হইল, এ সম্বন্ধে একটি বড় রহস্যময় সংবাদ বাহির হইয়াছে। লুক্সেমবার্গের রাণী তাঁহার রাজধানীতে নূতন পার্লামেণ্ট বসাইয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—"জর্ম্মণীর যুবরাজ আমাকে বন্দিনী করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের আক্ষেপ করিবার—তাঁহার বিরুদ্ধে দোষারোপ করিবার কিছুই নাই! কেন না—যুবরাজ সম্পূর্ণরূপে আমার ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন!—ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় দিব্য পরিপাটি নহে কি? আজকাল আমাদের দেশে যে সকল গ্রন্থকার 'Plot' এর অভাবে গ্রন্থ রচনায় ইস্তফা দিয়াছেন, তাঁহারা এই রহস্যময় কাহিনীটি ফেনাইয়া একখানি বেশ রহস্যোপন্যাস রচনা করিবার অবকাশ পাইবেন সন্দেহ নাই!

নির্ম্মাল্য।

ভক্তি যাহার
কণ্ঠের হার—
শক্তি-কুসুমমালা,
দেব-চরণে
নির্‌মাল্য সে
শ্বেত-চন্দন-ঢালা!

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

মাসিক সংবাদ।

স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

যাহাতে বোম্বাই অঞ্চলে সংস্কৃত ও পার্শী প্রভৃতি পুরাতন প্রাচ্য ভাষা-সমূহের অনুশীলন বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট আটজন পণ্ডিত ও চারিজন মৌলবিকে মাসিক একশত টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৃত্তি তিন বৎসর কাল স্থায়ী হইবে।

শ্রীযুক্তা সরযূবালা দাশগুপ্তা প্রণীত 'ত্রিবেণী-সঙ্গমে' নামক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

গত ফাল্গুনমাসে রাজসাহীতে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্যিক কন্ফারেন্সের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য গগনের চন্দ্রপাত হইয়াছে। বিখ্যাত গ্রন্থকার মিঃ ব্রাঙ্ক বুলেনের মৃত্যু হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিদেশিনী" নামক নূতন উপন্যাস প্রকাশ হইয়াছে।

চিত্র পরিচয়—গতবারে আমরা ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের উন্মেষ-ক্ষেত্র "সিরাজিভো" সহরের চিত্র প্রকাশিত করিয়াছি। উক্ত সিরাজিভো সহরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরাণী নিহত হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিহত যুবরাজ-দম্পতির প্রতিকৃতি অবসরে প্রকাশিত হইল।



সাবিত্রী ও সত্যবান।

স্বর্গীয় ৺রামগতি ন্যায়রত্নের জীবনী।

(১)

হুগলী জিলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে পণ্ডিতপ্রবর ৺হলধর চূড়ামণি মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ৺চূড়ামণি মহাশয়ের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাহার নাম ছিল ৺দিগম্বর ন্যায়বাগীশ। উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ন্যায়-বাগীশ মহাশয়ের কয়েকটী সন্তান সন্ততি হইয়াছিল; চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাদিগকে খুব স্নেহ যত্ন করিতেন।

দশবৎসর বয়সে ৺ন্যায়রত্ন মহাশয় গ্রাম্য পাঠশালাতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। একাদশ বর্ষে তাঁহার উপনয়নের পর কালিদাস ঘটক নামক একজন অধ্যাপকের নিকট কিছুকাল ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে, ১৩র বৎসর বয়ঃক্রমকালে, তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলে-জের ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তথায় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। এবং প্রতি পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা ও পারিতোষিক পাইতেন। শুনা যায়, ধাতুপাঠ তাঁহার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল এবং যাহাতে উহা ভুলিয়া না যান সেজন্য পঠদ্দশায় প্রত্যহ বাসা হইতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ও তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া আসার সময়ে, স্তব পাঠের ন্যায় সমগ্র ধাতুপাঠ আবৃত্তি করিতেন।

সংস্কৃত কলেজে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি তদানীন্তন পাঠ্যসমুদয় এবং যৎসামান্য ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন; ১৮৫০-৫১ অব্দে তিনি সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে সংস্কৃত কলেজে আটটী পনের টাকা ও ৪টী ২০৲ টাকার বৃত্তি নির্দ্ধা-রিত ছিল। যে সকল ছাত্র সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে ২।৩ বৎসর পরে কুড়ি টাকার বৃত্তিও প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে একেবারেই কুড়ি টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। ক্যাপটেন জর্জটাউনসেণ্ড মার্শেল সাহেব ঐ বৎসর পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ইঁহার যোগ্যতা ও প্রতিভা দর্শন করিয়া স্বীয় মন্তব্যে

ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। শুধু মার্শেল সাহেব কেন, যে যে অধ্যাপকের নিকট ইনি অধ্যয়ন ও পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সকলেই ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও শিষ্টাচার দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রসংশা করিতেন। উল্লিখিত সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ইনি ন্যায়রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়।

(২)

পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সমধিক স্নেহ করিতেন। তৎকালে সংস্কৃত কলেজের নিয়ম ছিল যে, সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পাইতে হইলে ছাত্রকে ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। ঐ ছয়বৎসর অতীত হইয়া গেলেও, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আরও ২ বৎসরকাল অধ্যাপনাকাল বাড়াইয়া দিয়া,—ইংরাজী ভাষাতে অধিকতর পারদর্শী করিবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি বিদেশে অধ্যয়ন হেতু নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই পরম হিতকর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। এইখানেই ইঁহার জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি হয়।

(৩)

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। ঐ পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীদের মধ্যেও কেহ কেহ আবেদন করিয়া ছিলেন। তৎসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার গুণগ্রাম ও স্বভাব চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন; সুতরাং ইহা-কেই মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ বৎসর ২৫ এ আগষ্ট তারিখে শিক্ষকতা উপলক্ষে ইনি হুগলীতে আসেন।

মহামান্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি একজন গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গুণাতিশয্যে মুগ্ধ হন। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বভাব জন্মে। সরকারী ও সাংসারিক সমস্ত বিষয়েই, উভয়ে উভয়ের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ন্যায়রত্ন মহাশয় কাপ্তেন রিচার্ডসন প্রণীত "হিষ্ট্রী অফ দি ব্ল্যাক হোল ট্র্যা জিডি" নামক একখানি ইংরাজী পুস্ত-কের অনুবাদ করিয়া "অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস" নাম দিয়া একখানি পুস্তক

প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে 'বস্তুবিচার' নামক অপর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বস্তু-বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ক কোনও পুস্তক এরূপ সুন্দরভাবে লিখিয়া—ইহার পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করেন নাই এবং অদ্যাপি ঐ সম্বন্ধীয় যত পুস্তক বাজারে বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ইঁহার প্রণীত পুস্তকই উৎকর্ষ ও প্রাধান্যলাভ করিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

(৪)

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে ইনি বাংলা ইতিহাসের প্রথমভাগ ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি বালক পাঠার্থীদিগের পক্ষে এত উপযোগী হইয়াছিল যে, পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়—এই পুস্তকখানিকেই বাংলা ইতিহাসের প্রথমভাগ স্বীকার করিয়া, পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে বাংলা ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়—উক্ত পুস্তকের তৃতীয়ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। এই তিনখানি পুস্তক একত্রে একখানি সম্পূর্ণ ও সুন্দর বাংলার ইতিহাস পুস্তক হইয়াছে। ১৮৬২ অব্দের প্রথমভাগে ইঁহার 'রমাবতী' নামক একখানি প্রাচীনকালের গার্হস্থ চিত্র উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ সালেই তিনি একশত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান (লাকুড্ডি) গুরুট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পিতৃ-বিয়োগ হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। তথায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী ৺ মহামায়া দেবীর মৃত্যু হয়। স্বর্গীয়া মহামায়া দেবী—পুত্র কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—ও রমাবতী নামক ১টী কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়—মহামায়া দেবীর নামানুসারে 'মায়া-ভাণ্ডার' নাম দিয়া এক ক্ষুদ্র পেটীকায় অর্থ-সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদ্বারা দরিদ্রদিগের সাহায্য করিতেন।

বহরমপুর অবস্থান কালে তিনি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। স্যার গুরুদাস তখন বহরমপুর কোর্টের উকীল ছিলেন। ১৮৬৬ অব্দে ন্যায়রত্ন মহাশয় 'ঋজুবাখ্যা'—১৮৬৯ অব্দে

'দময়ন্তী' ১৮৭২ অব্দে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'শিশুপাঠ' নামক একখানি ক্ষুদ্র শিশুপাঠ্য পুস্তিকা-প্রকাশ করেন ও তাহার কিয়দ্দিবস পরেই বঙ্গভাষার গৌরব—"বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক একখানি সুবৃহৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় এই প্রথম।

এক্ষণে অনেকে এই ধরণের পুস্তক প্রচার করিতেছেন বটে, কিন্তু যিনি যেরূপভাবেই লিখুন না কেন—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকের ন্যায় ওরূপ সহজ সুন্দর ও অর্থপূর্ণ মনোজ্ঞ পুস্তক অদ্যাপি বাজারে বাহির হয় নাই। এই পুস্তকের তিনিই "একমাত্র প্রণয়ন কর্ত্তা" বলিলেও সত্যের অপলাপ হয় না। এই পুস্তক প্রণয়ন কালে তিনি যেরূপ পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করাই কঠিন ব্যাপার। এক্ষণে তদীয় উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশ করিয়া যশস্বী ও সাহিত্যসেবীদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ১৮৭৪ সালে 'গোষ্ঠীকথা' নামক একখানি হাস্যরসাত্মক গল্প-পুস্তক রচনা করেন। ১৮৭৯ অব্দের ২৯এ জানুয়ারী তিনি হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তখন ইনি আড়াইশত টাকা বেতন পাইতেন। ঐ সালেই তিনি ভবভূতি প্রণীত সংস্কৃত 'মহাবীর' চরিতের অনুবাদ 'রাম-চরিত' প্রকাশ করেন। ১৮৮২ সালে "নীতিপথ" নামক একখানি ক্ষুদ্র অথচ নীতিবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক সহজ পুস্তক প্রচার করেন ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'ইলছোবা' নামক একখানি সুন্দর উপন্যাস প্রণয়ন করেন। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বগ্রাম "ইলাসভা" বা ইলছোবা গ্রামের ঐতিহাসিক পরিচয় কতকটা পাওয়া যায়।

(৫)

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার বাসগ্রাম ইলছোবাতে একটী বাংলা ও একটী ইংরাজী স্কুল, একটী পোষ্টাফিস ও একটী রাস্তা নির্ম্মাণ কল্পে উদ্যোগী হইয়া সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং "বাংলা ভাষার কুলুজি প্রস্তুত করিয়া, তাহার অজ্ঞাত কৌলিন্যত্বের নিন্দা ঘুচাইয়া, অনাদৃত ভাষার আদর বাড়াইয়া, সাহিত্যসমাজে বাংলাভাষার উচ্চাসন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, বাঙ্গালীজাতির একটা কলঙ্ক মোচন করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।" তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দেবী এখনও

জীবিতা আছেন। দুই পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রাবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়;—৩টী কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা, সুরলতা ও সুরসুন্দরী দেবী—এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি ১৮৯৪ সালের ৯ই অক্টোবর বাংলা ১৩০১ সালের ২৪এ আশ্বিন বিজয়া দশমীর দিন তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতেই দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

জ্যোৎস্নার পূত স্নিগ্ধ রজত-কিরণে
করে যথা যামিনীর তম বিনাশন,
তেমতি অশান্তিময় ক্ষুব্ধ এ পরাণে
দেখাও দেবতা তুমি শান্তির কিরণ।
আঁধার আঁধারতর হৃদয়ে আমার
আকাঙ্ক্ষা করালছায়া বেড়াইত ঘুরি,
যেদিন হেরেছি তব মূর্ত্তি করুণার
নবীন আলোকে হৃদি উঠিয়াছে ভরি।
সে আলোকে মাঝে মাঝে দেখিছে নয়ন
জীবন-সমুদ্র-পারে মধুর স্বপন।
তাই আজি যুক্তকরে করিগো প্রার্থনা,
বারেক দাঁড়াও তুমি মরমের পুরে।
লুপ্ত করি পরাণের বাসনা কামনা
বাজাও মোহন বাঁশী সুমধুর সুরে.
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভেদি উঠুক সে ধ্বনি
ভাসুক নয়ন তব প্রেম অশ্রু ধারে।
মুগ্ধ করি জগতের শত শত প্রাণী
দেখাও মুক্তির পথ নিরমল করে,
সংসারের শত সুখ ত্যজিয়া পরাণ
বিশ্বাস ভকতি সনে, হ'ক আগুয়ান॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পরে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

এতদিন (বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) বালিকা তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা বা অন্য অভিভাবকের সম্পূর্ণ অধীন ছিল, কিন্তু এইবার তাহাকে একটী নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইল। এ বন্ধনটী পূর্ব্ব বন্ধন অপেক্ষা আরও দৃঢ়, কিন্তু গরীয়ান্। কি সমাজের নিকট, কি ধর্ম্মতঃ এবং নিজের বিবেকের নিকটেও এই সুদৃঢ় বন্ধনটী তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখের ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। পিত্রালয়ে তাহার কতক পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, তখন অন্য কাহারও সহিত কোনরূপ সামাজিক সম্বন্ধে জড়িত না থাকায়, বালিকার কাহারও নিকট কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কারণ ছিল না; সে প্রফুল্লান্তঃকরণে স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহার সেই পূর্ব্ব স্বাধীনতা লোপ পাইল। এখন নূতন লোকের সহিত নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় অপরকে দেখিয়া তাহাকে লজ্জা করিতে হইবে, এ লজ্জা জোর করিয়া আনিতে হইবে না, ইহা স্বাভাবিক ও সমীচীন। অপরের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার জন্য এখন হইতে তাহাকে খুব সন্তর্পণে থাকিতে হইবে, কারণ ইহাই সামাজিক প্রথা। ফলতঃ বিবাহের পর তাহাকে একটি নূতন জীবন গঠিত করিতে হইবে। এখন সে আর নিজের বশ নহে, অপর একজন পূর্ব্বে অপরিচিত কিন্তু এখন পরম নিকটাত্মীয়ের সম্পূর্ণ অধীন। এখন তাহাকে কোথাও যাইতে হইলে বা গৃহের বাহির হইতে হইলে, আর কুমারী-কালের ন্যায় স্বেচ্ছায় যাইতে পাইবে না তাহাকে অপর একজনের আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হইবে, কারণ সামাজিক এই নব বন্ধনের সহিত তাহার পূর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। পুরুষের নিকট ত নয়ই, অপরিচিতা বা বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকটেও তাহাকে লজ্জার আবরণ টানিতে হইবে। এ লজ্জা

তাহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে না, বয়োবৃদ্ধির সহিত যতই তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইবে, লজ্জা আপনি আসিয়া তাহাকে অধিকার করিবে। এত গেল সামাজিক নিয়ম পালন, এক্ষণে সে যে নব সংসার ভুক্ত হইল, সেখানে তাহার কর্ত্তব্য কি এবং স্বামীর সহিতই বা তাহার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

এতদিন বালিকা পিতামাতার সংসারে থাকিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীদিগের সহিত পরমানন্দে কাল কাটাইতেছিল, ভাল মন্দ যা কিছু তাঁদের নিকটেই শিক্ষা পাইতেছিল, কিন্তু এইবার তাহার সেই সব শিক্ষার পরীক্ষা হইতে চলিল ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের শিক্ষা-সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। মাতা পিতাই এতদিন শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন; এখন স্বামী সেই স্থান অধিকার করিলেন। এই নব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সে জনক-জননী ও ভ্রাতা ভগ্নীর পরিবর্ত্তে শ্বশুর শ্বশ্রূ দেবর ননদিনীরূপ কতকগুলি নূতন আত্মীয় প্রাপ্ত হইল। এখন ইহাদের সহিতই তাহাকে অধিক সময় বাস করিতে হইবে; সুতরাং দেখা যাউক তাহার কিরূপ ভাবে থাকা উচিত এবং তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এতদিন উদ্ভ্রান্তভাবেই কাল কাটিতেছিল, ধরিতে গেলে তাহার কর্ম্মময় জীবনের এই সূত্রপাত হইল। এখন হইতে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়েই সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে, কাজকর্ম্মে, কথাবার্ত্তায় বা ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে গুরুজনদিগের সেবা, অল্পবয়স্কদিগকে যত্ন ও দাসদাসীদিগের প্রতি সৎ-ব্যবহার করিতে হইবে, অন্যথায় বিড়ম্বনা অনেক। এতদিন তাহার কার্য্যে দোষারোপ করিবার কেহ ছিল না, ধরিলেও তাহা সহজে মিটিয়া যাইত; কিন্তু এখন হইতে তাহার প্রত্যেক কর্ম্মেই ক্রটী বাহির করিবার জন্য অনেকে তৎপর। এরূপ ঘটনা যে কুত্রাপি তাহা নহে, বাঙ্গালীর প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কেন হয় তাহা কি কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন? বোধ হয় না। করিলে আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বধূ-নির্য্যাতনের অবাধ স্রোত প্রধাবিত হইত না। আবার পরিণত বয়স্কা বধূদিগের নিকটেও শ্বশ্রূ-দিগকে সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত হইতে হইত না। কিন্তু ইহাও যে বালিকা-দিগকে সুশিক্ষা প্রদানের অভাব তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। মাতাই প্রধানত ইহার জন্য দায়ী, কারণ বলিতেছি যে যদি মাতা কন্যাকে অশ্লীল প্রেমোক্তিপূর্ণ উপন্যাসাদি পাঠের পরিবর্ত্তে সৎগ্রন্থ পাঠ করান বা সৎব্যবহার

শিক্ষা দেন তাহা হইলে এরূপ ঘটে না। সাধারণতঃ যে যে কারণে এরূপ ঘটে তাহা নিয়ে বিবৃত করিতেছি।

(১) আধুনিক জননীরা কন্যাগণকে সৎব্যবহার শিক্ষা দিতে অনেক সময় উদাস থাকেন. ফলে দুহিতারা আচার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ থাকে।

(২) কন্যাদিগের প্রতি অত্যধিক মমতা প্রযুক্ত তাহারা ভ্রাতৃজায়া-দিগের প্রতি অত্যাচার করিলেও জননীগণ সংশোধন করিতে উদাসিনী থাকেন, এমন কি অনেক সময় উত্তেজিত করিতেও দেখা যায়। ফলে এই সকল বালিকাদিগের অন্তঃকরণ সেই ভাবেই গঠিত হইয়া কালে কুফল প্রসব করে।

(৩) মাতৃ-দৃষ্টান্তেও কন্যাগণ এরূপ কুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। কর্ত্রী হইলেই বধূ নির্য্যাতন করা যেন সংক্রামক ব্যাধি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গৃহিনীগণ সেইরূপ করিলে অপরিণত বুদ্ধি বালিকাগণও তৎদৃষ্টান্তে আপনাদিগকে সেইরূপ ভাবে গঠিত করে। ফলে এই অসদ্ব্যবহারের প্রবাহ পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসে।

অন্যদিকে সেই মাতারাই আবার যখন গৃহিণীর আসন গ্রহণ করে, তখন তাহারা পূর্ব্ব নির্য্যাতনের প্রতিশোধেচ্ছায় বৃদ্ধা শশ্রূদিগের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে কুণ্ঠিতা বা অসদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, তাহার ফলে তাহাদের অপ্রাপ্তবুদ্ধি কন্যারা সেই সকল ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লয় এবং কালে কালকূট বর্ষণ করে। সুতরাং সকল বিষয়েই জননীদিগের সর্ব্বাগ্রে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

কথাতেই আছে "ইটটী মারিলে পাটকেলটী খাইতে হয়।" জাগতিক সম্বন্ধ আয়নায় মুখ দেখা। যেমন দেখাইবে তেমনই দেখিতে পাইবে, ইহার বিপরীতাচরণ প্রায়ই ঘটে না। বধূদিগের নিকট যদি ভাল ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, নিজেরাও তাহাদের সহিত সৎব্যবহার কর। অবশ্য ইহা পরস্পরে প্রযোয্য, কিন্তু আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধাদিগের অপেক্ষা তরুণীদিগেরই এ সম্বন্ধে সমধিক সাবধান হওয়া উচিত। হইতে পারে প্রবীনারা দোষানুসন্ধিৎসু বা উগ্র স্বভাব সম্পন্ন, কিন্তু নবীনাদিগের কি উচিত নয় যে, নিজেদের স্বভাবে তাঁহাদিগকে বাধ্য করা? মমতায় বন্য পশুকে বাধ্য করা যায়, মানুষ বাধ্য হইবে না ইহা হইতেই পারে না। নবীনা পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া যখন স্বামী ভবনে আগমন করিল তখনই তাহার সেই ভবন নিজস্ব হইল। পিতা,

মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের সহিত সম্বন্ধ রহিল মাত্র, কিন্তু এই নবপরিচিত সংসারের পরিজনবর্গ তখন সমধিক আপনার জন হইয়া পড়িল এবং এই নূতন কর্ম্মজগতের কেন্দ্রস্থল হইল স্বামী। স্ত্রীলোকের স্বামীর ন্যায় পরমাত্মীয়, স্বামীর ন্যায় গুরুজন, প্রেমাস্পদ ও বন্ধু জগতে আর কেহ নাই। তাঁহার সুখেই সুখ, তাঁহার দুঃখেই দুঃখ, এমন কি তাঁহার জীবনের উপর নিজেরও ভবিষ্যৎ জীবন সমুদয় নির্ভর করে। সেই স্বামীই যখন এই নূতন কর্ম্মজগতের কেন্দ্র স্বরূপ তখন তাঁহার সম্পর্কে এই সংসারের জনগণের সহিত নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। স্বামীর পিতা পিতৃস্থান অধিকার করিলেন, শ্বশ্রূ মাতৃস্বরূপিণী, দেবর ননদীগণ ভ্রাতা ভগ্নীর স্থান লাভ করিল। স্বামী—সেত নারী-জীবনের সর্ব্ব-প্রধান উপাস্য; জীবন যাঁহার অনুগামী তাঁহার সহিত যে কি সম্বন্ধ তাহা সতী নারীই বলিতে সক্ষম, আর সক্ষম, আমার সহৃদয়া পাঠিকাঠাকুরাণী। এ অধম লেখক সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ নয়, ক্ষমা করিবেন।

নূতন সংসারে আসিয়া যখন কতকগুলি নব সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তখন কর্ত্তব্যাবধারণ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। বালিকা নূতন গৃহে আসিয়া নূতন পিতা মাতা স্বরূপ শ্বশুর শ্বশ্রূ লাভ করিল, অতএব তাঁহাদের সহিত ব্যবহার যে পিতা মাতার সহিত ব্যবহারের ন্যায় হইবে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বরং পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যের পরিমাণ যতটুকু শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। তাহার কারণ, তাঁহারা নারীর পার্থিব জীবনের পরম প্রিয়, পরম প্রেমাস্পদ ও পরম গুরু স্বামীরও পূজনীয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা আপন কন্যাগণকে পরহস্তে অর্পণ করিয়া তৎস্থান বধূদিগের দ্বারা পূরণ করিয়াছেন এবং আপন কন্যাগণের নিকট যেরূপ যত্ন প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে সেইরূপ শুশ্রূষা ও যত্ন এই বধূদিগের নিকট কামনা করেন। সুতরাং এই সমস্ত অভাব পূরণ করিবার জন্য বধূদিগের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত ও প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বধূগণ কোনরূপ অন্যায় করিলে বা অবাধ্য হইলে শ্বশুর শ্বশ্রূগণ অনেক সময় তাড়না করেন সত্য, কিন্তু তাহা কুভাবে গ্রহণ না করিয়া বধূদিগের বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, যথেষ্ট মমতা প্রযুক্ত তাহাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তাঁহারা ঐরূপ তাড়না করিয়া থাকেন; ফলতঃ ইহাতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই। আরও এক কথা—বিশেষ আত্মীয়তা না থাকিলে কেহ কাহাকেও কটূক্তি করিতে পারে না, বিশেষ যাহারা আপনার জন তাহাদিগের প্রতি। সুতরাং এরূপ ভর্ৎসনা যে মমতার চিহ্ন-জ্ঞাপক

তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। বধূদিগের ইহাতে ব্যথিত না হইয়া সারাংশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করাই উচিত, যাহাতে ভবিষ্যতে আর সেরূপ ভর্ৎসনা না পাইতে হয়। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহাদের বধূদিগের প্রতি। একটা কথা আছে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা" অর্থাৎ বড় ভাইও পিতার ন্যায় মাননীয় এবং পূজা পাইবার উপযুক্ত, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূও মাতৃস্থানীয়া। যখন উভয়েই স্বামীর পূজ্য তখন স্ত্রীরও সেই ভাবেই উভয়কে পূজা করা আবশ্যক। ইদানীং ভাই ভাইয়ে বা বধূদিগের মধ্যে এরূপ ব্যবহারের অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং তাহার ফলে সংসারে অশান্তি-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নানা দুঃখের আকর হয়। ইহার কারণ স্বার্থপরতা। একেত পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টান্তে এই স্বার্থপরতা আমাদের হৃদয় পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তদুপরি অশিক্ষিত জনক জননীর উপদেশ অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতেছে। একাধিক পুত্রের পিতামাতাকে সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষায় অবহেলা দর্শনে ভর্ৎসনাচ্ছলে প্রায়ই বলিতে শুনা যায় "যে করিবে তারই ভাল।" কথাটী অতি তুচ্ছ বটে কিন্তু তাৎপর্য্য অতি গুরুতর। সুকুমার মতি বালক তখন হইতেই এই পার্থক্য ভাব হৃদয়ে পোষণ করে এবং কালে অন্য ভ্রাতাদিগের উপর শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। তখন নিজের স্বার্থ বজায় করিতে পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেম ভুলিয়া যায় ও স্বয়ং কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তান সন্ততিগণকেও কুশিক্ষা প্রদান করে। স্বামীর অনুগামিনী স্ত্রীও তখন ভাসুর বা দেবর-জায়ার সহিত ভগ্নীভাব ভুলিয়া গিয়া বৈরীভাব অবলম্বন করে। ইহাদ্বারা সে যে কেবল নিজের সর্ব্বনাশ করে তাহা নহে, নিজ পুত্র কন্যাগণেরও ভবিষ্যৎ সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া থাকে। প্রাচ্য-শিক্ষা-প্রণালী সেরূপ ছিল না। তখন লোকে সন্তানগণকে স্বার্থ বলিদান দিয়া পরোপকারই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বালকবালিকার মন উন্নতভাবে গঠিত করিতেন। সুতরাং বালিকাও সেই সুশিক্ষাপ্রভাবে সকলকেই স্নেহ চক্ষে অবলোকন করিত, ফলে তাহাকে কর্ত্তব্যহানি-রূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে নবীনার উচিত ভাসুর বা দেবর-জায়ার সহিত ভগ্নীর ন্যায় সৎব্যবহার করা ও প্রীতির চক্ষে দেখা। এরূপ ব্যবহার তাহার জীবনের সুখ, সংসারের শান্তি ও পুত্র কন্যাগণের আদর্শ শিক্ষার স্থল। স্বামীর সহোদরগণকে নিজের সহোদর জ্ঞানে যথোপযুক্ত সম্মান ও প্রীতির

সহিত প্রতিপালন করাই উচিত। এরূপ করিলে প্রতিদানে সেইরূপ প্রীতিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘটনাচক্রে যদি নাও পাওয়া যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? লোকের সহিত সৎ ব্যবহার করাই মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, কারণ উক্ত হইয়াছে ;—

"জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে
সকল ধর্ম্মের সার রাখিও স্মরণে।"

অতএব একমাত্র ধর্ম্মই যখন মানব-জীবনের ভিত্তি স্বরূপ তখন এই সামান্য চেষ্টা টুকুতে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করি কেন?

তারপর ননদিনীদিগের সহিত ব্যবহার। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে হইবে না। স্বামীর সহোদরগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, সহোদরাগণের সহিতও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, সহোদরগণ সর্ব্বদাই এক ভবনে বাস করিবেন কিন্তু ননদিনীগণ কখন কখন আসিবেন। সুতরাং যাহারা কদাচিৎ আসিবে, সদা-সর্ব্বদা স্নেহের পাত্রী নহে, তাহাদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করা উচিত যেন তাহারা সেই স্বল্পকালব্যাপী স্নেহে কোনরূপ দোষারোপ করিতে না পারে। ফলকথা তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক স্নেহ করাই কর্ত্তব্য। আবার অনেক গৃহস্থে এরূপও আছে যে, কন্যা বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃ ভবনেই আজীবন বাস করিতে লাগিল। সেরূপ স্থলে বধূর কর্ত্তব্য কি? এস্থলে কয়েকটী বিষয় বিচার করিবার আছে। প্রথমতঃ দেখা উচিত হতভাগিনী স্বামী হারাইয়া আজীবন নিদারুণ মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল। তাহার সেই কষ্টের উপর যদি অন্য কোনরূপ কষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রদান করা যায় তবে তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়। অভিমান ও নৈরাশ্যে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া যায়, অথচ সে দুঃখ কাহারও নিকট বলিয়া উপশম করিবার নহে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহ বাস পরগৃহ বাসের তুল্য। পর ভাতী ভাল তবু পর গৃহী ভাল নহে! তথাপি নাচারে পড়িয়া তাহাকে সেই পরগৃহেই বাস করিতে হইতেছে। তাহাতে তাহার মনে যে নিদারুণ ক্লেশ হইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সেরূপ অবস্থায় অন্য কোন কারণে ক্লেশের উদ্রেক হইলে, তাহা বড়ই দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়ে। এমতে তাহার সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাহার স্বামি-বিরহ-জনিত কষ্টেরও কথঞ্চিৎ নিবারণ হইতে পারে। সাধারণতঃ তাহাকে গৃহস্থের

দেবসেবায় ও সাংসারিক কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখা আবশ্যক। সন্তানাদি প্রতি-পালনের ভার তাহার উপর কতক পরিমাণে ন্যস্ত রাখিলেও মন্দ হয় না। কারণ তাহা হইলে তাহার মন এই সমস্ত কার্য্যে সংযুক্ত থাকিয়া অন্য চিন্তা উদয় করিবার অবসর দেয় না এবং সেও এগুলিকে তাহার নিত্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে সম্পাদন করিতে তৎপর থাকে। তবে ক্রটী হইলেও কুবাক্য প্রয়োগ করা বা ভৎর্সনা করা বিধেয় নয়, বরং মিষ্ট বাক্যে তাহার সন্তোষ উৎপাদন করাই কর্ত্তব্য।

দাসদাসীগণের প্রতিও সুব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জানিয়া রাখা উচিত তাহারা উদরান্ন সংস্থান জন্যই অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, অতএব তাহারা যাহাতে হাসি মুখে সেই উদরান্ন নিত্য প্রাপ্ত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের নিকট লঘুত্ব প্রকাশ করাও উচিত নহে। এরূপ গাম্ভীর্য্য অথচ আন্তরীক ভালবাসার সহিত তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে যে, তাহারা ভয়ও করিবে অথচ আন্তরীক ভক্তি শ্রদ্ধাও করিতে ক্রটী করিবে না। ফলতঃ দাস-দাসীদিগের প্রতি পুত্র কন্যাগণের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

শেষ কথা, স্বামীর সহিত ব্যবহার। এটা কিছু নূতন কথা নয় এবং বোধ হয় আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে এ সম্বন্ধে শিখাইবারও বিশেষ কিছু নাই। চারিদিকে গ্রন্থাদির যেরূপ বহুল প্রচলন হইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষাও যেরূপ বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই পুস্তক পাঠে এ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। সকলেই জানেন স্বামী হইতে আপনার জন আর কেহ নাই এবং তাঁহাকে ভালবাসিতে বা যত্ন করিতে হয়। স্বামীর শয্যা বা শয্যাগৃহ পরিষ্কার রাখিতে, টেবিল সজ্জিত করিতে, চিরুণী ব্রাস্ আয়না প্রভৃতি তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্যগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে আধু-নিক নবীনাগণ সদাই তৎপর, সে সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাই না। তবে আর এ সম্বন্ধে কি বলিব? বলিব না মনে করিতেছি বটে, কিন্তু আবার দুই এক কথা না বলিয়াও থাকিতে পারি-তেছি না। আধুনিক যুবতীদিগের স্বামীর সহিত অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, আমরা সেকেলে বৃদ্ধ কিনা, আমাদের হিংসা হয়। কই আমাদেরত এত মাথামাখি ছিল না। আমরা ত এরূপ কপোত কপোতীর ন্যায় মুখো-মুখী বসিয়া নভেলপাঠ-সুখ উপভোগ করিতে পাই নাই বা আমাদের গৃহিণীরা মনোরমা, আয়েসা বা তিলোত্তমা প্রভৃতি নায়িকার চরিত্র

সমালোচনা করিতে আসে নাই। খুব বেশী অতি নিভৃতে অতি গোপনে সীতা বা দময়ন্তীর উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিত মাত্র; এবং নিজেরা কোন অভিমত প্রকাশ না করিয়া কেবল আমাদিগকেই বকাইয়া কণ্ঠ-শুষ্ক করাইত। তবে স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হিংসা না করিব কেন? তারপর আমাদের গৃহিণীরা নবীনাদিগের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে সাবান, পমেড্ এসেন্স প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যের আবদার করিত না, বরং সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাদিগকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য খুব অল্প সময়ই প্রাপ্ত হইত। দেহ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইলে বা ময়লা-জনিত কেশভার অধিক হইলে, অতি তুচ্ছ অথচ আধুনিক কুরুচি সম্পন্ন পদার্থ "খোল" দ্বারা মস্তক ও গাত্র ধৌত করিয়া ফেলিত। এবং ইউডিকলোন, কুন্তলীন, জবাকুসুম প্রভৃতি সুগন্ধি তৈলের পরিবর্ত্তে মস্তক শীতল রাখিবার জন্য সামান্য নারিকেল তৈল পাইলেই সন্তুষ্ট হইত। বলুন দেখি তবে সেরূপ অসভ্যতা ও কুরুচির পার্শ্বে বর্ত্তমান সভ্যতা ও পরিচ্ছ-ন্নতা দেখিলে হিংসা হয় কি না? সেকেলে বৃদ্ধাদিগকে কখন সোণার ফুল কাঁটায় কবরীর শোভা বর্দ্ধিত করিতে দেখা যায় নাই, বরঞ্চ সখ্ হইলে স্বভাবজাত বন্য পুষ্পমাল্যে কবরী সজ্জিত করিতেন। ইহাতে দুইটী ফল দর্শিত। প্রথমতঃ বহুমূল্য সুবর্ণ ক্রয় করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবার জন্য গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত বা ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না; দ্বিতীয়তঃ ফুলাভরণ অঙ্গে থাকায় তাহারই সৌরভে মন পুলকিত হইত,অন্য কোন গন্ধ দ্রব্যের আবশ্যক হইত না। এখন বিচার্য্য কোন্‌টি ভাল? অল্পে তুষ্টা সেকেলে অসভ্যতা ভাল, কি ব্যয় বাহুল্য আধুনিক সভ্যতা ভাল? একেলে সভ্যতা বা রুচির উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি দেখিয়া নিশ্চয়ই সুসভ্যা পাঠিকাঠাকুরাণী আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন এবং বোধ হয় মনে মনে গালাগালিও দিতে-ছেন? তা দিন্ আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই, তীব্র সমালোচনা করুন তাহাতেও আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সত্য কথা বলিব তাহাতে বিরক্তির ভয় করিলে চলিবে কেন? নবীনাদিগের স্বামীর সহিত এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বাংশে অনুমোদন করি না। তাহাদের মধ্যে কেহ সত্য করিয়া বলিতে পারেন কি যে তিনি ব্যয় বাহুল্য কোন দ্রব্যের অন্যায় আবদার করিয়া নিরীহ স্বামীকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন না, বা অভিলষিত দ্রব্য না পাইলে তাঁহার সহিত কলহ করিয়া অনর্থক মনঃকষ্ট দেন না? আমার ধারণায়

আজকাল সেরূপ স্ত্রীলোক খুব বিরল। কারণ চতুর্দ্দিকেই বিলাসিতার স্রোত যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহমান, সে বেগ রোধ করিতে খুব কম স্ত্রীলোকই সমর্থা। তবে সুদূর পল্লিগ্রামে যেখানে সহরের বিলাসিতা এখন প্রবেশ লাভ করে নাই, সেখানে এরূপ স্ত্রীলোক থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তত্রাপি প্রতিবেশিনীগণের অলঙ্কারাদি দেখিয়া স্বামীকে বিরক্ত করিতে তাঁহারাও পশ্চাৎপদ নহেন। এবং না পাইলে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া স্বামীর মনোবেদনা উৎপাদন করেন। কিন্তু স্ত্রীর কি তাহাই কর্ত্তব্য? স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ত সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধ উভয়ত প্রচুর দায়িত্বপূর্ণ ও মহান্। স্ত্রী স্বামীর যেমন সহধর্ম্মিণী সেইরূপ সম সুখ-দুঃখভাগিনী ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। স্বামীর অস্তিত্বে যাহার অস্তিত্ব, স্বামীর সুখ দুঃখের উপর যাহার অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে, স্বামীর অবর্ত্তমানে যাহার মূল্য কিছুই নহে নগণ্য। মাত্র, তখন যে কোন কারণে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করাই তাহার মহাপাপ। স্বামী সেবা এবং স্বামী-গৃহবাস ব্যতীত স্ত্রীলোকের অপর কোন ধর্ম্মকর্ম্ম বা তীর্থস্থান নাই। স্বামি-গৃহই তাহার প্রধান তীর্থ এবং কায় মন প্রাণে তাঁহার সেবা করাই তাহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সুতরাং নিজ আচরণে সদাই স্বামীকে প্রফুল্ল রাখা বা তাঁহার সন্তোষ বর্দ্ধন করাই স্ত্রীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য। অবস্থার আবর্ত্তনে স্বামীকে যদি বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হয়, স্ত্রীরও সন্তুষ্টান্তঃকরণে তাঁহার অনুগামিনী হওয়া আবশ্যক। সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, শৈব্যা প্রভৃতি গরীয়সী মহিলাগণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! আজকাল কয়জন স্ত্রীলোক ঐ সব আদর্শ রমণী-চরিত্র আলোচনা করেন? পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ঐ সমস্ত প্রাচ্য রমণীগণের অত্যদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ ও স্বামীসেবায় অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ কাহিনীপ্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। পিতামাতাগণ যদি গল্পচ্ছলেও বালকবালিকাদিগের নিকট এই সমস্ত গরীয়সী ভারত-রমণীর চরিত্র বর্ণনা করেন, তাহা হইলেও অনেক সুফল প্রসব করে। কিন্তু তাহাই বা কই? পিতা দৈনিক কার্য্যের পর যেটুকু অবসর পাইবেন সে সময়টুকু সভা-সমিতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন, এবং মাতা একটা নূতন সুখের অবতারণা চিন্তায় নিযুক্তা হইবেন। তবে আর শিশুগণকে শিক্ষাদান করে কে? শিক্ষক! সে ত নির্দ্দিষ্ট পাঠ অধ্যয়ন করাইয়াই অবসর পাইলেন। হায় রে আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী! পূর্ব্বে যে বিষয় আলোচনা করিলে লোকে ধর্ম্মচর্চ্চা হইতেছে

বিবেচনা করিত এখন তাহা গল্পে পরিণত হইয়াছে। প্রাতঃকালে শয্যা-ত্যাগের সময় যাঁহাদের নাম করিলে দিন সুখে কাটিবে বলিয়া নির্দ্দেশ ছিল, সে সব নাম এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। তবে কিরূপে নবীনাগণ প্রবীণা-গণের ন্যায় স্বামীসেবায় তৎপর হইবেন? গল্পচ্ছলে শৈব্যার অমানুষিক আত্মত্যাগ-কাহিনী একবার আলোচনা করিয়া দেখুন তাঁহার স্বামী-ভক্তি কি স্বর্গীয়, কি মহান্ কি স্বার্থশূন্য। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরী হইয়াও স্বামীকে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং একজন সামান্য ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী হইয়াছিলেন। সীতা সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও অকাতরে রাজ্যৈশ্বর্য্য, ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "যাঁহাকে লইয়া ভোগ বিলাস তিনিই যদি বনবাস ক্লেশ ভোগ করিতে চলিলেন, রাজভোগের পরিবর্ত্তে বন্য ফল মূলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, তবে আমার এ সকলে প্রয়োজন কি?" ভোগবিলাস সে ত স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য; স্বামী-সুখ বঞ্চিতা সতী নারীর সে সবের প্রয়োজন কি? কৌশীক পত্নী পতির মনোরঞ্জনার্থে কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত স্বামীকে লক্ষহীরার নিকট নিজেই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্ত্রী-চরিত্রগুলি কি মহান্ ও শিক্ষাপ্রদ। বালিকা কন্যাদিগের নিকট এরূপ চরিত্রের আলোচনা হইলে কেন তাহারা আপনাদিগের চরিত্রও সেইরূপভাবে গঠিত করিবে না; এবং কেনই বা তাহারা সেই সকল পূর্ব্ব ললনাদিগের ন্যায় অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনা করিবে না? নবীনাদিগের কি উচিত নয় যে এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দৃষ্টে নিজেরাও সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় পতি সোহাগিনী হন এবং স্বামীসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনা করেন? সাধকপ্রবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার অমৃতময় গ্রন্থ "বিল্বমঙ্গলের" এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন "কৃষ্ণ দর্শনের ফল কৃষ্ণ দর্শন," সমূহ কর্ম্মক্ষয় না হইলে কৃষ্ণ (ভগবান) দর্শন ঘটে না। সেইরূপ স্বামি-সেবার ফলও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় এবং হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি ও ঐকান্তিকতা না থাকিলে ভাগ্যে স্বামি-সেবা ঘটে না। বালবিধবাগণই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই বলিতেছিলাম যে স্বামীর প্রতি নারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ আমি কি করিব? ইহা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং প্রকৃত সতী-নারীই ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন। এইবার জননীরূপে তাহাদের কর্ত্তব্য কিরূপ তাহারই আলোচনা করা যাউক। [বারান্তরে প্রকাশ্য।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পরে।

'এই ত কলির সন্ধ্যে সবে,
এ'র পরে যে আর কি হ'বে,
ভেবেই আকুল প্রাণ,
এখন চল্‌ছে ফর্দ্দ ধ'রে,
শেষকালে কি ওজন দরে
চল্‌বে কন্যাদান ?
বরের বাজার যেরূপ গরম
তাইতে তাহার বিষম চরম
কাঁপায় সবার মন ;
আলোচনায় ফল্‌বে কি ফল ?
স্বার্থটা যে বেজায় প্রবল,
কম্‌বে কি 'বরপণ' ?
চোখের জলে ভাসে বক্ষঃ
নিঃস্ব ক্রমে লক্ষ লক্ষ
'ঘরোয়ানা' ঘর ;
'হা হা' রবে বঙ্গ পূর্ণ
পেষাই কলের চাপে চূর্ণ
বহু কলেবর !
এই ত মোটে সন্ধ্যে, আছে
সারা নিশি প'ড়ে পাছে,
তখন মনে হয়,—
বেয়াড়া এই বরের দরে
কুমারীরা থাকবে ঘরে,
(হবে) সমাজ কুমার-ময়।

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শুভদৃষ্টি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রভাত কহিল, দিদি! এইবার আমি যাবো, আর আমার থাক্‌লে কিছুতে চ'লছে না। গিরি বাধা দিয়া কহিল, না ভাই কতদিন আসো নাই—আর দুটো দিন থেকে যাও!

প্রভাত কিছুতে সম্মত হইতে চাহিল না। কহিল, এম্নি ক'রে দুদিনের যায়গায় আবার দুদিন বাড়িয়ে তুলবে।

মলিনা আসিয়া কহিল, দরকার নাই ভাই, এখুনিই বেরিয়ে পড়ো, কাজের লোক তুমি, কত কাজেরই না জানি ক্ষতি হ'চ্চে। তুমি না গেলে হয়ত বা লাটই বিকিয়ে যাবে।—

প্রভাত ঈষৎ হাসির সহিত ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, না দিদি! কতদিন এসেছি তুমিই বল না? না হয় দাদা কিছু না ব'ললেন, কিন্তু তবু আমি সংসারের মধ্যে আছি ত' যাই হোক একটা গরু ভেড়ার মধ্যে।—

মলিনা হাসিয়া কহিল, হাঁ, আছো নিশ্চয়ই! তার জন্য আর কারু কিছু হোক না হোক, বুড়ি পিসিমাটাও ছট্ ফট্ ক'রে থাকেন।

এমন সময় অমেঘ বাহিনী লতিকাবালা আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই কহিল, কি হ'য়েছে দিদি? বাহির হইতে সে ইহার কতকটা শুনিয়াও ছিল। কিন্তু আপনাকে ঠিক এটা বিশ্বাস করিতে দেয় নাই, ভাবিতেছিল এর মধ্যেই প্রভাতবাবু চলে যাবেন! কবে এলেন?

মলিনা কহিল, হবে আর কি লতি! প্রভাতবাবু যে চলে যাচ্চেন!

লতিকা চকিতে একবার প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া তারপর দিদির একটু খানি গা ঘেঁসিয়া গদ্‌গদ ললিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ইস্ তাই বৈকি? তা কিছুতে হচ্চেনা, প্রভাতবাবুকে এখনও ত পাঁচটিদিন যেতে দিচ্চি না।

মলিনা হাসিয়া কহিল, "দিচ্চি না বল্লেই কে শুনবে? ওকি তোর নিজের লোকটি যে,—

লতিকা দিদির মুখ টিপিয়া ধরিয়া তাহার অসমাপ্ত কথা মুখেই মিশাইয়া

দিয়া কহিল—না, কক্ষনই না—প্রভাতবাবু আমার অনুরোধে আর পাঁচটি দিন থাকবেনই।—

লতিকার এই আগ্রহ, আর দিদি মলিনার এই অনুরোধ, যুগপৎ তাহার হৃদয়ে বেপথু সঞ্চার করিয়া দিল। সে কিছুতে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, তাহার জন্য তাহাদের এ আগ্রহ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল। সে যখন সামান্য কুটুম্ব পুত্র ব্যতীত আর কেহই নয়।

তবু সে তাহার উত্তরে না ভিন্ন "হাঁ" কিছুতে বলিতে পারিল না। যেন জোর করিয়া কে তাহার ইচ্ছার টুঁটি চাপিয়া হত্যা করিয়া গেল। প্রভাতের হৃদয় তার জন্য অনেকখানি অশ্রু উদ্বেলও হইয়াছিল, কিন্তু সে এত গোপনে তাহা সম্বরণ করিয়া গেল যে কাহাকেও তাহার ব্যথা জানিতে দিল না।

মলিনা কহিল, তাহলে নিয়শ্চই যাবে ভাই ?

প্রভাত কহিল, হাঁ দিদি—

মলিনা কহিল, তাহলে আবার এসো!—এ ক'দিন সব এক সঙ্গে ছিলুম বড় আনন্দে ছিলুম!—

প্রভাত কহিল, আমিও বড় আনন্দে ছিলুম দিদি। লতিকা বলিতে যাইতেছিল—কেন আর দুই দিন থাকিয়া এ আনন্দ সম্ভোগটা আরও দুই দিন ভোগ কল্লেই বা কি ক্ষতি হ'চ্ছিল। কিন্তু, দিদি ও ভাজের সামনে দাঁড়াইয়া এ কথাটা বলা তাহার একান্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইল। শুদ্ধ দুটি তার করুণ আঁখি দিয়া প্রভাতের কাছে অভিযোগ করিল—নিষ্ঠুর এতটুকুর জন্য এ আয়োজনের কি দরকার ছিল ?

প্রভাতও জানাইল তার নয়ন দৃষ্টিতে—সুন্দরী—এই ক্ষণিকের মিলনান্দ-টুকুই আমাদের চির জীবনের বিরহ নিশায় ধ্রুব তারাটির মত জেগে থাকবে।

বিদায়ের ক্ষণ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া প্রভাত গাড়ীতে চড়িল।

বাড়ীর দরজাতেই গাড়ি আসিয়াছিল। গিরি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আবার এসো ভাই! মা বাপ হারা ছোট ভাই আমার।—ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িয়া স্নেহময়ী ভগ্নীর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার ক্রন্দনে সকলেই বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। লতিকার চক্ষুও ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে সবলে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহা দমন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মলিনা অগ্রসর

হইয়া প্রভাতের হাত দুটি ধরিয়া দীনভাবে সস্নেহে কহিল, দেখো ভাই আবার এসো! একবারে ভুলে যেয়ো না, এ কদিন বড় সুখেই ছিলুম। আর বিয়ে থা ক'রবো না বলে বৃথা উদাস সেজো না—দাদা, পিসিমা যা বলেন শুনো—এখন তোমার জ্ঞান হয়েছে, লেখা পড়াও শিখেছ।

প্রভাতের হৃদয় তখন কিরূপ অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কাহারও কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, শুদ্ধ সকলের দিকে একটা করুণ চাহনি চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

মলিনা আবার কহিল, ভাই এক আধখান চিঠি লিখো।

প্রভাত কষ্টে হাঁ উত্তর দিল, তারপর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। স্নেহবন্ধন নিপীড়িত প্রভাত উদ্বেল হৃদয়ে গাড়ীর পশ্চাতের খড়্খড়ি দিয়া যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়া রহিল।

দেখিল একে একে সকলেই বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, সকলের শেষে লতিকাও বুঝি মুখে কাপড়টি দিয়া গাড়ীখানার দিকে একটা উদাস মর্ম্মভেদী চাহনি হানিয়া চলিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলিয়া গেল।

প্রভাতের মনে হইল সে দীর্ঘশ্বাসটা যেন তাহার অতি নিকটে বুকের উপর দিয়াই বহিয়া গেল।

বুকে খানিক হাত রাখিয়া তারপর ব্যাগ হইতে একখানা বই টানিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্ষণে ক্ষণে একটা স্মৃতি, একটা সুকুমার স্মৃতি—তাহার কল্পরাজ্যের উপর দিয়া উদ্বেল কুহক তুলিয়া—বহিয়া যাইতে লাগিল। তখন সে বই ফেলিয়া শুনিতে লাগিল, যেন কোন সুদূর কালে—কোন্ বিরহী কবি তাহার অশ্রু-গুঞ্জরিত ভাষায় গাহিতেছে,—

"চোখে চোখে যারে রাখিবারে সাধ,—
পলক ফেলিতে ঘটিল বিষাদ, এম্নি প্রেমের ছলনা।"

গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে এই গীত-ধ্বনি যেন তাহার পঞ্জরে পঞ্জরে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।



বাড়ী আসিয়া প্রভাতের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এইটুকুর জন্য কিন্তু সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, মন সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, আহার বিহার শুদ্ধ অরুচীকর, নিকুঞ্জবনের ভিতর হইতে পাখী যেন কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রভাত নিজেই নিজের অবস্থাটা বুঝিয়া ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল।

কিন্তু আপনাকে ঠিক রাখিবার সে ক্ষমতা তাহার আর নাই, সে যেন তাহা কোথায় হারাইয়াই ফেলিয়াছে, ধর্ম্ম আরাধনাতেও চিত্ত সুস্থির হয় না, কোথা হইতে কি একটা বিপ্লব আসিয়া তাহার হৃদয়ের সব সুন্দরকে মলিন করিয়া দেয়।

দীর্ঘ দিন রাত্রির সুদীর্ঘ অবসরে সেই চিন্তা, সেই স্মৃতি—সেই ভিন্ন আর তাহার কিছু নাই,—প্রভাতে যখন জাগিয়া উঠে, তখন সূর্য্যকিরণে তাহারি দীপ্তরাগ চোখের উপরে ভাসিয়া পড়ে; অপরাহ্নে নদীতীরে বেড়াইতে গেলে, শুনিতে পায় নদী যেন উজান গতিতে, তাহারি হৃদয়ের কথা অশ্রু মর্ম্মরিত ভাষায় প্রকাশ করিতেছে, আকাশের চন্দ্র নক্ষত্রের দীপ্তিতে তারি দুটি করুণ আঁখিকে জাগাইয়া দেয়—নেশা এতই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল।

পিসিমা রজনীকান্তকে কাঁদিয়া কহিলেন, প্রভাতকে দেখবার কেউ কি নাই? বাছা দিন দিন, শুকিয়ে যাচ্চে, অথচ সবাই নিশ্চিন্তে আছে, এত ছেলে মানুষের পূজা আজ্ঞা তপ জপ কি সয়?

রজনীকান্ত কিছু জানিনা বলিয়া পিসিমার কথাটাকে, নিতান্ত তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

পিসিমা বুঝিলেন মা বাপ নাই, ভাই আর ভাইএর ভাবনা কতটুকু ভাবিবে? যতটুকুও বা ভাইএর হৃদয় ছিল, তাহার অনেকখানি এখন আর একজন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাতের কাছে গিয়া কহিলেন "বাবা বল্ দেখি তোর কি ভাবনা? ছেলে মানুষ, এখন হ'তে তোর এত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কেন? এখন খাবি, বেড়াবি হাস্‌বি মাখ্‌বি, তা নয়? এ কি?

প্রভাত হাসিয়া রাগিয়া পিসিমাকে কোন প্রকারে ভাগাইয়া দিয়া কহিল,

আমার কিচ্ছু হয় নাই, আমি বেশ নিশ্চিন্তে আছি। কিন্তু হা রে মায়ের হৃদয় শুদ্ধ এই কথাতে সে কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন, বউমা তুমি যদি এর কোন উপায় ক'রতে পারো, আমার ত ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয় না, আমার তেমন প্রভাত কালী হয়ে যাচ্চে।—

বিন্দু কহিল, আমি কি উপায় ক'র্ব্বো বাছা, ঠাকুরপোর এতটা বয়স হ'লো তবু একটা বে দিলে না, ছেলে আব্দার কর্লে যে বে—ক'র্ব্বো না, তোমরাও অম্নি চুপ করে গেলে, হবেই ত রোগ—খুব গুরুতর হ'য়েই দাঁড়াবে।—

পিসিমা তাঁহার দুই স্নেহ ছল ছল ব্যগ্র আঁখিতে একটা আতঙ্কের চাহনি চাহিয়া কহিলেন, বল কি? তাহলে আমার প্রভাতের কি হবে? হাঁ বউমা? প্রভাতের জন্য তাঁহার হৃদয় এমন ব্যাকুল যে, আর তাহার সম্বন্ধে কোন একটা অনিষ্ট চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। ব্যাকুল ভাবে বার বার কহিতে লাগিলেন তা হ'লে কি হবে বউ মা?

বিন্দু কহিল, হবে আর কি? এ বয়সে আমরা ত জানি বাছা, নারীই পুরুষের সব ব্যথার ব্যথী, সঙ্গী জুটিয়ে দাও—কক্‌খনই এতটা থাকবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস!

"আর মা বিবাহ সে আগে বাঁচুক তারপর ভগবান যদি দিন দেন, বলিয়া প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

বিন্দু দেখিল, বেচারী পিসিমার আজ আর ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য কোন ভরসা করিবার সে ক্ষমতাটুকুও আর নাই। ভাবিল আচ্ছা, একবার ভাল করিয়া দেখাই যাউক না। সেই সময় প্রভাতও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যই তাহার চেহারা অনেকটা বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বিন্দু সস্নেহে কহিল,—ঠাকুরপো কথা রাখবে? রাখো যদি তা হ'লে একটা কথা তোমায় ব'লবো?

প্রভাত কহিল কি?

বিন্দু কহিল বেশি নয়। যদি তুমি স্বীকার পাও যে আমার কথার উত্তর দেবে, তা হলেই ব'লবো—নইলে নয়।

"এমন ব্যাপার? আচ্ছা না হয় আমি স্বীকারই পেলাম—বলিয়া প্রভাত মাথা চুলকাইতে লাগিল।"

ন্দুবি কথা পাড়িয়া দেখিল, আগেকার মত প্রভাত বিবাহের নামে, এক-

বারে লাফাইয়া উঠিল না, বরং যেন একটু কোমলভাবে কহিল, বিবাহ সে আমার মত তাপসের জন্য কেন ?

বিন্দু সাহস পাইয়া প্রভাতকে ধরিয়া বসিল। সারাদিন ধরিয়া টানা টানিতে প্রভাত স্বীকার পাইল, বিবাহ করিতে সে যে, কখনও গররাজী ছিল তাহা নয়, তবে সংসারে অভাবটা বেশী, আর মাথায় ভাবটাও প্রবল, এই কারণে কখনও ইহাতে মত দেয় নাই। তবে যদি কেহ তাহার অভাব অভিযোগগুলা চিরকাল মাথায় করিয়া বহিতে পারে, তবে সে বিবাহ করিতে রাজী আছে; দুর্ভাবনার হাত হইতে এড়াইবার জন্য প্রভাত আজ ইহার অপেক্ষাও বেশী করিতে পারিত।

বিন্দু কহিল, আমরা থাকতে তোমার গায়ে কোন অভাবেরই আঁচ লাগ্‌তে দেব না। কথাটা পাকাপাকি করিয়া বিন্দু পিসিমাকে শুভ সংবাদ দিল, পিসিমা আনন্দে গলিয়া গেলেন, তিনি আর কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, কহিলেন তোমার সিঁথের সিন্দূর চির-উজ্জ্বল থাকুক মা -তুমি পাকা হাতে নোঙা পরো।—

দাদা রজনীকান্তও এ সংবাদে অল্প আনন্দিত হইলেন না, ভাবিলেন যাই হোক ছোঁড়াটা এদ্দিন পরেও যদি মানুষের মত মানুষ হ'য়ে ওঠে।

শুভদিনে শুভক্ষণে একটা ছোট খাটো পরীর মত সুন্দরী মেয়ের সহিত প্রভাতের বিবাহ হইয়া গেল।

বরপক্ষ কন্যাপক্ষ কোন পক্ষেই অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য ছিল না। ইহাতে পাড়া প্রতিবেশী প্রচুর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল, অনেকে কৃপণের ঘরকন্না বলিয়া অপবাদও দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কিছু আসিয়া যায় নাই।

তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল, কন্যার দরিদ্র পিতা-মাতার—তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই এমন লেখাপড়া জানা জামাই আসিয়া তাহাদের ভাঙ্গা ঘর আলো করিবে। আমরা এ বিষয়ে পাকা রিপোর্ট দিতেছি, এ বিষয়ে প্রভাতেরই ষোল আনা হাত ছিল। সে আজকালকার অধিকাংশ সভ্যগৃহস্থের মত কন্যার দরিদ্র পিতাকে পীড়ন করিয়া টাকা আদায়টাকে খুব ঘৃণার চক্ষেই দেখিত এবং এই হেতু এ বিবাহে একটি পয়সা পণ স্বরূপ গ্রহণ করে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেয়েটির নাম চারুশীলা। তাহার নামটি যেমন কোমল মুখখানিও তেমনি শ্রীভরা, প্রভাত ভাবিল বেশ হইল, আর তাহাকে পরের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। দূর হইতে তাহার ভাবখানি, ভঙ্গিমাটুকু—ভারি মনোরম ঠেকিতে লাগিল।

কিন্তু ব্যবহার করিতে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চিত্ত বেশ সুস্থির হইতে পারিল না।

প্রভাত একটা কথা কহিলেই বলে, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও আমার মার জন্য বড় মন কেমন ক'চ্চে। এমন চাঁদের আলো, এমন দক্ষিণা বায় কিছুতে সে একটা উত্তর দেয় না। কেবলি বলে "পাঠিয়ে দাও"।

যে আশায় সে তার সোণার জগতের মধ্যে স্ত্রীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী করিবে বলিয়া ভাবিতেছিল, তাহার সে সোণার স্বপ্নটা একটা মরীচিকার দীপ্তি হানিয়া মরুতেই মিলাইয়া গেল।

কান্না থামিতেই যখন তার দিন যায়। স্বর্গের প্রথম ভিত্তিস্থাপনেই যখন এতটা গলদ—তখন আর দ্বিতীয়বারের জন্য অপেক্ষা তাহার সহিল না। বিন্দুবাসিনীকে গললগ্নীকৃত-বাসে কহিল, দোহাই বৌদিদি, চারুকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

বিন্দু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, হাঁ তা দেব বৈকি? সে কাকে নিয়ে থাকবে, সেটি হচ্চে না।

প্রভাত কহিল, "আমি ব'লছি বৌদিদি, ওর কোন কষ্ট হবে না। ওর স্বামীর সঙ্গ অপেক্ষা,—গাঁয়ের কানাই বালকের সঙ্গ—ঢের" বিন্দু কথাটা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, তুমি খেপ্‌লে নাকি ঠাকুরপো? মেয়ে মানুষের স্বামীর সঙ্গ অপেক্ষা আর কোন বড় সঙ্গ আছে? একথা কেউ ব'লতে পারে? আজ চারু ছেলে মানুষ আছে,এতদিন সেখানে কাটিয়েছে,মন কেমন করে বৈ কি?

প্রভাত হাঁ না কোন একটা উত্তর না দিয়া যেন কতকটা রোষ ভরেই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিন্দু ভাবিল, তাহার ঠাকুরপোটি একবারে গাছ পাকা ফল হাতে করিতে চাহে, দুদিনের সবুর সহে না। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা হে আচ্ছা তাই হবে। চারুকে আমরা বাপের বাড়ী পাঠাই আর না পাঠাই তোমার কাছে না পাঠালেই ত হ'চ্চে।

প্রভাত কহিল হাঁ!

বৈরাগ্য আবার দ্বিগুণভাবে জাগিয়া উঠিল, আহারে বিহারে এমন পুরদাস্ত ঔদাসিন্য ইতি পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আগে বিবাহই করিব না বলিত, এবার কিন্তু পুরা সন্ন্যাসী সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে উপনীত হইল। পায়ে খড়ম, মাথায় লম্বিত কেশদাম, মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া শয়ন, সর্ব্বদা গীতা পাঠ, সকলের তাক লাগিয়া গেল যে এমন ছেলে ঘরে টিঁকিলে হয়।

ভাবনায় ভাবনায় পিসিমার ত পেটের ভাত চাল হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি নিজে সারাদিন ধরিয়া, চারুকে মাজিয়া ঘসিয়া কপালে টিপ কাটিয়া সন্ধ্যারদিকে, প্রভাতের গৃহাভিমুখী করিতে যত্ন পান, কিন্তু প্রভাত বাহির হইতেই বলিয়া পাঠায় বাহিরের ঘরেই তার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, পীড়াপীড়িতে তাহার জেদ আরও বাড়িয়া যায়, তখন আর কেহ তাহাকে বাড়ীর দিকে লওয়াইতে পারে না।

পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া আপনার ঘরের দ্বার বন্ধ করেন। বালিকার সাধের বাসর ভাঙ্গিয়া যায়। প্রসাধন উন্মোচন করিতে করিতে তাহার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, হায় ঈশ্বর তাহাকে এমন এতটুকু ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, তাহার উপযুক্ত স্বামির জন্য এতটুকু উপযুক্ত করিয়া তোলেন নাই।

দীপ নিভাইয়া, আঁধার শয্যায় শুইয়া সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিতে থাকে, ওগো এসো তুমি, আমি বালিকা! আমাকে তোমার স্পর্শ দাও! আমার দলগুলি ফুটাও! আমি অযোগ্য, তুমি নিজগুণে আমায় যোগ্য ক'রে নাও।

প্রভাত বসিয়া বসিয়া সব খবরই গ্রহণ করে, আর একটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া, তাহার এই নিষ্ঠুরতাকে আরও নিষ্ঠুরতর করিয়া তুলিতে থাকে, এক একবার হৃদয়ের স্বভাব অনুকম্পায় মনে করে; না এ সবের আর দরকার নাই, যেমন ছিলাম তেমনি থাকি, কিন্তু তখনি কেমন রক্তের মত একটা নেশা তাহাকে চাপিয়া ধরে, এই নিষ্ঠুরতাকে কেমন সয়তানের হাসির মত ভাল লাগে, সে কিছুতে ক্ষান্ত হইতে পারে না, যেন এই রক্ত-সমুদ্র মন্থন করিয়াই, একটা রহস্যের আবিষ্কার করিয়া দেখিতে চাহে, তাহার মধ্যে কি আছে? নহিলে সে নিজেও বেশ বুঝিয়াছিল, এ তাহার সন্ন্যাসও নহে, বৈরাগ্যও নহে, এ একটী নিষ্ঠুর রকম রক্ত-রাঙা উল্লাস।

এমন সময় ভগ্নীপতি মন্মথবাবু আসিয়া এ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গিরিবালাও তখন সেখানে ছিল। গিরির মুখে সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন এর জন্য তোমার বাপের বাড়ীতে এত ভাবনা, গিরি কহিল, দেখ না ছোট ভাই দুটো নয় পাঁচটা নয়, কোথায় সুখে ঘরকন্না ক'রবে, আমরা দেখে সুখী হবো, তা নয় একবারে পরমহংস হ'য়ে দাঁড়াচ্চে।

মন্মথবাবু প্রভাতকে ডাকিয়া কহিলেন, কি হে ভায়া তা হ'লে আমার সঙ্গে পশ্চিমে যাবে, সেখানে দেখবে রাস্তায় রাস্তায় সাধু সন্ন্যাসীর মেলা ব'সেছে, তোমার উচুদরের সঙ্গী মিলে যাবে।

প্রভাত উচুদরের সঙ্গীদের জন্যই ব্যস্ত ছিল না,—সে ব্যস্ত ছিল আপনাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে,—চিত্তের এই অকারণ ক্ষোভ ক্ষিণ্ণভাব কিছুতে তাহার ভাল লাগিতে ছিল না। মন্মথবাবু না বলিলেও আপনিই সে দেশ ভ্রমণের কথা পাড়িত। কারণ তার জানা ছিল দেশ ভ্রমণে যতটা চিত্ত স্থির হয় এতটা আর কিছুতে নয়। জানাইল সে রাজী আছে।

যাইবার কালে পিসিমা অনেক কাঁদিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল না, প্রভাতকে এ সময় চোখের আড়াল করেন, কিন্তু মন্মথবাবু যখন, গোপনে খুব ভরসা দিয়া গেলেন, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। চারুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, প্রভাত আমাদের ভুলে থাকৃতে পাবে, কিন্তু সে সতী লক্ষীর আকর্ষণ কিছুতে এড়াতে পাবে না—বলিয়া চারুশীলার ললাটে একটা ক্ষুদ্র চুম্বন করিলেন, চারুরও চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে স্বামীর জন্য যে আজ কি ব্যাকুলতা, তাহা নারী-হৃদয় ভিন্ন কে বুঝিবে?

চারিদিকে প্রকৃতির নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রভাত কয়েক দিনে গিয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হইল। এলাহাবাদে প্রবেশিবার আগেই বাহিরের খোলা বাতাস খাইয়া, তাহার চিত্ত যেন অনেকটা সুস্থির হইয়া গিয়াছিল। যখন সে বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী হইতে নামিল, তখন যেন অনেকটা পূর্ব্ব জীবন ফিরিয়া পাইল। এখানকার আকাশ বাতাস যেন তাহার সব বন্ধন টুটিয়া দিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইল।

মুক্তির প্রাচুর্য্যে সুস্থির হইয়া, বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ শুনিল যেন কাহার কণ্ঠস্বর,—এ স্বর ত সে বহুদিন শোনে নাই,—তাহার সন্ন্যাস-কঠোর বক্ষে দ্রুত রক্ত-স্রোত বহিয়া গেল। ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। সত্যই কি সে লতিকাবালা। একবার অনেক দিন সে শুনিয়া-

ছিল বটে, লতিকা পশ্চিমে স্বাস্থ্য বদলাইতে আসিয়াছে, এতদিনও যে সে আছে, তা ত শোনে নাই। মনের ব্যগ্র উত্তেজনায় বাড়ীর বুড়া চাকরটার কাছে এ সম্বন্ধের নিট্ খবর জানিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু "লতিকা" কথাটাই তাহার পক্ষে এত গুরুতর হইয়া পড়িল যে, সে কিছুতে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিল না। বাড়ীর ভিতরে গিয়া কিন্তু তাহার সব গোল কাটিয়া গেল। দেখিল সত্যই সেই ছবি।

যা সে তার জীবনের প্রথম উন্মেষ-প্রভাতে দেখেছিল, একখানি চিত্রিত প্রতিমার মত, একটি স্বপ্ন-রচিত স্বপ্নখণ্ডের মত! যার স্পর্শ তার প্রাণের মধ্যে জাগিয়েছিল গান, হাসিতে যার স্বর্গের সুষমা ঝ'ড়ে প'ড়েছিল। দেখিল কল্প লোকের সেই সারভূত সৌন্দর্য্য সম্ভার। স্মৃতি যার জীবনের পাতায় পাতায় একটা স্বর্ণ প্রতিবিম্ব লইয়া মুদ্রিত হইয়া আছে, দেখিল সেই উষা লোকের তরুণী প্রতিমা, তাহার অন্ধকার জীবনের পারে প্রভাত নক্ষত্রটির মত উজ্জ্বল হইয়া আছে।

ভক্ত অবনত হইয়া দেবীর কাছে নত হইল।

* * * * * * *

পশ্চিমের হাওয়া একদিকে যেমন তাহার শরীরকে স্বাস্থ্যময় করিয়া তুলিতেছিল, অন্যদিকে লতিকার হাস্য ও সঙ্গ তাহাতে প্রাণের পূর্ণতা ঢালিয়া দিতেছিল। চারিদিক হইতে একটা অপূর্ব্ব পুলকোচ্ছ্বাস তাহাকে যেন মাতাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। এবং এই পুলকোচ্ছ্বাসে কখন সে তাহার আমিত্বটাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে টেরই করিতে পারে নাই।

হঠাৎ একদিন জাগরিত হইয়া দেখিল, সম্পূর্ণ তার পরাজয় হইয়াছে, তাহার সে বৈরাগ্যও নাই উচ্চ সপ্তকও নাই, এখন সে দীন পৃথিবীর ধূলি কণার মত একান্ত দীন।

অধঃপতনটা বেশ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া একদিন প্রভাত মন্মথবাবুকে কহিল, কই মন্মথবাবু যা মনে ক'রে এসেছিলাম তা ত হ'লো না, যদি দৈবাৎ কোন দিন এক সাধু পুরুষের দর্শন হয়, দ্বিতীয় দিন আর তাঁর দেখাই নাই।

মন্মথবাবু কহিলেন, ঐটুকু আর বুঝছো না ভাই! সাধু মানুষের ঐটুকুই ত বিশেষত্ব "শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ"।

প্রভাত হাসিয়া উঠিল। মন্মথবাবু আর কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে

লতিকা, সেই ঘরে পান দিতে আসিয়াছিল। কহিল, দাদা ও ভণ্ড মানুষদের সঙ্গে তুমি এত বকো কেন? ওরা বাইরে সাধু হ'য়ে থাকতে চান, কিন্তু ভিতরে কুমতলব ছাড়া আর কিছু নাই।

"তাই সত্যি নাকি" বলিয়া মন্মথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, লতি ত আচ্ছা আবিষ্কার ক'রেছে।

প্রভাত তাহার দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, কি আমি ভণ্ড? এত দিনের পর এই আবিষ্কারটা হ'লো আপনাদের? আচ্ছা আমি জান্‌তে চাই আমি কোন খানটায় ভণ্ড! কথার ভণ্ড—না কাজে ভণ্ড?

সে প্রমাণ করবার ভার আমার নয়—বলিয়া আস্তে আস্তে মন্মথবাবু উঠিয়া গেলেন।

প্রভাত দুইবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ফিরুন মন্মথবাবু কথাটা প্রমাণ করেই দিয়ে যান!

মন্মথবাবু হাসিতে হাসিতে—আর ফিরিলেন না। অগত্যা প্রভাতকে লতিকাকে লইয়াই পড়িতে হইল। লতিকাও চলিয়া যাইতেছিল, প্রভাত তাহার অঞ্চলটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আচ্ছা বলো আমি কিসে ভণ্ড? কোন খানটায় আমার ভণ্ডামি দেখ্‌লে!

লতিকা একটা কোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিল, ভণ্ড নন আপনি,—বলুন দেখি ঠিক ভেবে?

প্রভাত স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর আস্তে আস্তে লতিকার অঞ্চলটা ছাড়িয়া দিয়া করুণ নেত্রে কহিল, সত্যই সুন্দরী আমি ভণ্ড! আমি এই রকম ভণ্ডই থাকৃতে পারি, যদি তুমি আমায় ভণ্ড ব'লে শাসাও।

লতিকা "চুপ" বলিয়া একটা মধুর হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতও বিছানায় পড়িয়া অপূর্ব্ব পুলকে একখানা বইএর পাত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। পড়ায় মন ত আদৌ লাগিল না। কেবলি অপেক্ষা করিতে লাগিল, কখন লতিকা আবার আসিবে,—আসিয়া আবার তাহাকে ভণ্ড বলিবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন লতিকা আসিল না, তখন পান আনিবার ছুতায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। লতিকা তখন অপরাহ্ন বেলায় রামায়ণ পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। পাশে লখিয়া ঝীটা বসিয়াছিল।

প্রভাত পান চাহিতেই লতিকা গর্জ্জিয়া কহিল, কোথায় হে পান, আমি

রোজ রোজ মশাইএর জন্য এত পান সেজে দিতে পারি না, মাইনে টাইনে কিছু খাই ব'লতে পারেন ?

প্রভাত এ কৃত্রিম কোপের অর্থ বুঝিত, হাসিয়া কহিল; মাইনে নাই খাও, সাজিয়া দিলে হানি কি ?

লতিকা বইটা বন্ধ করিয়া কহিল, কি হবে সেজে দিলে, পরকালের কিছু কাজ হবে ব'লতে পারেন ?

প্রভাত "দরকার নাই" বলিয়া যখন নিজেই পান সাজিতে উদ্যত হইল, তখন লতিকা তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া নিজেই পান সাজিতে লাগিয়া গেল। কাছে বসিয়া লখিয়া তাহাদের এই ছেলে মানুষী দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, সেও হাসিতে লাগিল।

প্রভাত লখিয়ার কাণ বাঁচাইয়া কহিল। লতিকা, আমি যেমন তোমায় দেখবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র তুমিত তেমন নও।

লতিকাও লখিয়ার কাণ বাঁচাইয়া কহিল, এ কি মানুষের রকম ? আমি কে ? আমায় দেখ্‌লে কি হবে ? তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেন এ ভালবাসাটা নিজের স্ত্রীর উপরে দিলেই ভাল হয় না কি ?

প্রভাত কহিল কেন ? তুমি বুঝি ভালবাসবার যোগ্য পাত্র নও কেমন না ?

লতিকা একটা রহস্যভরা কটাক্ষ হানিয়া পানটা প্রভাতের হাতে দিয়া কহিল। জানি না কতই রকম মানুষের মধ্যে আছে।

অতিথি পান চিবাইতে লাগিল কি অমৃত চিবাইতে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিল না, সেইখানেই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিয়া গেল। যে কথা তাহাদের দুইজনকার মধ্যে কতবার হইয়া গিয়াছে, তাহাই, কত রহস্যের তারে তারে কত সাবধান সঙ্কোচের ভিতর দিয়া একটা বিচিত্র লীলায় উৎসারিত হইয়া যাইতে লাগিল। ভাষায় তাহা নিতান্ত সামান্য হইতে পারে, কিন্তু জীবনের মধ্যে, সে একটা ভাবিবার জিনিষ।

লখিয়া দেখিল, যখন তাহাদের আসর জমিয়া উঠিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। সেদিন আর তাহার রামায়ণ পাঠ শোনা হইল না।

বড় আনন্দ ও কৌতুকে তাহাদের দিন যাইতেছিল। ইহার মধ্যে বিচ্ছেদের কল্পনাও কেহ করে নাই,—এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ী হইতে লতিকাকে দেশে পাঠাইবার জন্য পত্র আসিল।

পত্রে মলিনা লিখিয়াছে যে, এতদিনে তাহাদের জামাই বিনোদবাবুর চিত্ত স্থির হইয়াছে, তিনি এখন ওকালতি ছাড়িয়া, দেশের একটা স্কুলে মাষ্টারী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেখানে নিজের স্ত্রীকেও লইয়া যাইবেন, এই কারণ লতিকা,সারুক আর নাই সারুক পত্রপাঠ তাহার পাঠানোর বন্দোবস্ত চাই-ই।

একটা বজ্রদণ্ডের মত পত্রখানা যেন প্রভাতের বুকটা দলিয়া চষিয়া দিয়া গেল। শুষ্ক মুখে লতিকাকে কহিল, কি লতি? তা হ'লে চ'ল্‌লে?

লতিকা কোন উত্তর দিতে পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া, যেমন পান সাজিতে ছিল তেমনি সাজিতে লাগিল।

প্রভাত ধরাকণ্ঠে কহিল। যাও তুমি সুখী হও। তোমার সুখেই আমার সুখ! আজ হ'তে আমার মধ্যে জীবনব্যাপী একটা বহ্নিচক্রের আয়োজন—তবু তোমার সুখ হবে ভেবে, সে বহ্নিতে, আমি ছাই চাপা দিচ্চি! কাঁদ্‌ছি না রক্ত দিয়ে বক্ষের ক্ষত ভরিয়ে তুল্‌ছি! ব'লবোও না তুমি আমার কতখানি ছিলে! শুদ্ধ তুমি সুখী হও! স্বামীর সোহাগ ভোগ করো! আমাদের ভুলে যাও! ভগবানের কাছে এই মাত্র প্রার্থনা কচ্চি!

লতিকাও সে সময় কিছু বলিতে পারিল না,—শুদ্ধ একবার করুণভাবে প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে আপনার ঘরের দিকে উঠিয়া গেল। উঠিয়া সেখানে তাহার কি মনে হইতে লাগিল? ঘরের যে কাজেই যায়, থাকিয়া থাকিয়া কোথা হইতে কি একটা ব্যথা, পাথরের ভারের মত তার সমস্ত বুকটা জুড়িয়া বসে! নারী ভাবিল একি হইল প্রভাত ত তাহার কেউই নয়। তবে এ রকম কেন হয়? হাসিও আসে, লজ্জাও পায়! আবার কান্নাও চাপে।

ভাদ্রের প্রকৃতি লীলার মত জীবনের মধ্যে এ কিসের লীলা চলিতে লাগিল। ওপারে দূরে খানিকটা চিকি মিকি স্বর্ণকিরণ আর এপারে খানিকটা কিসের এ বর্ষণ! মেঘ নাই অথচ বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে? বিছানায় শুইয়া ক্ষণে ক্ষণে লতিকার, প্রভাতের অকপট সরল বাক্যগুলি মনে পড়িতেছিল। এমন সময় গিরিবালা আসিয়া কহিল, কি লতিকা শুয়ে রয়েছিস্ যে—কোথায় যেতে হবে মনে নাই?

লতিকা কিছু উত্তর না দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল, গিরি কহিল, আজই যে যাত্রার দিন, এত দিনের পর তোর দেবতা ডাক দিয়েছেন, তবু এখনও তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছিস্!

লতিকা উঠিয়া চোক মুছিয়া কহিল। সত্যি বৌদিদি, এতদিন তোমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে ছিলুম বড় সুখে ছিলুম। তুমি আমায় মায়ের মত দিদির মত যত্ন করেছ,—আর সে চক্ষের জল রাখিতে পারিল না, গিরি স্বহস্তে লতিকার মুখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, আবার আসবি ভাই, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো. তোকে বছর বছর আনবোই!

লতিকা গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, দেখ বৌদিদি, আমার মা নাই, বাপ নাই, তোমরাই আমার বাপ মা সব। উদ্বেলিত অশ্রু-তরঙ্গে দুই নারীই অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

ঝি আসিয়া খবর দিল যাত্রার আর বিলম্ব নাই, বাবু ব'লে পাঠালেন রাত্রি নয়টার মধ্যেই র'ওনা হ'তে হবে।

লতিকা, পোর্টমাণ্টা গোছাইতে লাগিল। মনের একান্ত অভিলাষ,—এই সময় একবার প্রভাত আইসে, তা' হইলে, তাহাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিয়া যাইবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন প্রভাত আসিল না। তখন মনে করিল একবার ঝিকে দিয়া ডাকিয়া পাঠায়, কিন্তু কি আছিলায় ডাকা হয়? আছিলাটা মনে না পড়ায় তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। বাহিরের বারান্দার কাছে, একবার উচ্চকণ্ঠে গলার সাড়া দিল। কিন্তু কই প্রভাত! পানগুলা ঝির হাতে দিয়া প্রভাতের কাছে পাঠাইয়া দিল। হায় এ সময়ও প্রভাত একবার আসিল না!

নারী জানিত না, যে কি ঝটিকাই তাহার বক্ষে বহিয়া যাইতেছিল। রাত্রি নটার সময় মন্মথবাবু, ভগ্নীকে লইয়া ট্রেণের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রভাত সংকল্প করিয়াছিল তাহাদিগকে ট্রেণ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া আসিবে, তাহার জন্য সে প্রস্তুতও হইয়াছিল, কিন্তু যাত্রাকালে মন্মথবাবু যখন কোনরূপ আহ্বান করিলেন না, তখন সে চুপ করিয়া লতিকার বিদায় দৃশ্য দেখিল,—সেমিজের উপর সাড়ীখানি পরিয়া লতিকা অশ্রু মুছিতে মুছিতে চলিল, তাহাই দেখিতে লাগিল।

একবার ইচ্ছা হইল তাহাদের সঙ্গে সেও তখনই দেশে চলিয়া যায়, কিন্তু মন্মথবাবু বলিয়াছিলেন তিনি না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কথাটা মনে পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

বসন্তের চাঁদ উজ্জ্বল আভা বিস্তার করিয়া আকাশে হাসিতে লাগিল। আর একজন সেই চাঁদের আলোয় মাথা গুঁজিয়া আপনার হৃদয়ের চাঁদ অনু-

সন্ধান করিতে লাগিল। লতিকা! লতিকা! কোথায় রে লতিকা? মত্ত মাতঙ্গ তাহার লতা ছিন্ন করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে! ট্রেণের শব্দ তাহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

কে তুমি?

কে তুমি? কিসের তরে? হেথা বার বার
আসিতেছ কার আশে? কোথায় বা ধাম?
কে তোমার? ভেবে দেখ তুমিই বা কার?
কোথা যাও? থাক কোথা? কিবা তব নাম?

[২]

কে তোমায় পাঠিয়েছে? কি পথে আবার
কোন্ দেশে কার কাছে করিবে গমন?
নাহি কি উদ্দেশ্য কিছু জীবনে তোমার?
কতদিনে নিজকার্য্য হবে সম্পাদন?

[৩]

কে তুমি? কিসের তরে জীবন তোমার?
কোথা ছিলে? কেনই বা আসিলে হেথায়?
কি আছে তোমার হেথা? খোঁজ একবার?
মায়ায় গিয়াছ ডুবি কি হবে উপায়?

[৪]

ভেবেছ কি যাতায়াত জীবনের সার
মায়াময় ধরাধামে? কি করিলে, হায়!
কি করিতে এসে; এই তুচ্ছ দেহভার
শুধু কি বহনতরে এসেছ হেথায়?

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

সাবিত্রী।



সাবিত্রী বলিলে আপাততঃ গায়ত্রী, উমা, সাবিত্রী, ব্রহ্মপত্নী, শতরূপা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেকেরই প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে আমরা যে সাবিত্রীর বিষয় বলিতেছি, ইনি মদ্রদেশাধিপতি রাজা অশ্বপতির কন্যা এবং শাল্বদেশীয় সত্যবান্ রাজার পত্নী। ইঁহার সাবিত্রী নামের কারণ যথা—

সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হুতয়া হ্যপি।
সাবিত্রীত্যেব নামাস্যা শ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা॥

মহাভারত বনপর্ব্ব।

অর্থাৎ মদ্রদেশাধিপতি ধর্ম্মপরায়ণ রাজা অশ্বপতি যৌবনকাল অতীত হইলে সন্তান না হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং সন্তান কামনায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সাবিত্রী মন্ত্রদ্বারা লক্ষবার হোম করিয়া প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন।

রাজা অশ্বপতি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবী সাবিত্রীর উপাসনা করিলে, যখন অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন সাবিত্রী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে বলিলেন;—মহারাজ! তোমার পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, নিয়ম, সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন ও ভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

তখন অশ্বপতি বলিলেন, আমি পুন্নাম নরকাদি হইতে পরিত্রাণের কামনায় সন্তানের নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি। দেবি! তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আমাকে এই বর প্রদান কর যে, আমার বহু-সংখ্যক কুলভাজন পুত্র উৎপন্ন হউক। সাবিত্রী বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই তোমার অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে তোমার পুত্রের নিমিত্ত বলিয়াছি এবং সেই প্রজাপতির অনুগ্রহেই তোমার দিব্যপ্রভাবা কন্যা অচিরকাল মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব মহারাজ! তুমি এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ করিও না, আমি প্রসন্না হইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারেই তোমাকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর রাজা অশ্বপতির সহধর্ম্মিণী মালব রাজের কন্যা যথাবিধি গর্ভধারণ

পূর্ব্বক দশমাস পূর্ণ হইলে একটী পঙ্কজ-নয়না কন্যা প্রসব করিলেন, রাজাও পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জাতকর্ম্মাদি যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ করিলেন।

যে হেতু সাবিত্রী মন্ত্রদ্বারা তর্পিত এবং প্রীত হইয়া সাবিত্রী কন্যাটী দান করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণগণ ও পিতা (রাজা অশ্বপতি) ইহার "সাবিত্রী" এই নাম রাখিয়া ছিলেন।

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ।

* * * *

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব।

সেই রাজকন্যা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে তিনি যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু স্বর্গীয় জ্যোতি দ্বারা নিবারিত হইয়া, যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতেই প্রজ্বলিতা সেই কন্যাকে কেহই বিবাহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল না।

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীম্।
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈ র্নৃপতি র্দুঃখিতোঽভবৎ।

রাজা দেবসদৃশী সেই স্বীয় কন্যাকে নবযৌবন-সম্পন্না এবং জামাতৃগণ কর্ত্তৃক অপ্রার্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—

পুত্রি! প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্ বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিষ্য ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশ মাত্মনঃ।
প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্য স্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্।

মহাভারত, বনপর্ব্ব।

হে কন্যে! তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত, কেহই আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না। তুমি নিজেই আত্মসদৃশ গুণবান্ স্বামীর অনুসন্ধান কর। এবং তুমি যে পুরুষ প্রার্থনা করিবে, তাহা আমাকে জানাইবে, আমি বিবেচনা করিয়া সম্প্রদান করিব, তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর।

অনন্তর সাবিত্রী বৃদ্ধমন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুবর্ণময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবন সমূহে গমন করিলেন।

একদা নারদ রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক রাজাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় সাবিত্রীও পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। তখন নারদ সাবিত্রীকে সমাগত দেখিয়া রাজাকে বলিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিল এবং কি নিমিত্ত ইহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না? তখন রাজা নারদের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! এ যাহাকে মনোনীত করিয়াছে, ইহার নিকটেই সেই বরের কথা শ্রবণ করুন।

অনন্তর সাবিত্রী রাজা অশ্বপতি কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, শাল্ব-দেশে দ্যুমৎসেন নামে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, এবং তিনি কিছুদিন পরে অন্ধ হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজাকে অন্ধ এবং তাঁহার পুত্রকে শিশু জানিয়া নিকট-বর্ত্তী পূর্ব্ব-শত্রুগণ এই অবসরে তদীয় রাজ্য অপহরণ করায়, তিনি শিশুপুত্র ও পত্নীর সহিত বনে গমন করেন এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তপো-বনে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তিনিই আমার উপযুক্ত পতি, এই হেতু মনে মনে আমি তাঁহাকেই বরণ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন, হায় হায়, মহারাজ! সাবিত্রী নিতান্ত অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে; যে হেতু না জানিয়া গুণবান্ সত্যবানকে বরণ করি-য়াছে। ইহার পিতা সত্য কথা বলেন, এবং মাতা সত্য কথা বলেন, এই হেতু ব্রাহ্মণগণ ইহার সত্যবান এই নাম রাখিয়াছেন। এই সত্যবান্ সূর্য্যতুল্য প্রতাপশালী, বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রসদৃশ বীর্য্যবান্ এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান্। সত্যবান্ শান্ত, দান্ত মৃদু, শূর, সংযতেন্দ্রিয়, অসূয়া-রহিত, লজ্জা-শীল এবং সৌন্দর্য্যশালী। এক কথায় তিনি সর্ব্বগুণোপেত। কিন্তু —

এক এবাস্য দোষোহি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্য মতিবর্ত্তিতুম্।
একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽদ্য প্রভৃতি সত্যবান্।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দ্দেহন্যাসং করিষ্যতি।

রাজন্! ইহার একমাত্র দোষ সকল গুণকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। সে দোষ চেষ্টাদ্বারাও নিরাকৃত হইবার নহে। ইহার একটী দোষ আছে, অপর দোষ নাই! সেই অল্পায়ু সত্যবান্ অদ্য হইতে সম্বৎসর পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ করিবে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, সাবিত্রী! তুমি এস, যাও, অন্যকে বরণ কর; সেই সত্যবানের একটী প্রধান দোষ সকল

গুণকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। অল্পজীবী সেই সত্যবান্ সম্বৎসর পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ করিবে, দেব-পূজিত ভগবান্ নারদ ইহা সত্য বলিতেছেন।

সাবিত্রী বলিলেন—

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপিবা।
সকৃৎ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্।
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

একবার আমি যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ুই হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান্ই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বরণ করিব না।

মনে মনে নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যদ্বারা সঙ্কল্পিত বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, তৎপরে কার্য্যদ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব এ বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

নারদ বলিলেন—মহারাজ! আমি আপনার কন্যা সাবিত্রীর এইরূপ স্থিরবুদ্ধি এবং এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে কোনও প্রকারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না অতএব—

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।
সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সর্ব্বেষাং ভদ্র মস্তুবঃ।

তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদান কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক, আমি এখন চলিলাম। তোমাদের সকলের সকল প্রকারে মঙ্গল হউক। এই বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা দেবর্ষির আদেশানুসারে রাজর্ষি দ্যুমৎসেন যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই তপোবনে গমন পূর্ব্বক রাজর্ষির যথাযোগ্য পূজা করিয়া তৎসমীপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এবং সত্যবান্কে কন্যা সাবিত্রী ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। সত্যবান্ গুণান্বিত পত্নীলাভে পরম প্রীত হইলেন, সাবিত্রীও অভিলষিত পতি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন।

পিতা গমন করিলে, সাবিত্রী গাত্র হইতে বস্ত্রালঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া বল্কল ও কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন; এবং সকলের অভিলষিত কার্য্য-

সম্পাদনে সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিবা নিশি দুঃখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বহুকাল গত হইলে সত্যবানের মৃত্যুকাল সমীপবর্ত্তী হইল। সাবিত্রী আজ সেই দিন, ইহা জানিতে পারিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিয়া সূর্য্য চতুর্হস্ত প্রমাণ উদিত হইলে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাসমাপনান্তে সংযতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে সত্যবান্ আহারাদি সমাপন করিয়া স্কন্ধে কুঠার লইয়া কাষ্ঠাহরণার্থ বনগমনে উদ্যুক্ত হইলে, সাবিত্রী শ্বশুর শাশুড়ীর আদেশ অনুসারে স্বামীর সহিত গমন করিলেন। বনে গমন করিয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়ায় সত্যবান্ সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সাবিত্রী দেখিলেন, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রক্তবস্ত্রপরিধায়ী কোনও পুরুষ (যমরাজ) সত্যবানের দেহ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমিত প্রাণপুরুষকে স্বীয় পাশে বন্ধনপূর্ব্বক বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। এবং তদীয় স্বামীর দেহ তখন কান্তিহীন কদাকার নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া সাবিত্রী স্বামীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া যমরাজের অনুসরণ করিলে যমরাজ বলিলেন, সাবিত্রি! গৃহে ফিরিয়া যাও, ইহার প্রেতকার্য্য কর, তুমি স্বামীর নিকটে ঋণমুক্ত হইয়াছ। সাবিত্রী বলিলেন, আমার পতিকে যেস্থানে লইয়া যাইতেছেন অথবা তিনি স্বয়ং যেস্থানে গমন করিতেছেন, আমিও তথায় যাইব, ইহাই আমার সনাতন ধর্ম্ম। এইরূপে যমরাজের সহিত সাবিত্রীর অনেক কথোপকথনে যমরাজ সাবিত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্যবানের জীবনরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।

ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবম্।

* * * *

বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি।

আমি পতিহীনা হইয়া সুখ ইচ্ছা করি না, পতিহীনা হইয়া স্বর্গও কামনা করি না। আমি প্রার্থনা করিতেছি, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, তোমারই বাক্য সত্য হউক।

এষ মুক্তো ময়া ভদ্রে ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনি!
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি।

যম বলিলেন—হে কুলনন্দিনি, হে কল্যাণি! আমি তোমার পতিকে এই পাশমুক্ত করিলাম। এই ব্যক্তি তোমার সহিত চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবে। এই বলিয়া যমরাজ সাবিত্রীকে নিবৃত্ত করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। সাবিত্রীও স্বামীকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর বিবর্ণ শরীর-সমীপে গমন পূর্ব্বক দেহে প্রাণ সংযোজিত করিলে, সত্যবান্ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া আশ্রমে যাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে বাহুযুগলে ধারণপূর্ব্বক রাত্রিশেষে আশ্রমে আগমন করিলেন, এবং আশ্রম মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূঃ শ্বশুর এব চ।
ভর্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্ব্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতম্।

এইপ্রকারে সাবিত্রী আত্মা, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং পতিকুল, সমস্তকেই বিবিধ বাধা বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্ব্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।

এই উৎকৃষ্ট সাবিত্রী-উপাখ্যান যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে। সে ব্যক্তি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করে, কখনও সে দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। এই সাবিত্রী-ব্রত করিলে স্ত্রীলোক কদাচ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে না।

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে যাতু ষষ্ঠী তিথি র্ভবেৎ।
মহাষষ্ঠীতি বিখ্যাতা দুর্লভা ত্রিদশৈরপি।
তস্যাঃ পূর্ব্বস্তু যঃ পক্ষ স্তস্য কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
মেষে বা বৃষভে বাপি সাবিত্রীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।

পরাশর।

পরাশর বলিয়াছেন যে, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীকে মহাষষ্ঠী বলা হয়, ঐরূপ শুভতিথি দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। ঐ ষষ্ঠীর পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী মেষরাশির মধ্যেই হউক অথবা সৌর জ্যৈষ্ঠ মাসেই হউক, উহাকে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী বলিয়া জানিবে।

জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রী মর্চ্চয়ন্তি যাঃ।
বটমূলে সোপবাসা ন চ বৈধব্য মাপ্নুয়ুঃ।

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে যে সকল রমণীগণ উপবাস করিয়া বটবৃক্ষমূলে সাবিত্রী দেবীর অর্চ্চনা করে, তাহারা কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে না।

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রী ব্রতমুত্তমম্।
অবৈধব্যায় কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ঃ শ্রদ্ধা সমন্বিতাঃ।

রাজমার্ত্তণ্ড ও কৃত্যচিন্তামণি।

রাজমার্ত্তণ্ড এবং কৃত্যচিন্তামণিতে বলা হইয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে স্ত্রীগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অবৈধব্যের নিমিত্ত সাবিত্রী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

সাধারণতঃ ব্রতের দুইটী অংশ, উপবাসাদিরূপ এবং পূজাদিরূপ ব্রত। স্ত্রীগণ এই সাবিত্রী-ব্রতের উপবাসাদিরূপ ব্রতমাত্র অংশ অনন্ত-ব্রতের যেরূপ নিয়ম উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কারণ, একস্থলে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অন্যত্র আর কিছু বিশেষ বলা না হইলে, সে স্থলেও ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইবে, এইরূপ কল্পনা করাই উচিত। ব্রতের উপবাসাদি কার্য্য সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদাশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা।

গর্ভিণী, সদ্যঃপ্রসূতা এবং কুমারী ইহারা নক্তব্রত করিবে। রজস্বলা যদি অশুদ্ধাবস্থায় থাকে, (অর্থাৎ ষোল রাত্রি স্ত্রীগণের রজস্বলাবস্থা, তন্মধ্যে প্রথম চারিদিনই অশুদ্ধাবস্থা, এই চারিদিনের মধ্যে ব্রত পড়িলে) তবে পূজাদি অপরের দ্বারা করাইবে, উপবাস স্বয়ং করিবে। উপবাসে অসমর্থ হইলে নক্ত-ব্রত করিবে।

উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।

উপবাস করিবার সামর্থ্য না থাকিলে নক্ত ভোজন করিবে। উপবাসে অসমর্থদিগের পক্ষে নক্ত ভোজনই শাস্ত্রে অভীপ্সিত। এই বচনই উহার প্রমাণ।

ব্রতকারিণী অশুদ্ধাবস্থায় থাকিলে অন্য দ্বারা পূজা করাইবে, কায়িক উপ-

বাসাদি শুদ্ধা অশুদ্ধা সকলের পক্ষেই স্বয়ং কর্ত্তব্য। স্মৃতি-পরিভাষা নামক গ্রন্থে বর্দ্ধমানাচার্য্য এই কথাই বলিয়াছেন।

চতুর্দ্দশী খণ্ডিত হইলে শুক্লা চতুর্দ্দশী যেদিন পূর্ণিমাযুক্ত হইবে এবং কার্য্য কাল পাইবে, চতুর্দ্দশীবিহিত ধর্ম্মকার্য্য সেই দিনই করিবে, কেন না পূর্ণিমার সহিত চতুর্দ্দশীর যুগ্মাদর আছে। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীযুক্ত হইলে এবং কর্ম্মযোগ্য কাল পাইলে ধর্ম্মকার্য্য সেই দিনই করিবে। কারণ—

কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টমী চৈব কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা পরবিদ্ধা ন কুত্রচিৎ।
উপবাসাদি কার্য্যেষু এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। নিগম।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী ইহারা যেদিন পূর্ব্ব তিথিযুক্ত হইবে, সেই দিনই তদ্‌বিহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। পর তিথিযুক্ত এই দুই তিথিখণ্ডে কদাচ ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। উপবাসাদি কার্য্যে ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। শুক্লচতুর্দ্দশীও যদি ত্রয়োদশীর দিন অপরাহ্ণে মুহূর্ত্তকাল মাত্র ব্যাপিনী হয়, তা হ'লে তদ্‌বিহিত উপবাস-ব্রতাদি ঐ ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশী খণ্ডেই করিবে।

চতুর্দ্দশী তু কর্ত্তব্যা ত্রয়োদশ্যা যুতা বিভো।
মম ভক্তৈর্ম্মহাবাহো ভবেদ্ যা চাপরাহ্ণিকী।
দর্শবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা রাকাবিদ্ধা তথা মুনে।

স্কন্দপুরাণ।

হে মহাবাহো! চতুর্দ্দশী যেদিন ত্রয়োদশীযুক্ত এবং অপরাহ্ণে মুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী হইবে, আমার ভক্তগণ ঐরূপ ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীখণ্ডেই উপবাসাদি কার্য্য করিবে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমাবিদ্ধা চতুর্দ্দশীখণ্ডে ঐ সকল কার্য্য করিবে না। কিন্তু মহাদেব কর্ত্তৃক আমার ভক্তগণ এইরূপ বিশেষ করিয়া কর্ত্তার নির্দ্দেশ করায় ঐ বচনটী শিবব্রতবিষয়ক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ত্রয়োদশীর দিবাভাগে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর লাভ না হইলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী উভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।
অমাবস্যা তৃতীয়া চ উপোষ্যাঃ স্যুঃ পরান্বিতাঃ।

পদ্মপুরাণ।

একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, উভয়পক্ষের চতুর্দ্দশী অমাবস্যা এবং তৃতীয়া, ইহারা যেদিন পরতিথির সহিত সংযুক্ত হইবে সেই দিনই ঐ সকল তিথিবিহিত কার্য্য করিবে। এই ব্যবস্থার প্রতিপোষক রূপেই বলা যাইতেছে।

শিবা ঘোরা তথা প্রেতা সাবিত্রী চ চতুর্দ্দশী।
কুহূযুক্তৈব কর্ত্তব্যা কুহ্বামেব হি পারণম্।

শিবচতুর্দ্দশী, অঘোরা চতুর্দ্দশী, প্রেতা চতুর্দ্দশী এবং সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ইহারা যেদিন অমাবস্যা সংযুক্ত হইবে, সেই দিনই উপবাস করিয়া পরদিন অমাবস্যার মধ্যেই পারণ করিবে।

নারদ বলেন—

দিবাভাগে ত্রয়োদশ্যাং যদা চতুর্দ্দশী ভবেৎ।
তত্রপূজ্যা মহাসাধ্বী দেবী সত্যবতা সহ।

ত্রয়োদশীর দিন দিবাভাগে যদি চতুর্দ্দশী হয়, তবে সেই সময়ই সত্যবানের সহিত মহাসাধ্বী দেবী সাবিত্রীকে পূজা করিবে। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, দিবাভাগে অর্থাৎ দিন থাকিতে (বেলাবেলিই) ত্রয়োদশীর পর চতুর্দ্দশীর প্রবৃত্তি হইলে ঐ সময় অর্থাৎ দিনের বেলাই সাবিত্রীর পূজা করিবে। এই জন্য স্মার্ত্ত বলিতেছেন যে, দিবাভাগ শব্দের দ্বারা'দিবার শেষ দুই দণ্ড অবধি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রদোষকালের প্রথম দুই দণ্ড, যাহা দিবা ঘটিত দণ্ড বলিয়া গণিত হয়, তন্মাত্রকালেও যদি ত্রয়োদশীর দিন চতুর্দ্দশীর প্রবৃত্তি হয়, তা হ'লেও ঐ দিনই সাবিত্রীর ব্রত করিবে। অতএব দিবাভাগের দ্বারা ঐরূপ অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়াই প্রদোষকালে ঐ ব্রত-ঘটিত পূজার চির প্রচলিত আচরণ সঙ্গত হইল। প্রদোষের প্রথম দুই দণ্ড মাত্র চতুর্দ্দশীর লাভে ঐ দিন প্রদোষে পূজা হইতে পারে বলিয়াই, প্রদোষ-কালকে পূজার বিহিত কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, নতুবা বচনের সারসিক অর্থ গ্রহণ করিলে দিবাভাগে ব্রতব্যবস্থা অনিবার্য্য। সুতরাং প্রদোষকালেই ব্রতাচরণ করিবে।

পূর্ব্বদিন দিবার শেষ দুই দণ্ডে হইয়া পরদিন ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হইলে পরদিনেই সাবিত্রীব্রত করিবে। কারণ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী তিথিরই বলবত্তা।

পূর্ব্বদিন দিবাভাগে চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশীযুক্ত হয় নাই, পরদিনও ত্রিসন্ধ্যা-ব্যাপিনী হয় নাই। এরূপ স্থলেও পরদিনই ব্রতাচরণ করিবে।

চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যা যদা ভবতি নারদ।
উপোষ্য পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ।

জ্যোতিষ।

নারদ! যে স্থলে চতুর্দ্দশীর দিন অমাবস্যা হইবে, সে স্থলে ঐ দিনই উপবাস করিবে এবং চতুর্দ্দশীর মধ্যেই সেই সাবিত্রীর পূজা করিবে। অতএব অমাবস্যা যুক্ত চতুর্দ্দশীতে যে সাবিত্রী-ব্রতের বিধান দৃষ্ট হয়, এবং শিবা ঘোরা ইত্যাদি রূপে অমাবস্যাতে সাবিত্রী-ব্রত বিধায়ক বচন উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের বিষয় এইরূপ স্থলেই (অর্থাৎ পূর্ব্বদিন দিবাভাগে চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী যুক্ত হয় নাই এবং পরদিনও ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয় নাই, এইরূপ স্থলেই) বুঝিতে হইবে।

সাবিত্রী মর্চ্চয়িত্বা তু ফলাহারা পরেঽহনি।
ততশ্চাবিধবা নারী বিত্ত ভোগান্ লভেত সা। পরাশর।

পরাশর বলিয়াছেন—সাবিত্রীকে অর্চ্চনা করিয়া যে পরদিনে ফলাহার করিয়া থাকে, সেই নারী অবিধবা হয়, অর্থাৎ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না। এবং সে বিত্তৈশ্বর্য্যাদি স্বর্গীয় ভোগ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ, সমাজদ্বার।

"আঁধারে আলোক।"

(১)

খোল আঁখি মন! আর কেন? আর নয়
এখন' কি মিটিল না আশ?
অনন্ত পিপাসা ল'য়ে মরুভূমি-মাঝে
বৃথা কেন কর হা-হুতাশ?

(২)

কোথা খোঁজ' শীতলতা, অগ্নিকুণ্ডমাঝে?
কেন হেন বৃথা আকিঞ্চন?
অন্ধকার কর দূর কাট' মোহপাশ
ভুলে যাও পুত্র পরিজন।

(৩)

খোল অতীতের পুঁথি, দেখ একবার,—
কি আছে সেথা? "কেবল আঁধার।"
এখনও কি আছে আশা রহিতে হেথায়,
এত ভুল এখনও তোমার!

(৪)

এত ক্ষোভে, এত দুঃখে, এত পরিশ্রমে,
এত মহা ঘোর নিরাশায়;—
এত পাঁজি পুঁথি খুলে, এত দেখে শুনে,
কোন শিক্ষা পেলে না হেথায়?

(৫)

তাই বলি মন খোল আঁখি দুটি তুমি,
চাহ দেখি নয়ন মেলিয়া।
দেখ দেখি একবার কিবা আশে হায়,
এতদিন আছরে ডুবিয়া!

(৬)

আবর্জ্জনা রাশি যত দাও দূরে ফেলে
রুদ্ধদ্বার কর উদ্ঘাটন;—
ডেকে আন পবিত্রতা অশান্ত হৃদয়ে
কুটিলতা দিয়ে বিসর্জ্জন।

(৭)

ছুটাও ভকতি স্রোত পরাণ ভরিয়া
রোধ কর বাসনা-প্রবাহ।
"আঁধারে-আলোক" যদি একান্ত বাসনা
"বিভুনাম গাও অহরহ॥"

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাস্যানিধি।

(বিদেশী গল্প)

স্বামী স্ত্রীর প্রতিদিন কলহ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নির্য্যাতন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবজ্ঞা প্রকাশ, উভয়েরই এইরূপ মনোমালিন্যে নিত্য নব বিভীষিকা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে সোণার সংসার যে কিরূপে শ্মশানে পরিণত হয়, তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। সংসারের মধ্যে এইরূপ উপদ্রব সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতেই বিদ্যমান। এইরূপ উপদ্রব বর্জ্জিত সুখের সংসার অতি অল্পই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মনোমালিন্যের একটী প্রধানতম কারণ সংসারে অর্থাভাব; এবং সেই অর্থাভাব হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের নিত্য প্রয়োজনাভাব; এই দুইএর অভাবেই সুখের সংসারে অশান্তির করাল-ছায়া প্রবেশলাভ করিয়া ক্রমে দারুণ বিভীষিকার ক্রীড়াস্থল করিয়া তুলে; মানুষে অতি অল্পেই পশু প্রবৃত্তির অনুকরণে ও সহায়তায় ক্রমে যে পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহার বিচিত্র কি !

মুর সপ্তাহে যাহা উপার্জ্জন করে তাহা আর স্ত্রীপুত্রের জন্য ঘরে আনয়ন করে না; বেতন পাইয়াই শুঁড়িখানার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ মুদ্রাগুলি শেষ না হয়, ততক্ষণ সুরাদেবীর শরণাপন্ন হইয়া স্ত্রীপুত্রের কথা বা সংসারের অবস্থা একবারও মনে স্থান না দিয়া সুরাপানেই উন্মত্ত হইয়া থাকে; মুদ্রাগুলি ফুরাইলে কখন কখনও কর্জ্জ করিয়াও প্রবল পান-আশা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে; শুঁড়িও এইরূপ দানাদার খরিদ্দারকে পাইয়া এক ফার্দ্দিং স্থলে পেনির লাভাশায় মাতাল মুরকে ধার দিয়াও থাকে।

মুর যখন বাড়ীতে আইসে তখন সে সম্পূর্ণ উন্মত্ত। পুরুষ-পুঙ্গব ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিরপরাধিনী অবলা স্ত্রী মেরীর নিকটে বীরত্ব ও পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে; সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে; মেরী কোন জিনিষ রক্ষা করিতে যাইলে তাহাকেও উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া অন্তরধিষ্ঠিত সুরাদেবীর বলি-গ্রহণেচ্ছা আংশিক পূরণ করিয়া থাকে। এমন হতভাগ্য যে, স্নেহের পুত্তলী পুত্রটির মুখের পানে একবারও দৃষ্টিপাত করে না।

মেরী এইরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, স্বামীর উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত

না করিয়া, আপনার গতর খাটাইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতেই অতিকষ্টে পুত্রটীকে লইয়া দিনযাপন করিয়া থাকে। আহা! প্রতিদিন এইরূপ অবস্থায় কাটাইয়া মেরীর হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে—মাতাল স্বামীকে লইয়া সংসারে যেন আর তাহার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু কি করিবে, নয়নানন্দ পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া তাহাকে সকলই সহ্য করিতে হয়। দুঃখিনী মাতার হৃদয়ের ধন, জীবনের অবলম্বন সেই সুকুমার শিশু যখন কচিমুখে হাসির ফোয়ারা তুলিয়া সর্ব্বসুষমাধার প্রকৃতির অফুরন্ত শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া, উদার মাতৃবক্ষে সগৌরবে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অবাধে নৃত্য করিতে করিতে আধ আধ "মা" "মা" ধ্বনিতে সংসার-চক্র-নিষ্পীড়িত ব্যথিত জননীর কর্ণকুহরে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে—জীবন-ভার-বহনাক্ষমা সংসার-সুখ-লালসা-বর্জ্জিতা অধীরা জননীর দারুণ চিন্তাকুলাকুলিত হা হুতাশময় হতাশ হৃদয়ে স্বরগের সুখ-সমৃদ্ধির উৎস আনয়ন করিয়া, কামনার অনন্ত সাগরে সুখ-কল্পনার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করে; নৈরাশ্য-আঁধারাবৃত শোক-দুঃখের নিভৃত নিকেতন অনন্তমসীময় হৃদয়-কন্দরে আশার ক্ষীণ উন্মেষ রেখা আনয়ন করিয়া, অমাবস্যার আঁধারময় রজনীর অবসানে নবোদ্ভাসিত লোহিতময় বালসূর্য্য-কিরণসম্পাতে আলোকিত মহীমণ্ডলসদৃশ দিব্য প্রভাময় ও নবীন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তুলে। তখন হতভাগিনী মেরী তাহার হৃদয়নিহিত সকল দুঃখের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া, সুকুমার প্রাণ-পুত্তলিটির সুকোমল বদন-কমল ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বিধাতার অপূর্ব্ব সুমহান্ দান আপন জীবনাধিক তনয়কে বক্ষে চাপিয়া একবার ঊর্দ্ধনয়নে কাতরপ্রাণে করযোড়ে পরমপিতা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে, হীনচরিত্র সুপথভ্রষ্ট হতভাগ্য স্বামীর সুমতি কামনায় কতই প্রার্থনা করে! কিন্তু হায়! ভাগ্য যাহার প্রতিকূল—কে তাহার কর্ম্মফল রোধ করিবে? আপনার স্বামীর কল্যাণ কামনায় জগৎস্বামীর নিকট মেরীর সকল প্রার্থনা সকল রোদন ভাগ্যদোষে সব বিফল হয়।

সংসারে মুরের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! দুর্বৃত্তের অত্যাচারে মেরী জর্জ্জরিত! তাহার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই। এখন মুরের ব্যবহার বড়ই অসহনীয় হইয়াছে; প্রতিদিনই এখন হতভাগিনী মেরীকে পাষণ্ড স্বামীর হস্তে লাঞ্ছিত এমন কি প্রহৃত হইতে হয়। তাহার চক্ষুর জল আর প্রায়ই শুষ্ক হয় না! দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ কিরয়াছে; শীর্ণ দেহখানি আরও শুকাইয়া গিয়াছে, বদন নিষ্প্রভ হইয়াছে;

জীবনও অতিশয় তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কি করিবে, সে নিরুপায় নিতান্ত অসহায়। পাষণ্ড স্বামীর দারুণ নির্য্যাতন হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? সহায় সম্বলের মধ্যে তাহার শিশু সন্তানটি মাত্র। নরাধম পিতার অযথা অত্যাচার হইতে নিরপরাধিনী জননীকে রক্ষা করিবার পক্ষে সে নিতান্তই অক্ষম, কিন্তু তাহাতেও তাহার পরিত্রাণ নাই—দুর্দ্দশাগ্রস্ত অসহায়া জননীর বক্ষাবলম্বন হেতু অমানুষ পিতার আক্রোশে পড়িয়া তাহাকেও সময়ে সময়ে দুঃখিনী মাতার যন্ত্রণার অংশীভূত হইতে হয়! জননীর বেদনায় বিচলিত—ক্রন্দনে ক্রন্দিত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এই অপ্রাপ্তবয়স্ক সুকুমার শিশুর, হৃদয়বেদনা-নিঃসৃত সকরুণ রোদন,—হৃদয় বিদারক সজল সাবেগ-কম্পিত কাতর সতৃষ্ণ চাহনি, ভগবন্! তোমার অনন্ত দয়ার কি নিতান্তই অনুপযুক্ত? না ইহাই তোমার বাঞ্ছনীয়? না তাহার কর্ম্মফল যাহা জীবের সর্ব্বথা অলঙ্ঘনীয়?

যাহা হউক, আমাদের অধৈর্য্য হইবার প্রয়োজন নাই। একটি সংসারের দুইটি মাত্র প্রাণীর কাতর ক্রন্দনে এত বিচলিত হইলে চলিবে কেন? সুখ দুঃখ জীবনের চিরসাথী; উভয়টির আস্বাদন জীবমাত্রেরই বাঞ্ছনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী। সুখের অভাবে দুঃখ—আর দুঃখ সহনই সুখ! এ জগতে দুঃখকেই যদি আমরা পরমেশ্বরের দান ভাবিয়া, অবনত মস্তকে কর্ত্তব্যজ্ঞানে সহ্য করিতে শিক্ষা করি, তাহ'লে বোধ হয় আমাদের জীবন এত দুঃখভারাক্রান্ত হয় না। বাহ্যিক সুখের কোলে লালিত চিরকাল সুখ-শয্যায় শায়িত হইয়া সুখের স্বপ্নে বিভোর থাকিলেই জীব কি চিরসুখী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? না তাহা কখনই নয়—সুখ দুঃখ জীবের অন্তরের সহিত সম্বন্ধ ও সংলিপ্ত; বাহ্যিক সুখ বা দুঃখের নির্দ্দেশ বা নিশানা যাহা কিছু আমরা অবলোকন করিয়া থাকি, তাহার সহিত অন্তর্নিহিত সুখ বা দুঃখের পরিমাণ কখনই অনুমিত হইতে পারে না। বাহ্যতঃ অভাবের নামই দুঃখ আর স্বচ্ছলতাই সুখ; এই দুইটিই জীবমাত্রেরই দৈনিক জীবনের প্রধান অঙ্গীভূত। তদ্ভিন্ন সুখের অভাব না হইলেই বা কে কোথায় দুঃখের আস্বাদন অনুভব করিয়াছে? আর দুঃখের কণামাত্র লাঘবে কেই বা সুখ না ভোগ করিয়াছে? সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর সুখ ইহাই যেন চিরন্তন প্রথা; বিধাতার বিধান। কিন্তু হত-ভাগিনী মেরীর ভাগ্যলিপি অন্যরূপ! দুঃখের লাঘব হওয়া দুরে থাকুক বৃদ্ধিই যেন ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রেত! ভগবান্ তাহার দুঃখেরই স্রোত

বজায় রাখিলেন; জানি না কবে তাহার ম্লান অধরে হাসির রেখা অঙ্কিত দেখিব!

এদিকে দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার যেমনি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভগবান্ তাহার দণ্ডেরও ব্যবস্থা করিলেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন হতভাগ্য মুরের চাকুরীতে জবাব হইল। মুরের মাথায় বজ্রপাত হইল, মুর দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল; ভাবিতে লাগিল, আজ বৃহস্পতিবার আর একদিন পরেই শনিবার, কি করিয়া কি লইয়া সে শুঁড়ীখানায় যাইয়া পান-আশা পরিতৃপ্ত করিবে।

মুর যেথায় কাজ করিত সেই স্থানের আর এক জন মুরের সমকক্ষ মাতাল ফ্রান্সিস শুঁড়ীখানায় আসিয়া মুরের সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার শুঁড়ীকে বলিয়া, তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, শৌণ্ডিকও ফ্রান্সিসের হিতকর পরামর্শে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল এবং তাহাকে বিনামূল্যে একটি বোতল মদ্য পান করিতে দিল। ফ্রান্সিস বিনামূল্যে মদ পাইয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিল ও শুঁড়ীকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ফ্রান্সিস বোতলের অর্দ্ধেকটি গলাধঃকরণ করিয়া বাকি বোতলটি পকেটে করিয়া আপনার গৃহের দিকে প্রস্থান করিল।

ফ্রান্সিস যদিও মাতাল বটে কিন্তু সে মুরের মত অত্যাচারী নহে। ফ্রান্সিস মদ্যপান করে সত্য, কিন্তু তাহার সংসারের প্রতি, স্ত্রী পুত্রের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ আছে। সংসারের নিয়মিত খরচ করিয়া যদি কিছু বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলে সেই অর্থে সে মদ্যপান করিয়া থাকে, নচেৎ চতুর ফ্রান্সিস পরের ঘাড়ে কাঁটাল ভাঙ্গিতে বড়ই মজবুত। অধিকাংশ দিনই সে পরের উপর দিয়াই আপনার মতলব হাসিল করিয়া লয়। আমাদের মহামতি মুরও কতবার ফ্রান্সিসকে সাদরে মদ্যপান করাইয়াছে, কিন্তু তা বলিলে কি হয়, আজ মুরের চাকুরীতে জবাব হইলেই ফ্রান্সিস সর্ব্বাগ্রেই মুরের মহাজন সেই পরিচিত মদ্য বিক্রেতার নিকট মুর-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিয়া শৌণ্ডিকের কতক উপকার সাধন করিয়া, বাকি আপনার মতলবও পূর্ণ করিল। এখন ফ্রান্সিস মুরের ভাল করিল কি মন্দ করিল পাঠক বুঝিয়া লউন। ফ্রান্সিস মুরের বন্ধু কি শত্রু তাহা বোধ হয় সকলেরই অনায়াসে উপলব্ধি হইবে।

মানুষ বিপদে পড়িলে কেহই যে তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করে না, বা কেহই যে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাহে না ইহা স্বাভাবিক। বিপদে

অনেক স্বভাব-বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে বিপদ যে কি বস্তু তাহা বিপদ্‌গ্রস্তের অনুভবে আইসে না। বিপদ আপনার কার্য্য ষোল আনা পূর্ণ করিলে পর, তবে তাহার চক্ষু ফুটে। তখন সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে সম্পদ ও বিপদ বলিয়া দুইটী জিনিষ অহর্নিশি চক্রের ন্যায় মানুষের পাছু পাছু ঘুরিতেছে। মানুষ যখন সম্পদ-সাগরে ভাসমান থাকে, তখন সে একবার ভুলেও ভাবে না যে, পর মুহূর্ত্তে তাহার কি হইবে। সম্পদ-সোহাগে বিপদ যে একেবারে ঈর্ষায় বুক ভরিয়া পার্শ্বেই তাহার অপেক্ষা করিতেছে, সুযোগ পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া, তাহার যত সমৃদ্ধি বৈভব সম্পদ-সহচর সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যে তাহাকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে ; হায় ! ভ্রান্ত মানব একবারও তাহা ভাবিবার অবকাশ পায় না ; যাহা হউক বিপদই আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দেয়। বিপদেই আমরা বুঝিতে পারি কে আপনার—কে পর। বিপদই আমাদের জানাইয়া দেয়, কে বন্ধু বা কে শত্রু ! এখন দেখা যাউক নষ্টচাকুরী হতভাগ্য মুরের কিরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় হয়। এ বিপদেও মূঢ় তাহার চরিত্র সংশোধন করিতে পারে কি না। পাঠক, চলুন, এখন আমরা হতভাগ্য মুরেরই গতি লক্ষ্য করি। চির দুঃখ নিমজ্জমানা মুরপত্নী এখন কষ্টেই দিন যাপন করুক। তাহার দুঃখের উপর দুঃখ বাড়িল। ভগবান্ তাহার দুঃখ অপনোদন করুন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীননিলাল সুর।

ভ্রম সংশোধন।

মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম বশতঃ "কে তুমি" নামক কবিতার একাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। আগামী মাসে উহার অবশিষ্ট অংশ প্রকাশিত হইবে।

মাসিক সংবাদ।



নদিয়া জেলার লোক সাহিত্য-সেবায় অগ্রগামী—বিশেষতঃ সংস্কৃত চর্চ্চায় নদিয়া শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণকুলে এই বিদ্যা কমিয়া আসিতেছে,—সে বৎসর নদিয়ার সেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ উপাধি পাইয়াছেন; এবার তাঁহার কন্যা আর্য্য সাহিত্য-সভা হইতে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরস্বতী উপাধি লাভ করিয়াছেন;—এখন তাঁহার নাম হইল, বিবি নুরজাহাঁ খাঁ সরস্বতী। শুভমস্তু।



মণিপুরের বন্দী রাজা কুলচন্দ্র ধ্বজসিংহ এতদিন হাজারিবাগে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। কুড়ি বৎসর এইভাবে অবস্থান করিয়া বর্ত্তমানে জীবনের অবশিষ্ট কাল বৃন্দাবন ধামে বাস করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন,—সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। ভাল হইয়াছে।



সরস্বতীর সিদ্ধ সেবক সহৃদয় ও ভাগ্যনিষ্ঠ ডাক্তার পি, সি. রায় পঞ্চনদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া যে পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন, তাহা তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দান করিয়া আসিয়াছেন। রাসায়নিকের নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য উহা ব্যয়িত হইবে। কাজটি শোভন এবং উচ্চভাব-সম্পন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।



আগামী বর্ষের "অবসর" আরও একটু উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আয়োজন হইতেছে।



গতবর্ষের উপহার লইয়া একটু কথা হইয়াছিল,—অনেকের নাকি 'মনের মত' হয় নাই। এবার সে অভাব পূরণ হইবে। আষাঢ়ের কাগজেই সমস্ত প্রকাশ পাইবে।



টীকারীর মহারাজ কুমার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন।







মান

স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি পাদপল্লবমুদারম্ ॥

Mohila Press, Calcutta.

বঙ্গে বরষা।

প্লাবি ধরা তারাকারা, নক্ষত্র পতন
জিনি সব্যসাচী করে বাণ বরিষণ
ভারত সমর-ভূমে,
আচ্ছাদিয়া ঘন ধূমে
রাখিয়া অম্বর যেন, হ'তেছে বর্ষণ
প্রলয়ের ধারা, গর্জ্জে বিদারি শ্রবণ॥

ভীম রবে ইরম্মদ, সে নীরদ সনে
সৌদামিনী করে খেলা প্রফুল্লিত প্রাণে,
ঝলসি নয়নতারা,
হ'য়ে যেন দিশেহারা
উল্লাসে প্রাণেশে পেয়ে বিরহ' বসানে
দেবাসুর সমরান্তে, বিরলে নির্জ্জনে।

যেন দেব রোষ-বহ্নি তারাকারা রূপে
আসিছে গ্রাসিতে বিশ্ব, সোল্লাস কৌতুকে
কিম্বা যথা হুতাশন,
দহিতে খাণ্ডব বন,
দ্বাপরে, উল্লাস ভরে নেচেছিল সুখে;
তেমতি ঝরিছে ধারা ধরণীর বুকে।

এই সে বরষা বঙ্গ যার আগমনে
ধরে অভিনব সাজ সুশ্যাম বরণে।
ফুল্লমতি কৃষিদল
লভি যেন নব বল,
নবীন উৎসাহে রঙ্গে ধায় ক্ষেত্র পানে
নব "অবসর" আশে শরতের সনে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কুতবামনারের নির্ম্মাতা কে ?

পাঠকগণের মনে স্বতঃই উদিত হইবে যে, এ আবার কেমন অসঙ্গত প্রশ্ন। সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ সম্রাট কুতবউদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহারি নামানুসারে এই স্তম্ভেরও নাম 'কুতবমিনার' রাখা হইয়াছে ; এবং সমস্ত ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকেও ইহার যথেষ্ট সত্য সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু এই বিখ্যাত কুতবমিনার নামক স্তম্ভ দিল্লীর সম্রাট কুতব-উদ্দিন কর্ত্তৃক প্রস্তুতও হয় নাই ; এবং তাহার নামানুসারেও ইহার নাম 'কুতব-মিনার' হয় নাই। বহুদিন হইতে এই সামান্য ভ্রমটা সকলেই সত্যরূপে মানিয়া লইতেছেন। সত্য সর্ব্বদাই দৃঢ় থাকিবে। সম্ভবতঃ এই যে সাধারণের প্রীতির একটা বিশ্বাস,একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে,তাহা ত্যাগ করাইবার জন্য চেষ্টা করা শুধু বৃথাই হইবে। আমি জানি যে আমার এই অতি প্রবল মতামত অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মতকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সাক্ষ্য দিবে ;অথচ বর্ত্তমান প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে সে ত্রুটী অবশ্যই থাকিবে সুতরাং কেহ যেন ইহাতে বিরক্ত না হয়েন। স্যার আলেকজন্দর কানিংহাম (Sir Alexander cunningham) এবং অন্যান্য লেখকগণ শুধু সর্ব্বসাধারণের মতের উপরেই নির্ভর করিয়াছিলেন। মিঃ কিন্ (Mr keen) নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিয়াছেন যে "দাসবংশীয় কুতবউদ্দিনই এই বিখ্যাত স্তম্ভের প্রতিষ্ঠাতা।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যখন মিঃ কিনের মত বিখ্যাত ঐতিহাসিকই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, এখানে প্রশ্ন হইতে পারে তবে কি তিনি এসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না ? বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসবেত্তাদিগের বর্ণিত ইতিবৃত্ত মিথ্যাপ্রমাণ করিবার চেষ্টা যেমনই নিষ্ফল হোক না কেন, ঐতিহাসিক সত্যের জন্য যে গবেষণা তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট উপহার এবং এই প্রতিদানই সূক্ষ্ম সত্য অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক জ্ঞানেচ্ছু যুবককে প্রকৃতরূপে পুরাবৃত্ত বর্ণনা করিতেও অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু হইতে বাধ্য করে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে একবার এসিয়াটিক সোসাইটীর (Asiatic Society) সংবাদ পত্রে সাধারণের এই যে কুতবমিনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং পরলোকগত মেজর রেভারটি (Major Raverty) সেই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি

তাঁহার কর্ম্মশিল্প জীবনের অধিকাংশ সময়ই এইরূপ সাধারণ ভুল সমস্ত উদ্ঘাটন করিবার জন্য কর্ম্মব্যাপকতায় কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার প্রতিদান অতি অল্পই হইয়াছিল। তিনি অনেকবার প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সিন্ধুদেশাধিপতি মহম্মদ কাশিম আরববিজয়ী নহেন। কিন্তু মিঃ এল-ফিন্‌ষ্টোন (Mr. Elphin stone) বলিয়াছেন যে, কাশিমের পুত্র মহম্মদ-ই আরববিজয়ী। বর্ত্তমানে প্রফেসার ষ্টেন্‌লি লোনপোল (Stanley Lonepoole) প্রাচীন ভ্রম সকল তাঁহার রচিত Mediaeval India নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। Darins Hystaspes সম্বন্ধে অনেক বই-ই আছে, কিন্তু ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে Darins, Hystaspesএর পুত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে একখানা বই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আছে মহম্মদ বক্তিয়ারই বঙ্গবিজয়ী; কিন্তু ইহাও আবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই বিজয়ী ইক্তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ (Ikhtiyar uddin) বক্তিয়ার উদ্দিনের পুত্র। স্তম্ভ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভুলগুলি অসংখ্যরূপে বাড়িয়া যাইতে পারিত; কিন্তু বর্ত্তমানে সকলেই তথায় যাইতে পারেন ও প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন।

ভারতবাসীর নিকট 'কুতবমিনার' এত পরিচিত যে তাহার কোন বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এই বিখ্যাত স্তম্ভ ২৩৮ ফিট উচ্চ এবং ইহার পাঁচটী তালা আছে। নীচের তিনটী তালাই লাল পাথরে ও উপরের দুইটী অতি সুন্দর মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকের দেওয়ালগুলি কত সুন্দর কারুকার্য্যে বিভূষিত রহিয়াছে। সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ডে কত আরবীয় ভাষায় কত খোদিতলিপি সংযোজিত হইয়াছে; তাহা হইতে এই বিখ্যাত স্তম্ভের বহু ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়। ঐ খোদিত লিপি সকল সম্পূর্ণ হিন্দু-ভাব-সম্পন্ন। এই পরিদৃশ্যমান সত্য সকল অসঙ্গত কল্পনায় গঠিত। বর্ত্তমানে কেহ কেহ একথাও বলেন যে, চৌহান বংশীয় রাণা পৃথ্বীরাজ তাঁহার কন্যাকে আপন বাড়ী হইতে গঙ্গা দেখাইবার জন্য এই বিখ্যাত স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্যার আলেকজন্দার কানিংহাম মহোদয়ের একজন সহকারী মিঃ বায়লার—(Mr. Beylar) এই স্তম্ভের প্রতিষ্ঠাকারী হিন্দু, এই সত্যের প্রমাণ করিতে বহু চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এ তাহার নিজেরই ভুল। ঐ স্তম্ভের শিল্পিগণ সকলই হিন্দু ছিল, সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য ও ন্যায্য বর্ণনা সকলই ঐ স্তম্ভের গাত্রে খোদিত হইয়াছে।

এই প্রসিদ্ধ স্তম্ভ কাহারো উপাসনা মন্দির নহে, ইহার পার্শ্ব-সংলগ্ন অপর একটি মস্‌জিদ আছে। যদিও মস্‌জিদের উপরিভাগে দুইটি চূড়া থাকা তাহাদের ধর্ম্মেরই নিয়ম, তথাপি একমাত্র কুতবউদ্দিনই একটি চূড়া নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার প্রমাণ রাখিয়া যান নাই; গজনী প্রদেশে আলিগর জেলার অন্তর্গত 'কোল' নামক স্থানেও ইহার একটী উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানক্ষেত্রে সকলেই একমাত্র সুলতান কুতবউদ্দীনকেই এই স্তম্ভ নির্ম্মাতা বলিয়া আরোপ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা একমাত্র "কুতব"কেই জানেন। কিন্তু একজন মুসলমান লেখক ইহা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "The eath or the pillar of kutb sahib," এই বিখ্যাত স্তম্ভ কুতব সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বাগ্‌দাদের নিকটবর্ত্তী উষ" (Ush) নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন এবং একজন বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, অবশেষে দিল্লীতে গমন করেন। তথায় সুলতান আল্‌তাম্‌স্‌ কর্ত্তৃক তিনি বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিলেন। ইনি-ই Elphinstoneএর বর্ণিত 'আল্‌তাম্‌স্‌'। এই পুণ্যাত্মা ১২৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জীবনলীলা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ঐ মস্‌জিদ্‌ও স্তম্ভের অনতিদূরেই তাহার সমাধি স্থাপিত হইয়াছিল। মিঃ কানিংহাম্‌ মহোদয়ের বর্ণনা অনুসারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে. তাহার সমসাময়িক 'কুতবউদ্দিন উষীর' (Kutb-ud-din ushi) নামানুসারে এই স্তম্ভের নামানুকরণ হইয়াছে এবং এই কারণেই তাহার সমাধিও এই বিখ্যাত স্তম্ভের সন্নিকটে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্মৃতি হইতে যে প্রাচীনতত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন, সেই শাস্ত্রবিদ্‌ তত্ত্বাবধায়ক এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র সুলতান কুতবউদ্দিন ও তাহার প্রাসাদমালার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের বর্ণনাই করিয়া গিয়াছেন। ইহাও সত্য যে এই বৃহৎ মসজিদের নির্ম্মাণকার্য্য ৫৮৯ হিজরি অব্দে (ইং ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ) অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়াছিল। এবং পাঁচ বৎসর পরে ৫৯৪ হিজরি অব্দে (ইং ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে) সেই বৃহৎ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। গজনীর অধীন দিল্লীর শাসনকর্ত্তা কুতবউদ্দিন এবাকের আদেশ অনুসারে যে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই প্রাচীন প্রাসাদ ক্রমান্বয়ে কুতবউদ্দিনের জামাতা আল্‌তামস্‌ কর্ত্তৃক এবং পুনরায় আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক

বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। সেই মস্‌জিদশেখর দ্বয়ের নাম সেই শুভানুধ্যায়ী মহাপুরুষের নামানুসারে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মস্‌জিদ নির্ম্মাণকারী শাসন-কর্ত্তার নামানুসারে হওয়া উচিত নহে; কারণ সেই চূড়ার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যেহেতু ইহা তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বা জীবনকালে আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু কুতবউদ্দিনের নাম ঐ স্তম্ভের নিম্নস্থিত খোদিত লিপিশ্রেণীতে দেখা যায়, এই বিশ্বাস বিশেষ কারণ যুক্ত নয়, ইহা কেবল সৈয়দ আহম্মদের আনুমানিক প্রস্তাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নিদর্শনও অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিঃ কানিংহাম্‌ বলেন সেইগুলি অবোধ্য ও অস্পষ্ট। মিঃ কারষ্টিফেন (Mr. Carrstephan) বিশেষ তত্ত্বাবধান করিয়াও ইহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইহাও মানিয়া লইতে সম্মত যে স্তম্ভটী "কুতব" এই নামেই বিখ্যাত এবং অন্য এক খোদিত লিপি কুতবউদ্দিনের অধীন রাজা শামের (Sam) পুত্র মহম্মদের বলিয়া পরিচয় দেয়। এই কারণগুলিও সেই বিধ্বস্ত খোদিত লিপির অনির্ণেয় বর্ণনা সমর্থনের যথাযথ প্রমাণ নয়। এই স্তম্ভনির্ম্মাণ কার্য্য কুতবউদ্দিনের উপর আরোপ করিবার অন্য কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। অপরদিকে এইরূপ আরোপণ জলন্ত খোদিত লিপির সহজ প্রমাণের ও খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান ঐতিহাসিকদের প্রমাণেরও সম্পূর্ণ বিপরীত। খোদিত লিপি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ১২১০ হইতে ১২৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা সুলতান আল্‌তামস্‌ কর্ত্তৃক এই বিখ্যাত স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভের দ্বিতলের উপরিস্থ খোদিত বর্ণনাই তাহার যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। পুনরায় দ্বিতলের দ্বারদেশের বর্ণনাই প্রমাণ করিতেছে যে, তৎ কর্ত্তৃকই এই প্রাসাদ-সমাধাকার্য্য আদিষ্ট হইয়াছিল। তৃতল ও তৎ দ্বারদেশের উপরে তাহারই নাম পুনর্বিবৃত রহিয়াছে। চতুর্থ তলবেষ্টিত বর্ণরেখার উপরেও তদ্রূপই আছে। তৎগৃহের দ্বারদেশের পুর্ব্ব বর্ণনাই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, আল্‌তামসের রাজত্ব কালেই এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

সেকেন্দার লোদীর তৎপরবর্ত্তী বর্ণনাতেও ইহাই প্রাক্‌সদৃশ, আল্‌তামসের উপরেই ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে আরোপণ পুন নির্ব্বাচিত হইতেছে। সেই সেকেন্দার লোদী পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনঃ সংশোধিত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীনলিপির আর দৃঢ় প্রমাণের আবশ্যক হয় না। কিন্তু ইহাও যদি অভীপ্সিত হয়, তবে আবদুলফিডা, শামসিরাজ ও আমির খস্রু এই তিন জন

প্রাচীন ঐতিহাসিকদের ইতিহাসই ইহা প্রমাণ করিবে। তথাপি মিঃ কার ষ্টিফেন্ এই ইতিহাসবেত্তাদের প্রমাণের উপর বিশেষ নির্ভর করেন নাই এবং তিনি এই বিশেষ যুক্তি উত্থাপন করেন যে, ইহার সমাধাকার্য্যে আল্‌তামসের আদেশই—তিনি যে ইহা আরম্ভ করেন নাই তাহার বিশেষ প্রমাণ। সেকেন্দর লোদীর খোদিত লিপি ও আল্‌তামস্ কর্ত্তৃক বিবৃত ভ্রমপূর্ণ বর্ণনার প্রতিলিপি বলিয়া অবিশ্বাস্য। কুতবউদ্দিন এবাক্‌ই এই কুতবমিনার প্রস্তুত করিয়াছেন—এই পূর্ব্বানুমিত ধারণার বশেই মিঃ আলেকজান্দার কানিংহাম্ এবং মিঃ থোমাস্ উৎকৃষ্ট সহজ প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিতে তদ্রূপ ভ্রমে পতিত রহিয়াছেন। কারণ ইহা তাহাদের পূর্ব্বধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। সুলতান আল্‌তামস্‌ই বা কেন পৃথিবী-বিখ্যাত এই শিল্পকার্য্যে মিথ্যা বর্ণনারূপ কষ্টকর কার্য্যে হাত দিবেন, তাহাও বর্ণিত হয় নাই। সম্ভবতঃ প্রকৃত পক্ষে এই খোদিত লিপিতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছুই নাই এবং তিনি ইহার আরম্ভ ও সমাধা কার্য্যে আদেশ করিয়াছিলেন—এই দুইটী সত্য বিষয়ও কেন যে তিনি বিবৃত করিবেন না, তাহারও কোন কারণ নাই। ইহাও সত্য, যে স্তম্ভের নিম্নদেশে শামের (Sam) পুত্র সুলতান মহম্মদের সোপাধি নাম লিখিত আছে। কিন্তু বর্ণনীয় শামের সুপরিচিত কনিষ্ঠপুত্র মইজুদ্দিন ও সাহাবুদ্দিনের কথাই স্মৃতিপথে আনয়ন করে। তিনি ৬০২ হিজরি অব্দে (১২০৫ খৃষ্টাব্দ) প্রাণত্যাগ করেন। ইহাও সম্ভব যে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়াসুদ্দিনকেও বুঝাইতে পারে; কারণ তিনিও মহম্মদ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। শামের পুত্র মহম্মদ মইজুদ্দিনের অধীনে যখন কুতবউদ্দিন দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখনই তৎকর্ত্তৃক এই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সত্য ঘটনাও প্রমাণ করিতেছে না যে আল্‌তামস্ স্বাধীন রাজসদৃশ স্বীয় রাজ্য সংস্থাপনের পর তৎকল্পিত আরম্ভ ও সমাধা কার্য্যের অধিকার সময়ে তাহার শ্বশুর মহাশয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গুণ-পরিচায়ক মিথ্যা খোদিত লিপি স্থাপিত করিয়াছিলেন। আল্‌তামস্ এই মসজিদের আয়তন আরও বৃহত্তর করিয়াছিলেন এবং তাহার শেষ কার্য্য ৬২৯ হিজরি অব্দে (১২৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ) হইয়াছিল। যদিও আল্‌তামস্ কর্ত্তৃক খোদিত লিপির সময় নির্দ্ধারিত নাই, তথাপি আমরা সম্ভবতঃ ন্যায়তঃই ধারণা করিতে পারি যে, যখন তিনি মসজিদের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখনি এই স্তম্ভও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রকৃতই এরূপ একটী বৃহদাকৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে একবৎসরের অধিক সময়

লাগিবে। সুতরাং আমাদেরও নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দই এই বিখ্যাত স্তম্ভের নির্ম্মাণ কাল।

এখন এই প্রবন্ধের উপসংহার অতি অল্প কথায়ই বিবৃত করা যাইতে পারে। এই মস্‌জিদ ও স্তম্ভ "কুতবউদ্দিনে"র নামেই সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত। কিন্তু এই নামটী যে সম্রাট্ কুতব উদ্দিনের নাম হইতেই আসিয়াছে, তাহা নয়। ইহা "উষ" নামক রাজ্যের "সাধু কুতবউদ্দিনের" নাম হইতেই হইয়াছে এবং ঐ মহাত্মার সমাধিও এই স্তম্ভের সন্নিকটেই দেওয়া হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের গাত্রস্থিত খোদিত লিপি দৃষ্টে দেখা যায় যে, শামের পুত্র সুলতান মইজুদ্দিন অথবা সাহাবুদ্দিন মহম্মদের অধীনতায় যখন কুতবউদ্দিন দিল্লীতে শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় ১১৯৩ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৎকর্ত্তৃক এই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই মইজুদ্দিন অথবা সাহাবুদ্দিন ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন। সুলতান আল্‌তামস্ ১২৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদের পুনঃ সংস্কার করাইয়াছিলেন; এবং প্রায় সেই সময়ই তৎকর্ত্তৃক মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী এই বিখ্যাত স্তম্ভও নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পাদদেশে এই স্তম্ভ নির্ম্মাতার শ্বশুর কুতবউদ্দিন এ-বাকের প্রধান অধিরাজ ও শুভানুধ্যায়ী শামের পুত্র সুলতান মহম্মদের স্মৃতিতে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতএব এই স্তম্ভ মস্‌জিদ নির্ম্মাণের সময় হইতে ৩৪ অথবা ৩৫ বৎসর পরে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং সুলতান আল্‌তামস্‌ই ইহার প্রকৃত নির্ম্মাতা। *

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

"কৃতজ্ঞতা।"



ক্ষুদ্র আমি ছিনু কোন আঁধারে মিশিয়া,
ছিল না অস্তিত্ব কিছু বলিতে আমার।
যাঁহাদের কৃপাবলে মরতে আসিয়া,
হেরিনু নয়নে বিশ্ব শোভার ভাণ্ডার॥

---

* East & West নামক পত্রিকায় Mr. Vincent A. Smith কর্ত্তৃক লিখিত "Who built the Kutbminar?" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

শৈশবে যাদের স্নেহ-সুধা-সঞ্জীবনী,
বাঁচাইল অসহায় ক্ষুদ্র কলেবর।
ভুলি নিজ সুখ-দুঃখ দিবস রজনী,
আমার মঙ্গলে যাঁরা রত নিরন্তর॥

কিশোরেতে হিতকর যাঁদের বচন,
খুলে দিল ধীরে ধীরে জ্ঞানের দুয়ার।
ঊষার কুয়াসাবৃত গগনে যেমন,
ধীরে আসি রবিকর হরে অন্ধকার॥

সংসার-অর্ণবমাঝে কর্ম্মময় স্রোতে,
ভাসিতেছে অনিবার জীবন-তরণী।
নিরাশা-তরঙ্গে পড়ি ঘাত-প্রতিঘাতে,
পশে কাণে যাঁহাদের মমতার বাণী॥

মঙ্গলে আশীষ-পূর্ণ করুণার গাথা,
করে প্রাণে পুনঃ নব আশার সঞ্চার।
ভুলাইয়া শত দুঃখ শত কাতরতা,
জনক-জননী ভবে শান্তির আধার॥

কিন্তু হায়; সে দয়ার দিতে প্রতিদান,
কি আছে শকতি ক্ষুদ্র হৃদয়ে আমার।
শ্রদ্ধা ভক্তি কেমনে গো পাবে সেথা স্থান,
যেথা শুধু মর্ম্মভেদী শত হাহাকার॥

মিটাতে আপন সাধ আপন বাসনা,
আপনার তরে প্রাণ আকুল আপনি।
অকৃতজ্ঞ হৃদি হায়; বারেক ভাবে না,
এ জগতে কত পূজ্য জনক-জননী॥
বিন্দুমাত্র স্নেহ-ঋণ পারে শোধিবারে,
থাকে যদি 'কৃতজ্ঞতা' হৃদয়-মাঝারে॥

শ্রীস্বর্ণপ্রভা মজুমদার

শুভদৃষ্টি ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

তারপর দিন নানা ছুতায় প্রভাত দিনের বেলায় আদৌ বাড়ীতে প্রবেশিল না। এখানে সেখানে কাটাইয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গিরিবালা তাহাকে জল খাইতে দিল। খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিল মাত্র।

গিরিবালা কহিল, কোন অসুখ করে নাই ত প্রভাত ?

প্রভাত কহিল, কোন অসুখ করে নাই, ভালই আছে সে !—

গিরি তবু আশ্বস্ত হইতে পারিল না। কহিল, আজ আর তোমার বাইরে বেড়িয়ে কাজ নাই। ওপরে আলো দিয়ে আসা হ'য়েছে, তুমি যাও।

প্রভাতও কতকটা তাহাই চায়। ভাবিল নিরালা ঘরে মুখ গুঁজিয়া অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে।

বারান্দার ধারে আসিতেই তাহার হৃদয় যেন কি যেন স্পর্শে চকিত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এইখানে সে বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইত, আর লতিকা তাহার সম্মুখে পান সাজিতে বসিত। পান সাজিতে সাজিতে কত কথাই তাহাদের হইয়া যাইত। সে কথা কতবার দুজনার মধ্যে হইয়া গিয়াছে, তাহারি পুনরালোচনায় এমন কত সন্ধ্যা কত প্রভাত কাটিয়া গিয়াছে।

একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া বক্ষেই মিলাইয়া গেল। সেদিনকার সেই মালাগাছটি পর্য্যন্ত লতিকা যেভাবে দেওয়ালে দোলাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি আছে। বকুলমালার রংএর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু গন্ধ এখনও তাহার স্পর্শ লইয়া বহিয়া যাইতেছে।

মনের একাগ্র উত্তেজনায় একবার সেটা স্পর্শ করিতে চাহিল, কিন্তু তখনি আপনার দিক হইতে বাধা পাইয়া চুপ করিয়া গেল। ভাবিল তাই ত, তাহাতে আমার ভালবাসিবার অধিকারটুকু মাত্র আছে, কিন্তু তাহাকে স্পর্শিবার তাহাতে আসক্তির ভাব জাগ্রত করিয়া তাহাকে সঙ্গ-সুখ দিবার অধিকার ত আমার নাই। সে চিন্তাও মনে আনা অন্যায় ও পাপ। আকাশের দিকে

হাত জোড় করিয়া কহিল. ঈশ্বর তাকে সুখে রেখো, সে অসহায় দীন, তাকে তার প্রেমাস্পদের কাছে শুভদৃষ্টিতে স্থাপিত করো। মনের আবেগে আরও অনেকখানি বলিয়া গেল। কিন্তু আজ এ শক্তি আসিল কোথা হইতে? যার বলে সে এতখানি বলিতে পারিল, অকপটে এতটা হৃদয় দান করিতে পারিল, শুদ্ধ ভালবাসার খাতিরে এতটা সে যে পারিবে, প্রভাতও তাহা কখন কল্পনা করে নাই। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা আছে কি না?--নাই! শুদ্ধ উদার মহান্ ভালবাসা, এ ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিভুর নিকট প্রার্থনা করিল, –ঈশ্বর রেখো এই প্রেম চির অটুট, যেন সারা জীবনের পথে শুদ্ধ হইয়া চোখের নেশার মাত্র পর্য্যবেসিত না হয়।

এমন সময় গিরি আবার আসিয়া ডাকিল, প্রভাত!—

প্রভাত কহিল, কি দিদি?

গিরি কহিল, বাইরে এতক্ষণ বসে আছো, এ তো ভাল করো নাই, আমি জানি ছেলে বেলা হ'তে তোমার বাইরের ঠাণ্ডায় থাকা সয় না।

প্রভাত উত্তর দিল,—না দিদি! আজকের এই দক্ষিণের বাতাস আমার বেশ লাগছে। গিরি ভাবিল—যা ভেবেছিলাম তাই হ'লো। তাহার মনে বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল যে, কেন সে প্রভাত ও লতিকাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিতে দিয়াছিল। বেদনায় তাহার বক্ষস্থল আলোড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু সে কি সান্ত্বনা দিবে? ছুটো একটা ধর্ম্মের কথা পাড়িয়া প্রভাতের মুখ দিয়া তাহারই সদর্থ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

প্রভাত উত্তর দিল বটে, কিন্তু তাহার বেশ মনঃপূত হইল না।

তখন গিরি প্রভাতকে শীঘ্র বাড়ী পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। মন্মথ না আসা পর্য্যন্ত তাহাকে আদৌ বাড়ী হইতে বাহির হইতে দিল না, এবং মন্মথ আসিলেই নানা উপদেশের মালা পরাইয়া দিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিল। যাইবার আগে প্রভাত কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন মন্মথবাবু?

মন্মথ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, কেন? তুমি কি কচি খোকাটি আছো, বুঝতে পাচ্চো না, ঘরে ষোল বছুরে পত্নী রেখে এসেছো।

প্রভাত হাসিয়া কহিল,—ষোল বছুরে হ'লে কি আজ দুরান্তরে হাওয়া খেতে বেড়ুতুম?

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, উঃ ভুল হ'য়েছিল, তখন তোর দাদাকে আমার একখানা চিঠি লিখলেই ঠিক হ'তো যে, আজ কালকার ইচড় পাকা ছেলেদের জন্য ইচড় পাকা বউও চাই, মানে তাদের তর সয় না। আমি তোর দিদিকে কত বৎসর বয়সে বিবাহ করেছিলাম জানিস্? তখন সবে মাত্র উনি নয় বৎসরের।

প্রভাত কোন উত্তর না দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মন্মথবাবু কহিলেন, যাই হোক বাড়ী যাবি, আমি ফুলধনু সেখানে রেখে এসেছি, কোন প্রকারে স্ত্রীর অমর্য্যাদা করিস না। আমাদের বাঙালী ঘরের মেয়ের মত মেয়ে কোথাও আছেরে পাগল! কতক গুলো ইংরাজী বইই পড়েছিস ত কেবল?

প্রভাত কহিল, তাতে কি হয়েছে তাই বলুন না!

মন্মথ কহিলেন, দেখেছিস্ কোথাও এমন স্বামীর জন্য তদ্গত-প্রাণা স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী, এমন স্বামী-সর্ব্বস্ব নারী জগতে আর কোনও দেশে আছে? নিতান্ত অধম দীন দুঃখীর ঘরেও স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা আর কোন দেশে হয় কি? সাধে কি কবি গেয়েছেন—

কোথা হেন শতদল বুকে করি পরিমল
থাকে পতি-মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে
বঙ্গবালা-মধু বিনা মধু কোথা কুসুমে?

প্রভাত আর বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

মন্মথ কহিলেন, লোকটা বদ্ধ পাগল। বঙ্গললনা যে কি জিনিষ, তাহা এখনও বুঝিল না, শুধু বই প'ড়লে কি হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদ হইতে বৈদ্যনাথ ও রাজমহল ঘুরিয়া যাইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দিন কতক পরে গিয়া প্রভাত বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

পিসিমা প্রভাতের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এলিরে বাপ্? আমি

এদ্দিন ধরে নয়নের মণি হারা হ'য়েছিলাম। বাড়ীতে আহার আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল।

বিন্দুবাসিনী কহিল, কি ঠাকুরপো এ'লে, মনটা এইবার বেশ স্থির হয়ে গেছে ত?

প্রভাত কহিল, সে খবরে প্রয়োজন তোমাদের?

বিন্দু কহিল, প্রয়োজন আছে বৈ কি, নইলে জিজ্ঞেস্‌বোই বা কেন?

প্রভাত কহিল, তবু শুনি কি প্রয়োজনটা?

বিন্দু মুখ টিপিয়া কহিল, সেখানকার লতিকাবালার সঙ্গে কেমন আলাপটা জমেছিল, তাই ব'লছিলাম।

প্রভাত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, লতিকা? লতিকাকে তোমরা কেমন ক'রে জানলে?

বিন্দু কহিল, হাঁ গো লতিকাই! তুমি মনে করেছ, লতিকাকে বুঝি তুমিই কেবল জানো, আর কেউ জানে না! তারা কাল যে আমাদের বাড়ী হ'য়ে স্বামী-স্ত্রীতে কেঁদুয়াখালী গেল।

প্রভাত সাগ্রহে কহিল, কি রকম শুনি?

বিন্দু কহিল, স্বামী তার চাকরী স্থানে যাচ্ছিলেন, তাই পত্নীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে যেতে, পথে দুর্য্যোগের দরুণ আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রভাত আবার জিজ্ঞাসিল,—কাল? এই গত কাল? তাহার বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল, কাল সে কেন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তাহা হইলে অন্ততঃ আর একবারও লতিকার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিত।

বিন্দু কহিল, হাঁ কালই তারা এসেছিলেন।

প্রভাত কহিল, আমি ত এর কিচ্ছু শুনি নাই, শুনি তারপর?

বিন্দু হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি? লতিকা তোমায় একটি বড় জিনিষ দান ক'রে গেছে, খুব গোপনে, রত্নটী কিন্তু আমার কাছেই জমা রেখে গেছে সে,—বুঝেছ!

প্রভাত কথাটা যেন ভাল বুঝিতে পারে নাই। এই ভাবে কহিল কি? ব্যাপারটা ত ভাল বুঝতে পার্লাম না!

বিন্দু কহিল, সে ত পার্বেই না। লতিকা তোমায় একটি রত্ন দান

ক'রে গেছে, আর ব'লে গেছে, এ লতিকার দত্ত ব'লে প্রভাতবাবু অবশ্য গ্রহণ কর্ব্বেনই।

প্রভাত অবাক হইয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু হাসিতে হাসিতে কহিল, ভয় নাই, ওগো সে রত্ন আমার কাছেই জমা আছে, মিলিয়ে দেব এখন! বলিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাত এ রহস্যের কিছু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না! ভাবিল, হয় ত লতিকা কোন অভিজ্ঞান তাহার জন্য রাখিয়া গিয়াছে, আবার ভাবিল তাও কি সম্ভব? নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে দোলাইতে লাগিল। একবার ভাবিল, না হয় বৌদিদিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা যাক,—সে রত্ন কি?

কিন্তু সামান্য একটা বিষয়ের জন্য মনের এই গাঢ় উত্তেজনা বাহিরে প্রকাশ ঠিক নয় বিবেচনা করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রের আহার শেষ হইলে বিন্দুবাসিনী কহিল, ঠাকুরপো! আজ আর তোমার বাইরে যাওয়া হবে না।

প্রভাত কহিল, কেন?

বিন্দু কহিল, দরকার আছে, বলিয়া চুপি চুপি কাছে গিয়া কহিল, মনে নাই সেই রত্নটী।

প্রভাত "আচ্ছা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চটিটা পায়ে দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। এদিকে পিসিমা বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন, রেখে দাও বউমা তোমার অন্য কাজ, আগে চারুকে নিয়ে প্রভাতের ঘরে দিয়ে এ'সো।

বিন্দু কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন পিসিমা; আমি ত নিয়ে যাবার জন্যই আয়োজন কচ্চি!

পিসিমা মালা জপিতে জপিতে কহিলেন, চারু লক্ষ্মীমা, কেঁদ না যেন আজ।

বিন্দু কহিল, কাঁদবে কেন, ওরও কি প্রাণ স্বামীর জন্য একটু আকুল হয় নাই? আর কি ও ছেলেমানুষটি আছে, ঠাকুরপোও আজ কিছুতে ঠেলতে পার্বে না। সেদিনকার সে মুখ হ'তে আজকের এ মুখের জৌলুষ ঢের বেড়ে গেছে। চারুর হাতে পানের ডিবাটি দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিন্দু উপরে একবারে প্রভাতের ঘরে উপস্থিত হইল।

চারু ঘরের মধ্যে প্রবেশিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিন্দু ডাকিল, এ'স চারু!

চারু এক পা অগ্রসর হইয়া আর পারিল না, স্বামীর বিনা আহ্বানে আর

কি করিয়া যাওয়া যায়, তাহার স্বভাব অভিমান গর্ব্বিত নারীত্বটা যেন লজ্জায় ও দুঃখে পাণ্ডুর হইয়া যাইতেছিল।

বিন্দু জোর করিয়া টানিয়া প্রভাতের হাত ও চারুর হাত একত্র করিয়া কহিল, এই দান বুঝেছ ঠাকুরপো! লতিকা এই রত্ন তোমায় দান ক'রে গেছে! আমরা ত তোমায় "এ" নেওয়াতে পারিনি, কিন্তু লতিকা গর্ব্ব ক'রে ব'লে গেছে, শুদ্ধ আমার খাতিরে প্রভাত এ দান—এই স্ত্রী-গ্রহণ কর্ব্বেনই।

প্রভাতের একবারে তাক লাগিয়া গেল। এমন ব্যাপার ত সে কল্পনাও করে নাই। বিন্দু কহিল, বাস্তবিক ঠাকুরপো এ সামান্য দান নয়। চেয়ে দেখ দেখি এ কি রত্ন?

চারুর অবগুণ্ঠনটা উন্মোচন করিয়া দিয়া কহিল—দেখ দেখি এই অশ্রু-ধোয়া মুখ, এ মুখ কখনও তোমার বিরুদ্ধে "না" ব'লতে পারে?

প্রভাত চকিতে একবার চারুর মুখখানা দেখিয়া লইল। ভাবিল তাই ত! আজ ত আর তাহাতে বালিকার সে কাতরতা নাই। তাহার মনে হইল, এইবার যেন তাহার দৃষ্টির উপর হইতে একটা কালো যবনিকা সরিয়া গেল। এত দিনে যেন শুভদৃষ্টি হইল।

নিজেকে অনেকটা আরাম বোধ করিয়া আর একবার প্রভাত চকিতে তাহার বালিকা স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া লইল। অবগুণ্ঠনের ভিতরে এক কমনীয়তাটুকু তাহার ভারি মধুর ঠেকিল।

বিন্দু কহিল, আজ হতে সম্পূর্ণ চারু তোমার হাতে প'ড়লো। এখন তুমি তাকে পায়ে ঠেল আর মাথায় রাখো! সত্যি! কি ব'লবো তোমায়; তুমি এলাহাবাদ গেলে চারুকে তোমার জন্য গোপনে কত চোকের জল ফেল্‌তে দেখেছি। ভেবোনা এ মিথ্যা, সত্যই তোমার জন্য ও কেঁদেছিল। সত্যই—!

প্রভাতের তখন ভিতরে যাহাই হইতে থাকুক, বাহিরে কিন্তু খুব খানিকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ কেঁদেছিল খুব কেঁদেছিল সত্যই, কিন্তু সে তার বাপের বাড়ীর জন্যই নিশ্চয়, আমার জন্য ত নয় ই। আমি তার কে?

এ কথায় চারু চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার বসনাঞ্চল ইতস্ততঃ সরিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দু বাধা দিয়া কহিল, ঠাকুরপো তুমি কি ছেলে মানুষের মত বকো,—তা ঠিক নাই, তুমি আর যাই বলো, তুমি তার কে, একথা কিছুতেই ব'লতে পার্বে

না! তুমি ত মেয়ে মানুষের মন জান না, তোমায় কেমন ক'রে বোঝাব ব'লো। তবু তুমি জেনে রেখো, যে মেয়েমানুষ তার বাপের বাড়ীর জন্য কাঁদতে পারে, স্বামীর জন্য সে আরও খুব বেশীই পারে, তাতে ভুলটী নাই। দরকার হ'লে নিজের প্রাণটাকেও অনায়াসে স্বামীর জন্য দিতে পারে।

প্রভাত "উত্তম" বলিয়া বৌদিদিকে বিদায় দিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে এই কয়মাসের মধ্যেই এমনভাবে বাড়িয়া উঠিবে, তাহা সে আদৌ ভাবে নাই। তাহার মুখে চোখে যেন একটা অপরূপ লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে; আগে যে শুধু সর্ব্বদা সরমে সঙ্কুচিত হইয়া লুকাইয়া রহিত, আজ সে বিকাশোন্মুখতার একটা পরিপূর্ণ আভাস লইয়া কম্পিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এখন একবার শুধু দক্ষিণ বায়ু বহিলেই হয়। যেন রূপার খাটে, রূপার মত ঝকঝকে বিছানায় রাজকন্যা রূপার কাঠিতে মৃত হইয়া আছে, এখন রাজপুত্র আসিয়া সোণার কাঠিতে জিয়াইয়া লইলেই হয়। প্রভাত আস্তে আস্তে চারুর অবগুণ্ঠনটা ঈষৎ টানিয়া ডাকিল, চারু!—

চারু বিছানার ধারটিতে অপরাধীটির মত বসিয়া পড়িল। একটা উত্তর দিবার সামর্থ্য তাহার কুলাইয়া উঠিল না।

আজ যদি প্রভাতের অন্তর দৃষ্টিটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইত, তবে দেখিত—চারুর গোপন হৃদয়তলে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য কি অগাধ আত্ম-বিসর্জ্জনের আয়োজনই স্তূপীভূত হইয়া আছে,—প্রভাত আবার ডাকিল "এসো চারু, তোমার হৃদয় এইবার আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি! তুমি খুবই কেঁদে ছিলে, না?

বালিকা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের সমস্ত ঘনীভূত অপরাধ-রাশি অশ্রু-জলে সিক্ত করিয়া স্বামী' চরণে ঢালিয়া দিল।

প্রভাতও আর স্থির থাকিতে পারিল না, অন্ততঃ লতিকার অনুরোধটাও বলিয়া তাহার চোকের অশ্রু মুছাইয়া দিল।

তারপর কি জানি কেন তাকে একটা আগ্রহে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া একটা চুম্বনও না করিয়া থাকিতে পারিল না।

চারু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল। আমি অপরাধী ব'লে তুমি কেন সে অপ-রাধ নিলে? তুমি কেন আমায় শুধরে দিলে না? আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, তুমি না শিখালে আমায় কে শিখাবে? তুমি কেন আমায় শিখালে না?—

প্রভাত চারুকে দুই ব্যগ্র বাহুতে বেষ্টন করিয়া কহিল, সে আমারি বুদ্ধির

দোষ চারু! আমিই বুঝি নাই যে ঘরের মধ্যেই তুমি আছো! আমার স্ত্রী—ভরসা—শান্তি! বৃথাই দূরে গিয়েছিলাম।

দূরের বাঁশী মিলনের গান গাহিয়া উঠিল।

সারারাত্রি ধরিয়া চারুর বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া প্রভাত ভাবিতে লাগিল, লতিকার দানের কথা। হঁা দান বটে! ইহাই মস্ত দান! সে আজ তাহার দৃষ্টি দান দিয়া চলিয়া গেছে! শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

কে তুমি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৫

যেতে হবে এ সংসার মায়ার আধার!
পথের সম্বল কি গো? বৃথা পরিজন!
নয়ন মুদিয়ে দেখ সকলি আঁধার
বিপদে সহায় হয় কে আছে এমন?

৬

এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র! কর্ম্ম মাত্র সার,
কর্ম্ম করি কর এবে পাথেয় সঞ্চয়!
মায়ায় আবৃত হ'য়ে থেকো না'ক আর,
অদৃষ্টের দাস জীব! সব মায়াময়!

৭

খাটিতেছ দিবানিশি ভূতের বেগার,
আমার আমার করি ব্যস্ত অনুক্ষণ!
কি আছে হেথায় তব! সকলি অসার—
এক নিত্য সত্য বস্তু ব্রহ্ম সনাতন!

৮

সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কর সর্ব্বসত্তারূপ,
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত সদানন্দময়!
এক নিত্য সত্য বস্তু ব্রহ্ম বিশ্বরূপ
"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" জানিও নিশ্চয়॥

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ সমাজদ্বার।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



জননীরূপে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি এবং যেরূপ ভাবে শিশুগণকে পালন করা উচিত, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্তও দিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিয়া পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না। তবে পূর্ব্ব অধ্যায়ের বর্ণনার জটিলতা অপনোদন করিয়া তাঁহাদের সহজ বোধ্য করিবার জন্য সেই কথাগুলিই এ অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এক কথা বারংবার বলায় ক্রমেই তিক্ত হইয়া পড়িতেছে, তবে অবস্থা-বিশেষে তিক্তরসও উপাদেয় হয় এবং উপকারেও আসে, সেই ভরসায় আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সহৃদয় পাঠক মহাশয় ও সহৃদয়া পাঠিকাঠাকুরাণী লেখকের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বালকবালিকাগণকে কিরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এ পরিচ্ছেদে তাহারই সমর্থন করিলাম। নিজেদের আদর্শ চরিত্রে শিশুদের চরিত্র গঠিত করিতে হইবে; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে নিজেদের চরিত্র গঠন করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশুগণ পিতা অপেক্ষা মাতার নিকট অধিক সময় যাপন করে, সুতরাং পিতার স্বভাব যে পরিমাণ ভাল হওয়া আবশ্যক, মাতার স্বভাব ততোধিক ভাল হওয়া উচিত। অবশ্য ভিন্নদেশীয়-গণের কথা বলিতেছি না, হিন্দুদিগের বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আয়া বা পালয়িত্রী রাখিয়া শিশু-সন্তান পালন করিবার প্রথা বড় একটা দেখা যায় না। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে ধনীদিগের গৃহে এরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত পরি-লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা অতি বিরল; গৃহিণীরা নিজেরাই সন্তান লালন পালন করিয়া থাকেন। বাল্যাবস্থায় জননীরাই শিক্ষয়িত্রী, শাসনকর্ত্রী ও মমতা-দায়িনী। এই তিনের সংযোগেই শিশু পালন করিতে হইবে। তাঁহারা পুত্র-কন্যাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবেন, আবশ্যক বিবেচনায় তাড়না

করিবেন, আবার স্নেহদানে তাহাদিগকে বৰ্দ্ধিত করিবেন। সন্তান কোনরূপ কুকর্ম্ম করিলে উপেক্ষা করা উচিত নহে, তদ্দণ্ডেই তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। এমন অনেক জননী আছেন, যাঁহারা অত্যধিক বাৎসল্য প্রযুক্ত সন্তানের দোষ উপেক্ষা করেন। কিন্তু তাহার ফল যে কিরূপ বিষময় হয়, তাহা তাঁহারা পরিণামে বুঝিতে পারেন এবং তখন সংশোধন করিবার উপায় বৰ্জ্জিত হইয়া হা হুতাশ করেন। ইহা কি আক্ষেপের কথা নয়? গোড়া কাটিয়া আগায় জল সেচন করিলে বৃক্ষ যেমন পুনর্জ্জীবিত হয় না, সেইরূপ বাল্যাবস্থায় সুশিক্ষা না দিয়া, পরিণত বয়সে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা সন্তানকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। আবার বৃক্ষটী রোপণ করিয়া ও তাঁহার মূলে সার দিয়া জলসেক না করিলে সে যেমন বলবান হয় না ও পরে আপনা হইতেই কুঞ্চিত হইয়া যায়, সেইরূপ শিশু-সন্তানের অপরিণত অবস্থাতেই জ্ঞানোপদেশ এবং সৎশিক্ষা দ্বারা লালন পালন না করিলে পরিণত অবস্থায় তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া অশেষ দোষের আকর হইয়া পড়ে। কাঁচা মৃৎপাত্রে দাগ কাটিয়া পোণে পুড়াইলেও যেমন সে দাগ লোপ পায় না, সেইরূপ শিশু-হৃদয়েও যে শিক্ষা অর্পণ করিবে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। সুতরাং জননী-রূপে প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই সন্তানদিগকে সাধ্যানুসারে সৎশিক্ষা, সদাচার, ধর্ম্মানুশীলন প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলিই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি সন্তানের দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল করাইতে বাসনা থাকে, যদি সন্তানের ব্যবহারে স্বয়ং সুখ ও সন্তোষ পাইতে ইচ্ছা কর, যদি পৃথিবীতে রত্নগর্ভা আখ্যা চাও, তবে সন্তানকে অতি বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষা প্রদান কর, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং আবশ্যক মত মৃদু তাড়না ও মমতাসূত্রে তাহাদিগকে প্রতিপালন কর। আদর্শ জীবনচরিত্র পাঠ করিয়া দেখ, তাঁহাদের জননীরা তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন এবং সেই দৃষ্টান্তে নিজেদের চরিত্র গঠিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

যখন সবই হইল, তখন বৃদ্ধাদিগেরও কর্ত্তব্য কি, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমার বিবেচনায় স্ত্রীলোকদিগের এই অবস্থাই প্রকৃত অবসর গ্রহণ করিবার অবস্থা। সুতরাং এ অবস্থায় যাহাদিগের সংসার তাহাদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, নিজেরা সাধ্যমত নির্লিপ্তভাবে পুত্র-পৌত্রাদির সহিত আমোদ আহ্লাদে ও ঈশ্বরারাধনায় সময় অতিবাহিত করিবেন। নির্লিপ্ত

থাকিতে বলিতেছি, কেননা তাহা না হইলে ঈশ্বর-চিন্তার পথ সরল হয় না। সংসার এরূপ মোহের আগার যে, ইহাতে জড়িত থাকিলে অন্য কোন দিকেই মনঃসংযোগ করা যায় না। বাল্যকাল হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত কেবল এই সংসারেই লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত পারত্রিকের জন্য ভগবচ্চিন্তার অবসর খুব কমই পাওয়া যায়, কিন্তু এই বৃদ্ধাবস্থাই ইহার জন্য খুব প্রশস্ত। আজীবন ত সংসার —সংসার করিয়া ঘুরিয়া আক্লান্ত হইয়াছি এবং সে স্থানের সুখও ত যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি হইয়াছে, তবে আর কেন, আরও সেই মায়ার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকি কেন? মোহের আবরণ উন্মোচন করিয়া এইবার এই শেষ দশায় পারত্রিকের মঙ্গল কামনায় সেই পরম মঙ্গলময়ের নামানুকীর্ত্তন করি না কেন? এইরূপ ভাবিয়াই এ অবস্থায় ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। তবে আমি ছাড়িলেও আমায় ছাড়ে কই? আমাকে সেই সংসারে থাকিয়াই যখন সময়োচিত কার্য্য করিতে হইবে, তখন সেস্থানেরও ঘাত-প্রতিঘাত কিয়ৎ পরিমাণে লাগিবেই। তাই বলিয়াছি যে, এ অবস্থায় সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে মনোযোগ না দিয়া এবং যাহাদের সংসার তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া নির্লিপ্তভাবে ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকাই উচিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্যের সমষ্টি।

পরিশিষ্টে আমি স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্ববর্ণিত চারিটী অবস্থাই একত্রীভূত করিয়া দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীর ইষ্টানিষ্ট আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। নারীজাতি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহারা চিরজীবনই পরাধীনা। স্বাধীন থাকিবার চেষ্টা করা বা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা করা তাহাদের ধৃষ্টতা মাত্র। ভগবান্ তাহাদিগের অদৃষ্টে যে সুখ লেখেন নাই, তাহার চেষ্টা না করিয়া অধীনতাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বাল্যে পিতামাতার অভাবে অন্য অভিভাবকের অধীন, যৌবনে স্বামীর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় স্বামী জীবিত থাকিলে তাঁহার নতুবা সন্তানের অধীন। ইহাই আমাদের সমাজনীতি এবং এই নীতির বলেই হিন্দুরমণী-সমাজ আজও জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। শুধু যে উদরান্নের জন্যই তাঁহারা পরাধীনা, তাহা নহে, লজ্জাই

যাহাদের ভূষণ, প্রকাশ্যভাবে সমাজের চক্ষে বাহির হইবার যাহাদের অধিকার নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও তাঁহারা পরাধীনা। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বাধীনভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন, সমাজের চক্ষে তাঁহারা নিন্দনীয় হন। তারপর স্ত্রীলোকই সংসারে লক্ষ্মী, স্ত্রীলোক লইয়াই সংসার, কারণ তাহারাই প্রকৃতিরূপিণী। অতএব যাহাদের লইয়া সংসার, তাহাদের সংসার মানাইয়া চলাই উচিত। যাহাতে সব দিক বজায় থাকে, সংসারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আরও কর্ত্তব্য,—যাহারা শান্তিময়ী, সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর পুরুষ যাহাদের আশ্রয়ে শান্তিলাভ করিতে আসেন, তাহাদের নিজেদের প্রশান্ত থাকা। মিতব্যয়িনী হওয়াও আর একটি কর্ত্তব্য। যে সংসারে স্ত্রীলোক অপব্যয়িনী সে সংসারের উন্নতি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমার ধারণায় উপরি-উক্ত দোষসমূহ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় পরিণাম। কারণ, তাঁহারা আজকাল যে পরিমাণ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহা জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্বল্পবুদ্ধি নারী বর্ণপরিচয়ের দুই এক পাতা পড়িতে শিখিয়া বা অতিকষ্টে অসংযুক্ত বর্ণ-বিন্যাসে এক আধ খানা চিঠি লিখিতে পারিলেই আপনাদিগকে খুব শিক্ষিতা বিবেচনা করেন। এদিকে আধ্যাত্মিকভাবে কোন শিক্ষাই না পাওয়ায় সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই প্রসব করেন। বলিয়াছি,—স্বল্প ব্যয়ে কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসেরও অভাব নাই, অতএব তাহা পাঠান্তে কেন তাঁহারা ক্লিওপেট্রা বা লাইটিঙ্গেল ভাবাপন্ন না হইবেন। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক পিতামাতারই কন্যাকে অতি বাল্যাবস্থা হইতেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত প্রাচ্য উপদেশদানে সুশিক্ষিতা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং পাশ্চাত্য রুচি-সম্পন্না ও সমবয়স্কাদিগের নিকট হইতে সাধ্যমত দূরে রাখাই উচিত। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তারিতভাবে বলিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতা প্রযুক্ত এই খানেই এ অধ্যায়ের যবনিকা নিক্ষেপ করিলাম। তত্রাপি আশা করি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা পাঠেই আমাদের বর্ত্তমান স্ত্রী-সমাজের চক্ষু ফুটিবে। লেখকের জীবন ত পূর্ব্ব হইতেই মরুভূমি হইয়াছে, তাহার আর উপকার বা অনিষ্ট কি? এক্ষণে সমালোচকের হাত এড়াইতে পারিলেই এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই।

শ্রীনবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হরিদ্বারে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্দ্দিকে বিশাল পর্ব্বত-বেষ্টিত উপত্যকা ভূমি হরিদ্বারে কেমন এক প্রকার ঝড়ের মতন বাতাস এক ঘেয়ে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দিনরাতই এক প্রকার হু হু শব্দ যাত্রীদিগের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেখানে গেলে প্রথম প্রথম মনে হয় যেন কোথায় বারোয়ারী বসিয়াছে, সেইখান হইতেই বুঝি এই কলরব কাণে আসিতেছে। যাঁহারা কখন পুরী গিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক মনে করিবেন, এটা যেন সেই তীর্থরাজ সমুদ্রের অবিরাম গর্জ্জন—তাঁহাদের কাণের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে বাঁদরের উৎপাত মথুরা বৃন্দাবন হইতে বড় কম নহে। মনে হয় মথুরা বৃন্দাবনের বাঁদরগণ অধিক বাঙ্গালী যাত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া যেরূপ বাঙ্গালী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ হিংসুক ও দুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিদ্বারের বাঁদরগণ বাঙ্গালীর সঙ্গ খুব কমই লাভ করিয়া থাকে ; কাযে কাযেই মথুরা বৃন্দাবনের বন্ধুগণের ন্যায় অতদূর পরিপক্ক হইয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা বঙ্গবাসী দিন দিন এতদুর বাবু হইয়া পড়িতেছি, কর্ম্মশক্তি হারাইয়া হিংসা ও ক্ষুদ্রতার গণ্ডিতে এমনভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি যে, আমাদের ন্যায় স্বার্থপর মনুষ্যজাতির সংস্পর্শে যে সকল জীব জন্তু পর্য্যন্ত আসিতেছে, তাহারাও যেন তাহাদের জাতীয় সদ্‌গুণ পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছে। একদিন বিজয় ভায়া পাণ্ডাদিগের তেতালার ছাদে বসিয়া নিরবিলে পত্র লিখিতেছিলেন। ভাল জুতা জোড়াটী খুলিয়া সম্মুখে দোয়াতের পাশে রাখিয়া দিয়াছেন, এমন সময় পিছু থেকে চুপি চুপি আসিয়া বাঁদর মহাশয় জুতা জোড়াটী লইয়া বেমালুম লম্বা দিলেন। বিজয় ত বেকুবের একশেষ। অনেক খাবার দেওয়া গেল, তবুও বাঁদর নামিয়া আসিল না। তখন আমরা জার্ম্মাণির বেলজিয়ম আক্রমণের অভিনয় করিয়া ফেলিলাম। তাড়া —কেবল তাড়া—প্রায় আধ ক্রোশ পর্য্যন্ত পাহাড়ের দিকে তাড়া করিয়া লইয়া গেলে, তখন বাঁদর মহাশয় জুতা ফেরত দিতে বাধ্য হইলেন। হরিদ্বার ঘুরিয়া আমাদিগের

জয়পুর অভিমুখে রওনা হইবার কথা কিন্তু হরিদ্বার (Station) নামিয়া দেখিলাম, Sideingএ আমাদের E I Railwayর Darbar Carriageর মতন রঙচুঙে ৫।৭ খান গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাড়ীতে আলোর জন্য Dynamo পর্য্যন্ত চলিতেছে। গাড়ীসংলগ্ন তাম্বুও বিস্তৃত, ঘন ঘন সঙ্গীন পাহারা পড়িতেছে। গাড়ীর গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জয়পুরি ধরণের মানুষ আঁকা রহিয়াছে। শুনিলাম জয়পুরের মহারাজা এই নূতন গাড়ী প্রস্তুত করিয়াই হরিদ্বার আসিয়াছেন, পরে জয়পুরে সংসার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাতু বাবুর (যিনি এক্ষণে জয়পুর ষ্টেটের অবৈতনিক জজ ও কাউন্‌সিলের মেম্বর) নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আজমীরের গবর্ণমেণ্টের লোকো আপিস হইতে মহারাজা ৪ লাখ টাকা খরচ করিয়া এই নূতন Broad Gauge Rail প্রস্তুত করিয়াছেন।

একদিন আমি মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া কুশাবর্ত্তের ঘাট ছাড়াইয়া ঠাকুর দেখাইতে দেখাইতে বরাবর গঙ্গার কিনারা দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখি বিচিকিচ্ছি, আওয়াজ করিয়া আমার বুকের কাছে এক সেপাই সঙ্গিন খাঁড়া করিয়া ধরিয়াছে, আমি ত অবাক, হৃৎকম্প উপস্থিত। তাহার কথা একটীও বুঝিতে পারিলাম না ; ঠিক এই সময় একজন বুড়া হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ শিবের মাথায় ফুল দূর্ব্বা দুধ ঢালিয়া ফিরিতেছিলেন, তিনিই মধ্যস্থ হইয়া গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ মহাশয় বলিলেন আপনি করিয়াছেন কি, এ যে জয়পুর মহারাজার অন্দর ! শুনিতেছেন না, অই সব রাণীদিগের গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে ? এটা যে অন্দরের পাহারা।

তখন আমার জ্ঞান হইল,বাস্তবিক লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হরিদ্বার সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এই প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ীতে মহারাজা রাণীপুত্র সমভিব্যাহারে বিরাজ করিতেছেন। অন্দরের অনেক স্থান ঝাঁপ, টাটি, চাঁচ প্রভৃতি দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু রমণীর কণ্ঠস্বরও শোনা যাইতে লাগিল ! জয়পুর গিয়া যখন মহারাজার অনেক রাণীর কথা শুনিতে লাগিলাম, তখন আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বারের রাজ-অন্দরের রমণীদিগের চেঁচামেচির কথা মনে পড়িতে লাগিল।

হরিদ্বারে আর একটী নূতন দেখিবার ও শিখিবার জিনিষ হইয়াছে, সেটী কনখলের সন্নিকট গুরুকুল আশ্রম। আমরা বড়ই হতভাগ্য যে, গুরুকুলের

প্রকাণ্ড মেলা আরম্ভ হইবার ৪ দিন পূর্ব্বেই আমাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বে হরিদ্বার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুমতে বেদ শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চ্চা করিবার জন্য ঋষিকুল নামে আর একটী শাস্ত্রীয় স্কুল হরিদ্বারে স্থাপিত হইয়াছে। গুরুকুল ও ঋষিকুলের পার্থক্য শেষকালে কিছু কিছু বলিব।

আমরা হরিদ্বারের ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রথম দিন ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে গিয়া দেখি দিব্যি নীল জল। গঙ্গার পূর্ব্ব পারে Electric কলের কুলি মজুর সব এপার হইতে হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইয়া যাইতেছে, বিচিত্র বিস্তৃত উপলখণ্ডগুলির উপর দিয়া ক্ষীণ ধারে তীব্র স্রোতে নীল জল বহিয়া চলিয়াছে। হিম জলে ডুব দিয়া যাত্রিগণ সূর্য্যের মিষ্টি কিরণ উপভোগ করিতেছে। গাভীগণ স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করকচ লবণখণ্ডগুলি অবলেহন করিতেছে। গঙ্গাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য পাঞ্জাবী যাত্রী তন্মনে ভাগবৎ পাঠ শ্রবণে আত্মহারা। হরিদ্বারের ঘাটে ঘাটে মাড়োয়ারি-গণ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য গাভীগণের উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের মতন এক একটী লবণের চাঙ্ রাখিয়া দিয়াছে, ষাঁড় ও গাভীগণ ইচ্ছামত দেব-সেবার ফুল বেলপাতাদি ভক্ষণ করিয়া, ঐ সমস্ত লবণস্তূপ আপন মনে অবলেহন করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে প্রবেশ করিতে এক অতিকায় বীর পুরুষের চেহারা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। ইনি একজন কোস্তান, কুস্তির পরিণাম বাতে পঙ্গু হইয়া এখানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। এ পলোয়ানটী বড় সোজা লোক নহে, গোলাম, কালু করিম ইহার শরীরের তুলনায় অনেক ছোট। কিঙ্কর সিং অপেক্ষাও ইহার অবয়ব দীর্ঘ ও ভয়াবহ বলিয়া অনুমান হইল।

হরিদ্বারের প্রথম দিন কত সুন্দর, হরিদ্বারের প্রথম সন্ধ্যা কত মধুর—আকাশে চাঁদের আলো পাহাড়ের মাথায় পড়িয়া, পাহাড়ের বনময় পাদদেশ আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। উপরে Light নিম্নে Shade, আর এই Shade Lightর প্রতিবিম্ব কিরণ-শুভ্র গঙ্গাবক্ষে বিদ্যমান। গঙ্গাতট শঙ্খ ঘণ্টা বেদগানে মুখরিত; আর এই মধুর চাঁদের আলোকে—মধুর কোলাহল-মুখর মধুর সন্ধ্যায় আগুল্ফনিমজ্জিতা মধুময়ী মনোরমা রমণীপুঞ্জ মধুর কণ্ঠে গঙ্গা কিনারায় গান গাইতেছে; আর সালপত্রে পুষ্পমালা-শোভিত ঘী'য়ের দীপ জ্বালিয়া ভাসাইয়া দিতেছে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্র এই সমস্ত দীপালোক

গঙ্গাবক্ষ হীরক খচিত করিয়া গানের সুরে তালে তালে নাচিতে নাচিতে যেন কোন এক অদূরদেশে ধর্ম্মগাথা গাহিবার জন্য সারি সারি বহিয়া চলিয়াছে।

হরিদ্বারের দ্বিতীয় মূর্ত্তি—প্রায় বছর গত হইতে চলিল, কবে দেখিয়াছি কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সে কথা ভুলিতে পারি নাই। দ্বিতীয় দিন আমরা হরিদ্বারের উত্তর পাহাড়ে বিল্বকেশ্বরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। অসংখ্য বেল বাগানের মধ্যে কএকটী দেব-দেবীর মন্দির আছে, বিল্বকেশ্বর শিবই সকলের শ্রেষ্ঠ। বসন্তকাল কচি কচি নব বিল্বপত্রের ছায়ায় সাদা ধপ্‌ধপে আঙ্গিনাটী দেখিতে অতীব মনোরম। আমাদের আগের বছর আমার বিশিষ্ট আত্মীয় জেমো মুর্শিদাবাদ জেমোকান্দীর রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় মহাশয় সপারিষদে পশ্চিম ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, ২।৩ মাস পরে তিনি তীর্থ-প্রত্যাগত হইয়াই দেশে কালগ্রাসে পতিত হন।

আমরা বিল্বকেশ্বরের চত্বরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ তাঁহার ও দলবলের সকলের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ রাজা গৃহে ফিরিলে এই সব স্থানের কত চিহ্ন আমরা উপহার পাইয়াছিলাম, তাঁহার নিকট এই সুদুর মেঘের দেশের কত নূতন কথা ঘরে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছিলাম; তিনি হরিদ্বার তীর্থের বড়ই যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজ আমরা বাঙ্গালা দেশ হইতে তাঁহার সেই প্রিয় দুর্গম পার্ব্বত্য তীর্থে আসিয়া তাঁহাদের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু এই স্বল্প এক বৎসরের মধ্যে সে রাজাও নাই; তাঁহার পারিষদ ও পরিচারক বর্গও ৩।৪ জন সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র মরিয়া যায়, তাহার হাতের লেখাটী পর্য্যন্তও কত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে!

একটি হাতের রেখার আয়ুর সহিত আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের আয়ুরও তুলনা হয় না। আর এই সঙ্কীর্ণ জীবন গর্ব্বে মারামারি কাটাকাটি করিয়া আমরা কত কাণ্ডই না করিয়া বসিতেছি! যে জীবন আঁখির পলকে মরিয়া যায়, সে ত চিরদিনই মৃত, এই মরা জীবন রক্ষা করিবার জন্য, বাবা কলেরায় জল জল করিয়া মরিতেছে, আর পুত্র জীবনের ভয়ে সরিয়া পড়িতেছে, স্বামী বসন্তে মরণের দ্বারে উপস্থিত, স্ত্রী কোন গতিকে দরজায় দাঁড়াইয়া তত্ত্ব করিয়াই বেমালুম পলাতক। কি অসামঞ্জস্য! মানুষ আধুনিক শিক্ষায় পশু হইতেও কি ভীষণ জানোয়ারে পরিণত হইতেছে! এই সব চিন্তা

করিতে করিতে বড়ই ভগ্ন হৃদয়ে বিল্বকেশ্বর পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম, যখন পাহাড়ে উঠি তখন বেলা ৩টা. কিছুদূর উপরে উঠিলে আমাদের চতুঃপার্শ্বে মাঘমাসের মতন কুয়াসা অনুভব হইতে লাগিল, দূরে দূরে জমাটবাঁধা কাল মেঘ পাহাড়ের গায় সামিয়ানার মতন ঝুলিতে লাগিল। পাণ্ডাঠাকুর বলিল, "মহাশয়! আর উঠিবেন না, সত্বরে নামুন,—মেঘ ক্রমশঃ জমিয়া উঠিল।" পাহাড়ে উঠিতে যত কষ্ট, নামিতে তার সিকি কষ্টও হয় না। চড়াইয়ে উঠিতে গেলে অনভ্যস্তের প্রতিপদে Heartর palpitation বাড়ে, Heart Fail করিতে থাকে, আর নামিবার সময় কে যেন জলের স্রোতের মতন ঠেলিয়া নামাইয়া দেয়, কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। আমরা অতি শীঘ্র নামিতে নামিতে কাল মেঘে পাহাড় ঢাকিয়া গেল, কোন্‌টী পাহাড়, কোন্‌টী আকাশ তাহার কোন পার্থক্য রহিল না। প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল, ফিস ফিস করিয়া বারিপাত হইতে লাগিল। মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও বজ্রাঘাতে সহরখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। আমরা ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের উপর কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার তেতালা বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সম্মুখে গঙ্গার পরপারে চণ্ডীপাহাড়টী যেন আগাগোড়া ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ ভৈরব মেঘ-মূর্ত্তিতে আমাদের চোখের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাণ্ডারা বলিল, এখানে মেঘ উঠিলে অধিক বারিপাত হয় না, বাতাস ও বজ্রাঘাত বেশী হইয়া থাকে, আমাদের দেশে কালমেঘে আকাশ ঢাকিলে আমরা দেখিতে পাই উর্দ্ধে, কত উর্দ্ধে মেঘপুঞ্জ ছুটাছুটী করিতেছে, যেখানে Horizen, আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমা, সেই খানেই দেখি মেঘ মাটিতে নামিয়াছে, মেঘে মাটিতে মিশামিশি হইয়া গিয়াছে; দূরে দূরে আকাশপ্রান্তে চিকুর হানিতেছে, বজ্রাঘাতে বক্ষ কম্পিত হইতেছে। আমরা কখনও পাতাল হ'তে বিজলী হাসিয়া স্বর্গে উঠা দেখিতে পাই না—চরণপ্রান্তে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া মাথার উপর নিভিয়া যাইতে দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে না, বুকের উপর বজ্র নির্ঘোষের গভীর আরাব আমরা কখনও শুনি নাই, আমরা যখন পাণ্ডাজীর তেতালা বারাণ্ডায় বসিলাম, তখন কোনটা আঁধার কোনটা মেঘ, কোনটা পাহাড় কোনটা ঘর, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; মনে হইতে লাগিল, আমরা যেন কোন মেঘ জাহাজের ক্যাবিনের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছি। আমাদের মেঘ-ক্যাবিনের চতুঃপার্শ্বে যেন বাসুকি সহস্র সহস্র বিদ্যুৎজিহ্বা বাহির করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই বন্ধ করিতেছে; আর সহস্র-ফণীর বিষের তাড়নে পৃথিবী যেন মুহুর্মুহু হুঙ্কার

দিয়া উঠিতেছে। আমরা দেখিতে লাগিলাম, গঙ্গার গহ্বর হইতে বিজলী হাসিয়া উঠিয়া আকাশ দিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে। আমরা যেন দেখিলাম, আমাদের গৃহের পাদদেশে বিদ্যুৎ উঠিয়া ছাদে গিয়া নিভিয়া যাইতেছে। আমাদের মনে হইতে লাগিল, যেন বুকে বসিয়া মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। আমরা যেন কোন Electiic তারের বেড়ায় ঘেরা রহিয়াছি, আমাদের চতুর্দ্দিকে Paintei এরLandscape view এর গাছপালা আঁকিবার তুলি টানার মতন বিদ্যুৎপুঞ্জ এঁকে-বেঁকে খেলা করিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের মনে হইতে লাগিল—আমরা বুঝি ঘোর পাতকী, তাই দেবের দেশে দেবদ্বারে আসিয়াছি বলিয়া, দেবতাদিগের কোপে পতিত হইলাম। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় ভূমিতে পাপী-তাপীর মৃত্যু হইলে পাছে স্থান-মাহাত্ম্য নষ্ট হয়. সেই কারণেই বুঝি বিভূতি-ভূষণ নীলকণ্ঠ শম্ভুনাথ আমাদিগকে জীবন্মৃত করিয়াও রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। যাই হউক, আমরা মেঘের দেশে মাথার উপর মেঘ-বজ্রের অদ্ভুত হুড়াহুড়ি দেখিয়া, ভীত-চকিত-স্তম্ভিত ও হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িলাম। বৈজ্ঞানিক বিজয় ভায়া এম, এ ক্লাসের Electricityর theory ভুলিয়া এই Practical action দেখিয়া মনে মনে কিছু ভাবিতেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের জমীদার মহাশয় রঞ্জনভায়া এই বিদ্যুতের ভীষণ প্রকোপ দেখিয়া মনে মনে তাঁহাদের কলিকাতার বাসার বিদ্যুতের পাখার উপর যে হাড়ে হাড়ে চটিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কারণ এই দুর্য্যোগে তিনি এমন ভীত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার বড় camera টীর ব্যাগ সমেত সমস্ত ভারই অবশেষে প্রায় আমাকে বহন করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থাকিবার বিশেষ সুবিধা বলিয়া আমরা ষ্টেসনের উপর কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ধর্ম্মশালার নির্জ্জন কক্ষ দুটী দখল করিয়া বসিয়াছিলাম। বাসায় মাতাঠাকুরাণী. বড় ভাজ ঠাকুরাণী ও চাকরটী ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, এই দুর্য্যোগে বিদেশে তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাখা নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনায়, দেবতার অস্ত্রযোগ সামান্য একটু কমিলেই আমরা বাতাস ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়া, ভীষণ অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড হইতে Station অভিমুখে ছুটিলাম। ভয়ে যে মানুষের বল বাড়ে তাহা এই আমার প্রথম পরীক্ষা হইল। আমরা নিরাশাসম্ভূত বল ভরসায় বাসার অমঙ্গল চিন্তা করিয়া, ক্ষণিক বিদ্যুতের সাহায্যে ক্যামেরা ঘাড়ে করিয়া

রাস্তা ধরিয়া ঠিক রানারের মতন ছুটিতে লাগিলাম। যে বিদ্যুতকে এত ভয় করিতেছিলাম, সেই আবার কিছুক্ষণ পরে আমাদের পথের সম্বল হইল। অবশ্য তিনি আর তখন হুহুঙ্কারে গগন বিদীর্ণ করিতেছিলেন না! আমরা তিন জনই ছুটি ক্যামেরার জিনিষপত্র ভাগ-বিলি করিয়া লইয়া ছুটিতেছিলাম। আমিই সকলের আগে যাইতেছিলাম। এক একবার বিদ্যুতের আলোকে সাদা পাথরের বাড়ী, বিস্তৃত সাদা পাথরের রাস্তা সবই যেন এক হইয়া একটী বিস্তীর্ণ বালুকাক্ষেত্র বলিয়া অনুমান হইতেছিল। পথ ভুল হইয়া যাইতেছিল। আমরা রাস্তার মধ্য পথ ধরিয়া এই ভাবে ছুটিতে ছুটিতে Post office পর্য্যন্ত আসিয়াছি, পথে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই, হঠাৎ যেন আমার মনে হইল, আমি বুঝি পথ ভুলিয়া কোন পাকা বাড়ীর দেওয়ালে গিয়া ঢু মারিলাম, আমার চোখ, মুখ, কপাল যেন ছুরিকাবিদ্ধ হইল, আমার সম্মুখে দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ার ন্যায় শব্দ করিয়া যেন একজন মানুষ 'যান গেলরে' বলিয়া ভূপতিত হইল।

ধাক্কা খাইয়া আমিও মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—রঞ্জন ভাই শীঘ্র এস খুন হইলাম। রঞ্জন ঠিক আমার পিছু পিছু আসিতেছিল, পিছু ফিরিয়া দেখি তাহার কোন সাড়া শব্দ নাই, একাকী বিষম প্রমাদ গণিলাম! একটু পরে দেখি রঞ্জন ও বিজয় দু'জনে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন বুঝিলাম, রঞ্জন ভায়া আমাদের পতনের শব্দে বিপদ বুঝিয়া বেমালুম পিছুপানে পাঁইতারা দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ বিজয়ের সাহসে পুনরায় এক সঙ্গে সঙ্গীর পরিণাম দেখিবার জন্য ফিরিতেছিলেন, যাহা হউক শেষে বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে পাইলাম, একটা মানুষ বেহুষ হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, আর এক বোঝা কাঠ তাহার মাথার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই পাহাড়িটাও পাহাড়ে কাঠ ভাঙ্গিতে গিয়া আমাদের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেবতার প্রকোপ একটু কমিলে সেও বোধ করি কাঠের বোঝা লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। এমত অবস্থায় আমার সহিত Collision, আমি ছুটিতেছিলাম বলিয়া বেগে তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িয়াছি, সে হঠাৎ ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া রাস্তার উপর চিৎপাত হইয়াছে, তাহার কাঠের বোঝার ৪।৫টী খোঁচা আমার কপাল চোখ ও গালে বিদ্ধ হইয়া রক্তস্রাব হইতেছে, তাহার কাঠের বোঝার আঘাতে আমার সমস্ত মুখ এমন ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল যে, সে সব চিহ্ন

বহুদিন বিদ্যমান ছিল, আমার সমস্ত মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছিল, চোখের পাতায় পর্য্যন্ত কাঠে খোঁচা ফুটিল, কিন্তু ভগবানের এমনই মহিমা যে অত অন্ধকারে, অত অতর্কিতে অমন সংঘর্ষে আমার চোখের ভিতর একটুকও আঘাত লাগিল না, কি আমি কাণা না হইয়া কি করিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম, ভাবিলে আত্মহারা হইয়া পড়ি; প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি পদবিক্ষেপে যে ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন বিন্দুমাত্র চলিবার উপায় আমাদের নাই বলিয়া, সেই ভগবানকে চিনিবার জন্য—সেই ভগবানকে বিশ্বাস করিবার জন্য কত যাত্রা—কত গান—কত কথকতা—কত শ্রুতি—কত শাস্ত্র—কত উপদেশ—কত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতেছে, তবু যেন মানুষ তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাঁহার নাম স্মরণ করিবার সাবকাশ পাইতেছে না, তাঁহাকে ভক্তি ভজন করিতে শিখিতেছে না, ইহা অপেক্ষা মানবের পশুত্ব আর কি হইতে পারে? বিজয় ভায়া আসিয়া বেগতিক দেখিয়া বলিয়া উঠিল—লোকটার ত এখনও জ্ঞান হইল না, শীঘ্র সরিয়া পড়ুন, আর শুশ্রূষার সময় নাই, শেষে নিজেদের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। রঞ্জন ভায়া বড় লোকের ছেলে, দৌড়াইতে বরাবরই নারাজ, কিন্তু এবার দেখিলাম, তাঁহার gullap এ বেশ চরণ চলিতে লাগিল, পলাইবার পথে তিনিই দেখিলাম সকলের অগ্রগামী, আমাদের ১০।১২ মিনিট আগে তিনি বাসায় পৌঁছিয়াছিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য, গঙ্গার উদ্দাম দৃশ্য! ৩।৪ দিন মেঘ বাতাসের সমান হুড়াহুড়ি চলিল। অনন্তর গঙ্গার ঘাটে গিয়া দেখি, এ হরিদ্বার আর সে হরিদ্বার নাই, গঙ্গার সে নীল জল নাই, বিচিত্র প্রস্তর খণ্ডগুলি আর গঙ্গাবক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া উঁকি মারিছে না, ব্রহ্মকুণ্ড হইতে চণ্ডী পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত এক হইয়া রাঙ্গা জল নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মুর পথে আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে শুঁড়িখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; সম্মুখে শুঁড়িখানা দেখিয়া তবু তাহার দুর্ব্বিসহ যাতনার কতকাংশ লাঘব হইল; সে মনে করিল, যে আজ দম্ ভরিয়া মদ্য পান করিয়া তবে গৃহে যাইবে, মত্ত অবস্থায় আর ভাবনায় তাহাকে ব্যাকুল করিতে পারিবে না; এইরূপ মনে করিয়া ভাবনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য মুর সাগ্রহে শুঁড়িখানায় প্রবেশ করিল ও শৌণ্ডিককে অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিছু অধিক মদ দিতে আদেশ করিল; হতভাগ্য এখনও জানে না যে, তাহার আসিবার পূর্ব্বেই ফ্রান্সিস শুঁড়িকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে; যাহা হউক দোকানরক্ষক মুরের আদেশে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া তাহাকে বলিল "দেখ মুর, তোমার আসিবার পূর্ব্বেই আমি তোমার সকল বিষয় অবগত হইয়াছি; আজ আর কিছু হইতেছে না, যে কয়দিন ধারে খাইয়াছ, প্রথমে তাহা শোধ করিয়া তাহার পর যত খাইতে চাহ নগদ দাম দিয়া খাইতে পার! ধারে খাইবার কথা এখন আপাততঃ ভুলিয়া যাও! কর্ম্মনাশা লোককে আমি ধারে মদ্য দিই না; এখন তোমার চাকুরী নাই কি করিয়া তুমি আমার দেনা পরিশোধ করিবে? আমি কি শেষে তোমার জন্য দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইব? তাহা হইবে না; পূর্ব্বের দেনা শোধ করিয়া এখন হইতে নগদ খাইতে থাক—ফেল কড়ি, খাও মদ তুমিতো আমার পর নও।"

শুঁড়ির মুখে এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া মুর একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল; সে জীবিত কি মৃত স্থির করিবার ক্ষমতা তাহার লোপ পাইল! তাহার দেহের সমস্ত বল কে যেন এক মুহূর্ত্তে সব হরণ করিল, যেন তাহার কথা কহিবার ক্ষমতাটুকুও নাই; মুরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অপরাপর মাতাল-গণ তাহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল; হতভাগ্য সকলের কাছে এইরূপ ঘৃণাস্পদ হইয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া লজ্জায়, ঘৃণায় ও অভিমানে ভগবানের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করিতে করিতে শুঁড়িখানা ত্যাগ করিয়া পথের ধারে একখানি বেঞ্চের উপর যেন জীবনী-শক্তি হীন হইয়া বসিয়া পড়িল।

কর্ম্মচ্যুত মুর এখন একটী ফার্দ্দিংএর জন্য পরের মুখাপেক্ষী ভিক্ষুক! তাহার এ ভিক্ষা কেন? কেবল পান-আশা পরিতৃপ্তির জন্য; সে এখন মদ্যের এতই বশীভূত হইয়াছে যে, পথের ধারে জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতেও তাহার লজ্জা বোধ হইল না; হায় অভাব! তোমার দংশন বড়ই তীব্র; মুরের মত মানুষের সাধ্য কি যে, তাহা সহ্য করে! কত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমার বশীভূত হইয়া নিত্য নিত্য কত শত ভীষণ কার্য্য অম্লান বদনে সঙ্ঘটিত করিতেছে; তুমি প্রয়োজন মত সবই করাইয়া লও—উচ্চ নীচ, মান অপমান—সু বা কু কিছুই তোমার পথে তিষ্ঠিতে পারে না। পানাসক্ত হতভাগ্য মুর কি করিয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে; তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিবে! সে পথে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহারই কাছে একটী ফার্দ্দিংএর জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ; হতভাগ্যের উপর দয়া-পরবশ হইয়া কেহই কিছু দিয়া গেল না; পরন্তু যাহারা মাতাল মুরকে জানিত তাহারা মুরের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রূপের সহিত তিরস্কার করিতে ও ভুলিল না।

ভিক্ষা করিয়াও কিছু মিলিল না, এদিকে রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া মুর, ভগ্নমনে অগত্যা গৃহের দিকে চলিল; এদিকে মেরী মুরের বিলম্ব দেখিয়া মনে মনে নানারূপ কুচিন্তার জল্পনা কল্পনা করিতেছে; একবার মনে করিতেছে, হয়তো শুঁড়ির দোকানে মদ খাইয়া পড়িয়া আছে, আবার মনে হইতেছে, হয়তো বা পথিমধ্যে মাতাল অবস্থায় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চালান গিয়াছে; দুধের বাছা চার্লস পিতার বিলম্বে যেন ক্রমেই আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ মেরীকে পিতার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া মেরীর উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিল; সন্তানের কাতরতায় হতভাগিনীর চক্ষে জল আসিল; সন্তান-বৎসলা জননী আপন মনোভাব অতি কষ্টে গোপন করিয়া সন্তানকে নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিল এবং মনে মনে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল; অবোধ সন্তানের পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তিতে শীঘ্রই মেরীর ধৈর্য্যবাধ ভাঙ্গিয়া গেল; দুই চক্ষের জল গণ্ডস্থল বহিয়া হৃদয় ভাসাইতে লাগিল, মেরী আর স্থির থাকিতে পারিল না; নন্দনকে বক্ষে লইয়া সদুঃখে রোদন করিতে লাগিল; একে পিতার আগমন-বিলম্ব হেতু শিশুর হৃদয় ত উদ্বেলিত হইয়াছিল, এখন আবার জননীর এবম্বিধ সদুঃখ রোদনে তাহার উদ্বেলিত ক্ষুদ্র হৃদয়

একেবারে আকুল হইয়া উঠিল; সে মাতার ক্রন্দনে একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; হায়! অবোধ বালক—সংসারের ভাল মন্দ কিছুই জানে না কিছুই বোঝে না; সে পিতামাতাকে পাইলেই খুসী হয়; পিতার অবর্ত্তমানে মাতার রোদনে সে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে! যাহা হউক সন্তানের একেবারে উচ্চ চীৎকারে মেরীর চমক ভাঙ্গিল, তাহার রোদনে যে সুকুমারমতি সন্তানের কোমল হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝিয়া মেরী তৎক্ষণাৎ রোদন সম্বরণ করিল এবং রোরুদ্যমান শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তাহাকে ভুলাইবার ছলে নানারূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, শিশুর ও আপন শোকাবেগ প্রশমিত করিতে লাগিল; শিশুটীও মাতার অবস্থান্তর বুঝিয়াও মাতার মিষ্ট মধুর সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ক্রন্দিত জননীর চোখের জল মুছাইয়া, তাহার মুখে হাসি ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছে. এই আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে অবিলম্বেই মাতৃবক্ষে নিদ্রিত হইল!

বালককে শয্যায় শোয়াইয়া মেরী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করযোড়ে কাতরে প্রার্থনা করিল, হে প্রভো! হে দয়াময়! হয় আমার স্বামীকে সৎপথে ফিরাও, আমার স্বামীকে সুমতি দাও, সংসারের প্রতি তাঁর মন আকর্ষণ কর, নতুবা আমায় শীঘ্রই মৃত্যু দাও! সংসার আমার বড়ই তিক্ত লাগিয়াছে—আর আমার কিছুই ভাল লাগে না।

মেরী শয্যা হইতে নামিয়াই ফিরিয়া দেখিল, মুর নির্ব্বাক অবস্থায় কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান; পুরুষ-পুঙ্গবের আর সে প্রতাপ নাই; যেন বিশ্বের ভাবনা তাহার মস্তকে আসিয়া পড়িয়াছে! মুরের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া, মেরী যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া, ভয়ে ও ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার কি হইয়াছে, আজ তোমার এভাব কেন? বল বল আমার বড়ই ভাবনা হইতেছে! এতক্ষণ তোমার জন্য কত কি ভাবিতেছিলাম—দুধের বাছা চার্লি তোমাকে দেখিতে না পাইয়া, এতক্ষণ কত কাঁদিতেছিল, আমি তাহাকে অনেক কষ্টে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়াছি।

মেরীর কথায় মুর বলিয়া উঠিল, মেরী! আর কি হইবে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; এখন নিশ্চিন্ত! খুব নিশ্চিন্ত! আজ আমার চাকুরী গিয়াছে; মেরী! আজ আমার চাকুরী গিয়াছে! আর আমি দাঁড়াইতে

পারিতেছি না—ঘরে কিছু থাকে তো খাইতে দাও! মুরের কথায় মেরীর মাথায় যেন বজ্রপাত হইল! মেরী কাঁদিতে লাগিল। মুর বলিল, মেরী, কাঁদিলে কি হইবে! এখন আমায় কিছু খাইতে দাও; ঘরে মদ আছে কি? মেরী বলিল, ঘরে কি কখন মদ আন যে থাকিবে! যাহা উপায় করিয়াছ তাহাত মদই খাইয়া উড়াইয়াছ! আর মদের নাম করিও না—ঐ মদেই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! ঘরে যা কিছু খাবার আছে খাও—মদটী পরিত্যাগ ক'রে দেখ দেখি, তোমার কত ভাল হয়! আবার তোমার সংসারের প্রতি মায়া পড়িবে—একবার নিজের সংসারের অভাব—নিজের স্ত্রী-পুত্রের দুর্দ্দশা ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি, দেখিবে মদ নিজেই তোমায় পরিত্যাগ করিবে। মদে তোমারও ঘৃণা জন্মিবে; মেরী, এই বলিয়া ঘরে যা কিছু আহার্য্য দ্রব্য ছিল, মুরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল; মেরী আজ মুরের মেজাজ অন্য দিন অপেক্ষা বিশেষ নত দেখিয়া ঠিক অবসর বুঝিয়া স্বামীকে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে; তাহার বাক্যগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী কিন্তু হৃদয়হীন মুরের অন্তঃকরণে মুহূর্ত্তমাত্রও স্থল পাইল কি না, কার্য্যতঃ তাহা শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে; যাহা হউক চির-ব্যথিতা স্বামিসোহাগ-বঞ্চিতা পতিব্রতা মেরীর হৃদয়ভার আজ অনেকটা লাঘব হইয়াছে। মুরের চাকুরী গিয়াছে, ইহাতে মেরীর মাথায় ভাবনায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মুরের অস্বাভাবিক ভাবান্তরে মেরীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আজ আশায় আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মেরী যাহা কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল, নিজের জন্য কিছুমাত্র না রাখিয়া সমস্তই মুরের সম্মুখে রাখিলে, ক্ষুৎপিপাসা-কাতর মুর আজ অতি শীঘ্র সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল; আরও কিছু আহার্য্য চাহিলে মেরী বলিল, দেখ যাহা কিছু তৈয়ারী করিয়াছিলাম, সমস্তই তোমাকে ধরিয়া দিয়াছি, এমন কি একটু দুধের বালকের জন্যও রাখি নাই; বাছা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিলে কি দিয়া তাহাকে ভুলাইব এমন পর্য্যন্ত আর কিছুই নাই, যাহা হউক, তুমি যে সমস্তই খাইয়া ফেলিলে তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি—আরও কিছু থাকিলে আজ তোমায় পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া আমার মনের আশা তৃপ্ত করিতাম, কিন্তু হায়, এমনই দুরদৃষ্ট যে আজ আর ঘরে কিছুই নাই। মুর কিন্তু মেরীর কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আহারটী বড় মন্দ হয় নাই, তবে ইহার উপর একবোতল মদ

হইলে বড় ভাল হইত ; মেরী, মদ না পাইলে আমি কিছুতেই বাঁচিতে পারিব না ; মদ আমাকে বড়ই আপনার করিয়া তুলিয়াছে, মদ না খাইলে যাহা কিছু আহার করিলাম, তাহার কিছুমাত্র হজম হইবে না। তোমার তৈয়ারী খাদ্য উদরস্থ হইয়া আজ বিষবৎ হইয়া উঠিবে। এক মদ বিহনে আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। মেরী সদুঃখে বলিল, হায়! আমি যে এত বলিলাম,—আমি যে আপন ও পুত্রের অংশ পর্য্যন্ত তোমায় খাওয়াইলাম, ইহাতেও তোমার তৃপ্তি বোধ হইল না? মদ না খাইয়া মানুষ কি থাকিতে পারে না, কই পূর্ব্বে ত তুমি মদের এত ভক্ত ছিলে না? আমার কথা শুন—মদের জন্য অত কাতর হইও না! মদ খাইলে মানুষ-প্রবৃত্তির লোপ পায়, মদ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে ; আমি দেখিতেছি, তুমি মদ খাও না —মদে তোমায় খাইয়াছে।

মেরীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় মুর বড় কিছু বাদানুবাদ করিল না, সে ভাবিল, যখন তাহার কাছে একটী ফার্দ্দিং পর্য্যন্ত নাই, তখন মদের আশা বড়ই অল্প ; যাহা হউক সে আজ চুপ করিয়া রহিল, ভাবিল, কাল যাহা হয় করিব, আমার মদ না হইলে চলিবেই না, একদিন আহার না করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু মদ না পাইলে আমার স্থির হইয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব। এদিকে মেরী আরও ভাবিতা হইল, সে মনে মনে ভাবিতেছে যে, স্বামীর যখন চাকুরী ছিল, তখন সে ঘরে এক ফার্দ্দিংও না দিয়া, আপনার মদের খরচেই সমস্ত মাহিনা ব্যয়িত করিয়াছে, এখন চাকুরী নাই, যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে মদ না খাইয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া ত বোধ হয় না। মদের জন্য আমাকে এখন বারংবার বিরক্ত এবং বিব্রত করিয়া তুলিবে, আমি দিনান্তে কায়িক পরিশ্রমে যৎসামান্য উপার্জ্জন করি, তাহাতে ত অতিকষ্টে দিনাতিপাত হয় মাত্র। এখন চাকুরীহীন স্বামীরই বা কি ক'রে মদের খরচ চালাই। এইরূপ ভাবনায় মেরীর প্রাণ বড় কাতর হইয়া উঠিল। কি করিয়া স্বামীর মন ফিরাইবে আপনার দুঃখ ঘুচাইবে, এই ভাবনাতেই আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল।

এইরূপে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মেরী অতিকষ্টে ধারধোর করিয়া স্বামীর মদের খরচ চালাইতেছে, কিন্তু এখন আর চলে না। মেরী একবেলা খাইয়াও পুত্রটীকে একবেলার খাবার দুইবেলা খাওয়াইয়াও তবু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। চাকুরী যাইবার পর হইতে মুরের মদ্যপান দ্বিগুণ-ভাবে বাড়ি-

য়াছে, সে মনে ভাবিয়াছে এ ত' এক রকম বেশ! চাকুরী না করিয়া বেশ ত সুখে আছি, তখন দিনান্তে এক বোতল খাইতাম, এখন দুই বোতল খাই-তেছি; গুণবতী পত্নী গতর খাটাইয়া, পয়সা রোজগার করিয়া আমাকে খাওয়াইতেছে, আমার আর এখন চাকুরীর চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি! পরের দাসত্ব না করিয়া এখন বেশ এক রকম সুখে আছি। দুষ্ট এই সার ভাবিয়া নির্ভাবনায় একমাস কাটাইয়া দিল।

আর চলে না—মেরী আর চালাইতে পারিল না। চারিদিকে দেনা হইয়া গেছে, মেরীর গুণে যাহারা তাহাকে ধার দিয়া সাহায্য করিত—নিতান্ত অভাবে যাহাদের দ্বারে সাহায্য-প্রত্যাশী হইয়া উপস্থিত হইলে মেরীকে প্রায় কখনই ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না, এখন মেরীর দৈনন্দিন অভাবে তাহারাও ভাগ্যক্রমে হাত গুটাইল। আহা! হতভাগিনী নিজে কায়িক পরিশ্রম-দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতে নিজে খাইবে—পুত্রটীকে খাওয়াইবে, না অস্থুরাধম স্বামীর অভাব পূরণ করিবে। মুর ক্রমে মদের পয়সার জন্য মেরীকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল; মেরী নীরবে সমস্তই সহ্য করে; কিন্তু প্রতিদিনই স্বামীর এই অমানুষোচিত ব্যবহার বৃদ্ধি পাও য়াতে সহ্যশীলা মেরীরও সহ্যের বহির্ভূত হইল। মেরী আজ স্পষ্টই বলিল যে, সে তাহার মদের খরচ যোগাইতে পারিবে না, সে নিজে আধপেট খাইয়া তাহার আহার যোগাইয়া থাকে, আহারের অভাবে স্নেহের পুত্তলি বালকের অবস্থা দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইহাতেও কি তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগে না!—ইহাতেও কি তাহার পান-আশা পরিবর্ত্তিত হয় না!—ইহাতেও কি তাহার মদ্যপানে ঘৃণা জন্মে না। মেরী আজ সহ্যের শেষ সীমায় উপনীতা হইয়া আরও বলিল, দেখ তোমার অত্যাচার—তোমার নির্য্যাতন সহ্য করিবার আর আমার ক্ষমতা নাই, এবারে তোমায় উচিত মত শিক্ষা দিবার জন্য আমায় বাধ্য হইয়া পুলিশের সাহায্য লইতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

মেরীর কথায় পাষণ্ড মুর আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, দুষ্ট মেরীর উপর নানারূপ কটু গালি বর্ষণ করিয়া, এমন কি প্রহার করিতেও বিরত হইল না। দুধের বাছা বালকটী পিতার—মাতার উপর এরূপ ব্যবহারে যারপর নাই ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া, পিতাকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, তাহাতে পিশাচ পুত্রটীকে ভূমিতলে নিক্ষেপ

করিয়া মেরীকে প্রহার করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দিল। মেরী অনন্যোপায় হইয়া পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুলিশের দিকে চলিল, ইত্যবসরে দুষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাহা কিছু পাইল লইয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীননিলাল সুর।

আধার ও আধেয়।

শক্তিকার ? যোগী কেবা ?
কে পারে কহিতে সূক্ষ্ম আপনার কথা
ধ্যান মাত্র ভ্রম বলি' জ্ঞান হয় সব,
মনে হয় ঘুচে যাক্ ব্যথা।
সুষুপ্তির মোহন আবেশে
শুনেছিনু একদিন অদ্ভুত সংবাদ,
নগণ্য দীপের আলো
দীপাধার সনে যেন করিছে বিবাদ।
বলে কিনা আলো হাসি'
'দীপাধার ! তুইত রে নিকৃষ্ট অধম
আমাকে বহন ক'রে
আধার লভিলি নাম সর্ব্বক্ষুদ্রতম।'
নম্র মৃদুস্বরে বলে দীপাধার—
'শুন ওহে দীপ-আলো ! হয়োনা গর্ব্বিত,
আমি আছি বলে তুমি
মিটি মিটি জ্বলে লোকে হও পরিচিত।
জগৎ আধারে থাকি'
উপহাস করে যদি কেহ এ জগতে।
অজ্ঞান অধম সেত
নিরাধার স্থান কভু পারে না চিনিতে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শিক্ষার দোষ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি আকুল-ক্রন্দনে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রভাতে ননির মাতা বাটীর বাহির হইলেন। সমস্ত রাত্রি ভীষণ ঝটিকাপ্রবাহে প্রকৃতি যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রভাতের শান্ত-দৃশ্যে পরিণত হয়, ননির মাতার অবস্থাও তদ্রূপ।

তিনি একবার বধূশূন্য বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন, সব শূন্য। বিজয়াদশমীর পরদিবস প্রভাতে যেমন চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য—উদাস—হাহাকার করে ; বধূশূন্য তাঁহার বাড়ী আ'জ তেমনই হাহাকার করিতেছে। রোদন-লোহিত চক্ষুতে আবার জল আসিল, আঁচলে সে জল মুছিতে মুছিতে তিনি প্রতিবাসিগণের দ্বারস্থ হইলেন।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশায়ক—সকলেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন, মুসলমানদিগের বাড়ী বাড়ী ফিরিলেন,—জনে জনের নিকটে মর্ম্মবাণী জানাইলেন, তাঁহারাও সকলে সমবেদনা জানাইতে ক্রুটী করিলেন না, তবে বধূর সন্ধানে সাহায্য বা কোন প্রকারে সহায়তা করা তাঁহারা যুক্তি-যুক্ত মনে করিলেন না। ননির মাতা কেবল মুখের সহায়তা পাইয়া সন্তুষ্টি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। রাস্তার ধারে—প্রস্ফুটিত কুসুমভারাবনত কদম্বৃক্ষতলে দুঃখ-চিন্তা-শোকভারাবনত হৃদয় লইয়া ননির মাতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই,—কি করিয়া বধূমাতার সাক্ষাৎ পাই! এ গ্রামের একটি মানুষও কি দুঃখীর সহায় নাই। হা ভগবান্;—না জানি আমার মা—আমার সরলা সতী বৌমার উপর পাষণ্ডগণ কি অত্যাচারই না করিয়াছে! মা কি আমার জীবন আর নারীজন্মের সার সতীত্ব লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিবে? মধুসূদন! তুমি দীনের সহায়—সতীর রক্ষক, তোমা বই আর কাহারও সাধ্য নাই যে, এ বিপদে রক্ষা করে!

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানের নাম করে—নির্ভর করিতে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারে না। পারে না বলিয়াই বোধ হয়, প্রত্যক্ষ সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে। ননির মাতাও নির্ভর করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া-

চিন্তিয়া পরিধানের শ্লথ বসন টানিয়া পরিয়া—মস্তকের আলু-থালু কেশপাশ টানিয়া বাঁধিয়া নাদকুঞ্জ গ্রামের পথ ধরিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িলেন। মাঠে তখন কৃষকেরা লাঙ্গল লইয়া ভূমি কর্ষণ করিতেছিল। কোথাও দলবদ্ধ হইয়া ধানের জমীতে নিড়ান দিতেছিল। কোথাও কোদালি করিয়া ভবিষ্যৎ শস্যের জন্য জমী প্রস্তুত করিতেছিল। রাখালেরা গরু লইয়া কেবল মাঠে আসিয়া প্রথম গোষ্ঠ গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সমস্ত মাঠে তখন রৌদ্র পড়িয়াছিল। ননির মা তাহাদিগের দিকে চাহিতে চাহিতে পথ বহিয়া চলিয়াছিলেন, -তাঁহার দুঃখ-ভার-ক্লিষ্ট চিত্তে এই উদয় হইতেছিল—জগতের সকলেরই জন্য শান্তি আছে,—সকলেই সুখ ও শান্তিতে গত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে উঠিয়াছে—সকলেরই যে যে ছিল, সে সে আছে! সকলেই ভরাবুকে হাসিমুখে আপন আপন কাজে নিযুক্ত হইয়াছে! কেবল আমি এই সুখের জগতে খালি বুকে হাহাকার লইয়া ফিরিতেছি! আর আমার বৌমা—কোন্ সর্ব্বনেশেদের হাতে পড়িয়া দুঃখের মর্ম্মান্তিক শক্তিশেলে ছট্‌ফট্ করিতেছে। হায়, আমাদের কোনও অশান্তি ছিল না,—শ্বাশুড়ী-বৌ'য়ে দুঃখের ভাত সুখ করিয়া খাইয়া অতি শান্তিতে দিন কাটাইতেছিলাম। যে দস্যু আমাদের এই সুখের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল—ভগবান্, তাহার বিচার তুমি করিও!

ক্রমে তিনি নাদকুঞ্জ গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাচরণ স্মৃতিভূষণের বাড়ী কোন্‌দিকে,—তাহা ননির মা অবগত ছিলেন না। একজন কৃষকবধূ মৃৎকলসী কক্ষে লইয়া বাবুদের 'শ্যাম-সায়রে' জল আনিতে যাইতেছিল, ননির মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা বাছা; শ্যামাচরণ স্মৃতিভূষণের বাড়ী কোন দিকে?"

কৃষকবধূ অচঞ্চল দৃষ্টিতে ননির মার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা; তিনি আপনার কে হন?"

ন-মা। কেউ হন না মা,—আমি বড় বিপদে পড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতেছি।

কৃ-ব। তাঁরও বড় বিপদ,—ঐ যে খেজুরগাছটা দেখ্‌ছেন, ঐ খেজুর-গাছের বাঁ পাশ দিয়ে চ'লে যান—একটু গেলেই সাম্‌নে একটা বেলগাছ দেখ্‌বেন—সেই বেলগাছওয়ালা বাড়ীই তাঁর।

ন-মা। তুমি বোলছিলে, তাঁর বড় বিপদ—কি বিপদ মা?

কৃ-ব। পরশু রাত্রে তাঁর বড় ছেলেটি মারা পড়েছে। আহা, ছেলেটি যেন সোণার কাত্তিক।

ননির মাতা চমকিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, যাহার আশায় তিনি এত পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন,—এই দুর্দ্দিনে—এই ঘোর বিপদ-তরঙ্গে যাহার আশ্রয় লইবেন বলিয়া বুক বাঁধিয়া আসিতেছিলেন,—সে আশা শূন্যে পরিণত হইল।

তিনি আর কোন কথা কহিলেন না,—কৃষকবধূর প্রদর্শিত পথে চলিয়া গেলেন। কৃষকবধূ পশ্চাৎ ফিরিয়া দুই একবার চাহিয়া দেখিল, সে ঠিক পথে গেল কি না। যখন দেখিল, ঠিক পথ ধরিয়াছে—তখন সে জল আনিতে চলিয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অশৌচে আপত্তি।

প্রশান্তমূর্ত্তি স্মৃতিভূষণঠাকুর বহির্ব্বাটীস্থ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে বসিয়া একজন লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট।

ননির মা স্মৃতিভূষণঠাকুরের নাম শুনিয়াছিলেন, কখনও চক্ষুতে দেখেন নাই। কিন্তু মস্তকে শিখা, দীর্ঘ দেহ ও প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিই স্মৃতিভূষণঠাকুর হইবেন। তিনি উঠিয়া সেই কুটীরের দাবায় বসিলেন।

স্মৃতিভূষণঠাকুর একবার মাত্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কোন কথা কহিলেন না। এরূপ অনেক লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া থাকে,—কেহ বিবাহ-অন্নপ্রাশনের দিন দেখাইতে আসে। কেহ কন্যা বা বধূর শ্বশুরবাড়ী বা বাপের বাড়ী যাইবার দিন দেখাইতে আসে। কেহ কেহ একাদশী কবে জানিতে আসে। কেহ কেহ বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা-পত্র লইতে আইসে। সুতরাং যাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাহার কথা শেষ করিয়া নবাগত স্ত্রীলোকটির সহিত কথা কহিবেন, স্থির করিলেন। ননির মাতারও অনেক কথা বলিবার আছে বলিয়া, পূর্ব্ব বক্তার প্রসঙ্গশেষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মনোযোগের সহিত উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের এইরূপ কথা হইতেছিল। স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"কি করিব ভাই, স্বীকার করি কি করিয়া! হইতে পারে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়—প্রমাণ প্রয়োগ দিতেও তাঁহারা ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু এ সকল প্রমাণ-প্রয়োগ এত দিন যে না ছিল তা' নয়, তবে এত দিন একমাস অশৌচ ব্যবহার করিয়া আসিলেন কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন, কেবল কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া নহে,—আমার বিশ্বাস, জাতি যত বড় হইবে—আচার ব্যবহার ও বৃত্তি যত উচ্চ হইবে, সমাজের ততই মঙ্গল হইবে"—

বাধা দিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"তবে স্মৃতিভূষণদা; আর আপত্তি করিয়া কাজ নাই,—স্বীকার করা যাক্—মিত্তিরদের বাড়ী শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাক্। তোমারও নিমন্ত্রণ হবে—তারা ব'লেছে, ডবল বিদেয়, আর ডবল সিদে দেবে।"

স্মৃতি। তা'ত দেবে ভায়া,—কিন্তু অশৌচ নেবে যে বার দিন। তের দিনে শ্রাদ্ধ করিবে ও দান দিবে—ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে—তাহা হইলে অশৌচান্ন ভোজন করা হইবে যে। এ ব্যবস্থা আমি কি করিয়া দিব?

বাঁড়ুয্যে। ভাল, আমার সঙ্গে তোমার তর্ক হোক্। অবশ্য আমি শাস্ত্র জানি না—যুক্তিও ত শাস্ত্র।

স্মৃতি। হাঁ—বল।

বাঁড়ুয্যে। এই তুমি বলিলে, জাতি যত উন্নত হইবে, সমাজের তত উন্নতি হইবে, তবে কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতেছে, তোমার তাহাতে আপত্তি কি?

স্মৃতি। প্রথমে ধর কায়স্থ প্রকৃত ক্ষত্রিয় কি না,—

বাঁড়ুয্যে। তোমার মত কি?

স্মৃতি। শাস্ত্রের কথা লইয়া কাজ নাই—ধর কায়স্থ ক্ষত্রিয়। কিন্তু মাসাশৌচ ব্যবহার হইতেছে কেন?

বাঁড়ুয্যে। হইতে পারে ভুলক্রমে।

স্মৃতি। কাহার ভুল?

বাঁড়ুয্যে। কায়স্থদিগের পিতৃ-পিতামহের।

স্মৃতি। ভাল,—পিতৃ-পিতামহের ভুল শোধরাইবার জন্যে ব্যস্ত হইবার এত শীঘ্র প্রয়োজন কি ছিল?

বাঁড়ুয্যে। অনর্থক একমাস কষ্ট করিবার আবশ্যকতাই বা কি?

স্মৃতি। এখনকার চেয়ে তখনকার লোক ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আচারবান্ ছিলেন।

তাঁহারা বুঝিলেন, যদিও অতীত কোনও কালে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমানে আচার ব্যবহার ও বৃত্তি সমুদায়ই শূদ্রবৎ হইয়াছে,—অতএব অশৌচও শূদ্রের ন্যায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বোধ হয়, তাই করিয়াছিলেন।

বাঁড়ুয্যে। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি যুদ্ধ—কিন্তু বর্ত্তমানে দেশ পরাধীন—সুতরাং সে বৃত্তি এখন পরিচালনার উপায় নাই, তাই তাঁহারা যুদ্ধ ছাড়িয়াছেন—অথবা তাঁহারা মসিজীবী ক্ষত্রিয়।

স্মৃতি। না গো—যুদ্ধই কেবল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। দেশের জন্য—দশের জন্য—পরের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন বা আশ্রিত জীবের জীবন রক্ষাই ক্ষত্রিয়-জীবনের সারব্রত বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এক সময় কৃত্তিকান্তে শনিগ্রহ রোহিণী ভেদ করিয়া গমন করিবেন, এবং সেই জন্য দেশে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি হইবে। দৈবজ্ঞ-মুখে এই বারতা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয় দশরথ বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, শনির প্রকোপ হইতে যাহাতে প্রজাগণ রক্ষা পায়, তাহার উপায় করুন। তাঁহারা বলিলেন,—না, তাহা হইবার নহে। ইহার ফল অনিবার্য্য। তখন দশরথ অনন্যোপায় হইয়া নিজের বিপদ লক্ষ্য না করিয়া, অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া শনির সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। যুদ্ধে জয়ীও হইলেন। শনি তাঁহার যুদ্ধবিদ্যার অপূর্ব্ব শক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া বলিলেন—বর গ্রহণ কর। দশরথ বলিলেন,—"অন্য বর চাহি না প্রভু; তোমার কুদৃষ্টি হইতে যাহাতে জগত্রয় রক্ষা পায়, তাহাই কর। জগতের হিতই, আমার হিত।"

এইরূপ প্রাণই ক্ষত্রিয়ের প্রাণ। হইতে পারে, জজ্ সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতির প্রাণ এইরূপ,—তাঁহারা দেশের সেবায়—দশের সেবায় নিযুক্ত—তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে পারেন,—দ্বাদশ দিনে তাঁহাদের অশৌচ যাইতে পারে—কেন না, তাঁহারা নিত্য পবিত্র। কিন্তু এই যে ক্রূরমতি অনার্য্য-স্বভাব শূদ্রবৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, ইহাদের অশৌচ দ্বাদশ দিনে যায় কি করিয়া? আমি বলি কি, আগে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়রূপে প্রস্তুত করিয়া তারপরে ক্ষত্রিয়াচার ধরিলে ভাল হয়। জাতির উন্নতি ও অবনতি আছে,—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বাঁড়ুয্যে। কথা কিন্তু গায়ে পড়ে।

স্মৃতি। সে কি প্রকার ভায়া?

বাঁড়ুয্যে। যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্রাচার বশতঃ একমাস অশৌচ

ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তবে অকার্য্য কুশল এখনকার ব্রাহ্মণ একমাস অশৌচ-ভোগী না হইবে কেন ?

স্মৃতি। শুধু অশৌচভোগী কি ভায়া, আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তবে অনেক ব্রাহ্মণ-নামধারী কদাচারী ব্রাহ্মণকে পৈতাহীন করিয়া ম্লেচ্ছমধ্যে পরিগণিত করাইয়া দিতাম। আমার বিশ্বাস, সমাজের জাতিগত এইরূপ উন্নতি ও অবনতি না থাকাতেই হিন্দুসমাজের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণের জীবের আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিবারণই কার্য্য ছিল, তাহারাই এখন আধ্যাত্মিক গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত। ভায়া, হিন্দু সমাজের নিয়ম ছিল কি জান,—ব্রাহ্মণ সারা বিশ্বের জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবে—আপনার তপোবল দিয়া জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মের অমৃত-ধারা বহাইবে। আর ক্ষত্রিয় বিপন্নের রক্ষা করিবে—আশ্রিতের প্রতিপালন করিবে—আর্ত্তের সেবা করিবে। বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য করিয়া আপন আপন দেশে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করিবে। শূদ্র ঐ সকল কার্য্যে ঐ তিন জাতির সহকারী হইবে। চাকুরী করিবে। এখন সকলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যত্বের দাবি করিতেছে, করুক—উন্নত হউক,—কিন্তু আচারে উন্নতি করিবে না—প্রাণে উন্নতি করিবে না—বৃত্তির প্রসারণ করিবে না। কেবল যাহা ক্রূরতা—আর আত্ম-কলহ, তাহাই জড়াইয়া আনিয়া সমাজে গোলযোগ বাধাইবে।

বাঁড়ুযো। তবে কি নিম্নজাতি উচ্চ-জাতিতে পরিণত হইতে পারে ?

স্মৃতি। হাঁ, তা পারে। বিষ্ণুপুরাণে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে—অন্যত্রও আছে।

বাঁড়ুয্যে। যাক্—অত আলোচনা করিয়া এখন আর কি হইবে। এখন মিত্তিরদের বাড়ীর নিমন্ত্রণের কি ?

স্মৃতি। আমি ত ভায়া, দ্বাদশ দিন অশৌচগ্রহণকারী কায়স্থের নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত। কিছুতেই পারিব না।

বাঁড়ুয্যে। দয়ালমিত্তির কা'ল বলিতেছিল,—স্মৃতিভূষণ ঠাকুর যদি আমাদের প্রতি এমন অসদয় ব্যবহার না করিতেন, তবে কি আর ওঁর ছেলেটি মারা পড়িত ?

স্মৃতি। ছেলে মারা পড়ার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ?

বাঁড়ুয্যে। দয়াল মিত্রের জামাই বড় ডাক্তার—আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে পারিতেন।

স্মৃতি। দয়াল মিত্রের জামাই যাহাকে চিকিৎসা করে, সে কি মরেই না? আর আমার বিবেক ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দিলে যদি ছেলে না বাঁচে—না বাঁচুক। ব্রাহ্মণ হইয়া বিবেক ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে কেহই পারে না।

বাঁড়ুয্যে। তবে কি করা যাইবে?

স্মৃতি। কি করিবে? আমি কখনই তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিব না।

বাঁড়ুয্যে। তাহা হইলে কেহই যাইবে না। সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছে।

স্মৃতি। ভালই—যাওয়াও উচিত নহে।

তখন বাঁড়ুয্যেমহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সময় বাড়ীর মধ্যে সমবেত ক্রন্দনের রোল উঠিল।

ননির মাতা করুণ-বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার পুত্র মারা পড়িয়াছেন শুনিয়াছি, এখন বুঝি বাড়ীতে কোন আত্মীয়া আসিলেন?"

স্মৃতিভূষণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকোচ্ছ্বাসিত কাতর স্বরে বলিলেন,—"হাঁ, আমার এক শ্যালিকার আসিবার কথা ছিল, তিনিই বুঝি আসিলেন।"

ন-মা। আমার অদৃষ্ট বশতঃই আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—আমি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম।

"ব'স আমি আস্‌ছি"—বড় কাতর ও উদাসভাবে এই কথা বলিয়া স্মৃতিভূষণ মহাশয় বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ননির মাতা তারপরে অনেকক্ষণ সেখানে একা বসিয়া বসিয়া বোমার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখে মোহে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আর বসিয়া কালক্ষেপ করা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—স্মৃতিভূষণ ঠাকুর যে প্রকার বিপন্ন ও পুত্রশোকাতুর—ইঁহার পরিবারবর্গ যে প্রকার শোকাচ্ছন্ন,—তাহাতে যে ইঁহার দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যাইবে, তাহার আশা নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ করিয়া কাজ নাই;—তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন। আবার মনে করিলেন, যখন আসিয়াছি, তখন কথাটা স্মৃতিভূষণ ঠাকুরকে একবার জানাইয়া যাওয়া ভাল। কিন্তু তাঁহার বহিরাগমনের শীঘ্র সম্ভাবনা নাই,—বুঝিয়া ননির মা বাটীর মধ্যেই গমন করিলেন।

তখন ক্রন্দন-রোল থামিয়া গিয়াছিল, এবং সমবেত সকলে দাবায় বসিয়া ছেলে যে প্রকারে মারা গিয়াছে, সে যে প্রকার সুশীল, শান্ত ও গুণবান্ ছিল, এবং ভবিষ্যতে সে, যে প্রকার হইতে পারিত; তাহারই বর্ণনা-রূপ শোক-কাহিনীর আলোচনা হইতেছিল। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ও সেই স্থানে ছিলেন; কাজেই ননির মাতা ম্লান-বিষণ্ণ মুখে সেখানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

তুমি এস।

আজি দীর্ঘ-বিরহ অবসানে,
বারেক তুমি এস!
এই পরিত্যক্ত অশ্রু-সিক্ত
ভাঙ্গা হিয়া পরে ব'স?
আমি তোমারি দরশ লাগিয়া,
(কত) বরষ বরষ জাগিয়া,
আমি চেয়ে থাকি শুধু তোমা-পানে সখা,
তোমারি মিলন মাগিয়া,
আমি জানি না কিছু তোমা বিনা আর
তুমি মোর সরবস্ব।
আমি তোমারি লাগি এ দীরঘ নিশি,
শূন্য-পরাণে জাগি,
কত নিদাঘের জ্বালা সহি এ হৃদয়ে,
তোমারি প্রেম লাগি,
শুধু তোমারি দরশ পিয়াসায়,
(বুকে) শ্রাবণের ধারা ব'য়ে যায়,
সে যে খেলে তাণ্ডব জীমূত-মন্দ্র,
ক্ষণপ্রভা-আশা নিরাশায়,
আমি সহি নিতি কত শিশির-সম্পাত,
তোমারি স্মৃতি লাগি।

তুমি ভেঙ্গে হিয়া খানি গিয়াছ যে দিন,
ফেলে সে মরু-মাঝারে,
গেছে অভিমানে পিক নীরবে ভ্রমরা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাতরে ;
গেছে শুকায়ে ফুলের হাসিটী,
(চির) নীরব প্রাণের বাঁশীটী,
গেছে আশা-রাশি ভাঙ্গি নিঠুর মলয়া,
উধাও—দিগন্তে মিশিয়া,
আমি চাহি তোমা-পানে, তোমারি ধেয়ানে,
বেয়াকুলে আছি বসিয়া।

তুমি এস, পুনঃ তায় যেখানে যা সাজে,
সাজাও দিয়ে তা' মধুরে,
এস, নিরমল নভে হাসাতে তারারে,
বিতরিতে সুধা বিধুরে ;
এস, শ্যাম-পত্র-কুঞ্জে,
(এস) বিকসিত ফুল-পুঞ্জে,
এস, শ্যামল নব শষ্পদলে
তরুণারুণ রঙ্গে,—
যেন ভূষিতা স্মিতা স্বপ্নময়ী বালা,
শত হীরক-হারে।

তুমি এস, সখা এস, আজি এ প্রাণে,
রেখেছি জ্যোছনা বিছায়ে,
আমি ফুলের হাসিটী রেখেছি কুড়ায়ে,
ব্যজনীতে ধীর মলয়ে ;
আজি গাহিবে পাপিয়া প্রেম গান,
(দূর) আকাশের গায়ে তুলি তান,
আমি সীমাহীন পথে মুক্ত এ প্রাণ,
ঢেলে দেব, যাবে জ্বালা এ,
আজি 'তুমি' 'আমি' আর র'বনা,—চির—
দুঁহে দুঁহু যাব মিশায়ে।

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন



অবসরের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল,—সবে আর একমাস মাত্র বাকি। শ্রাবণের সংখ্যা প্রকাশ হইলেই একাদশ ভাগ পূর্ণ হয়। এই একাদশ বর্ষে অবসরের ভাগ্যে বহু পরিবর্ত্তন – বহু জটিল-জঞ্জাল-যন্ত্রণা— বহু কলহ-বিবাদের বিষাদ-কালিমা লিপ্ত হইয়াছে। এমন দুর্দ্দিন বুঝি অবসরের কখনও আসে নাই। যাঁহারা অবসরের চিরহিতৈষী—যাঁহারা অবসরের সুখে দুঃখে চিরসহায়— সেই গ্রাহক লেখক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ সে সমস্ত কথা—সমস্ত বারতা হয় ত জানিতে পারেন নাই; তাই এস্থলে তাহার সংক্ষেপমর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি।

অবসরের প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ৺নবকুমার দত্ত মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে, তদীয় পুত্র সুরেণচণ্ডী দত্ত অবসর মাসিক পত্রের সম্পাদন-ভার ও বিস্তৃত কারবার এবং প্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। অপরিণত-বয়স্ক সুরেণচণ্ডী কেবল কাজ-কর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া—কাজ-কর্ম্ম গুছাইয়া লইয়া সাধারণের প্রীতি-ভাজন ও সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া লইতেছিলেন, এমন সময় কালের আহ্বানে পরলোকবাসী হইলেন। সব পড়িয়া রহিল,—সাজান বাগান অরণ্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। তখন নবকুমার বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় বিনা অর্থলাভে— সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইয়া—কেবল অগ্রজের প্রতিষ্ঠিত অবসর ও অবসর-সম্পর্কিত প্রেসাদি বিনষ্ট হইবার ভয়ে ভীত হইয়া, নিজ বিষয়-কর্ম্মের বিপুল ভারের মধ্যেও এ-ভার গ্রহণ করিলেন এবং অবসরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না। সুরেণের মৃত্যুর শ্মশান-ধূম-গন্ধ বিদূরিত হইতে না হইতেই নিজ বুদ্ধি-বশেই হউক, আর সুলোক বা কুলোকদিগের সৎ বা অসৎ পরামর্শের উত্তেজনা-বলেই হউক, সুরেণের স্ত্রী তাঁহার মাতার সঙ্গে মিশিয়া পুলিসকোর্টে ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। সুরেণচণ্ডীর শ্বাশুড়ী পাল্কী করিয়া হাইকোর্টে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আশা, সুরেণচণ্ডীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাব-ধায়িকা হইবেন—জানি না, অবসরের সম্পাদক হইবেন বলিয়া মনে সাধ

ছিল কি না! তবে লালবিহারীবাবু সম্পাদক হইয়াছেন বলিয়া কোর্টে দোষারোপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হাইকোর্টে ও পুলিসকোর্টে ভীষণ মোকদ্দমা চলিতে লাগিল—মোকদ্দমার আগুন 'দাউ দাউ' জ্বলিয়া সুরেণ-চণ্ডী দত্তের সমস্ত সম্পত্তি ও অবসর বিদগ্ধ করিয়া তুলিবার উপক্রম করিল। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণ আশঙ্কা করিলেন—সব গেল;—৺নবকুমার দত্তের রক্তার্জ্জিত সম্পত্তি ও সাহিত্য-ক্ষেত্র পুড়িয়া খাক্ হইল। গত কার্ত্তিক মাস হইতে এযাবৎকাল এইরূপই চলিতেছিল।

গত আষাঢ় মাসে সুরেণের স্ত্রী সুরেণের পূজনীয় পিতৃব্য ও সুরেণের পরম-পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর (অর্থাৎ খুড়শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর) বিরুদ্ধে মাননীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, তাহা ডিসমিস হইয়া গেল এবং মাননীয় হাইকোর্টের মাননীয় সদাশয় বিচারপতি অনারেবল মিঃ জষ্টিস্ আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় সুরেণচণ্ডী দত্তের শ্বাশুড়ীর আবেদন ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে অবৈধ বলিয়াই হউক কিম্বা পুরুষের সহিত পাল্লায় পরাজিত হইবেন বলিয়াই হউক, তাঁহার সাধ অপূর্ণ রাখিলেন। আবার লালবিহারী বাবুর বিপক্ষে এত জঞ্জাল-জাল জড়াইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি দিন দিন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারেন ভাবিয়াই হউক কিম্বা অপরবিধ কারণেই হউক—উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া লালবিহারীবাবুর পক্ষীয় উকীল এটর্ণী সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণী-অ্যাট্-ল মহাশয়কে এডমিনষ্ট্রেটার নিযুক্ত করিলেন। যতদিন সুরেণচণ্ডী দত্তের স্ত্রী সাবালিকা না হইবেন, ততদিন শরৎবাবু তাঁহার অবসরে অবসর, অবসর-প্রেস ও অবসর পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধান ও সমস্ত কার্য্য করিবেন। সমস্ত দেনা-পাওনা-দায়িত্ব এখন তাঁহারই।

তারপরে অবসরের হিতৈষিগণের অনুরোধে এবং উক্ত উভয় পক্ষের সম্মতি-ক্রমে শরৎবাবুই অবসর-সম্পাদনের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যে তিনি কোনরূপ বেতনাদি গ্রহণ করিবেন না। অবৈতনিক (অনারারি) ভাবেই কার্য্য করিবেন।

অতএব এই এক বৎসর কিরূপভাবে কার্য্য হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই আপদ-বিপদে অবসর সম্পাদনে ও প্রকাশে নানাবিধ ক্রটী ঘটিয়া যাইবার সম্ভব। ভরসা করি, অনিচ্ছাকৃত ও দুর্ঘটনা-সম্ভূত গতবৎসরের ক্রটী-অপরাধ মার্জ্জনা করিতে কেহই কৃপণ হইবেন না।

অবসরের আগামী বর্ষে—অর্থাৎ দ্বাদশভাগ হইতে অবসরের সম্পাদক হইলেন, হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল-এটর্ণী-উচ্চশিক্ষিত জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়। ইঁহার সম্পাদনে অবসর যে অপূর্ব্ব গৌরব ও উন্নত-শ্রী লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে! তত্ত্বাবধায়ক ইনি এবং প্রকাশ-ভারও ইঁহার উপর—কাজেই এরূপ কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার পরিচালন ও পরিদর্শনে নিশ্চয়ই ক্রটী-বাহুল্য ঘটিবে না বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এবার উপহারের বন্দোবস্তও বাহুল্যভাবে ও জন-মন-বিমোহনরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তবে এমাসে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারা গেল না, কেন না, এখনও সব দিক্ ঠিক হয় নাই। আগামী শ্রাবণের সংখ্যায় উপহারের পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইবে।

আষাঢ় ও শ্রাবণের সংখ্যা যদিও শরৎ বাবুর সম্পাদনে প্রকাশ হইবে, তথাপি তাঁহার নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ বা রুচি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচিত হইবে না, কারণ যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে গিয়াছে, তাহার পরভাগ শেষ করা হইবে। ভাদ্রমাস হইতে—নূতন বর্ষে—নবীন সম্পাদকের নির্ব্বাচিত নব নব প্রবন্ধে অবসর সজ্জিত হইবে।

ভরসা করি, অবসরের পুরাতন গ্রাহক, লেখক পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ পূর্ব্বের মতই অবসর পরিচালনে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

"আরও।"



আর' আলো, আর' প্রেম, আর' আশা ভরসা।
আর' আর' ক'রে মোর বেড়ে গেল পিপাসা॥
দিনে দিনে পলে পলে আশার নেশায়।
"আর" কি যাবে না ছেড়ে এ জীবনে হায়॥
"আরও—আরও" হায়! কত দূরে শেষ তোর।
অনন্ত এ মহানিশা হবে না কি কভু ভোর॥

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক সংবাদ।

নদিয়া-শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অশীতিবর্ষ বয়সে গত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ রবিবারে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত,—তাঁহার প্রণীত অনুবাদিত ও সঙ্কলিত—কাব্যদর্পণ, বাসবদত্তা, সীতাহরণ, চারুগাথা, শৈবলিনী, রত্নযুগল ও গোবিন্দদাসের কড়চা নামক পুস্তকগুলি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ইন্দুপ্রকাশ ১লা মে আমেরিকার নিউইয়র্ক হইতে লুসিটেনিয়া জাহাজে লণ্ডন যাইতেছিলেন, ৭ই মে আয়র্লণ্ডের উপকূলে জর্ম্মণের টর্পিডোর আঘাতে সমুদ্রগর্ভে লুসিটেনিয়া নিমজ্জিত হয়,—সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীবাবুর হৃদয়-নিধিও অতল জলধি-তলে ডুবিয়া যায়। চণ্ডীবাবুকে এই পুত্রশোক-বহ্নিতে শ্রীভগবান্ শান্তি-বারি দান করুন।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর প্রণীত "শুকদেব" গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত "নুরজাহান" প্রকাশ হইল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিদেশিনী" উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

ফরাসীগভর্ণমেণ্ট নূতন আইন পাস করিয়াছেন—আইনের মর্ম্ম এই—যে সকল লোক যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তাহাদের সহিত যে সকল প্রেমিকার প্রেমালাপ ও প্রাণের বদল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহারা যুদ্ধকার্য্য-ব্যাপৃত প্রেমিকের কোন প্রতিনিধির সহিত এখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে পূর্ব্ব প্রেমিকের বিবাহিতা পত্নী বলিয়াই গণ্যা হইবেন। ভাল!—ইয়োরোপের মধ্যে ফ্রেঞ্চই পূর্ণ সভ্য। বাবুদের এই সভ্যতাই আদর্শ। নবপরিণীতা সতী প্রেমিকার গর্ভে যদি ইহার মধ্যে সন্তান হয়—সে কাহাকে বাবা বলিবে? এই আইন মতে ১৮ই মে এম্ সাউকে নামক এক ব্যক্তি এম লরিণ নামক সৈনিকের প্রতিনিধিরূপে মিলি মটিগ্-নি নাম্নী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যত দিন 'স্বয়ং' না মিলিতেছে, ততদিন প্রতিনিধির সঙ্গেই প্রেমের খেলা চলিবে। স্বস্তি!!



জাল-উইল নামক গ্রন্থের একটী দৃশ্য

শিক্ষা ও শিক্ষার আদর্শ।

কিছুকাল যাবত শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়া আমার মনে যে কয়েকটী বিষয় আলোচনীয় বলিয়া ধারণা হইয়াছে, অবসরের পাঠকগণকে আজ তাহাই কিছু উপহার দিব।

যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলে তাহাকেই বলে সুশিক্ষা; আর যে শিক্ষার বলে মানুষ আপন মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুপদ-বাচ্য হয় তাহাকে কুশিক্ষা বলে। সুশিক্ষা নন্দন-কাননের সুরভি কুসুম, আর কুশিক্ষা নরকের পূতিগন্ধযুক্ত কীট। প্রথমটি লাভ করিলে মানুষ সংসারে থাকিয়াও স্বর্গ-সুখ অনুভব করে এবং শেষোক্তটীর সংস্পর্শে মানুষকে নরকের কীটে পরিণত করে।

আধুনিক শিক্ষা যে কুশিক্ষা এবং প্রাচীন শিক্ষা যে সুশিক্ষা এমন কথা বলিতে পারি না। আধুনিক শিক্ষার দ্বারা যে দেশে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রাচীন শিক্ষার দ্বারা পুণ্য-স্রোত প্রবাহিত হইত এমনটিও বলিতে পারি না। তবে এটুকু বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, আধুনিক শিক্ষা দ্বারা ঠিক্ সে কালের ন্যায় ধর্ম্মরত খাঁটি মানুষ সৃষ্টি হইতেছে না। কি জানি কেমন একটা পার্থক্য-জাল যেন ক্রমে ক্রমে সেকালের ছাত্রজীবনে ও আধুনিক ছাত্রজীবনের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে। ইহার কারণ-তত্ত্ব কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন?

সে কালে রাজা হিন্দু ছিলেন। হিন্দুয়ানীর রক্ষা ও প্রসার তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি শিক্ষিত পণ্ডিত-মণ্ডলীর অন্ন-চিন্তা দূরীকরণার্থে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিতেন। কাজেই অধ্যাপকগণ নিশ্চিন্ত মনে দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষাদানার্থে অহোরাত্র রত থাকিতেন। এদিকে বিদ্যার্থী সকলও শাস্ত্রানুমোদিত সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিয়া অকপট চিত্তে জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহায় বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি অধ্যয়ন করিতেন। সুগন্ধি তৈল তাহাদের কুন্তলগুচ্ছে বিমর্দ্দিত হইত না, বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদও তাঁহাদের দেহ আচ্ছাদিত করিত না, অথবা কৃত্রিম কাচখণ্ড নাসিকার উপর সংস্থাপন করিয়া তাঁহারা ঈশদত্ত দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার করিতেন না। সামান্য স্থূল বসন তাঁহাদের পরিধেয় ছিল, পবিত্র কাষ্ঠপাদুকা তাঁহারা পায়ে দিতেন এবং

তাঁহাদের ভক্তি-মাখা ব্রহ্মচর্য্যোদ্ভাসিত কমনীয় বদনমণ্ডল দেখিলে এবং তাঁহাদের বিনয় ও সারল্য-মিশ্রিত বাক্য শুনিলে স্বতঃই সকলের শির ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁহাদের চরণে নত হইত।

কিন্তু কালক্রমে এখন সেদিন গিয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে ভারত হইতে সে জাতীয় শিক্ষা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের বিলাসীতার অনুকরণ করিতে গিয়া এখন ভারতবাসী ধনে প্রাণে মারা যাইতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যবাসী আভিজাত্যাভিমানী, আভিজাত্যের আসন সে দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ভারত-সন্তান সেই আভিজাত্যের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে গিয়া ত্যাগের আদর্শ ছাড়িয়া "ভোগকেই" জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়াছে। ফলে এখনকার শিক্ষা——এখনকার বিদ্যা জ্ঞানদায়িনী না হইয়া অর্থকরী হইয়া উঠিয়াছে। অর্থকরী হউক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি বিশেষ কিছু আসে যায় না; কারণ শিক্ষার আদর্শ অক্ষুন্ন থাকিলেই হইল।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় আধুনিক শিক্ষা আদর্শ বঞ্চিত। যাঁহারা শিক্ষক তাঁহারা নিজেরাই শিক্ষাদান কার্য্যটাকে এখন আর একটা পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। শিক্ষক যদি মনে করেন যে, আমি শাকান্নে পরিতুষ্ট থাকিয়া নিষ্কামভাবে শিক্ষাদান করিব, নিজে সত্যবাদী, সরলপ্রাণ, ধর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইব, তবে তাঁহার ছাত্রগণও তাঁহার চরিত্র অনুকরণ করিয়া আপনাপন জীবনকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে পারে।

যে নিজে অন্ধ, সে কেমন করিয়া অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে? তাই বলিতেছি, সেকালের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ছাত্র গঠন করিতে গেলে, যে ভাবের শিক্ষা এখন এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা থাকিবে থাকুক, শিক্ষকগণ সর্ব্বাগ্রে আপনাপন চরিত্র গঠন করুন। তাহা হইলেই এই ইংরাজী শিক্ষা হইতেও সদাচার সম্পন্ন ছাত্র সৃষ্ট হইবে। ইংরাজী শাস্ত্র পড়িয়াছি, শুধু পড়িয়াছি কেন এখনও পড়িতেছি ও পড়াইতেছি; কিন্তু কোন দিন কোন ইংরাজী শাস্ত্রে "পিতামাতার সেবা করিও না, দেব দেবী দেখিয়া ভক্তি করিও না, সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিওনা"—ইত্যাকার কোন বাক্য কোনদিন পড়িয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। বস্তুতঃ নিজের যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি আমার পিতৃ-পিতামহের ন্যায় দেবদ্বিজে ও

গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ হইব এবং সত্যবাদিতা. ন্যায় নিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক ধর্ম্মগুলি পালন করিব, তাহা হইলে অপরের সাধ্য কি যে, আমার দৃঢ় সংকল্প নষ্ট করে? মাঝী সুদক্ষ হইলে তরঙ্গের সাধ্য কি যে তরীখানি আন্দোলিত করে?

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ ইংরাজী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও ধর্ম্মে কর্ম্মে ও আচার আহ্নিকে ঠিক্ সেকালের ব্রাহ্মণসন্তানের ন্যায়। কৈ ইংরাজী শিক্ষা ত ইহাদের মনোবৃত্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই!

ইংরেজ আমাদের রাজা, কাজেই ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। রাজার অধীনে চাকুরী করিতে গেলেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ইংরেজী শিখিতে হইবে। বিশেষতঃ ইংরেজী আজ জগতের সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য ভাষা এবং ইংরেজী ভাষাতেই জগতের জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি লিখিত ও অনূদিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় অন্নসংস্থান ও জ্ঞানার্জ্জন এই উভয় কারণে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের এখন বিশেষ কর্ত্তব্য। মোগল বা পাঠানরাজত্বকালে হিন্দুর ছেলে আদর করিয়া উর্দ্দু বা পার্‌শী ভাষা শিক্ষা করিত; তাই বলিয়া কেহ কখনও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন ব্রাহ্মণের সন্তান কি পবিত্র উপবীত ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে নমাজ করিয়াছিলেন অথবা মুসলমানের ন্যায় বেশভূষা পরিধান করিতেন? তখন যদি হিন্দুর সন্তান মুসলমানী ভাষা শিক্ষা করিয়াও আপন হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, তবে এমন সদাশয় রাজার অধীনে থাকিয়া আজ পারিবেন না কেন? ইংরেজরাজ সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী, বরং মোগল-রাজগণ আপন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজের নিকট জাতীয় পরিচ্ছদধারী গোখেলে হইতে ঘোর সাহেব এন্, এন্, ঘোষ ও সমান আদরের বস্তু। এমন পক্ষপাতিত্বশূন্য রাজার অধীনে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া সে শিক্ষাকে "কুশিক্ষা" বলিতে অবসর প্রদান করা কখনই শিক্ষিতমণ্ডলীর কর্ত্তব্য নহে। ইংরেজী হউক, ফরাসী হউক, জার্ম্মাণী হউক, চীন হউক, যে কোন ভাষাই হউক জ্ঞানলাভের জন্য তাহা পড়িব অথচ আপন জাতিত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখিব ইহাই হইল সুশিক্ষার আদর্শ। এই আদর্শ বজায় রাখিতে পারিলে আধুনিক শিক্ষাতেও সুফল ফলিবে।

লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা কি বাঙ্গালীর ন্যায় বেশ ভূষা, পরিচ্ছদ

করিতেছেন? প্রকৃত কথা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। নহিলে এমন সোণার দেশে এমন দুর্ভিক্ষের হট্টহাসিই বা কেন, অথবা ব্রাহ্মণের সন্তান আজ নাস্তিক-কুল-চূড়ামণিই বা কেন? এই পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে আমাদের বংশধরগণকে রক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষকগণকে সাধু হইতে হইবে—নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রত পালন করিয়া তবে ছাত্রদিগকে সাধু হইতে উপদেশ দিতে হইবে। সতত তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া যাহাতে তাহাদের সুকোমল প্রাণে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, যাহাতে তাহারা মিতব্যয়ী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সরলপ্রাণ, বিনয়ী ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী যুক্ত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সাধকপ্রবর মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিতেন—

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন সোণার জমি রৈল পতিত
আবাদ ক'র্‌লে ফ'ল্‌ত সোণা।"

বাস্তবিকই উত্তম কৃষক হইলে এই জমিতেই—এই ইংরেজী শিক্ষারূপ বীজেই সোণার ফসল ফলাইতে পারেন। এখন চাই যোগ্য চাষী। যিনি ক্ষেত বুঝিয়া জমি চাষ করিয়া সদ্ বীজ বপন করিতে পারিবেন তিনিই পরে সুফলের অধিকারী হইবেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষকগণ এরূপ আদর্শের বিষয় একবারও চিন্তা করেন না; নির্দ্ধারিত সময়টুকু বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াই তিনি আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যে কি মহান্ কর্ত্তব্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহা ভাবিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা আদৌ বোধ করেন না। এই চিন্তার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার আদর্শ বিকৃত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আবার যে দিন শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষাকার্য্যকে একটা পুণ্যজনক অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিবেন এবং ছাত্রমণ্ডলী সেই স্মৃতির অতীত যুগের কথা স্মরণ করিয়া খাঁটি হিন্দুর সন্তান থাকিয়া বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবেন, সে দিন এদেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্য হইতে কলঙ্করাশি দূরীভূত হইবে। ভগবান্ জানেন সে সুদিন কবে আসিবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

কে ছোট কে বড়।

"আয় দেখিনি পাশাপাশি দাঁড়াই, মাপিয়া দেখি কে ছোট কে বড়!" এই এক খেলা ছেলে বেলায় সকলেই খেলায়। ছেলে বয়সে বয়োধিকের জুতা, ছাতি, সার্ট, কোট পড়িয়া "বড় হওয়া খেলা" কে না খেলিয়াছেন? মুখশ্রীতে কা'র চেহারা বড় দেখায় প্রতিজ্ঞা করিয়া কে না শতবার আর্‌সীতে মুখ দেখিয়াছেন! ছেলে মানুষের এবম্প্রকার খেলা দেখিয়া সকলেই আমোদ পাইয়া থাকি, আর মনে করি এ ছেলেমি বা ছেলেমানুষি বইতো নয়! কিন্তু বুড়ো বয়সে যদি এইরূপ ছেলেমানুষি করা যায়, তবে সকলের দৃষ্টিই সেদিকে পড়ে, এবং যে বুড়ো-ছেলেমানুষি খেলা খেলে সে সকলের তিরস্কার এবং তামাসার ভাজন হইয়া পড়ে।

দেবগণের মধ্যেও এই "কে ছোট কে বড়" নামে খেলা আছে। প্রতিদিন এ নিয়া কত ঝগড়া-ঝাটি, কান্নাকাটি চলিতেছে, কত আবদার, কত ছলনা চলিতেছে।

এক সময়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশ্বকর্ম্মা ও কর্ম্ম এই চারি জনের মধ্যে কোন্দল বাঁধিল—"কে ছোট কে বড়"। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ হার মানিলেন—কেহই এ তর্কের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে স্থির হইল কাঞ্চনপুরের রামসদয় বাঁড়ুয্যেকে এই তর্কের মীমাংসা জন্য সালিস মান্য করিতে হইবে। সে ব্যক্তি খুব খাঁটি লোক, কারও ধার ধারে না, অথচ বড়ই দুঃস্থ, দিনান্তে শাকান্নও তার মিলে না। অতঃপর লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশ্বকর্ম্মা ও কর্ম্ম, সাজিয়া গুজিয়া কাঞ্চনপুরে রওয়ানা হইলেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামসদয় বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করাইলেন। রামসদয় ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন—"এ গুরুতর কার্য্যে এই অধীনের উপর মীমাংসার ভার কেন অর্পিত হইল, কত দেব, কত দেবী আছেন তাঁহারাইতো এ বিষয়ে সুবিচার করিতে সম্যক পারদর্শী, তবে এ অধীনকে নিয়া নাড়া চাড়া কেন?" তখন লক্ষ্মী প্রভৃতি রামসদয় দ্বারাই উপযুক্তরূপে মীমাংসা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন। অগত্যা "আগামী কল্য বিচার হইবে" প্রকাশিয়া দেবদেবীগণকে বিদায় দিয়া চিন্তায় অভিভূত হইয়া রামসদয় বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

রাত্র এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা ছদ্মবেশে পুনরায় রামসদয়

ভবনে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন—"রে রামসদয়! আমি বিশ্বকর্ম্মা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া কোন বিষয়ে বিচার-জন্য সালিস মান্য করিয়া গিয়াছি। আমি তোর বাড়ী ঘর রাজবাড়ীর মতন করিয়া দেই, তুই আমাকে বড় বলবি তো?" রামসদয় দাও বুঝিয়া পা ফেলান, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন, বলিলেন,—"আচ্ছা কর, দেখা যাবে"। বলা বাহুল্য বিশ্বকর্ম্মার বরে মুহূর্ত্তের মধ্যেই রামসদয়ের বাড়ী অট্টালিকায় পরিণত হইল। বিশ্বকর্ম্মা রামসদয়কে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রামসদয় ব্যাপার দেখিয়া সে রাত্রে আর ঘুমাইলেন না—বসিয়াই রহিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। চারিদিকে জগৎ নীরব, হঠাৎ রামসদয়ের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, রামসদয় দেখিলেন—অপূর্ব্বা এক রমণী ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। রামসদয় জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি কে মা?"—রমণী বলিলেন, "আমি লক্ষ্মী—কিন্তু একি! বিশ্বকর্ম্মা আমার পূর্ব্বে আসিয়া তাহার কাজ গুছাইয়া গিয়াছে, দেখ রামসদয়! অট্টালিকা হইয়াছে বটে, ধনরত্ন না থাকিলে এ সব বৃথা। আমি ধনরত্নে তোমার দালান পূর্ণ করিয়া দেই, আমাকেই বড় বলিবে তো?" রামসদয় বলিলেন,—"মা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, দেখা যাবে।" মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতেই রামসদয়ের দালান-কোটা নানাবিধ ধনরত্নে পূর্ণ হইয়া গেল, লক্ষ্মীও অন্তর্হিত হইলেন।

রামসদয় মনে করিলেন—বাঃ! এ মন্দ নয়, যার কাজ সেই করে, আমার কোন পরিশ্রমের আবশ্যক নাই। আচ্ছা দেখি কি হইতে কি হয়! এমন সময় সরস্বতী আসিয়া উপস্থিত। সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে করিলেন, আমার পূর্ব্বেই বিশ্বকর্ম্মা ও লক্ষ্মী আসিয়া নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে—যাক্! তখন অগ্রসর হইয়া রামসদয়কে বলিলেন—"রামসদয়! ভাব কি? বিদ্যা না থাকিলে ধনরত্ন কিম্বা দালান কোটা ধুইয়া জল খাইলে চলিবে না। আমার সহিত প্রতিজ্ঞা কর যে, আমাকেই বড় বলিবে, আমি তোমাকে বিদ্বান্ করিয়া দেই।" রামসদয় বলিলেন—"মা! কোন প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না, তবে তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও বিচারে যাহা হয় হইবে।" এই কথায় সরস্বতী মুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে রামসদয়ের প্রশংসা করিলেন এবং ভাবিলেন এ যেমন তেমন লোক নয়। এই ভাবিয়া নিজকার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ম্মদেব পরোক্ষে থাকিয়া লক্ষ্মী, বিশ্বকর্ম্মা এবং সরস্বতীর কার্য্যকলাপ দেখিলেন, কিন্তু নিজে আর রামসদয়ের খোসামোদ করিতে আসিলেন না।

ক্রমে রাত্র প্রভাত হইল, রামসদয় বিচার করিতে বসিলেন। বিচারপ্রার্থী দেব-দেবীগণ আসিয়া যে যাহার আসন পরিগ্রহণ করিলেন। রামসদয় অকপটে বলিলেন,—"দেখুন! কর্ম্মই সবার চেয়ে বড়। আমার কর্ম্মে না থাকিলে এই অবস্থান্তর হইত না এবং আপনাদেরও ওরূপ মতি-গতি হইত না। আমার কর্ম্মে ছিল বলিয়াই এই সকল হইয়াছে।"

এইরূপ বিচারে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু মনে মনে রামসদয়ের বিচার-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শেষ সকলে চলিয়া গেলেন।

বস্তুতঃ কর্ম্মের সমান কিছু নহে। কর্ম্মে থাকিলে সবই হয়, কর্ম্মে না থাকিলে শত চেষ্টাতেও কিছু হয় না এবং হইবার নহে। কাহাকে বড় বলিব, কাহাকে ছোট বলিব, সে চিন্তা মনে স্থান না দিয়া—

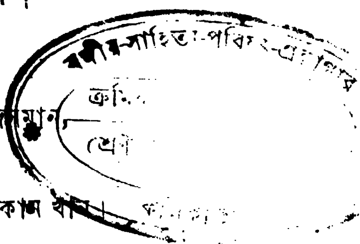
"দিন পেয়েছ দিন বুঝে নেও,
যে যার কাজে দেওরে মন।"

ভাবনাটা বড় মন্দ নহে, তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখাটা উচিত।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষায় সন্ধ্যা।

বাদল করে গেল
সারাটী দিনমান,
আলোক একতিল
ছিল না কোন খান।



যখনই মুখ তুলি
তখনই ঝুপ ঝুপ,
বিরলে চ'লে যায়
দিবস কোনরূপ।

বিরস ঘরে বসি
রাখাল সাথী-হীন;
রহিল গাভী বাঁধা
গোয়ালে সারাদিন।

পড়সী ডা'লে চা'লে
রেখেছে ঘরে ঘরে ;
যুবক ল'য়ে গেছে
খারাটী থাল ধারে।
দিবস ডুবু ডুবু
অশথ শাখাপরে,
ফুটিল সোণামাখা
কিরণ থরে থরে।
পূবের বাঁশ বন
কিরণে দুল দুল ;
দেখিলে মনে হয়
পরেছে শোণ ফুল।
এদিকে কাল মেঘ
হাতী, ঘোড়া, বাঘ হয়ে,
রবিরে গিলিবারে
বসেছে কাছে যেয়ে।
প্রতীচে রবি-কোলে
মেঘেরি নানা খেলা,
রাঙা কাল বহুরূপে
ধীরে ধীরে যায় বেলা।
চকিতে রাঙা রবি
বারিদে ডুবে গেল ;
শাওনে * গাঁয়ে গাঁয়ে
আঁধার নেমে এল।
বধূরা বাহিরিল
কপালে রাঙা টিপ ;
জ্বালিল ধীরে ধীরে
তুলসীতলে দীপ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়

* শ্রাবণে।

দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্য।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্য একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এমন চরিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে দ্বিতীয় একটী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একদিকে যেমন কঠোরতা অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে তেমনি সেই কঠোরতার মধ্যেও বিশ্বপ্রেমের মৃদু ঢেউ প্রবাহিত হইতেছে। যদিও চাণক্যচিত্রের প্রথমাংশ হইতেই তাহার চরিত্রে কঠোরতার ও তীব্রতার স্ফুরণ হইয়াছে, তথাপি ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, এই দীন হীন ব্রাহ্মণ আজীবনই এইরূপ কঠোর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন না। প্রকৃতির উৎপীড়নই ব্রাহ্মণের এই কঠোরতার বিশেষ কারণ। ব্রাহ্মণের গুণ প্রতিহিংসা নয় সত্য, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পদে পদে রাজদ্বারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, অবশেষে যাঁহাকে নিতান্ত নীচ জাতির ন্যায় আক্রান্ত হইয়া রাজ-সমীপ হইতে বাহির হইয়া আসিতে হয়, তাঁহার ক্রোধের সীমা যে কতদূর ছাপিয়ে উঠে, তাহা শুধু অনুভবনীয়। যাঁহার প্রতিজ্ঞার বল আছে, প্রতিভার প্রভাব আছে, অভিশাপের শক্তি আছে, তাঁহার পক্ষে মহারাজ নন্দকে অভিসম্পাত করা এবং তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নীতিবিরুদ্ধ হয় নাই ; এ স্বাভাবিক নিয়ম। তবে কঠোরতাও পণ্ডিত চাণক্যের জীবনের একটী প্রধান সঙ্গী, কঠোর না হইলে কেহ কখন দুরুহকার্য্যে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা ক্ষমাশীল জিতেন্দ্রিয় হইবেন এ কথা সত্য। পণ্ডিত চাণক্যকেও যখন মহারাজ নন্দের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন এই কঠোর প্রতিহিংসা-পূর্ণ হৃদয়ও একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এই প্রতিহিংসা সাধনের সময় উপস্থিত দেখিয়া প্রথম—"তাঁহার গম্ভীর মুখখানি আনন্দে সহসা প্রত্যূষের মত দীপ্ত হ'য়ে উঠলো, আবার তৎ-ক্ষণাৎ গোধূলির মত ম্লান হ'য়ে গেল। শীর্ণ দেহখানি প্রদীপ-শিখার মত কেঁপেই আবার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল, ওষ্ঠপ্রান্তে এক ব্যঙ্গহাস্য জেগে উঠে, ধীরে ধীরে নিভে গেল। শেষে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি—ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ, মুখ পাংশু, ললাটে গভীর রেখা……।

এই যে ভাব, এ বড় সুন্দর। এত কঠোর, এত উগ্রস্বভাব তথাপি তাহার ব্রাহ্মণ-জনোচিত ক্ষমার কথা ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছিল।

চিত্র-শিল্পীর এ বড় মনীষার প্রতিপাদক। দ্বিজেন্দ্রলাল চাণক্য-চরিত্রে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়া যতদূর কঠোর করা বিধেয়, ততদূরই কঠোর করিয়াছেন। এক জায়গায় আমরা দেখিতে পাই, যখন মহারাজ নন্দের পূর্ব্বমন্ত্রী বন্দীভাবে উপস্থিত হইলেন, চাণক্য পণ্ডিত তখন তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ করিলেন, এমন কি অবশেষে ইহাও বলিলেন,—"আমি পৈতা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ কচ্ছি, তুমি যদি চাও।" ইহা কি কম মহাপ্রাণতার কথা! তিনি আপনি তখন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"শূদ্রকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না।" চাণক্য কূটকৌশলী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ঐ অতি কঠোর অন্তঃকরণের মধ্যেও একটি অতি কোমল প্রবৃত্তি নিহিত ছিল। তাহা যদিও প্রথম জীবন-দর্পণে প্রতিফলিত হয় নাই, অবশিষ্ট জীবনে তাহা প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তখন তিনি কল্পনাকে বলিয়াছেন;—রাক্ষসী, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কি করেছি!—কি করেছি!" বলিয়া আপনিই শিহরিয়া উঠিয়াছেন। প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন যে, এ সব ব্রাহ্মণের কাজ নয়। ব্রাহ্মণের প্রতিভা সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, ব্রাহ্মণের প্রতিভা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি আবার বলিয়াছেন;—"যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ ক'রে এসেছি, সে বর নয়,—সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখতে পেয়েছি; সে সজীবমূর্ত্তি নয়, সে কঙ্কাল, সে এতদিন আমায় নিয়ে যাচ্ছিল, এখন তাড়া করেছে—ভয়ঙ্কর!" এই কথা বলিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই তখন তাহার মনে একটা অনুশোচনা আসিয়াছিল, একটা বিভীষিকা মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এক দিন যে চাণক্য "নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চাণকের সন্তান নই।" বলিয়া অচল অটল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজ সেই চাণক্য—"শাঁস নাই খোসা নিয়ে কি ক'র্ব্ব!" বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, চিত্রশিল্পী এখানে অতি সুন্দর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। এমন চিত্র বঙ্গসাহিত্যে খুব কমই আছে। কঠোরে কোমলে, কুটিলে সরলে এ চিত্রটী অতি উজ্জ্বলই হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তব-জীবনের কবি হইলেও বাস্তব-জীবনের চরিত্র ও আদর্শ-চরিত্র এই উভয়বিধ চরিত্র বিশ্লেষণে সমানই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "পাষাণী" নাটকে মহর্ষি গৌতমের তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র অঙ্কিত

করিয়াছেন। সে চরিত্র কি উদার—কি পবিত্র। দুর্গাদাসের" দুর্গাদাস-চরিত্র তাঁহার এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। এইরূপ দেব-দুর্লভ চরিত্র যিনি নাটকে ফুটাইতে পারেন তিনি ধন্য।

একদিন আমরা দেখিয়াছি সেই ভিক্ষুক-বালার কাতর কণ্ঠ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত চাণক্য কতটা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন এবং সেই আশ্চর্য্যজ্ঞাপকতার মধ্যে কতটা কোমলতা বর্ত্তমান ছিল। অপরিজ্ঞাত বালিকার স্বরে, এত কঠোর এত ভীষণ দর্শন চাণক্যের চোখেও জল আসিয়াছিল। তিনি কঠোর ছিলেন সত্য, কিন্তু চিত্রশিল্পী যে তার সেই অতিকঠোর, অতিপাষাণ হৃদয়ও কোমলতার আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার চরিত্র-বিশ্লেষণের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক।

বহুকাল অনাবৃষ্টির পর যদি হঠাৎ একদিন বৃষ্টি-ধারা প্লাবিত হইয়া ধরিত্রী শ্যাম-কান্তি ধারণ করে, যদি তৃষ্ণার্ত্তের সম্মুখে একগ্লাস সুস্বাদু পানীয় স্থাপিত থাকে, তাহা হইলে সে সুখের যেমন সীমা থাকে না, সেইরূপ কঠোরতার মধ্যে, পাষাণের মধ্যে অথবা নির্দ্দয়তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও কোমলতা লুক্কায়িত থাকে, তবে সেই বা কত সুন্দর কত মধুর! আমাদের চাণক্য-চরিত্রটী ঠিক্ তাই। এর একদিকে যেমন কঠোরতা মাত্রা অতিক্রম করিয়া ছাপিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি কোমলতার আধার—স্নেহের উৎস সতত সেই কঠোর হৃদয়ে সঞ্চালিত হইতেছে। এই যে কঠোরতা, ইহা ঈশ্বরদত্ত অভিশাপ। যখন তিনি সেই ভিক্ষুকের নিকট শুনিলেন যে, এই কন্যাটির নাম "আত্রেয়ী" তখন তিনি এক সঙ্গে ক্রোধে ও আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এমন কি ভিক্ষুককে মারিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে সেই মুহূর্ত্তেই স্থিরচিত্তে বলিলেন—"দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো—তুমি আমায় সম্রাট করেছো—তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে আবার স্বর্গে উঠিয়েছো, আমি তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা কর্ব্ব।" আনন্দে কতদুর অধীর হইলে তবে এইরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় তাহা চিন্তনীয় বিষয়।

পণ্ডিত চাণক্য যতই কঠোর, যতই নির্দ্দয় হউন না কেন, তাঁহার হৃত-সর্ব্বস্ব পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল কঠোরতা, নির্দ্দয়তা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার অন্তরে যে স্নেহের উৎস অন্তর্হিত অবস্থায় বিরাজিত ছিল তাহা পুনরায় উদ্‌যাপিত হইল। চাণক্য এক সঙ্গে শোকে ও আনন্দে অধীর

হইয়া পড়িলেন। "ভারতের শাসনকর্ত্তার কন্যা—তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা কর্ত্তে;" এই ভাবিয়া চাণক্যের চোখে জল আসিল।

আজ চাণক্য নিশ্চিন্ত। আজ আর চাণক্য পণ্ডিত সে চাণক্য নাই। সেই এক শুষ্ক মরুময় প্রান্তরের পরিবর্ত্তে এক নব প্রস্ফুটিত কুসুম-সুশোভন স্নিগ্ধ-হিল্লোল-প্রবাহিত উদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, পাষাণ হইতে বারিধারা নির্গত হইয়াছে। আজ আর সেই বিচক্ষণ কূটকৌশলী চাণক্য এ জগতে নাই, তাই তিনি আজ স্নেহময়ী কন্যার কোমল হাত দু'খানা ধরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রিত্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। যদিও তিনি এতদিন দর্প, উচ্চাশা ও প্রতিহিংসায় চালিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণের উচিত প্রবৃত্তি নয়, ইহা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন এবং সে জন্য বিশেষ অনুতাপও করিয়াছেন। আর ইহাও বলা যাইতে পারে বোধ হয় যে, যার উপর ঈশ্বরের এত অত্যাচার—রাজার এত অত্যাচার, তার এ কাজ অনুচিত হয় নাই, তার উপর চাণক্য পণ্ডিত অতিদর্পী ও অতিক্রোধী ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্য-চরিত্রটী আলোচনা করিলে এই দেখা যায় যে, চাণক্য যতই কঠোর—যতই প্রতিহিংসা-পরায়ণ হউন্ না কেন, তাঁহারও হৃদয় ছিল এবং চিত্রশিল্পীর এইটীই প্রধান বিশেষত্ব যে কঠোরেও কোমলের স্ফুরণ অতি আশ্চর্য্যরূপে দেখাইয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

বিনিময়।

নিখিল সংসার করিয়াছে হায়,
মোর সনে বিষম চাতুরী।
খেলিবার ছলে ডাকিয়ে আনিয়ে
হৃদয়ে মেরেছে গুপ্ত ছুরি॥
পিপাসায় মোর শান্তিবারি
দেবে ব'লে ডেকে এনে ছিল।
বিনিময়ে গো গরল-সম্ভার
নিরস কণ্ঠে ঢালিয়া দিল॥

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিদ্বারে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তীব্র স্রোতে হাটুজলে যাত্রীগণ কিনারার প্রস্তর সংলগ্ন শিকলগুলি ধরিয়া কোন গতিকে ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িতেছে, বাণের তীব্রস্রোত হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য Fero concrete চত্বরগুলির ধারে ধারে সারি সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার শিকল ঝুলান আছে, যাত্রীগণ এই শিকল সাহায্যে কোন গতিকে সে সময় প্রাণে প্রাণে গঙ্গায় স্নান করিয়া থাকে। আমরা থাকিতে থাকিতে দুইটা মহিষ ভাসিয়া চলিয়া গেল, তিনজন মানুষ স্রোতের টানে কোথায় গিয়া পড়িল, তাহার সন্ধান হইল না ; শুনিলাম হরিদ্বারের canal দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল Electric officeর কএকজন সাহেব তাহাদের দুই জনকে বাঁচাইয়াছে।

হরিদ্বারের গঙ্গার খালটী দেখিবার জিনিস। এই খাল উত্তর পশ্চিম ভারতের জলহীন মরুভূমি সদৃশ প্রদেশগুলিকে যেমন উর্ব্বর শস্যশালীক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে,তেমনি মধ্যবঙ্গেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ১৮৫৫খৃষ্টাব্দে হরিদ্বার ও মায়াপুরের মধ্য দিয়া ৬৩৫ মাইল একখাল গবর্ণমেণ্ট খনন করিয়া, গঙ্গার দক্ষিণদিক ঘুরাইয়া কানপুরে আনিয়া মিশাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই খাল হইতে আবার Ganges Etwah canal নামে আর একটী খাল কাটিয়া যমুনায় আনিয়া মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং যমুনারও আবার দুই তিনটী খাল এইভাবে খনন করা হইয়াছে। গঙ্গা ও তাহার উপনদীগুলিতে এইভাবে খাল কাটিয়া উত্তর পশ্চিমের জলহীন প্রদেশগুলিতে আবাদ হইতেছে বটে, কিন্তু নদীর প্রধান স্রোত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, স্রোতের প্রবলবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। যে গঙ্গা ও পদ্মার বেগ বাঙ্গালাদেশ একদিনও সহ্য করিতে পারিত না, মজা নদী বহতা হইয়া যাইত, যে গঙ্গার স্রোতের তেজে হুগলী, জলঙ্গী, পাংশা, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, কপোতাক্ষী, ভৈরব, যমুনা, বেত্রবতী, মুক্তেশ্বরী, চিত্রা, চালুন্দে, হরিহর প্রভৃতি মধ্য বঙ্গের নদীগুলির দামদল মলামাটী পরিষ্কার হইয়া সুন্দর বনে গিয়া জমায়েত হইত ; এ গঙ্গার আর সে তেজ নাই, এখনকার গঙ্গা আর বাণ ডাকিয়া নদীবহুল মধ্যবঙ্গকে ডুবাইয়া দিতে পারে না; তাহার

নদীগুলিকে শাসন করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না, তাই আজ বাঙ্গালার সমস্ত নদীগুলিই মজিতে বসিয়াছে ও কেহ কেহ মজিয়া গিয়াছে, চড়া পড়িতেছে, যাহার বক্ষে খেয়ায় পাড়ি দিতে গেলে, গোটা এক বেলা কাটিয়া যাইত, আজ তাহা বিড়াল কুকুরে হাটিয়া পার হইতেছে। আমাদের নদীকুল কেবল মরিতেছে না, মরিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও শাপগ্রস্ত করিয়া যাইতেছে। তাই আজ আমরা সর্প-শ্বাপদে ক্ষত বিক্ষত, প্লীহা যকৃতে জীর্ণশীর্ণ, তাই আজ আমাদের শস্য-শ্যামল মাতৃভূমি উর্ব্বরা শক্তিহীন।

ভাদরের ভরা গাঙ আর সেরূপ রাঙা জলে কুল ছাপাইয়া নৃত্য করিতে পায় না; খবরের কাগজে আর আমরা ললিতাকুণ্ডের বাঁধ ভাঙার কথা শুনিতে পাই না; আমাদের আমড়াখালির পুলও আর ছাপাইয়া জল আসে না। নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা আর বন্যার জলে প্লাবিত হইয়া যায় না। ম্যালেরিয়াও পালাইতে পারে না, জমিও উর্ব্বরা হয় না, তাই এখন আমরা মজা নদীর পচা জল খাইতেছি আর মরিতেছি। মশার ডাকে মনের ভয়ে যৌবনেই জীবন্মৃত হইয়া বসিতেছি। আমার যে বয়স খুববেশী হইয়াছে তাহাও নহে, আমিই প্রথম ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম যে, খুলনা রেললাইন খোলার পর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী হইতে লাগিল; আবার আমিই প্রথম দেখিলাম, যেমন লাল্‌তে কুঁড়ের বাঁধ ছাপাইয়া বন্যা আসা বন্ধ হইল, অমনি কোথা হইতে পাট আসিয়া ডাঙ্গার জমি দখল করিয়া বসিতে লাগিল। মাঠে সার দিবার প্রথাও প্রচলিত হইল, এদিকে ম্যালেরিয়া নামে এক ভীষণ ব্যাধি কোথা হইতে আসিয়া গ্রাম কে গ্রাম উজাড় করিয়া অরণ্যে পরিণত করিতে লাগিল।

হরিদ্বারের বাজারে কেদারনাথ বদরিনাথ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থে উঠিবার উপযুক্ত লাঠি, কম্বল, খড়ম, জুতা, শীতবস্ত্র ইত্যাদি জিনিস পত্র বেশ সস্তা পাওয়া যায়। এখানকার বাজারে মাছ মাংস বিক্রয় হয় না। বদরিনারায়ণ যাইবার কাণ্ডী ও কুলির বন্দোবস্ত এইখান হইতে ও হৃষীকেশ হইতে স্থির করা হইয়া থাকে। কাজটা বড় সহজ নহে, হরিদ্বার হইতে ডাণ্ডিতে বদরিনারায়ণ যাইতে প্রায় একমাসের উপর সময় লাগে, কুলি মজুরের ভাড়াও প্রায় ১০০৲ টাকার উপর, অবশ্য সাধু-সন্ন্যাসিগণ পদব্রজেই এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু বৃদ্ধ বা বড়লোক যাত্রীদিগকে এখানে নামধাম লেখাইয়া ডাণ্ডি সরবরাহকারী কোম্পানীদিগের নিকট হইতে নির্ব্বিঘ্নে

বদরিনাথ পৌঁছিয়া দিবার একরার পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তবে এই জনহীন পর্ব্বতপথে আহারাদি সংগ্রহ করতঃ, প্রাণ হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। মোটের উপর ভক্ত ভিন্ন বদরিনারায়ণ যাইতে কেহ সাহস করে না; কলিকাতার মণিহারী দোকানগুলির মতন হরিদ্বারে অসংখ্য বাঁশের লাঠির দোকান সারি সারি সাজান দেখিতে পাওয়া যায়। নক্সাকাটা, পিতলের তার জড়ান, দেবতার ছবি আঁকা হরেক রকমের সুন্দর সুন্দর বাঁশের লাঠির আড়ৎ হরিদ্বারের বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা Stationএর উপর কুম্ভকর্ণপাণ্ডার ধর্ম্মশালা হইতে প্রত্যহ শত শত পাঞ্জাবী যাত্রীদিগের সর্ব্বপ্রধান সওদা লাঠির বোঝা ঘাড়ে করিয়া রেলে উঠিতে দেখিতে পাইতাম। আমরাও মথুরা বৃন্দাবনে বাঁদরের উৎপাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এখান থেকে কএকখানি লাঠি খরিদ করিয়াছিলাম; এমন সুন্দর বাঁশের লাঠি যে,সঙ্গে করিয়া দেশে আনিতেও ঝঞ্ঝাট বোধ হয় নাই। হরিদ্বারের দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কনখল তীর্থ, কনখলে দক্ষযজ্ঞ, দক্ষেশ্বর শিব, সতীকুণ্ড ও Raja of Landhuras Temple প্রভৃতি দেখিবার জিনিস, দক্ষযজ্ঞ স্থানটী অতীব মনোরম। বড় বড় মহীরূহ বৃক্ষের ছায়ায় যজ্ঞের সমস্ত নিশানাগুলি কোন এক স্মরণাতীত কালকে যেন চির বর্ত্তমানে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রে আছে,—সহস্র তীর্থ করিলেও খলচিত্তের চিত্তশুদ্ধি ঘটে না—তীর্থস্নানের কোন ফললাভ হয় না, কিন্তু কনখল তীর্থে স্নান করিলে এ হেন যে খল তাহারও চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দুষ্ট খলেরও এখানে চিত্ত শুদ্ধি হয় বলিয়া এই তীর্থের নাম কনখল হইয়াছে. পাণ্ডারা ইহাই বলিয়া থাকে।

কনখলে বানরের উৎপাত অত্যন্ত অধিক, এখানে বারানসীর দুর্গাবাড়ীর মতন কোন যাত্রীই বানরদিগকে খাবার না দিয়া নিস্তার পায় না। ৺কালী ঘাটে কাণা খোঁড়াকে দুই এক পয়সা দান করিতে গিয়া, যেমন নিরীহ নূতন যাত্রীকে ভিখারীগণ ঘিরিয়া ফেলিয়া পয়সা কড়ি লুঠপাঠ করিয়া লয়; সেইরূপ এই বানরদিগকে বুঝিয়া সুজিয়া খাবার দিতে না পারিলে যাত্রীগণ তাহা-দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মহাবিপন্ন হইয়া পড়িয়া থাকেন। আমরা এই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া, ল্যাণ্ডুরার রাজার শিবমন্দির দেখিতে গেলাম। বাস্ত-বিক কণখলের বর্ত্তমান সৌন্দর্য্যও দেখিবার বস্তু যদি কিছু থাকেত তাহা এই ল্যাণ্ডুরার শিবমন্দির। মন্দিরটী নূতন Fashionএ প্রস্তুত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছোট ও বড় চতুর্দ্দিকে দুইটী করিয়া চত্বর। ভিতরে সুবৃহৎ শিবমূর্ত্তি, ল্যাণ্ডুরার

মন্দিরের শিবই এ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিব। ইহার মধ্যে কালী, দুর্গা, রাম, সীতা, গঙ্গা, সাবিত্রী প্রভৃতি অনেক দেবদেবী প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে বৃন্দাবনের সেটিয়াদিগের মন্দিরের ঘণ্টার অনুরূপ প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই সুবৃহৎ ঘণ্টাধ্বনি একটু প্রবল হইলে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই ঘণ্টা-ঘরের পার্শ্বে পাথরের সিড়ি গাঁথা উচ্চ একটী মঞ্চ; এই মঞ্চে বসিলে কনখল ও হরিদ্বারের সমস্ত গঙ্গার বাঁকটি প্রায় নজরে পড়ে; হরিদ্বার সহরের বাড়ী ঘরও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। গরমে যখন বরফ গলে, বর্ষা নামে, গঙ্গার কুলে কুলে রাঙাজল উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সাগর অভিমুখে ছুটিতে, থাকে তখন ল্যাণ্ডুরার রাজার মন্দিরের এই উচ্চ শ্বেত পাথরের মঞ্চে বসিলে কি মধুর মনোরম দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণনাতীত। গঙ্গার গহ্বর হইতে পাথরের খিলান করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে। ফাল্গুন মাস তখন গঙ্গা একেবারে সঙ্কীর্ণ, তবুও তাঁহাকে এই মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে; যখন বান ডাকে, মন্দির চত্বরের কানায় কানায় জল আসে, তখন এই উচ্চমঞ্চের প্রায় অর্দ্ধেক নদীগর্ভে নিমজ্জিত থাকে। তখন যদি এই বীচিবিক্ষুব্ধ বারি-বিধৌত উর্দ্ধমস্তিষ্ক শ্বেতমঞ্চে উপবেশন করিয়া হরিদ্বার হইতে কনখল পর্য্যন্ত মানবের এই ঐশ্বর্য্যশালী তীর্থভূমির স্থূল দৃশ্যটী অবলোকন কর, আর পরপারে পাহাড় ঘেরা প্রকৃতির বনভবনটীও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা পাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে,—মনে আসিবে, যেন দুইটী বিভিন্ন দৃশ্য দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতি একই উদ্দেশে একই স্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। দু'জনই মহান্, দু'জনই পবিত্র সৌন্দর্য্যময়ী; তথাপি একজন যেন মাজা-ঘসায় দ্বিতীয় হইতে কিছু মলিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একধারে বুঝি ভ্রমর, সূর্য্যমুখীরা বাস করে, অপরধার বুঝি কপালকুণ্ডলার বন-ভবন। একধারের মালিক বুঝি কোন রাজর্ষি জপতপমগ্ন,—গলায় সোণার তারে গাঁথা তুলসী ও মাণিকের মালা—অঙ্গে মূল্যবান্ রেশমী, চরণে স্বর্ণ-তার-জড়িত চন্দনকাষ্ঠের খড়ম। সোণার পুষ্পপাত্র—রূপার সাজি, মখমলে মোড়া কুশাসন। আর অপর ধারের মালিক যেন কোন বিভূতিভূষিত নগ্ন সিদ্ধপুরুষ অজীনাসনে ধ্যানমগ্ন কিম্বা বামা—ক্ষেপার অনুরূপ বুঝি কোন পাগলযোগী! কে ভাল, কে মন্দ, তোমার হৃদয় তাহা আপনিই বিচার করিবে, তুমি যেন কোন এক কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে

বিচরণ করিতে থাকিবে। অবশেষে তোমাকে নিরাশ বৈরাগ্য লইয়া জঠোর জ্বালার তৃপ্তিসাধন জন্য ল্যাণ্ডুরার পবিত্র রাজ-মন্দির হইতে শনৈঃ শনৈঃ সরিয়া পড়িতে হইবে। পাণ্ডারা বলে দক্ষস্থানের সতীকুণ্ড প্রকৃত নহে, কনখল হইতে কিছু দূরে আমরা পৃথক সতীকুণ্ড দেখিলাম।

স্থানটী মাঠের মধ্যে জঙ্গলের ভিতর। যদিও এখানে টোঙ্গা গাড়ী যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু গাড়ীতে যাওয়া বড়ই ঝকমারি কাজ, কনখল হইতে এই সামান্য পথটুকু আসিতে গাড়ীর ঝাকনিতে যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। আমরা সতীকুণ্ডের ফটো তুলিলাম, জঙ্গল ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতেছে, পাণ্ডাদিগের ব্যবসা উপযোগী প্রায় সমস্ত জিনিসই সতীকুণ্ডে স্থাপিত হইয়াছে; নূতনত্বের মধ্যে দেখিলাম, একটা ঘরে বড় বড় সিনে দক্ষযজ্ঞ, যজ্ঞপণ্ড, মহাদেবের সতীস্কন্ধে নৃত্য প্রভৃতি হরেক রকম দৃশ্য Paint করাইয়া পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে পুরাতন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সারি সারি টানাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। সতীকুণ্ডের ধারে দেখিলাম, ৪০।৫০ জন বালক মাথা নেড়া, সাদা আলখাল্লা গায়, খালি পায় এক এক ডাণ্টা হাতে বসিয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে দুইজন শিক্ষক দণ্ডায়মান। তাঁহাদের মাথা নেড়া, গলায় হলুদরঙের চাদর, গায়ে সাদা সার্ট, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছাখুলে কাপড় পরা, খড়ম পায় ডাণ্টা হাতে। ইহাদের দু'জনের মধ্যে একজন গুরুকুলের Boarding Superintendent দ্বিতীয়জন স্কুল বিভাগের Head Master

ছাত্রগণ সকলেই নিম্নশ্রেণীতে পড়ে, 5th class ও 6th classএর Examination শেষ হইয়া গিয়াছে, তাই এই অবসরে মুক্তকচ্ছ শিক্ষকগণ বালকছাত্রদিগকে লইয়া tripএ বাহির হইয়াছেন। উদ্দেশ্য Hardwar Canalএর স্রোতে কিরূপে Electricity প্রস্তুত হইতেছে, Electricityতে কিরূপভাবে হাড়গুড়া করা কল, ময়দা ভাঙ্গা কল, প্রভৃতি চলিতেছে, এই সব ছাত্রদিগকে দেখাইয়া সতীকুণ্ড দর্শন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করা। আশ্রমের পণ্ডিতগণ কেবল সংস্কৃত জানে, আমরা সংস্কৃত হিন্দি কিছুই ভাল জানি না, কোন ভাষায় পণ্ডিতদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিব, ইতস্ততঃ করিতে করিতে আমি ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত? উত্তর হইল We are Arjya by cast আমিত নিরুত্তর। তখন বিজয় তায়ার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত স্কটিস্‌চার্চ্চ

কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি, এস্ সি, পাশ করিয়া এম, এ, পড়িতেছেন। আর শিক্ষকদ্বয় কতকগুলি বালক লইয়া লাঠিহাতে খড়ম পায়ে,—নেড়া মাথায় কোন পাহাড়ের জঙ্গলে বাস করিতেছে, তাহাদের পাশ ফেলের কথাও কিছু জানি না, কিন্তু তাহাদের ইংরাজি বলার কায়দা দেখিয়া আমিত অবাক! কথাবার্ত্তায় যেন ঝড় বহিতে লাগিল। ভায়ার চাইতে তাহাদের ইংরাজী বলিবার ক্ষমতা অধিক বোধ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিদ্বার ভারতবর্ষের মধ্যে বেদ ও শাস্ত্র চর্চ্চার একটী শীর্ষস্থান। এই অধ্যাপকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় জানা গেল যে, হরিদ্বারের বৃহৎ দর্শনযোগ্য ব্যাপারই এই আর্য্য-সমাজীদিগের গুরুকুল-আশ্রম। গুরুকুল-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট বা রাজা মহারাজা কোনরূপ অর্থ সাহার্য্য করেন নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা মুনসীরাম স্বীয় অধ্যবসায় ও ভিক্ষার সাহায্যেই এই প্রকাণ্ড সুবৃহৎ গুরুকুল-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঠিক কনখলের অপর পারে ৩।৪ মাইল অতিক্রম করিয়া নীল পাহাড়ের পাদদেশে গুরুকুল আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। একধারে গঙ্গার একধারা প্রবাহিত, অপর তিন দিক ভীষণ-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন। গুরুকুলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে বড় মনোরম। লোকলোচনের অন্তরালে অভ্রভেদী পর্ব্বত-পাদদেশে আর্য্য-সমাজীগণ ক্রমে ক্রমে কি অভাবনীয় কাণ্ড-কারখানা করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িতে হয়। এই আশ্রমের মধ্যে স্কুল. কলেজ, বোর্ডিং Play Ground, Library. ফল-ফুলারি ও তরি-তরকারির বাগান, ডাক্তারখানা, গোশালা, চিত্রশালা, ছাপাখানা, সংবাদ পত্রের কার্য্যালয়, তাঁতের স্কুল, কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ও Ground অধ্যাপকদিগের বাড়ী এবং বিজ্ঞান শাখার প্রকাণ্ড Laboratory স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি বুঝিয়া দেখুন! আবার এখান হইতে সংস্কৃতে গুরুকুল-সমাচার ও Vedic magazene নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকাও বাহির হইয়া থাকে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই ভারতবর্ষ মৃতপ্রায়। আশ্রমের উদ্দেশ্য সেইরূপ প্রাচীনকালের ন্যায় বেদজ্ঞ, ত্যাগী, সংযত প্রকৃত ব্রহ্মচারী তৈয়ার করিয়া ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু দুঃখের বিষয় আর্য্যসমাজীদিগের আমাদের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে খাপ খায় না, ইহাদের দলের অনেকটা আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের দলের সহিত খাপ খায়। সে সব কথা পরে বলিতেছি। ছাত্রদিগকে এখানে যেমন বেদ, বেদান্ত, সংস্কৃত, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়,

তেমনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইংরাজীতে রীতিমত শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষকদ্বয় বলিলেন, আমাদের আশ্রমের Intermediate বা এল, এ, ক্লাসের ছাত্রগণ Calcutta Universityর এম, এ, ক্লাসের সমান শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ছাত্রগণ এদিকে যেমন নিরামিষাশী, মুণ্ডিত-মস্তিষ্ক, মুক্তকচ্ছ, নগ্নপদ, নিরীহ, আবার আবশ্যক হইলে তেমনি কোর্টপ্যান্‌টুলেন পরিয়া সাহেব সাজিয়া ঘোড়া ছুটাইতেও বিশেষ অভ্যস্ত। ড্রিল, ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি আধুনিক ক্রীড়াদিতেও বিশেষ পারদর্শী। ৯ বৎসর বয়সে উপনয়ন সারিয়া তাহাদিগকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়, আর ২৪ বৎসর বয়সে শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া তবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। ইহার মধ্যে ছাত্রদিগকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হয় না।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

তুমি।

তুমি হৃদয়ে আমার প্রেমের প্রবাহ
উছল অমিয়া ভরা,
তুমি বসন্ত-বায় বিমল সুষমা
ফুলের হাসিতে গড়া।
তুমি পুষ্প-পাত্রে সুরভি চন্দন,
প্রাণের মাঝারে প্রীতি,
তুমি নিদাঘে শান্ত শীতল পরশ,
বিরহে মিলন স্মৃতি।
তুমি স্বরগদীপ্তি—তটিনী-সঙ্গীত
বিশ্ব-বীণার তান,
তুমি তন্দ্রাকিনারে স্বপনের হাসি
পাগল করিতে প্রাণ।
তুমি সুনীল আকাশে স্নিগ্ধ-জ্যোছনা,
পুষ্পবিতানে অলি,
তুমি স্নেহের চেতনা—পুলক স্পন্দন
হৃদয়-বাগানে মালি।
তুমি এস হে আমার বক্ষ-আসনে,
আশীস্ করহে দান,
আমি সার্থক করি ও পদ পরশে
ত্রিতাপ-তাপিত প্রাণ।

শ্রীকেদারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শিক্ষার দোষ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রোদন-লোহিত উদাস বিস্ফারিত নয়নের করুণ দৃষ্টিতে ননির মাতার মুখের দিকে চাহিয়া, শোক-বাষ্প-বিরুদ্ধ কণ্ঠে, বড় মৃদুস্বরে একটি রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেগা, আমিত চিনিতে পারিলাম না ?"

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্মৃতিভূষণ ঠাকুরের স্ত্রী। বয়সে প্রৌঢ়া দেহ দীর্ঘ ও সম্পুষ্ট। বর্ণ গৌর ; মুখ-সৌন্দর্য্যে আর্য্যনারীর প্রতিভা বিদ্যমান। কিন্তু পুত্রশোকাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ এবং তাহাতে অতিশয় ম্লান।

ননির মা বলিলেন,—"আমার বাড়ী চাঁদের হাট। আমি চক্রবর্ত্তীদের বৌ।"

স্মৃতিভূষণ ঠাকুরের স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"মা ; আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমার বার বছরের ছেলে যমের মুখে দিয়াছি।"

ননির মাও কাঁদিয়া ফেলিলেন। ছেলের মা ছেলের শোক সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

তারপরে স্মৃতিভূষণ ঠাকুরের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ত মা, কখনও আমাদের বাড়ী এসনি, আ'জ কি মনে ক'রে ?"

ন-মা। আমি বড় বিপদে প'ড়েই এসেছিলাম মা। কিন্তু আমি এমনই হতভাগিনী যে, আমার বড় আশায় বড় নিরাশা জন্মিয়া গেল,—তোমরাও বড় কাতর।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় এই সময় বলিলেন,—"ও, তুমিই বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিলে—না ?"

ন-মা। হ্যাঁ বাবা ; আমিই বসিয়াছিলাম।

স্মৃতি। কি জন্যে আসিয়াছ ?

ন-মা। তা' আর বলিয়া লাভ নাই,—বলিতেও সাহস নাই—তোমরাও বড় বিপন্ন।

স্মৃতি। যখন আসিয়াছ, তখন বল।

ননির মাতা হীরাবাবুর সমস্ত কথা ও গত কল্য বধূহরণ প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। সকলেই স্থিরকর্ণে তাহা শ্রবণ করিলেন।

কথা সমাপ্ত হইলে গম্ভীরভাবে স্মৃতিভূষণঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা' আমার কাছে কেন আসিয়াছ ?"

ন-মা। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবাসী—হিন্দু-মুসলমান—ধনী-নির্ধন—সকলেরই দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছি,—কিন্তু দুঃখিনীর দুঃখে কেহই সহায় নাই। কোথায় যাব—কি করিব ভাবিয়া পাই নাই। আপনার দ্বারা সাহায্য পাইব কি না, আপনি কিছু করিতে পারিবেন না পারিবেন,—তাহাও ভাবিয়া দেখি নাই—মনের জ্বালায় ছুটিয়া আসিয়াছি। দশ যায়গায় যেমন ফিরিয়াছি, হয়ত আপনার দুয়ার হইতেও তেমনই ফিরিব—হয়ত অভাগিনী বৌমার সন্ধানও হইবে না—হয়ত পিশাচের পৈশাচিক অত্যাচারে সে চূর্ণ হইয়া যাইবে।

স্মৃতিভূষণ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"আমি চারিদিক্ হইতে বড় বিপন্ন।"

বর্ষীয়সী সুধার মা সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"হ্যাঁ, তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছ, তা' আবার পরের সাহায্য করিতে যাইবে।"

স্মৃতিভূষণের স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমাদের এ দুঃখের অন্ত করিবার কোন উপায় নাই—সহস্র দিন ধরিয়া কাঁদিলে বা শত-লোকের কৃপা-করুণা পাইলে আমাদের ধন ফিরিবে না,—কিন্তু চেষ্টা করিলে যদি ব্যথিতা রমণীর দুঃখ দুর হয়—চেষ্টা দেখিতে হইবে বৈ কি! আহা, বড় দুঃখে—বড় কষ্টে পড়িয়াই উনি আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন।"

স্মৃতিভূষণ একবার বিস্ফারিত নয়নে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন,—কোন কথা কহিলেন না।

কিঞ্চিৎ আশা পাইয়া ননির মাতা মৃদু-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার সাহায্য করিতে হইলে এখনই যাইতে হয়।"

সুধার মা বলিলেন,—"তোমার দেখ্‌ছি মা, আক্কেল নাই। এখন কি যেতে পারেন।"

স্মৃতিভূষণের স্ত্রী করুণস্বরে বলিলেন,—"নিঃসহায় রমণীর এ বিপদকালে আক্কেল বজায় রাখা দুর্ঘট।"

স্মৃতিভূষণ বলিলেন,—"আমি কোথায় গেলে, তোমার পুত্রবধূর সন্ধান পাইতে পারিব ?"

ন-মা। তা' কি আমি জানি বাবা? জানিলে তোমার এখানে না আসিয়া সেই স্থানেই যাইতাম।

স্মৃতি। কোন প্রকার সন্ধান পাও নাই?

ন-মা। না বাবা।

স্মৃতি। (গৃহিনীর প্রতি) আমার চাদরখানা আর ছাতাটি দাও।

স্মৃতিভূষণের স্ত্রী তাড়াতাড়ি চাদর ও ছাতা আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এখনও প্রাতঃ সন্ধ্যা হয় নাই। সেটা সারিয়া গেলে হইত না?"

"বিপন্নের সাহায্য করা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ উপাসনা"—এই কথা বলিয়া স্মৃতিভূষণ চাদরখানা স্কন্ধোপরি রক্ষা করিয়া ছত্রটি হস্তে লইয়া বিপদ্‌বারিণী শ্রীদুর্গা-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন।

ননির মাতাও গমনোদ্যতা হইলেন। স্মৃতিভূষণের স্ত্রী বলিলেন,—"তুমি এ বেলা এখানে থাকিয়া যাও মা,—বাড়ীতে কেহ নাই, এ বিপদে একমুঠা অন্ন উদরে পড়িবে না।"

ননির মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"যার, বেটার বৌ দস্যু-করে—কোন্ গোপন যায়গায় অপহৃতা, সে কোন্ সুখে ভাত-জল খাবে মা?"

সে কথার প্রত্যুত্তর না হইতে হইতেই ননির মাতা চলিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় স্মৃতিভূষণের বাড়ী হইতে একেবারে দয়ালচন্দ্র মিত্রের ভবনে গিয়া দর্শন দান করিলেন। দয়াল মিত্র গ্রামের মধ্যে ধনীব্যক্তি এবং বিষয়কার্য্যে ও মামলা-মোকদ্দমায় ভারি নামজাদা। তাঁহার শাসনে 'বাঘে—বক্রীতে' একঘাটে জল খায়। তাঁহার নামে স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী দশগ্রামের লোক হাড়ে কাঁপে।

দয়াল মিত্র ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে নূতন উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় দ্বাদশদিন অশৌচভোগ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন,—শ্রাদ্ধের আর তিন দিন মাত্র বাকী।

ব্রাহ্মণ ও স্থিতিশীল কায়স্থগণ তথা নবশায়কগণ তাঁহার বাড়ী খাইতে স্বীকৃত হইতেছে না। তাহারা বলিতেছে—যদি স্মৃতিভূষণ মহাশয় ব্যবস্থা দেন, আর নিমন্ত্রণে আসেন, আমরাও যাইব—নতুবা না।

যতদিন হইতে তিনি উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, ততদিন হইতেই স্মৃতিভূষণকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু স্মৃতিভূষণ কিছুতেই স্বীকৃত হইতেছেন না। তার জন্য তিনি গোপনে গোপনে স্মৃতিভূষণকে বশে আনিবার জন্য আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে সে চক্র-জাল বিচ্ছিন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া আছেন।

দয়ালমিত্র যখন আত্মীয় স্বজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রাদ্ধবিষয়ক দ্রব্যাদির আয়োজন-তালিকার আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় বাঁড়ুয্যে মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে দেখিয়া মুরুব্বি গম্ভীর হাসির ঈষৎ বিকাশ করতঃ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"কি ভায়া, খবর কি ?"

মিত্র মহাশয়ের বৈবাহিক চারুঘোষ এই কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, এবং বৈবাহিকের পার্শ্বে বসিয়া দ্রব্যাদির তালিকার আলোচনা করিতে-ছিলেন, তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন, অথচ কুলীন কায়স্থ হইয়া তাঁহার বৈবাহিক প্রণাম করিলেন না। তিনি তখনও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই বা জাতি কায়স্থের স্থলে ক্ষত্রিয় বলেন নাই। কিন্তু তখন কোন কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

মিত্র মহাশয়ের কথার উত্তরে বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"খবর বড় সুবিধা নয়।"

মিত্র। কিসের খবর সুবিধা নয় ?

বাঁড়ুয্যে। স্মৃতিভূষণের।

মিত্র। কি বলে ?

মিত্র মহাশয়ের বৈবাহিক চমকিয়া উঠিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে কায়স্থ হইয়া 'কি বলে' কে বলিতে পারে!

বাঁড়ুয্যে। কিছুতেই না,—তিনি বলেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন আপত্তি নাই। কিন্তু যতদিন ক্ষত্রিয়োচিত আচারবান্ না হইতেছেন—ক্ষত্রিয়োচিত প্রাণ না হইতেছে, ততদিন দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিলে অশৌচ যাইবে

না—অতএব এতকাল যে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, এখন হঠাৎ দ্বাদশ দিন অশৌচান্ত ও ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিলে, আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিব না,—তাহা হইলে অশৌচান্ন গ্রহণ করা হইবে।

ক্রোধে মিত্র মহাশয়ের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মুখে অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন,—"জ্বানে দাও। ও বেটা বিট্‌লে বামুন না এলে আমার মায়ের শ্রাদ্ধ বন্ধ হবে না।"

বাঁড়ুযো। স্মৃতিভূষণ না আসিলে কোন ব্রাহ্মণই আসিবে না।

মিত্র। না আসে না আসুক—রাঁধুনীবামুনের জা'ত না আসিলে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পণ্ড হয় না। বামুন জা'ত চিরকা'লই ক্ষত্রিয়ের দাসত্ব করিয়া ফিরিয়াছে।

মিত্র মহাশয়ের বৈবাহিক চারুঘোষ দুই হস্তে দুই কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া 'রাম রাম' করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"হ'রে, আমার পাল্কী ডাক—আমি এখনই বাড়ী যাব।"

দয়াল মিত্রের পিতৃব্য রামবাবু বলিলেন—"সে কি বাবা ?"

চারু। না মহাশয়, যেখানে ব্রাহ্মণের নিন্দা হয়, সেখানে কায়স্থ দাঁড়ায় না। যেখানে ব্রাহ্মণ অনাদৃত সেখানে ঘোষবংশ জলগ্রহণ করে না।

অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইল; চারুঘোষ কিছুতেই বুঝিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ বাড়ীতে আ'জ কখনই জলগ্রহণ করিবেন না—অধিকন্তু যদি ব্রাহ্মণগণ অশৌচান্ন বলিয়া শ্রাদ্ধ দিনে না আসেন, তবে তিনিও থাকিবেন না।

মিত্রম হাশয়েরা বিপদ গণিলেন। চারুঘোষ সমাজপতি লোক—তিনি যদি চলিয়া যান, সমাজের তিনভাগ লোক নিমন্ত্রণে আসিবে না।

রামসদয় অনেক দিন পর্য্যন্ত স্মৃতিভূষণকে বশে আনিবার জন্যে অনেক কৌশল করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই অশাস্ত্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, জানাইতেছেন, তখন তাঁহার শেষ অস্ত্র স্মৃতিভূষণের নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন;—এবং সমনাদি গোপন করিয়া পাঁচশত টাকা ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন। আ'জ তিনি সেই ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং ডিক্রীজারি করাইবার জন্য তখনই একজন লোক কোর্টে পাঠাইয়া দিলেন;—তাহাকে বলিয়াদিলেন, যত খরচই হউক, অন্ততঃ পরশ্বঃ তারিখে প্রত্যূষে স্মৃতিভূষণের সমস্ত অস্থাবর

সম্পত্তি আমার বাড়ী আসা চাই। দরিদ্র বামুন, তাহা হইলে না আসিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না।"

আদেশ পালন জন্য তখনই লোক চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, ইহা অতি গোপনভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্মৃতিভূষণ ঠাকুর বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু যাইবেন কোথায়? ননির মাতার বৌমা কোথায় অপহৃতা হইয়াছেন, কোথায় গেলে তাহার সন্ধান মিলিবে, সে সকল বিষয়ের সবিশেষ তথ্য না লইয়াই তিনি বাটীর বাহির হইয়াছেন,—তারপরে যে কার্য্যে তিনি বাহির হইয়াছেন, তাহাতে সফলকাম হইবেন কি না,—তাহাতে সুফল বা কুফল ফলিবে, তাহার আলোচনা না করিয়াই বাটীর বাহির হইয়াছেন, এখন কোথায় যাইবেন? কি প্রকারে তাহার সন্ধান করিবেন,—আর সন্ধান ও সাহায্য করিলে হীরাবাবু ও দস্যুগণ তাঁহার উপরে কি ব্যবহার করিবে, একবার তাঁহার মনে হইল,—কিন্তু তখনই তাহা মন হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন। বিপন্নের উদ্ধার করিতে হইবে—শরণাগতের রক্ষা করিতে হইবে, তাহার জন্য আবার অগ্র পশ্চাৎ ভাবনা ভাবিতে যায় কে? কিন্তু তিনি কোথায় গেলে তাহার সন্ধান পাইবেন।

গ্রামান্তরের মাঠে দাঁড়াইয়া স্মৃতিভূষণ সেই চিন্তা করিলেন। তারপরে স্থির করিলেন, থানায় গিয়া একবার সন্ধান করিয়া দেখা যাউক,—যদি এই ঘটনা কোন প্রকারে থানার কর্ম্মচারিগণের কর্ণে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা হয় ত অনুসন্ধানে লিপ্ত হইতে পারেন—সেখানে কোন প্রকার তথ্যও অবগত হওয়া যাইতে পারে। আর যদি থানার কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে কিছু না জানিয়া থাকেন, তবে সেখানে ইহা জানাইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করাও প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি থানা অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিয়াছে। অনলকিরণবর্ষী মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যগগনের প্রায় কাছাকাছি হইয়াছেন। থানাবাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী দেবদারু শ্রেণীর শ্যাম-সবুজ পত্রকুঞ্জে বসিয়া পাখীরা আর্ত্তস্বরের বিস্তার করিতেছিল,

এবং পুষ্করিণীর নীলজলে মৎস্তকুল ভাসিয়া আনন্দ-বারতা ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

থানার দারোগাবাবু তখন ভোজনাদি ব্যাপারের জন্ত বাসাবাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় একখান ভগ্নচৌকিতে বসিয়া গোলাপীবিড়ির ধূমপান করিতেছিলেন, এবং পার্শ্বের চালাঘরে তিন জন পশ্চিম দেশীয় সিপাহী 'ডা'ল-রুটী' পাকাইতেছিল।

স্মৃতিভূষণ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে থানাঘরে উঠিয়া নিজের চাদরে মুখ মুছিয়া ধূমপাননিরত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই কি দারোগা বাবু ?"

প্রৌঢ় বাবু স্মৃতিভূষণকে চিনিতেন। তিনি একটু হাত তুলিয়া বলিলেন,— "প্রণাম মশায়। আপনি কি আমায় চেনেন না ? আমি রামচন্দ্র বিশ্বাস,— আমি জমাদার। দারোগাবাবু বাসায় আছেন। দারোগাবাবুর নিকট কোন কাজ কি ?"

স্মৃতি। একটা সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।

জমা। কি সংবাদ ?

স্মৃতি। চাঁদেরহাটের একটি স্ত্রীলোক, দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে,— আপনারা সে খবর অবগত হইতে পারিয়াছেন কি ?

জমা। আমরা সে সংবাদ বিশেষরূপেই জানি,—অধিকন্তু আমরা সে জন্ত একটু বিপন্নও হইয়া পড়িয়াছি।

স্মৃতি। কি প্রকার ?

জমা। বসুন, দাঁড়িয়ে রহিলেন কেন ?

পার্শ্বে একখানা চেয়ার ছিল, স্মৃতিভূষণ তাহাতে উপবেশন করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি বলুন দেখি ?"

জমা। ঐ স্ত্রীলোকটি আপনার কেহ হন না কি ?

স্মৃতি। না।

জমা। তবে সে সংবাদে আপনার কি প্রয়োজন ?

স্মৃতি। তাহার শাশুড়ী আমাকে সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছে।

জমা। হ'য়েছে কি জানেন, সেই স্ত্রীলোকটিকে দস্যুগণ ধরিয়া আনিবে, এ সংবাদ আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাই;—সদলবলে আমরা তাহার নিকটে উপস্থিত হই এবং দস্যুগণের কবল হইতে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনি।

স্মৃতি। তারপর—তারপর ?

জমা। তারপরে সেই স্ত্রীলোকটিকে আনিয়া দারোগাবাবুর বাড়ীর মধ্যে রাখা হয়,—স্ত্রীলোকটি অজ্ঞান-অবস্থায় ছিল।

স্মৃতি। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল?

জমা। আমরা পাল্কীর মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পাই—আনাও হয় অজ্ঞান অবস্থায়—বাসাবাড়ীর মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল, ততক্ষণও অজ্ঞান ছিল।

স্মৃতি। সেটা অজ্ঞান-অবস্থা কি মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াছিলেন?

জমা। ডাক্তার আনান হইয়াছিল,—তিনি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একদম স্থগিত রহিয়াছে—যদি ইহার ক্রিয়া ভাল হয়, তবে বাঁচিবে, নতুবা না। অবস্থা আশাপ্রদ নহে।

স্মৃতি। তবে কি স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে?

জমা। মৃত্যু হইয়াছে কি না হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না।

স্মৃতি। সে এখন কোথায়?

জমা। তাও বলিতে পারি না।

স্মৃতি। সে কি?

জমা। ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলে, ঔষধ সেবন করাইয়া বাসাবাড়ীর একটা ঘরে তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখা হয়,—একজন বাগ্‌দীদের একটি বিধবা স্ত্রীলোককে উহার পরিচর্য্যার ভার দেওয়া হয়। সে খাইতে বাড়ী গিয়াছিল,—আসিয়া দেখে, যে ঘরে রমণী ছিল, সে ঘরে নাই। দারোগা-বাবুকে জিজ্ঞাসা করে,—দারোগাবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ক্রমে আমরা সকলেই ঐ কথা শুনিলাম—সকলে বাসার চতুর্দ্দিকে ক্রমে সমস্ত গ্রামে—বনে জঙ্গলে—তারপরে গ্রামের বাহিরে অনুসন্ধান করা গেল, কোথাও আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ইহাতে আমাদের বিপদ আছে—কাজেই আ'জ পুলিসসাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে, এবং তাহার বাড়ী অনুসন্ধান করিতে যাওয়া হইয়াছিল—এবং যেখানে যেরূপ-ভাবে সন্ধান করিলে মিলিতে পারে, মনে করা গিয়াছে, সেখানে সেইরূপ-ভাবেই সন্ধান করা হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোথাও মিলাইতে পারা যায় নাই। বোধ হয় পুলিসসাহেবও আ'জ কিম্বা কা'ল আসিবেন। তাই বলিয়াছিলাম—সেই রমণীর জন্যে আমরা কিছু সঙ্কটাপন্ন হইয়াছি।

স্মৃতিভূষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে এই সকল সংবাদ ননির মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন।

ননির মাতা দারোগাবাবুর নিকট ইতিপূর্ব্বে এসকল সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এবং বধূমাতার জন্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে ননির নিকট এই সমুদয় বার্ত্তা লিখিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। এখন না জানাইয়া আর উপায় নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সৌন্দর্য্য।

মুকুরে নেহারি' আপন মূরতি
রসে ঢল ঢল ষোড়শী যুবতি
মুচ্‌কিয়া হাসে গরবে।
প্রতিবিম্ব তার উঠেছে ফুটি'
কেশগুচ্ছ পড়ে চরণে লুটি'
বাখানে সে নিজে গরবে॥
রূপের ছটায় দীপ্ত কক্ষ
গরবে তাহার পূর্ণ বক্ষ,
নিন্দে সে নিখিল জগতে।
কনক-কান্তি সুনীল-বসনা
বিম্ব-অধরা নিবিড়-জঘনা
(সে যে) সুন্দরীর সেরা মরতে॥
দিব্য দরশনে মানস-মুকুরে
নিজকে নেহারি' মনোরম পুরে,
শান্ত যাহার প্রকৃতি।
সেই ত সুন্দর অহমিকা-হীন
ধ্রুবজ্যোতি যার অসীমে বিলীন
কে বলে সুন্দরী সে যুবতি?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

হারানিধি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দুর্ব্বৃত্ত স্বামীকে পুলিসের হস্তে দিয়া উপযুক্ত শাসন করিবে, না চিরদিনই তাহার হস্তে এইরূপভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মেরী শিশুটীকে কোলে লইয়া সম্মুখের পথ ক্রমশঃ অতিক্রম করিতেছে; যতই চলিতেছে, ততই তাহার ভাবনাও বাড়িতেছে; ক্রমে সে যেন অস্থির হইয়া পড়িল। হতভাগিনী আর চলিতে পারিল না, পথের মধ্যে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল; ভাবিল, পুলিসের হাতে প্রদান করিলে তাহার স্বামীকে নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা সে প্রতিদিন তাহার সমস্ত অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিবে। আর তাহার পুলিসে যাওয়া হইল না; সে পুনরায় গৃহের দিকে ফিরিল, ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল; দেখিল পাষণ্ড স্বামী অবশিষ্ট যৎ-সামান্য যাহা কিছু বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য ছিল, সমস্তই লইয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছে; ঠিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার পান-আশা পরিতৃপ্তির পথ পরিষ্কার করিয়াছে। হতভাগিনী স্বামীর এবম্বিধ ব্যবহারে যারপর নাই ব্যথিতা হইয়া কোল হইতে পুত্রকে ফেলিয়া ভূতলে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

এদিকে দস্যু মুর জিনিষগুলি হাটে অল্পদামে বিক্রয় করিয়া শুঁড়ির দোকানের দিকে চলিল। সেথায় আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া পথে বাহির হইল; চলিতে চলিতে মনে ভাবিল, মেরী নিশ্চয়ই পুলিসে রিপোর্ট করিয়াছে, আর তাহার মুখ দেখিব না—আর গৃহেও যাইব না, যে কয়টী মুদ্রা আছে তাহাতে যতদিন চলে এইরূপভাবে চালাইয়া পরে যা হয় করা যাইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দস্যুও তস্করের আবাসস্থান কাফিখানায় প্রবেশ করিল।

দুষ্ট তো আপনার মতলব আঁটিয়া নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু পতিপ্রাণা মেরী দুঃখে ও চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যত কাঁদিতেছে, শিশুটীও ততই কাঁদিতেছে, মাতা-পুত্রে এইরূপ কতক্ষণ কাঁদিল, অবশেষে স্নেহময়ী জননী শিশুপুত্রের অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল সদুঃখে চুম্বন করিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মানসে আপনারও শোকাবেগ বাহ্যিক হ্রাস করিয়া তাহাকে নানা-প্রকারে ভুলাইতে লাগিল। হায়! সরল শিশু মাতার বাহ্যিক রোদন

উপশমান্তে কতক সুস্থির হইল ও সস্নেহে জননীর গলা বেষ্টন করিয়া, মায়ের মিষ্ট কথায় আশ্বস্ত হইয়া, অতীত দুঃখের ঘটনা সমস্ত ভুলিয়া মাতৃ-অঙ্কে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল! মেরীও ক্রোড়স্থ শিশুকে শোওয়াইয়া ভগবানের নিকট সরোদনে আপনার দুঃখকাহিনী জানাইয়া, স্বামীর সুমতি প্রার্থনা করিতে করিতে শিশুর পার্শ্বে শয়ন করিল ও অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া জাগ্রত জীবনের সকল দুঃখ সকল অবসাদ ভুলিয়া গেল!

পরদিন মুর ঘরে ফিরিয়া যাইবার অভিলাষ করিলেও ভয়ে যাইতে পারিল না। তাহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, মেরী নিশ্চয়ই পুলিসের শরণাপন্ন হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে; সুতরাং গৃহে যাইলেই পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইতে হইবে, দুর্বুদ্ধি মুর এইরূপ ভাবিয়া আর ঘরে ফিরিল না। গত রাত্রে কাফিখানায় যাইয়া দুষ্টদের সঙ্গে পড়িয়া জুয়া খেলিয়া যে কয়টী মুদ্রা ছিল, সমস্তই হারাইয়াছে! এখন আবার যে মুর সেই মুর! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! নিদ্রার ব্যাঘাতে দেহ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! কি খায়—কোথায় ঘুমায়—এখন এই ভাবনাতেই দুষ্ট একেবারে কাতর হইয়া পড়িল।

হতভাগ্য পথিমধ্যে একটি পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া অবিলম্বেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইল, কিন্তু ক্ষুৎ-পিপাসায় নিদ্রা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না; তাহাকে উঠিয়া বসিতে হইল, বসিতেও কষ্টবোধ হইতেছে—মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতেছে, হস্তপদ ক্রমে যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে; একবার মনে ভাবিতেছে অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক—ঘরে গিয়া উদর পূরিয়া আহার করি; তাহার পর পুলিসে যাইতে হয় যাইব! আবার মনে হইল—কি মুখ লইয়া পুনরায় ঘরে যাইব, মেরীকে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া, তাহার জিনিষ অপহরণ করিয়া বিক্রয় করিয়াছি, সেই পয়সায় মদ খাইয়া জুয়া খেলিয়া আবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, এখন কি করিয়া আবার তাহার নিকট যাইয়া আহার চাহিব। আহা! কোলের শিশুকে কোল হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি, কোন মুখে আবার তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিব! পাপিষ্ঠের মনে এখন অনুতাপ আসিয়াছে, ক্ষুধানলের সঙ্গে সঙ্গেই অনুতাপানল আসিয়া সময় বুঝিয়া যোগদান করিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া শীঘ্রই চৈতন্য হারাইল।

এদিকে শোকাভিভূতা মেরীর নিদ্রাদেবীর প্রসাদে শীঘ্রই রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতে উঠিয়া মনে ভাবিল, স্বামী রাত্রে আসে নাই—এখনই আসিবে, এই ভাবিয়া শীঘ্রই ঘর-সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তবুও মুর ফিরিল না। মুরের আশাপথ চাহিয়া মেরীর সমস্ত দিন কাটিয়া গেল,—তথাপি মুরের সাক্ষাৎ নাই; মেরী বড়ই ভাবিতা হইয়া পড়িল, তাহার মনে নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। হায়! শিশুটীরও দুঃখের অবধি নাই। সমস্ত দিন পিতাকে না দেখিয়া, তাহার উপর জননীর বদনমণ্ডল সততই বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; মেরীও আর স্থির থাকিতে পারিল না; পুত্রকে কোলে লইয়া স্বামীর সন্ধানে বাহির হইল।

শুঁড়িখানা, বাজার, আড্ডা প্রভৃতি সর্ব্বত্র অনুসন্ধানে স্বামীর দেখা না পাইয়া ক্লান্ত-হৃদয়ে সে যখন শিশুকে লইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল, তখন কয়েকজন লোকের মুখে শুনিতে পাইল, এক মাতাল পার্কের ধারে একখানা বেঞ্চে শুইয়া আছে, পুলিস আসিয়া লোকটীর অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিতেছে না। মেরী এই কথা শুনিয়া কাল-বিলম্ব না করিয়া, পুত্রটীকে কোলে লইয়া ঠিক নির্দ্দেশ মত স্থানে উপনীত হইল, এবং আপনার স্বামীকে দেখিয়াই তাহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিলে, পুলিস মুরের সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল; মেরী উপস্থিত বুদ্ধিমত পুলিসের নিকট আপনার স্বামীর বিষয় যথাযোগ্য জানাইয়া তাহাকে বাটীতে লইয়া আসিবার জন্য পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিল। বালকটী পথিমধ্যে পিতার অবস্থা ও পুলিস সমভিব্যাহারে বহু লোক-সমাগম দেখিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। যাহা হউক, মেরী অতিকষ্টে পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া পুলিসের সাহায্যে স্বামীকে বাটীতে আনিয়া ফেলিল।

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পতিব্রতা মেরী সারারাত স্বামীর সেবায় নিযুক্তা। অনেক চেষ্টার পর মুরের সামান্য জ্ঞানোন্মেষের চিহ্ন দেখা দিল; মেরী যেন হাতে স্বর্গ পাইল, সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল অবসাদ মেরী মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল। মেরী ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে স্বামীর শুশ্রূষায় রত হইল। যাহা হউক, মেরীর সেবায় ক্রমশঃ মুরের চেতনার সঞ্চার হইল। সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল যে সম্মুখে মেরী। সে মনে করিল,

মেরী তাহাকে পুলিসের হাতে সোপর্দ্দ করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া পার্ক পর্য্যন্ত আসিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই ঘরের চারিদিক বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল—সে ত পার্কে নাই; সে যে আপনার ঘরে আপনার শয্যায় শায়িত; —মেরী তাহার পদতলে উপবিষ্ট; সে কি করিয়া ঘরে আসিল, কে তাহাকে ঘরে আনিল, এই ভাবিয়াই সে বিস্ময়ে আকুল হইয়া উঠিল! তাহার মুখে কথাটী নাই—বাক্‌শক্তি যেন রহিত হইয়া গিয়াছে! একবার মেরীর মুখের দিকে চাহিতেছে, একবার ঘরের চতুর্দ্দিক দেখিতেছে; বলিতে কি, মুর একেবারে বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছে।

মুরের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া মেরীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছে! সে একমনে ভগবানের নিকট স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে—মেরীর এবম্বিধ আন্তরিক নীরব প্রার্থনা মুর কিছুই অবগত হইল না—এক অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই শুনিতে পাইল না! তাহার মনের আশা কি পরম পিতা পূর্ণ করিবেন? দেখি, কর্ম্মফলের তীব্র তাড়না তাহাকে আরও কতদূর ভাসাইয়া লইয়া যায়।

মুর বিছানায় পড়িয়া অনিমেষ-নেত্রে মেরীর প্রশান্ত-গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া আছে; হতভাগ্য কি পত্নীর নীরব রোদন শুনিতে পাইতেছে—মেরীর হৃদয় বেদনা কি অনুভব করিতে পারিতেছে; হতভাগ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আরম্ভ হইয়াছে! অনুতাপানলে তাহার হৃদয় কি দগ্ধ হইতেছে! না আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় বুঝিয়া স্থির মনে আপনার কু-অভিপ্রায়ের কল্পনা করিতেছে। যাহা হউক, পতিপ্রাণা মেরী মুরের এইরূপ অবস্থায় অতিমাত্র ব্যথিতা হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি কতকটা সুস্থ বোধ করিতেছ! কিছু খাইবে কি? মুর মেরীর সাদর-সম্ভাষণে ও সন্তোষ-জনক প্রশ্নে একেবারে স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল; ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় তাহার পুনরায় সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইতেছিল,—তথাপি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না, এখন মেরীর প্রশ্নে যেন হৃত জীবনী-শক্তি পুনর্ল্লাভ করিল; ঘাড় নাড়িয়া কিছু খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল ও ক্ষীণ স্বরে বলিল, মেরী! অগ্রে একটু জল দিয়া আমার জীবন বাঁচাও; তাহার পর কিছু খাইতে দিও। মেরী তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল ও তৎপরে খাবার আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল! তাহাকে আহারাদি করাইয়া মেরী বলিল,—দেখ যাহা করিয়াছ বেশ করিয়াছ! আমি তাহার

জন্য তিলমাত্রও দুঃখিতা নহি; যে দুঃখ পাইয়াছি সে আমার অদৃষ্টের দোষ, এত কষ্টেও যদি তোমাকে সুখী করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিব; যাহা হউক, এখন নিদ্রা যাও! আমিও একটু বিশ্রাম লাভ করি, এই বলিয়া মেরী ভূমিতলে একখানি কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিল।

মেরী প্রত্যুষেই উঠিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছে, এমন কি মুর ও চার্লসের উঠিবার অগ্রেই তাহার প্রাতঃকালীন কার্য্য সকল সমাধা করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমে একটু বেলা হইলে সুকুমার শিশু নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া ক্ষুধায় কাঁদিতে লাগিল। আহা! দুধের বাছা—গত রাত্রে কিছুমাত্র আহার করিতে পায় নাই,—তাই সকালে উঠিয়াই খাবারের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে! মেরী অই সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে সান্ত্বনা দিবার মানসে দৌড়াইয়া আসিল ও চার্লসকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। পরে ঘরে যাহা খাবার ছিল, তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল! বালকের উদর-পূর্ত্তি হইলে সে শান্তভাব ধারণ করিয়া আপন মনে খেলিতে লাগিল! এতক্ষণে মুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল; মুর শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল কিন্তু অত্যধিক শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শয্যা হইতে ভূমিতলে নামিতে তাহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইল। মাথা ঘুরিয়া তাহার যেন পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, মুর অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় মেরী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও বলিল, দেখ তোমার দেহ এখনও অতি দুর্ব্বল! এখন তোমার উঠিবার কোন প্রয়োজন নাই; তুমি শয়ন কর, যাহা কিছু প্রয়োজন হয় বল, আমি আনিয়া দিতেছি; এখনই চা তৈয়ার করিয়া আনিতেছি, একটু পান করিলে অনেকটা সুস্থ বোধ করিবে; তাহার পর কিছু আহার করিয়া পুনরায় ঘুমাইবার চেষ্টা কর। মেরী এই বলিয়া অনতিবিলম্বে চা তৈয়ারী করিয়া তাহার সঙ্গে সামান্য রুটী ও অন্য যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া স্বামীর নিকটে ধরিল! মুর একে একে সমস্তই উদরসাৎ করিয়া যেন শরীরে অনেকটা বল পাইল।

মেরীর কথায় মুর সেই দিন উঠিয়া চলিবার আর বেশী চেষ্টা করিল না! রাত্রিও সেইভাবে কাটাইল; পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া মেরীর নিকট পুনরায় মদের পয়সা চাহিল। বলিল, মেরী! আজ তিন দিন মদ না খাইয়া একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি; শরীরে আর কিছুতেই

বল পাইতেছি না! আজ একটু মদ না খাইলে আর বাঁচিব না, মেরী, মুরের এই প্রস্তাবে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল; এবং ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে খুব মিষ্ট ভৎর্সনা করিল; কিন্তু সে ভৎর্সনায় মুরের হইবে কি! "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। মেরীর ভৎর্সনায় কিছুই ফল হইল না! মুরের মদ খাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছে—কে তাহাকে রোধ করে? মুর প্রথমতঃ মেরীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরী কিছুতেই ভুলিল না; সে বলিল, সে আর মদের পয়সা যোগাইতে পারিবে না। হতভাগিনী মনে ভাবিয়াছিল যে, এইবার তাহার স্বামীর চরিত্র সংশোধন হইবে, মতি-গতি ফিরিবে, কিন্তু হায়! হিতে বিপরীত হইল! এখন বুঝিল যে, সে তাহার সর্ব্বনাশ আপনই ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছে। মাতাল স্বামীকে ঘরে আনিয়া আপনার দুঃখের পথ আপনিই পরিষ্কার করিয়াছে।

মেরীর তিরস্কার বাক্যে মুরের চৈতন্য হওয়া দূরে থাক, তাহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দুর্বৃত্ত ঘরের চারিধার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, যে ঘরে আর বিক্রয়ের উপযুক্ত কোন দ্রব্যই নাই! তখন সে মেরীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া মদের পয়সা হস্তগত করিবার মানসে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল "মেরী! আমি চলিলাম! মদের জন্য আমি চলিলাম; দেখি কোথাও মদ পাই কি না! আমার মদ যোগাইতে যদি তুমি বিরক্ত হও আর আমি তোমায় বিরক্ত করিব না! যেখানে মদের সন্ধান পাই যাইব— সুতরাং আজ হইতে আর আমার আশা করিও না! মদের জন্য আজ হইতে আমি তুমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন!" মেরী মুরের কথায় ভীত না হইয়া বলিল "মদ যদি তোমার এতই প্রিয়—মদ না পাইলে যদি তুমি স্ত্রী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হও—আমি আর তোমায় বৃথা বাধা দিব না! তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিতে পার। আমি আজও গতর খাটাইয়া খাইতেছি, কালও খাইতে পারিব! যে অবধি মদের আস্বাদন পাইয়াছ, কখনও সংসারের জন্য এক পেনীও অপব্যয় করনি—যা উপায় করিয়াছ সমস্তই মদ খাইয়া উড়াইয়াছ; তাহার পর চাকুরী হারাইয়া মদের জন্য ঘরের জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিয়া আমাকে একেবারে পথের ভিখারিণী করিয়াছ! ইহাতেও কি তোমার পান-আশা পরিতৃপ্ত হয় নাই; আরও আমায় কত যন্ত্রণা দিবে, আর আমার এখন সামর্থ্য নাই যে, তোমায় প্রত্যহ মদের পয়সা

যোগাইব! দেখ, আমার কথা রাখ—মদ খাওয়া পরিত্যাগ কর; যতদিন না আবার তোমার চাকুরী হয়, আমি তোমায় খাওয়াইব! তোমার কিছুতেই কষ্ট হইবে না;” এইরূপে স্বামীকে বুঝাইতে বুঝাইতে দুই চক্ষের জলে মেরীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল!

মেরীর কথাগুলি শুনিয়া মুর কি ভাবিয়া বাহির হইতে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল, মেরীর কথার একটীরও প্রত্যুত্তর করিল না! ইহাতে হতভাগিনী ভাবিল, বুঝি বা স্বামীর সুমতি হইল; স্বামীকে ঘরে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মেরী অনেকটা আশ্বস্তা হইয়া প্রকাশ্যে বলিল, “দেখ, আমার কার্য্যে যাইবার সময় হইল, আমি এখন চলিলাম! ঘরে খাবার তৈয়ারী রহিল—নিজে খাইও এবং চার্লিকে ও খাওয়াইও!” গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথে যাইতে যাইতে মেরীর আর আনন্দ ধরে না; সে স্বামীর স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল ভাবিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে কার্য্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

শ্রীননীলাল সুর।

কৃষি ও শিল্প।

কৃষি আমাদের প্রাণ
শিল্প আমাদের দেহ।
এ অস্বীকার করিতে
পারিবেনা কভু কেহ॥

শিল্প-তরে কত জনে
করিতেছে কত দান;
কৃষির লাগিয়া কেন
এতটুকু নাহি টান!

প্রাণ না থাকিলে হায়,
থাকিবে কেমনে দেহ,
ভাবিয়া তোমরা তাহা
দেখকি কখনো কেহ।

শ্রীরোহিণীকুমার দাস।

ত্রিবেণী-সঙ্গম।

বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম "ত্রিবেণী" ভারতের একটি পবিত্র তীর্থস্থান; কারণ এইস্থানে পুণ্যতোয়া তিনটী নদীর একত্রে সঙ্গম হইয়াছে। এই পুণ্য-সলিলা নদী তিনটীর (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর) একত্রে সমাবেশ পুণ্য প্রয়াগধাম ও ত্রিবেণীতীর্থ ব্যতিরেকে আর কোথাও হয় নাই; এবং যে স্থানে উহাদের সঙ্গম হইয়াছে, সে স্থানটীও বড়ই নয়নরঞ্জন। একে তীর্থ, তাহাতে নয়নরঞ্জন, কাজেই উহা দেখিবার জন্য অন্তঃকরণে বলবতী বাসনার সৃষ্টি হইল, এবং তাহা নিবৃত্তি করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং আমারও বলবতী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে হইল। কালে যে উহা ফলবতী হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। নদী তিনটীর একত্র সমাবেশ-রূপ পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া হৃদয়ে যে কি এক—অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, এস্থলে তাহাই বর্ণনা করিব। বুঝিতেছি, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই এবং সেরূপ লোক খুবই বিরল—যাঁহারা ইহা সন্দর্শন না করিয়াছেন; তথাপি আমার চক্ষে উহা যে কি রমণীয় শোভাই বিস্তার করিয়াছিল, কি স্বর্গীয় মহান্ ভাবে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু প্লাবিত করিয়া তাহাতে আর এক অভিনব ভাবের সমাবেশ করিয়াছিল এবং আজও পর্য্যন্ত আমি ভগবানের সেই পরম রমণীয় রচনা কৌশল-বিজড়িত যে সুমহান্ ছবিখানি হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে অতিযত্নে আঁকিয়া রাখিয়াছি; তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। কি সুন্দর দৃশ্য সে! আমি যুক্তবেণী বা বাঁশবেড়িয়ার সন্নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণী-তীর্থের কথা বলিতেছি না। এস্থানের দৃশ্য অপেক্ষা যুক্তবেণী বা পুণ্য প্রয়াগধামের দৃশ্য আরও মনোমুগ্ধকর, আরও নয়নরঞ্জন, আরও সুমহান্ স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ। ত্রিবেণীধামে তিনটী নদী ত্রিধারায় আসিয়া ও এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া আবার বিভিন্নপথে চলিয়া গিয়াছে। নদী তিনটীর ভিন্ন গতি এবং বিভিন্ন পথ এখানে সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পুণ্য প্রয়াগধামে যুক্তবেণীর শোভা যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি সে রমণীয়তা জীবনে

কখনও ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কি মধুর। এক দিকে হরশির-বিহারিণী মা জাহ্নবীর কর্দ্দমাক্ত জলরাশি, অন্যদিকে যমুনার নির্ম্মল নীলাভ সলিল ; যেন হর-হরি-সম্মিলন। সরস্বতী এখানে অন্তঃসলিলা। গঙ্গা-যমুনার এইরূপ আশ্চর্য্য সঙ্গম এখানে স্পষ্টই অনুমেয়। এই সংমিশ্রণ যে ভাবুক-হৃদয়ে এক নব ভাবের সৃষ্টি করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? স্থূল-জগতের এই আশ্চর্য্য ঘটনাবলী দর্শনান্তে অনুসন্ধিৎসু হইয়া সূক্ষ্ম-জগতে একটু প্রবেশ করিলে এবং অন্তর্দৃষ্টিতে আমাদের দেহ-জগত অবলোকন করিলে, সেখানেও এইরূপ ত্রিবেণী-সঙ্গম উপলব্ধি হইয়া ভগবানের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে বিমোহিত হইতে হইবে। এবং বিমোহিত হইয়াই আমি এখন অন্তর্জগতের যে সূক্ষ্মতম সীমায় উপনীত হইয়াছি, আজ তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ভ্রমাত্মক হইয়া যদি কোন অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া ফেলি, সুধীগণ আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে চির কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব।

ত্রিধারায় ত্রিজগৎ প্লাবিত। স্বর্গে গঙ্গা "মন্দাকিনী" স্বচ্ছনীরা। ধারা-রূপে সুধা বহন করিয়া দেবগণের ও তদ্ভাবাপন্ন মুক্ত জীবগণের পিপাসার শান্তি করিতেছেন। মর্ত্ত্যে মা ভাগীরথী জাহ্নবী, ধরাবাসী পাপাত্মাগণের কাতর ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া শিবশির পরিহার পূর্ব্বক, শৈল-দেহ বিদীরণ করিয়া ধারারূপে ধরা'পরে গোমুখী-পথে প্রবাহিতা। মাতার পবিত্র জল স্পর্শে শত শত জীব মুক্ত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, শিবের জীবন-সর্ব্বস্ব জীবনরূপে ভারতের জীবন রক্ষা করিতেছেন। মাতার সুকোমল অঙ্গ স্পর্শে ভারত আজ শস্য-শ্যামল বাণিজ্যশালী ও উন্নতিশীল জনপদ। গঙ্গার ন্যায় প্রবলা নদী না পাইলে ভারতের বোধ হয় আজ এত উন্নতি লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিত না। লীলাময়ীর অনন্ত লীলা, ক্ষুদ্র মানব আমরা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব।

তারপর পাতালে মা "ভোগবতী"। জননী শুধু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে লীলা বিস্তার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পাতালপুরে অসুরদিগকেও সান্ত্বনা দিবার জন্য মা আমার শান্তি-বারিরূপে ভোগবতী নামে প্রবাহিতা। তাই বলিতেছি, ত্রিধারায় ত্রিজগৎ প্লাবিত। শুধু প্লাবিত কেন মুক্ত ও শান্ত। এই তিনের সংযোগই "ত্রিবেণী"।

এত গেল স্থূল-জগতের কথা। একটু সূক্ষ্ম-জগতে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, সেখানেও ত্রিধারা প্রবাহিতা হইতেছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে এক গঙ্গাই যেমন তিনটী বিভিন্ন নামে ত্রিধারায় প্রবাহিতা হইতেছেন; আমাদের এই দেহ-জগতেও সেইরূপ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, তিনটী নাড়ী প্রবল বেগে প্রবহমানা। স্বর্গে মন্দাকিনী স্বরূপ দেহ-জগতের ঊর্দ্ধতন প্রদেশে ইড়া, মধ্যপ্রদেশে পিঙ্গলা ও অধঃপ্রদেশে সুষুম্না প্রবাহিতা। কি সুন্দর সমাবেশ। বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইতে হয়। এই তিন নাড়ীর সমষ্টি বা সংযোগই "ত্রিবেণী সঙ্গম"। ঊর্দ্ধদেশে ইড়া নাড়ী, ঐশ্বরিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া মনুষ্যকে সাধনার পথে প্রধাবিত করিতেছে। মধ্যদেশে পিঙ্গলা নাড়ী মানুষের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্লেদমুক্ত করিয়া কর্ম্ম-জগতে নিয়োগ করিতেছে; এবং নিম্নদেশে সুষুম্না নাড়ী পবিত্রতার মূর্ত্তিমতীরূপে আসুরিক বৃত্তি সমুদয় ধ্বংস করিয়া মনুষ্যকে সুপথে চালিত করিবার জন্য দুইটীকে সাহায্য করিতেছে। আবার এই তিনটীর সংযোগস্থলই দেহ-জগতের "ত্রিবেণী-সঙ্গম" বা "স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম"।

কর্ম্ম-জগতেও ত্রিধারা প্রবাহিত। সঙ্কল্প, সাধন, ও ফল। এখানে মনের কিঞ্চিৎ কার্য্য আছে। মন, আত্মারই বিকাশ মাত্র, আত্মা আবার ভগবানের স্বরূপ। যেমন এক গঙ্গাই ত্রিধারায় ত্রিলোকে প্রবাহিতা, সেইরূপ কর্ম্মজগতে এক আত্মা বা উঁহার বিকাশ "মন" তিনটী বিভিন্নরূপে কার্য্যে নিযুক্ত। বাসনাই কর্ম্ম। মনোমধ্যে বাসনার উৎপত্তি না হইলে কর্ম্মের সৃষ্টি হয় না। যে কোন কার্য্যই কর না কেন, তাহার প্রথম উৎপত্তি মনে। যেমনই মনোমধ্যে কোন একটা কর্ম্ম করিবার জন্য সংকল্পের উৎপত্তি, সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সাধন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন ও সমাপনান্তে ফলাফল চিন্তা। ত্রিধারা একত্রে প্রবহমান। ফলাফল চিন্তা না করিয়াও কদাচ কাহাকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা কুত্রাপি ফলাফল চিন্তা করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন। আবার সেই অভিলষিত কর্ম্ম সমাপনান্তে ফললাভ করিয়া আনন্দ উপভোগ করাই "ত্রিবেণী-সংযোগ"।

আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক্, দেখিব ধর্ম্মমার্গেও সেইরূপ। প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান এবং এই তিনের সংযোগই "মুক্তি"-রূপ ত্রিবেণী-সঙ্গম। প্রেম-

হইতে ভক্তি ও ভক্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানের সম্যক বিকাশ না হইলে মুক্তিরূপ ফল-লাভ হয় না। এস্থলেও "মনের" কার্য্য, কারণ মনেই প্রেমের বিকাশ। বর্ত্তমান সময়ে প্রেম শব্দটী অনেক স্থলে কুরুচি-রূপক হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা স্বর্গীয় ও মহান্। কতকগুলি অর্ব্বাচীন কুরুচি-সম্পন্ন লোকের হস্তে পড়িয়া উহা আপাততঃ কুভাব ধারণ করিলেও, যে জিনিষ স্বভাবতঃ মহান্, তাহার মহত্ত্ব কখনও লোপ পায় না। হীরকখণ্ড মৃত্তিকালিপ্ত থাকিলেও যেমন তাহার স্বভাবজাত উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় না; সেইরূপ যে জিনিষ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভূষিত, যে কোন রূপেই ব্যবহৃত হউক না কেন, তাহার স্বাভাবিক মধুরতার কোন বিশ্লেষণ ঘটে না। আমার বর্ণিত এ প্রেম, সেই স্বর্গীয়, অবিনশ্বর ভগবৎ-প্রেম। ইহার মূলে ভক্তি, বিনিময়ে জ্ঞান ও ফলে মুক্তি বা মোক্ষ।

বলিয়াছি প্রেমের উৎপত্তি মন হইতে। সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিতে মন বড়ই তৎপর। সুন্দর বস্তু দেখিলেই মন কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই আপনা হইতেই তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করে বা ভোগ করিবার জন্য বাসনার সৃষ্টি করে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। ভাবুকগণ সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমে তাহার উৎকর্ষতার সহিত ভগবানের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে মন অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। ক্রমে মানব এরূপ তন্ময় হইয়া পড়ে যে, তখন মনে ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছুই স্থান পায় না। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই দিকেই অনন্ত-করুণাময়ের অনন্ত সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে থাকে। তখন শোক, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ, দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্য সমস্তই হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র সেই পরম মহিমাময়ের চিন্তাই সমস্ত হৃদয়টা অধিকার করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থাকেই সাধুরা মুক্ত-অবস্থা বা মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। তাই বলিতেছি, ধর্ম্মমার্গেও ত্রিবেণী "প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান" এবং এই তিনের সংযোগই মুক্তিরূপ "ত্রিবেণী-সঙ্গম"।

শান্তিমার্গেও ত্রিবেণী—শম, দম, তিতিক্ষা। এই তিনের সংযোগ ব্যতিরেকে শান্তি লাভ ঘটে না। যিনি যেরূপভাবেই শান্তিলাভের চেষ্টা করুন না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মানসিক প্রবৃত্তি সমুদয়কে দমন করিবার

ক্ষমতা না জন্মিয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি সর্ব্বজীবে বা সর্ব্বভূতে সমান-ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছেন, বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি কর্ম্মসংযোগ দ্বারা বিভুলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেছেন, কিম্বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ক্ষমা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না। ইহা রাজ-অট্টালিকায় বা দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে মিলে না; জন-সমাগম-শূন্য গহন কাননে বা দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরে পাওয়া যায় না। ইহা অর্থ বা খ্যাতির মধ্যে অবস্থান করে না। মনুষ্য-হৃদয়ই ইহার উৎপত্তি-স্থান এবং সেইস্থানেই সম্যক্‌রূপে ভোগ বা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, সাধন বা সবিশেষ অভ্যাস দ্বারা সৃজন করিয়া লইতে হয়, এবং সেই সাধনা বা চেষ্টাই শম, দম ও তিতিক্ষা এই তিনের অভ্যাস-জনিত মধুর পরিণাম; আবার এই তিনের সংযোগই শান্তি-মার্গে মধুর ত্রিবেণী-সঙ্গম।

সৃষ্টি-অঙ্কেও ত্রিবেণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা রূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন। বিষ্ণু সেই সৃজিত চরাচরকে পালন করিতেছেন, কেন না তিনি পালনকর্ত্তা; আর মহেশ্বর মহারুদ্ররূপে সেই সুযত্ন-সৃজিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কি সুন্দর সমাবেশ! একদিকে যেমন অবিরাম গতিতে সৃজন ও পালন কার্য্য চলিতেছে, অন্যদিকে আবার তাহার ধ্বংসেরও সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। একই সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর ত্রিরূপে তিনটি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনটী বিভিন্ন রূপ যুক্ত-বেণীর ন্যায় তিনটী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরভাবে কার্য্য করিতেছেন; আবার এই তিনটী বিভিন্ন রূপের একত্র সমাবেশ সেই পরম কারুণিক মহাপুরুষ-রূপ পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সংবাদ।

বৰ্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলন-সময়ে তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল মহাশয় গুপ্তবংশের রাজা নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদকে দান করিয়াছেন। এই প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রাটি কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদ-ভবনে রক্ষিত হইয়াছে।

কুমিল্লা-সহরে এবার ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিয়াছিল, সভাপতি হইয়াছিলেন, নব্যভারতের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়।

রাওলপিণ্ডির পশ্চিমে সরাইকালা (কালাতিসরাই) নামক রেলষ্টেসন। মোগল বাদসাহদিগের আমলে এই সরাইকালা কাবুলে যাইবার পথে একটি প্রসিদ্ধ চটি বা সরাই ছিল। সরাইকালার এক ক্রোশ দূরে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরীর ভগ্নাবশেষ এখনও অতীতের বহন করিতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাইরেক্‌টার জেনারল গত মাঘমাসে এই ভগ্নস্তূপ খনন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কার। শুনা যাইতেছে, তিনি একখানি নূতন শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যাইবে।

টালচার প্যালেস হইতে তত্র্যত্য শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় এণ্ড সন্সের কেয়ারে বঙ্গের খ্যাতিমান্ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহার লিপিকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। টালচার মিত্ররাজ্য।

ব্রাহ্ম-আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের পত্নী "ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর জীবনী" নামক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

বরিশালে সরকারি 'কৃষিপ্রদর্শন ভবন' প্রতিষ্ঠিত হইবে। উদ্দেশ্য, নানাস্থান হইতে সমানীত কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য এই ভবন হইতে প্রদর্শিত হইবে। ব্যয়-ভার গভর্ণমেণ্টই রহন করিবেন।
